প্রকাশক ঃ
সুশীল কুমার ধাড়া পঁচাশিতম জন্মোৎসব কমিটির পক্ষে
সভাপতি ডঃ শঙ্করীপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়

প্রকাশকাল ঃ
১৭ই ডিসেম্বর, ১৯৫৯

প্রচ্ছদ ঃ
প্রণবেশ মাইতি

মুদ্রক ঃ
শ্রীমা প্রিন্টার্স
তমলুক
মেদিনীপুর

মা-বাবার স্মৃতিতে
যাঁরা আমাকে পড়তে শিখিয়েছিলেন
এবং রুবিকে
যিনি আমাকে এ লেখায় উৎসাহ দিয়েছিলেন

নিছক নিজের কথা বলতে এই রচনা নয়, আমার কথা খুব একটা বলবার মতো বলেও মনে হয় না। আমার জীবনের নানা পর্বে যাঁরা তাঁদের চরিত্রের বৈশিষ্ট্যে আমার অভিজ্ঞতাকে বর্ণময় করেছেন, তাঁদের কথা এবং তাঁদের সময়ের কথা এই রচনায় পাঠকের কাছে উপস্থিত করেছি। স্থানে স্থানে দু'-চারজন চরিত্রের কথাপ্রসঙ্গে অনিচ্ছাসত্ত্বেও নিজের কথা এসে গিয়েছে। সে জন্য আমি লজ্জিত।

বর্তমান-সম্পাদক বরুণ সেনগুপ্তের প্ররোচনায় এই রচনা। 'পদ্মপত্রে জলবিন্দু' সাপ্তাহিক বর্তমানে ধারাবাহিক প্রকাশিত হয়েছিল। এখন আনন্দ পাবলিশার্সের উদ্যোগে বই হয়ে বেরোল। বইটির ভাল-মন্দের দায় ওই দু'জনের।

পাকা সোনার ভরি বত্রিশ টাকা, ভাওয়াল সন্ন্যাসীর মামলা সবে শুরু হয়েছে, গান্ধীজির অসহযোগ আন্দোলন নিয়ে প্রবল উত্তেজনা। আমরা তখনও ফাউলকারি বলি, ফ্রায়েড এগকে বলি পোচ, মুরগি তখন গেরস্তের বাড়িতে ঢোকে না। পরের বছর মেদিনীপুর কলেজিয়েট স্কুলের প্রদর্শনীতে দুই কিশোরের গুলিতে নিহত হবেন জেলা ম্যাজিস্ট্রেট পেডিসাহেব। সেই সময়।

আমি আগের বছর স্কুলে ভর্তি হয়েছি। স্কুলের ছাত্রদের হাতের কাজের প্রদর্শনী হয়েছিল স্কুলবাড়িতে। জুতোর বাক্স কেটে তৈরি জেলখানায় গান্ধীজির হাঁটুমোড়া ছবি বসিয়ে দিয়েছি। সকালে মহা আনন্দের সঙ্গে দেখে এসেছি। আমার সেই হাতের কাজ যে ঘরে রাখা ছিল, সেই ঘরেই পেডি খুন হলেন সন্ধ্যায় হ্যাজাকের আলোয়।

শহরের বাতাস হঠাৎ ভারী হয়ে উঠল। কী হয়েছে আমাকে কেউ বলেনি। সব বাড়ির রাত্রি পর্যন্ত খোলা থাকা সদর দরজা ঝপ করে বন্ধ হয়ে গেল। আমাদের বাড়ির রোওয়াকের একপাশে সিমেন্টের বেঞ্চে কেউ বা কারা একটা কাচের বয়াম বসিয়ে পালিয়েছে। ছোটকাকা বেশ ভয় পেয়েছেন। কখন চুপিসারে বাইরে বেরিয়ে আর কারও বাড়ির সামনে সেটাকে বসিয়ে দিয়ে এলেন। অস্ফুটে বললেন, অ্যাসিড।

আমাকে তখনও ভয় ছুঁতে পারেনি।

বাড়ির ভেতরে সবাই চাপা গলায় কথা বলছে। আমার সন্ধ্যা হলেই চোখ জুড়ে আসে। এক সময় আমি ঘুমিয়ে পড়েছিলাম। সকালে ভাসা ভাসা শুনলাম, জেলা ম্যাজিস্ট্রেটসাহেব খুন হয়েছেন। বাড়ির আবহাওয়া কিঞ্চিৎ হালকা। কাকা অ্যাসিডের বয়ামটা যেখানে রেখে এসেছিলেন, সেখানে নেই। সবাই নিশ্চিন্তির নিশ্বাস ছাড়ল। আমি স্কুলে রওনা হলাম।

আমাদের বাড়ি থেকে স্কুল পাঁচ মিনিটের পথ। কিন্তু স্কুলে পৌঁছতে পারলাম না। পুলিশ পথ আটকে দাঁড়িয়ে আছে, কাউকে যেতে দিচ্ছে না। আমরা অন্য দিক দিয়ে স্কুলে ঢোকবার চেষ্টা করলাম। সেখানেও পুলিশ। স্কুল

ঘিরে পুলিশের বেষ্টনী। স্কুলের বন্ধুরা অনেকে জড়ো হয়েছে। শুনলাম, বকুল গাছের পাশে আমাদের ক্লাসঘরে, যেখানে আমার সেই হাতের কাজটা ছিল, সেই ঘরেই কারা দু'জন গুলি করে পেডিসাহেবকে। তারপর হ্যাজাক লণ্ঠনে গুলি মেরে অন্ধকার করে দিয়ে পালিয়ে যায়। আমার বড় কষ্ট হয়েছিল। আমার অমন হাতের কাজটা কেউ দেখতে পেল না।

স্কুল বন্ধ থাকল পরের ক'দিন। গান্ধীজি লবণ আইন ভঙ্গ করার জন্য ডাণ্ডি রওনা হলেন।

দুপুরে পাঁচ বাড়ির গিন্নিরা সংসারের কাজ মিটিয়ে কোনও বাড়ির ছাদে রোদের দিকে পিঠ করে মাদুর বিছিয়ে বসেন। ততক্ষণে গোমো প্যাসেঞ্জারে খবরের কাগজ এসে গিয়েছে শহরে। ভাওয়াল সন্ন্যাসীর মামলা নিয়ে গিন্নিরা উত্তেজিত আলোচনা শুরু করেন। ভাওয়াল মেজোরানির স্বপক্ষে বলার কেউ নেই, তাঁর চরিত্র নিয়ে রসালো মন্তব্যের ত্রুটি থাকত না। ইঙ্গিতময় হাসাহাসি হত। মানে বুঝতে আমার অসুবিধা হয় না। চরিত্র ভাল না হওয়ার মানে কী, কেউ আমাকে বলে দেয়নি। কিন্তু সব বুঝতে পারি। আমি ছোট বলে আমার সামনে আদিরসের কথা বলতে কারও সংকোচ হয় না। আমার বয়স দশ? এগারো?

গরমের ছুটিতে আমি সারা দুপুর রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের গল্পগুচ্ছ পড়ি। মা'র ঘরের তাকে সামান্য কয়েকটি বইয়ের মধ্যে থাকত রবীন্দ্রনাথের গল্পগুচ্ছের চার খণ্ড। এমনিতে বড়দের বই পড়া বারণ, কিন্তু রবীন্দ্রনাথ সেই হিসেবের বাইরে। মা কোনওদিন বারণ করেননি। যখনই স্কুল বন্ধ থাকে, আমি গল্পগুচ্ছ খুলে বসি। সব বুঝতে পারছি তা নয়। মাস্টারমশায় গল্পটা আমার খুব ভাল লেগেছিল। এইভাবেই একদিন নষ্টনীড় পড়লাম। খুব ভাল লেগেছিল এমন মনে পড়ে না।

বছর তিনেক পরে কলকাতায় পড়তে এলাম। প্রেসিডেন্সি কলেজে ভর্তি হব। বাবা সঙ্গে করে নিয়ে এলেন। তিনি নিজেও এই কলেজে পড়েছেন। তাঁর সহপাঠীরা কেউ কেউ এখন অধ্যাপক। তাঁদের দু'-একজনের সঙ্গে দেখা করলেন বলে সময় বেশি লাগল। নইলে ফর্ম ভর্তি করে কলেজে ভর্তি হতে পনেরো মিনিটও লাগত না। পাশের প্যারীচাঁদ সরকার স্ট্রিট পার হয়ে হিন্দু হস্টেলে এলাম বাবার সঙ্গে। এত বড় হস্টেল আগে দেখিনি। মাঝখানে খেলার মাঠ, তিনদিকে বাড়ি। হস্টেলের সুপারিনটেন্ডেন্ট বাবার সহপাঠী। সেখানেও

সময় লাগল না, একজন এসে ঘরের নম্বর বলে দিয়ে গেল। পরে আমারও যেমন হয়েছিল, এই হস্টেলের অন্ধিসন্ধি জানতাম, বাবাও তেমনি নিশ্চিতভাবে আমাকে হস্টেলের দোতলার চার নম্বর ওয়ার্ডে পৌঁছে দিলেন। আজ দেখে গেলাম। কাল বিকালে বাক্স-বিছানা নিয়ে এসে ঘরে ঢুকব।

কলকাতা আমার কাছে নতুন জায়গা নয়। বছরে একবার-দু'বার আসা হয়ই। গরমের ছুটিতে এসে বড়মামার দু'হাত ধরে আমি, আমার সমবয়সি ছোটমামা শেষ বিকালে ট্রাম রাস্তা পার হচ্ছি। তখন রাস্তা ধোওয়া হচ্ছে। উড়িয়া মজুররা মস্ত একটা ক্যানভাসে মোড়া নল হাইড্রান্টে লাগিয়ে রাস্তায় জল দিচ্ছে। পটপট শব্দ হচ্ছে। রাস্তা থেকে গরম ভাপ বাষ্পের মতো উঠছে। গাড়ির চলাচল, মানুষের যাতায়াত কিছুই ব্যাহত হচ্ছে না। কেমন বিচিত্র দক্ষতায় নলের মুখ ঘুরিয়ে নিচ্ছে, কারও গায়ে ছিটে লাগছে না। রাস্তা পার হয়ে শ্রীমানি বাজারের দক্ষিণ কোণে বিহারির দোকানে যাচ্ছি আমরা। শনি বা রবিবার বড়মামা কলকাতায় থাকলে এটা আমাদের রুটিন। দোকানের সামনে বিহারি বড় একটা কড়ায় চপ, কাটলেট ভাজছে। পাশেই একটা ছোট ঘরে অয়েলক্লথ মোড়া দুটি কাঠের টেবিল। গুটি ক'য় টিনের চেয়ার।

বড় কড়ায় বিচিত্র ফুলঝুরি কেটে তেলের মধ্যে চপ-কাটলেট ভাজা হচ্ছে। সরষে তেলের সে সৌরভ আমাদের ক্ষুধা তীব্রতর করছে। আমরা অধৈর্য। কাচের ভিজে রেকাবিতে যখন সেই চপ আর কাটলেট পরিবেশন হল, তখনও খাবারে ধোঁওয়া উঠছে। আমাদের তর সইছে না, এক খণ্ড মুখে দিয়ে হাঁ করে হাওয়া নিয়ে ঠান্ডা করছি। বড়মামা প্রশ্রয়ের চোখে আমাদের দিকে তাকিয়ে আছেন। বিহারির দেওয়া খানিকটা কাঁচা পেঁয়াজ এবং তীব্র মাস্টার্ডও আমাদের মাতিয়ে দিয়েছে।

খাওয়ার পর বড়মামা চলে যাবেন। বাসে উঠে হাওড়া ময়দান। সেখান থেকে মার্টিন কোম্পানির ছোট রেলে উঠে সন্ধ্যার মুখে সেই গ্রামে পৌঁছবেন যেখানে আমার সুন্দরী বড় মামিমা আছেন।

শ্রীমানি বাজারের দক্ষিণ-পশ্চিম কোণে সেই বিহারির দোকান এখন আর নেই। থাকলেও তেল চিটচিটে অয়েল ক্লথের ওপর জলে ভেজা প্লেটে সেই চপ-কাটলেট আর খেতে পারব না। তবু বিহারিকে মনে আছে। তার দোকানেই আমার সঙ্গে কলকাতার অভিজাত খাদ্যের প্রথম পরিচয় হয়েছিল।

মেদিনীপুরের যতি সেনের দোকান ছিল আমাদের পাড়ায়। সেখানে

কাটলেট নয়, শুধু মাংসের চপ পাওয়া যেত। বিকালে তার স্বাদ গ্রহণ করবার জন্য ব্যাকুল হয়ে থাকতাম। দু'-পয়সায় একটা চপ, অর্থাৎ টাকায় বত্রিশখানা।

মেজোমামাকে বাদ দিয়ে কলকাতায় আমার ছ'মামা এক মাসি আর আমি, মোট আটজনকে বড়মামা যাবার সময় একটি টাকা দিয়ে যেতেন। সেই টাকা দিয়ে দিলখুশা কেবিন থেকে আটটি চপ আর আটটি কাটলেট কিনে আনা হত ওই আটজনের জন্য। দাম বেশি বটে দিলখুশার, কিন্তু চপ-কাটলেট আকারে বড়। সন্ধ্যায় ওই খাদ্য গ্রহণ করলে রাত্রে খাবার ইচ্ছা বিশেষ থাকত না। দিলখুশার কাটলেট আমার পরম প্রিয় ছিল। অত্যন্ত মিহি কিমা, কাঁচা লঙ্কার আশ্চর্য স্বাদ ও গন্ধ আজও স্মৃতি থেকে মুছতে পারিনি।

পয়লা জুলাই বিকালে রিকশ নিয়ে শতরঞ্চিমোড়া বিছানা আর একটা টিনের তোরঙ্গ নিয়ে হস্টেলে পৌঁছলাম। রিকশওয়ালাই আমার নির্দিষ্ট ঘরে মাল পৌঁছে দিয়ে গেল।

হস্টেলের মস্ত দেউড়ি পার হয়ে বাঁ দিকে খুদে খেলার মাঠের ধার দিয়ে ভীত সন্ত্রস্ত পায়ে এগোচ্ছি, দু'নম্বর ওয়ার্ডের বারান্দায় চেয়ারে বসে আছেন এক ব্যক্তি। বললেন, কী ভাই?

আমি বেশ ঘাবড়েই গিয়েছি, এখানে আমি নবাগত, কেউ আমাকে চেনে না, ইনি হঠাৎ আমার সঙ্গে কথা বললেন কেন। তাকিয়ে দেখলাম, আদুড় গায়ে চেয়ারে বসে এক ব্যক্তি আমাকেই সম্বোধন করেছেন। উজ্জ্বল গৌরবর্ণ, ছোট একটা ভুঁড়ি আছে মনে হল, নাকের নীচে কৃষ্ণবর্ণ সুপুষ্ট গোঁফ, খোলা বুকের ওপর মোটা পইতে।

তিনিই বললেন, কী ভাই, আর্টস না সায়েন্স? কোথা থেকে আসছ?

একটু থতমত খেয়ে গিয়েছিলাম, এখন সামলে নিয়ে বললাম, সায়েন্স, ফার্স্ট ইয়ার, সুকিয়া স্ট্রিট থেকে আসছি।

তিনি জিজ্ঞাসুচোখে তাকাতেই নিজের ভুলটা বুঝতে পারলাম। বললাম, মেদিনীপুর থেকে আসছি। কলেজিয়েট ইস্কুলে পড়েছি।

আরও কিছু বলতে যাচ্ছিলাম, তার আগেই তিনি বললেন, বলো কী? মেদিনীপুর? বাঃ। আমার অনেকদিনের ইচ্ছা মেদিনীপুরে যাবার। যাওয়া হয়নি। মেদিনীপুর আর তিব্বত, ওই দুটো জায়গায় যেতেই হবে।

মেদিনীপুরের সঙ্গে তিব্বতের কী সম্পর্ক বুঝতে পারিনি। জিজ্ঞাসা করব সে সাহস নেই। তার আগেই আমার বাক্স-বিছানা মাথায় রিকশওলা তাগাদা দিল, তার দেরি হয়ে যাচ্ছে।

গোঁফঅলা ভদ্রলোক বললেন, যাও, নিজের ঘরে যাও, কত নম্বর ঘর?

পরে জেনেছি, তাঁর নাম ভূদেব মুখার্জি।

ভূদেব সকাল বিকেল একতলার বারান্দায় কিছুক্ষণ একটি চেয়ার জুড়ে বসে থাকতেন। সামনে দিয়ে যে যাচ্ছে, তারই সঙ্গে আলাপচারী হচ্ছে একটু। এমন হাসিমুখে সহজ সুপরিচয়ের ভঙ্গিতে কথা বলেন যে কখনওই গায়ে-পড়া মনে হয় না।

কয়েকদিন বাদে আমাদের ক্লাসের একটি ছেলে এল। সে কোনও কারণে কলেজ খোলার দিন আসতে পারেনি। হাতে একটা টিনের সুটকেস, অন্য হাতে জলের কুঁজো। এক বগলে শতরঞ্চি-মোড়া ছোট বিছানা এবং অন্য বগলে ছাতা। বোঝাই যাচ্ছে, নতুন ছেলে। হয়তো কলকাতাতেও নতুন, অনিশ্চিত ভীরু পদক্ষেপে তিন নম্বর ওয়ার্ডের দিকে চলেছে।

ভূদেব তাঁর চেয়ারে বসেছিলেন। কী ভাই, এত দেরি কেন? কলেজ তো দু'তারিখে খুলে গিয়েছে।

ছেলেটা ভীষণ চমকে উঠল। কোনওক্রমে বলল, বৃষ্টি হচ্ছিল কিনা।

তার বগল থেকে বাঁশের বাঁটওলা ছাতাটা পড়ে গেল। দু'দিন হল কলকাতায় বৃষ্টি হয়নি। এবার তাই ভূদেবও চমকে গেলেন। বললেন, বৃষ্টি? কোথায় বৃষ্টি! ছেলেটি বলল, ব্রিজের ওপরেও। এত বৃষ্টি যে ট্রেন থেমে থাকল, ব্রিজ পার হল না বৃষ্টি থামা পর্যন্ত।

ভূদেব বললেন, ব্রিজ কি খোলা ছিল? তার সঙ্গে ট্রেনের কী সম্বন্ধ?

ছেলেটি অত্যন্ত নার্ভাস হয়ে বলল, বিশ্বাস করুন সত্যি খুব বৃষ্টি হচ্ছিল, ট্রেনের ড্রাইভার সারা ব্রিজ পার হতে ভয় পাচ্ছিল।

এতক্ষণে বোঝা গেল। ভূদেব হাওড়া ব্রিজের কথা বলছেন। ছেলেটি বলছে পদ্মার ওপরে সারা ব্রিজের কথা।

ভূদেব বললেন, আমাকে একবার সারা ব্রিজ দেখে আসতে হবেই। অনেকদিনের ইচ্ছে।

ছেলেটি বলল, তিন নম্বর ওয়ার্ডে যাব।

ভূদেব আঙুল তুলে দিক নির্দেশ করে দেওয়াতে ছেলেটি ছাতা কুড়িয়ে

নিয়ে তিন নম্বর ওয়ার্ডের দিকে দ্রুত চলে গেল। যাবার আগে ভূদেব আবার বললেন, অনেকদিন সারা ব্রিজ দেখার ইচ্ছে।

ভূদেব নবাগতদের সাহায্য করতে চাইতেন, কূট প্রশ্ন করা তাঁর স্বভাবে ছিল না। সকলের সঙ্গে কথা বলতে ভালবাসতেন। সারা সকাল ও অপরাহ্ণে বাইরে বসে থাকলেও, শুনেছি ছাত্র ভাল ছিলেন। লেখাপড়ার খামতি ছিল না।

মাস কয়েক পরে আমার ঠাকুরদার অসুখের খবর পেয়ে মেদিনীপুরে চলে গিয়েছিলাম। তাঁর মৃত্যুর পর অশৌচেব দশায় হস্টেল ফিরছি, খালি পা। ভূদেব যথারীতি তাঁর স্থায়ী আসনে বসেছিলেন, কী ভাই, কী হয়েছে? খালি পা কেন?

আমার কথা শুনে তৎক্ষণাৎ ভবকে ডেকে পাঠালেন। ভব আমাদের রান্নাশালের প্রধান।

বললেন, এই ছেলেটি একমাস নিরামিষ খাবে। আর রাত্রে ভাত খেতে নেই। নিরামিষ তরকারি আর লুচি করে দিয়ো।

পঞ্চাশ বছর পরে একবার কাজে আসানসোল গিয়েছিলাম। শুনলাম আঁদুলের ভূদেব মুখার্জি বড় 'সার্জেন'। বিলেত থেকে পাস করে এখানে প্র্যাকটিস করছেন। আসানসোলে খুব পসার।

বড় ইচ্ছা হয়েছিল ভূদেবের সঙ্গে দেখা করি। হল না। জানাও গেল না, ভূদেব তিব্বত মেদিনীপুর আর সারা ব্রিজে যেতে পেরেছিলেন কি না।

আমার হস্টেল জীবন শুরু হয়ে গেল। নতুন অভিজ্ঞতা, তার মোড়ে মোড়ে চমক। নতুন বন্ধু হল অনেক, কলেজ এবং হস্টেলে। হস্টেলের মাঠে ফুটবল খেলা হয়। আমাদের ওয়ার্ডের বি টিমের জন্য আট জন খেলোয়াড় পাওয়া গেল না। আমাকে বি টিমে খেলতে হবে। বড়দের নির্বাচন সিদ্ধান্ত অমান্য করতে পারিনি। সত্যি বলতে গেলে সেই প্রথম খেলার মাঠে নামলাম। স্কুলের মাঠে হকি স্টিক হাতে দৌড়াদৌড়ি করেছি, ব্যাটে বলে সংযোগ হত না সচরাচর, তাতে ক্ষতি নেই। কিন্তু এ যে টুর্নামেন্ট খেলা। খেলার পর বারান্দায় বসে ঘাম শুকানো, ভিমটোর একটা বোতল হাতে নিয়ে বীরত্বের প্রশমন। তারপর স্নান এবং রাত্রির ভোজনের জন্য তৈরি হওয়া।

চার নম্বর ওয়ার্ডে একটা ছোট ঘরে একা থাকব। মেদিনীপুরেই আমার একা শোবার অভ্যাস হয়ে গিয়েছিল। আমার বাবা পশ্চিমে চাকরি করেন, আমি ঠাকুরদা-ঠাকুমার কাছে মানুষ হয়েছি। বালক বয়সে তাঁদের কাছেই শুয়েছি। কৈশোরে দোতলায় আলাদা ঘরে একা শুতাম।

আমার শহরের সঙ্গে কলকাতার আকাশ-পাতাল তফাত। কলকাতার মানুষগুলো ভাল পোশাক পরে, খায়দায় ভাল, শহরটাও বেশ সুন্দর। রাস্তা ভাল, সন্ধ্যায় রাস্তার আলো জ্বালানো হয়। আমাদের শহরেও রাস্তার আলো শুরু হয়েছিল। ল্যাম্পপোস্ট অনেক দূরে দূরে, হ্যাজাক লণ্ঠন জ্বলত সন্ধ্যার দিকে, তার অল্প পরেই নিভে যেত। কলকাতার মতো সারা রাত আলো জ্বালানো থাকত না।

আমার বালক বয়সে মেদিনীপুরে বিজলি ছিল না। হ্যারিকেন জ্বেলে লেখাপড়া করতে হত। আমাকে অবশ্য সন্ধ্যায় বিশেষ পড়তে বসতে হত না। ঠাকুরদা, যাঁকে আমরা নাতি-নাতনিরা দাদা বলতাম, রাত্রে লেখাপড়া করতে পারতেন না। চোখের কোনও অসুবিধা ছিল। আমাদের পড়তে বসিয়ে দিয়ে

নিজের ঘরে শুয়ে থাকতেন। রাত ন'টা বাজলে তাঁর খাবার পরিবেশন হত। একেবারে ছোটবেলায় দেখেছি, ঘিয়ে ভাজা পাঁচটি লুচি খেতেন, সঙ্গে একটা সাদাসিধা তরকারি। বেশির ভাগ দিনই আলু ছেঁচকি। তারপর, এক গেলাস গরম দুধ। ক্রমশ, তাঁর খাওয়া কমতে লাগল, আমি যখন মেদিনীপুর ছাড়ি, তিনি রাত্রে দুটি লুচি খান।

আমাদের বাড়ির নিয়মকানুন খুব বিচিত্র। মধ্যবিত্ত গৃহস্থের বাড়িতে এমন নিয়ম-শৃঙ্খলা আমি আর কোথাও দেখিনি। দাদা অর্থাৎ ঠাকুরদা অতি প্রত্যুষে শয্যা ত্যাগ করতেন। শীত গ্রীষ্ম নির্বিশেষে। শৌচাদির পর স্নান হবে কুয়োতলায়। তখনও শহরে বিজলি বাতি আসেনি। অন্ধকারে মস্ত এক পিতলের ঘড়ায় কুয়ো থেকে জল তুলে স্নান করতেন। বাড়িতে জলের কল আসবার পর, এই পরিশ্রম আর করতে হত না। কল খুললেই জল। বাসি ধুতিটি ধুয়ে, কাচা একটি ধুতি পরে ঠাকুরঘরে গিয়ে বসতেন। আমরা বলতাম দাদা আহ্নিক করছেন। আহ্নিক, না জপ, না প্রার্থনার অন্য কোনও ধারা, তখন বুঝিনি, এখনও জানি না। অন্ধকার সেই ক্ষুদ্র ঠাকুরঘরে, মশার কামড় অগ্রাহ্য করে প্রায় একঘণ্টা আহ্নিক করতেন। কোনও দেবদেবীর মূর্তি বা ছবি ছিল না। কোনও মন্ত্র উচ্চারণ বা স্তোত্রপাঠ শোনা যেত না। কার কাছে কী প্রার্থনা করতেন, কী নিবেদন করতেন, কোনওদিন তার উল্লেখও করেননি। শুধু দেখেছি কখনও কোনও মন্দিরে যান না। এমনকী নানা পূজাপার্বণে ঠাকুর দেখতে যাননি কখনও। মন্দিরের সামনে দিয়ে আমরা যেমন যন্ত্রচালিতবৎ হাত উঁচু করি নমস্কারের ভঙ্গিতে, তাও কখনও দেখলাম না।

দাদার যখন আহ্নিক শেষ হল তখন সবে সূর্যের আলো দেখা দিয়েছে। আমাদের ঘরে ঢুকে প্রথমে তাঁর দুটি শীতল, কোমল হাত আমার গালে দিয়ে বলেছেন, ওঠ ভাই বেলা হয়ে গেছে। আমি সহসা উঠতে পারি না, তখন দু'চোখে ঘুম জড়িয়ে আছে, ঠাকুমার গায়ে হাত দিতেই তিনি জেগে উঠলেন, শয্যা ত্যাগ করলেন, এবার তাঁর নিত্যদিনের কাজ শুরু হবে।

ঠাকুমা প্রথমে বাড়ির সংলগ্ন বাগানে পনেরো-কুড়ি মিনিট পায়চারি করবেন, দু'-একটা গাছের পরিচর্যা করবেন, তারপর স্নানাদি সেরে, তিনি যখন পূজায় বসবেন, ততক্ষণে আমি তৈরি হয়ে গিয়েছি। দাদার সঙ্গে সদরে গিয়ে বসেছি। বইখাতা নিয়ে।

বাড়ির কাজের মানুষেরা ঝাঁট দেওয়া, ধোওয়া মোছা শেষ করেছে, বাড়ির এক প্রান্তে মেজোকাকার ঘরের সবাই উঠে পড়েছে, দিনের সংসার যাত্রা শুরু হয়ে গিয়েছে। এবারে, উনুনে আগুন দেওয়া হবে। মেজোকাকার ঘর থেকে প্রাইমাস স্টোভের শব্দ শোনা যাচ্ছে। চা তৈরি হবে, একমাত্র মেজোকাকাই এ বাড়িতে চা পান করেন।

ছোটকাকা উঠবেন অনেক পরে। ন'টা না বাজলে তাঁর ঘুম ভাঙে না। দাদা তখন আবার স্নানের জন্য তৈরি হচ্ছেন। আবার সেই অনুক্রম, স্নানের পর পরিধানের ধুতিটি স্বহস্তে কাচবেন। এবারে আর ধুতি নয়, এবার পরবেন সাদা প্যান্ট, কোর্টে যাবার পোশাক। স্নান করার আগে ঠাকুমা এক গেলাস শরবত পাঠিয়ে দিয়েছেন, সামান্য লেবুর রস মেশানো, আমিও তার ভাগ পেয়েছি।

দাদা সাদা শক্ত কলারের শার্ট পরে স্টাড বোতাম লাগালেন, এবারে খেতে বসবেন। ঠাকুমা মেঝেতে দাদার জন্য আসন পেতে তৈরি, রান্নার যে লোক ছিল, সে একটা পিতলের ভারী ছোট হাঁড়ি এবং কাঁসার থালা ও জলের গেলাস দিয়ে গেল। দাদাকে আমি কোনওদিন সে জল খেতে দেখিনি। ঠাকুমা হাঁড়ি থেকে আতপ চালের তপ্ত সফেন ভাত বের করে ফেলেছেন, পাশের একটা ছোট রেকাবিতে মুগের ডাল ভাতে এবং আলু মাখা হচ্ছে, একটা ছোট বাটিতে সামান্য গব্যঘৃত। এই তাঁর আহার, কদাচ একটা উচ্ছে বা কাঁকরোল যুক্ত হবে। আমরা ছোটরা রেকাবি নিয়ে প্রসাদের আশায় বসে আছি। ভাত এবং ভাতের সঙ্গে যা থেকে যাবে, ছোটকাকার জন্য থাকবে। ছোটকাকা তৈরি হয়ে প্রথম ওই দিয়ে জলযোগ করবে। এই প্রক্রিয়ার কোনও ব্যতিক্রম ছিল না। খুব গরমের সময় কাঁচা আমের ফটিক ঝোল যুক্ত হত, যাকে আমরা হালকা অম্বল বলে জানতাম। ভোজনান্তে এক বাটি সেই অম্বল দাদা পান করতেন; গরম কমলে, অথবা আম পেকে গেলে এই পদটি নিঃশব্দে বর্জিত হত।

দাদা খড়ম ছেড়ে জুতো পায়ে শার্টের ওপর আচকান চাপালেন, রুপোর ঘড়ির চেন অলংকারের মতো বাইরের দিকে ঝুলতে লাগল। বেশির ভাগ কাগজপত্র মুহুরি নিয়ে গিয়েছে, বাকি যদি কোনও মামলার কাগজপত্র থাকে হাতে নিয়ে ঠাকুমার দিকে একবার ভরা দৃষ্টিতে তাকিয়ে দাদা বেরিয়ে গেলেন। কিছুটা হেঁটে মল্লিকের চক অথবা গোলকুঁয়োর চক থেকে ঘোড়াগাড়ি ধরবেন।

এবারে আমাদের জীবনযাত্রা শুরু হল। আমার স্কুলের সময়। আলুভাজা,

ডাল, ভাতের অধিক তৈরি হত না, মাছে আমার রুচি নেই, হয়তো বাজারও তখন পর্যন্ত এসে পৌঁছয়নি, আমি স্কুলে রওনা হয়ে গেলাম।

রাত্রের যে বাসি লুচি দিয়ে আমি ব্রেকফাস্ট করেছি তার সব আমি খেয়ে না ফেললে, ছোটকাকাও তার ভাগ পেতেন। কিন্তু তা ছাড়া তাঁর বিশেষ ব্রেকফাস্ট ছিল। গিরি ময়রানির দোকান থেকে আলুর চপ বেগুনি এসেছে, ঠাকুমা, কাকিমা, ছোটকাকা মুড়ি দিয়ে জলযোগ সারছেন। ছুটির দিনে আমিও তার ভাগ পাব।

আমার শৈশবে মেজোকাকা চাকরি করতেন না। নানা অভিনব ব্যবসা করতেন। তার সব পরের পর অর্থকরী না হওয়াতে মেজোকাকা চাকরি নিয়েছিলেন মিউনিসিপ্যালিটিতে। রোজ লেট হয়ে যেতেন।

এতক্ষণে বাজার এসে গিয়েছে। ঠাকুমা, কাকিমা এক একটা বঁটি ঘিরে বসেছেন। সামনে এক গামলা জল। আনাজ কেটে কেটে তাতে ফেলা হচ্ছে। রান্নার লোক সে-সব নিয়ে যাচ্ছে। ঝি মাছ কুটছে। তার বয়স কম, কথা বলে বেশি। মাছের নানা খণ্ডিমা করছে।

এর পর পানসাজা। কত পানসাজা হত জানি না। কিন্তু তার স্বাদ ছিল খুব। বর্ষাকালে কেয়াফুল দিয়ে সুগন্ধি খয়ের তৈরি করা হয়েছে বাড়িতে, সুপুরি কাটা হল যত্ন করে। কমলা লেবুর খোসাগুলিকে রাখা হয়েছে পানে দেবার জন্য। ছোট এলাচ, বড় এলাচ, সামান্য মৌরি, আর কর্পূর। ঠাকুমা যখন আহারান্তে পান খেতেন তখন তাঁর রাঙা টুকটুকে ঠোঁট, পানের সৌরভ আমাকে মাতিয়ে দিত। কাকিমা আবার একটু দোক্তাও নিতেন পানের সঙ্গে। বিশেষ কোনও দোক্তা যেন তাঁর পছন্দ ছিল। এক পয়সায় এক প্যাকেট পাওয়া যেত, নিশ্চয় তিন চার দিনের জন্য যথেষ্ট।

দুপুরে ভোজন অত্যন্ত দেরিতে হলেই, অত বেলাতে যে বাড়িতে জলখাবার হয়েছে। ছোটকাকা দুটোর আগে খেতে চাইতেন না, হয় বন্ধুদের সঙ্গে ব্রিজ খেলছেন, ব্রিজ খেলে তিনি অনেক মেডেল পেয়েছেন। নয় কোনও বিশিষ্ট নভেল পড়ছেন, ছেড়ে উঠতে পারছেন না। মেজোকাকাও আড়াইটের আগে অফিস থেকে ফিরতে পারতেন না। সব শেষে আসতেন সরকারদাদু। তিনি মিউনিসিপ্যালিটির বড়বাবু, পৃথিবীর সব বোঝা তাঁর ঘাড়ে। তিনি না থাকলে শহরটা বোধহয় অচল হয়ে যেত। সরকারদাদুর এ-বিশ্বাস অবিচল ছিল।

সরকারদাদু যখন খাবেন, ততক্ষণে ভাত ঠান্ডা কড়কড়ে, তার ওপর আধছটাক প্রায় ঘি ঢেলে দিতেন, তাঁর নিজের জন্য নিজের কেনা একটা

বোতল থেকে, কখনও দেশ থেকেও ঘি আনতেন, তখন আমরাও ভাগ পেতাম। ডালও হিম হয়ে গেছে, তরকারিও ঠান্ডা। সরকারদাদু খাবার পর এক ঘটি জল খেয়ে ঠাকুমার দালানে এসে বসবেন। ঠাকুমা সেখানে বসে সরকারদাদুর অপেক্ষায় হাই তুলছেন। সরকারদাদু এসে একটা তক্তপোশের এক ধারে বসে ঠাকুমার সঙ্গে গল্প করবেন কিছুক্ষণ। তাঁর সব গল্প শুধু তাঁর অফিস নিয়ে। অর্থাৎ মেদিনীপুর মিউনিসিপ্যালিটি। তিনি না থাকলে, তাঁর সব দিকে নজর না থাকলে যে কত ক্ষতি হয়ে যেত শহরের তার বিশদ বর্ণনা করতে করতে তাঁর চোখ ঘুমে জুড়ে আসত। একটু পরেই তিনি ওই তক্তপোশে গড়িয়ে পড়তেন, তাঁর নাক-ডাকা শোনা যেত। ঠাকুমা তখন তাঁর চেয়ারটি ছেড়ে পাশেই শোবার ঘরে খাটের ওপর শীতলপাটি পেতে শুতেন। তাঁর চোখে বই পড়ার চশমা আর দু'ভলুম কালীপ্রসন্ন সিংহের মহাভারতের এক খণ্ড। কোথা থেকে পড়া শুরু হত, তার বোধহয় কোনও নিশানা থাকত না। ঠাকুমা কিছুক্ষণ মহাভারতের খানিকটা পড়ে, ওইখানেই ঘুমিয়ে পড়তেন।

আমি পরে সেই মহাভারত পড়ে দেখেছি। সব বাক্যের মানে করতে পারি না। ব্যবহৃত শব্দগুলিও দুরূহ। তবু সেই বই আমার ছোটবেলা থেকে কলেজে পড়তে চলে যাওয়া পর্যন্ত ঠাকুমাকে নিয়মিত পড়তে দেখেছি।

ব্যতিক্রম শুধু হত শীতকালে। বিশেষ করে যদি বড়ি দেওয়ার দিন হয়। পশ্চিম ছাদে মাদুর পেতে শুয়ে বসে বড়ি পাহারা দেওয়া হত। নানা গালগল্প হত, আশপাশের বাড়ির মেয়েরাও আসতেন। ভাওয়ালের মেজোরানি কয়েক বছর তাঁদের গল্পগাছার সিংহভাগ জুড়ে থাকতেন। সেদিন ঠাকুমার মহাভারত পড়া হত না।

শীতের বেলা তাড়াতাড়ি ফুরিয়ে আসত। ততক্ষণে দাদারও কোর্ট থেকে ফেরার সময় হয়েছে। তিনি আদালতের পোশাক ছেড়ে আবার স্নানের জন্য তৈরি হয়েছেন। স্নানের পর আবার ঘণ্টাখানেক মশা ভর্তি অন্ধকার ঠাকুরঘরে নীরবে আহ্নিক করবেন।

তখন বুঝতে পারিনি, পরে আমার সন্দেহ হয়েছিল, দাদা দীক্ষিত না হলেও মনেপ্রাণে বোধহয় ব্রাহ্ম ছিলেন। দাদার জন্যই আমার বাল্যকাল থেকেই রবীন্দ্রসংগীতের সঙ্গে প্রগাঢ় ভালবাসা হয়ে গেল। শহরে ব্রাহ্ম সমাজের একটি বাড়ি ছিল গোলকুঁয়ার চকের কাছে। সারা বছর বাড়িটা অবহেলায় মলিন, কিন্তু কোনও ব্রাহ্ম উৎসবের সময় হঠাৎ ফুলে-পাতায় সজ্জিত হয়ে উঠত। বাইরে

মস্ত মস্ত ফেস্টুন। ছোট হলের দেওয়ালে চারপাশে লেখা একমেবাদ্বিতীয়ম্। দাদা সমস্ত ব্রাহ্ম অনুষ্ঠানে যোগ দিতেন এবং আমি সব সময়েই তাঁর সঙ্গে সেখানে গিয়েছি। প্রার্থনা হত, ভারী ভারী গলায় কয়েকজন বক্তৃতা করতেন। আমার মন নেই সেদিকে, উপাসনা শুরু হবার আগে এবং শেষে অব্যর্থ এবং মাঝে মাঝে বক্তৃতার ক্ষণিক বিশ্রামে রবীন্দ্রসংগীত গাইতেন শহরের আধুনিকা সুসজ্জিতা, যুবতী মেয়েরা। এই দৃশ্য আমাদের শহরে বিরল, তার ওপর গাইয়েদের যৌবন এবং গানের মাধুর্য আমাকে আপ্লুত করে রাখত।

কলকাতায় পড়তে আসবার আগেই আমি লক্ষ করেছিলাম, কর্নওয়ালিস স্ট্রিটের ওপর আদি ব্রাহ্মসমাজের বাড়ি। সেখানেও নানা উৎসব হত। তা ছাড়া প্রতি রবিবারে উপাসনা হত। শালীন সুসজ্জিত নারী পুরুষ আসতেন। রবীন্দ্রনাথের গান হয়। সভাগৃহ যেন অন্য এক মাত্রায় উন্নীত হত। হস্টেলে ভর্তি হবার পরের রবিবারই আমি ব্রাহ্ম সমাজে গিয়ে হাজির হলাম। মার্জিত পোশাক-পরা নরনারীর মধ্যে আমাকে কিঞ্চিৎ বিসদৃশ দেখাচ্ছিল। তাই পিছন দিকেব একটা বেঞ্চিতে আসন নিয়েছিলাম। কিছুক্ষণ পরেই সভা শুরু হয়ে গেল। সেখানে প্রার্থনায় আসা, এক গুচ্ছ যুবতী গান ধরলেন। তখন আমার চোখে যুবতী মানেই সুন্দরী, তার ওপর ওই গানের শব্দ ও সুরের মাধুর্য আমাকে মুগ্ধ করেছিল। এরপর আচার্যের দীর্ঘ ভাষণ হল। তারপর সমাজের কাজকর্ম নিয়ে কিছু আলোচনা হল। গান আর হয় না। বিরক্ত নিরাশ হয়ে এক সময় উঠে এলাম। সভা তখনও চলেছে।

প্রথমদিন লক্ষ করিনি, পরের রবিবার দেখি হলের নানা স্থানে বোর্ডের ওপর লেখা, 'কেবলমাত্র প্রার্থনার শেষ পর্যন্ত যাঁহারা থাকিবেন, তাঁহাদের জন্য।' অস্বস্তি হচ্ছিল। প্রথম দুটি গানের পর আর কোনও গান হয় না, আচার্যের দীর্ঘ ভাষণ শেষ হবার আগেই উঠে এলাম।

তারপরের রবিবার আবার গিয়েছি। ক্রমশ সাহস বেড়েছে, দেওয়ালের সাবধান বাণী অগ্রাহ্য করে একটু এগিয়েই বসেছি, যদিও ধারের দিকে, যাতে কাউকে বিরক্ত না করে চলে আসা যায়। নিবিষ্টমনে গান শুনছি, গাইয়েদের তারিফ কবছি মনে মনে, হঠাৎ দেখলাম এক ভদ্রলোক হলের দরজাগুলি ভেজিয়ে দিচ্ছেন। বুঝতে পারলাম, আমার মতো শুধু গান শোনার ভক্তদের আটকে রাখার ব্যবস্থা হচ্ছে। গানের মধ্যেই সব দরজা বন্ধ হবার আগেই

বেরিয়ে এলাম। এরপর আর যাইনি, দু'-তিনটে গান শোনার জন্য অতক্ষণ উপাসনায় সময় দেবার ইচ্ছা আমার ছিল না।

হস্টেল জীবন ভাল লাগে, তবু বাড়িব আবহাওয়ার অভাব বোধ করি। শনিবার দুপুরে ক্লাস শেষ হলে মামাবাড়ি চলে যাই। চার পয়সা ভাড়া লাগে ফার্স্ট ক্লাসে। মামাবাড়ি অক্সফোর্ড মিশন হস্টেলের কাছে। সেইখানেই ছোটবেলা হস্টেলবাসীদের দেখে আমার খুব লোভ হত হস্টেলের। স্বাধীন, নির্বিরোধ, সমস্তক্ষণ হাসিখেলা, পৃথিবীর যত সুখ ওইখানে। তা ছাড়া বড়মামা মাজু ফিরে যাবার আগে আমাদের দোকানে নিয়ে যাবেন, তার প্রবল আকর্ষণ।

কলকাতার নানা ভোজের সঙ্গে বড়মামাই আমার পরিচয় করিয়ে দিয়েছিলেন। তাঁর সঙ্গেই দু'-চারবার চাচার হোটেলে গিয়েছি। সেখানকার ফাউল কাটলেট তখন উত্তর কলকাতাকে মাতিয়ে রেখেছিল। বড়মামাই সেদিন আমাদের দিলখুশা রেস্টুরেন্টে নিয়ে গেলেন। এখানে চেয়ার, টেবিল ভাল, বিহারির দোকানের মতো ময়লা, ভাঙাচোরা নয়। সেখানে পরিচয় হল দিলখুশার, মটন চপ ও মটন কাটলেটের সঙ্গে। এমন অমৃতসম ভোজ্য আমার অজ্ঞাত ছিল এতদিন ভেবে খুব দুঃখ হয়েছিল।

প্রথম দিন হস্টেলে খাওয়ার ঘরে গিয়ে ভারী অস্বস্তিতে পড়েছিলাম। আমার এক ক্লাস ওপরের এক ছাত্রের সঙ্গে আলাপ হল। সে সঙ্গে করে নিয়ে গেল। মাঠ পেরিয়ে আলাদা একটা বাড়িতে নীচের তলায় দুটি খাওয়ার ঘর। আমার সঙ্গী মতি আমাকে যে ঘরে খেতে নিয়ে গেল তার দরজার মাথার ওপর লেখা 'ব্রামিনস ওনলি', শুধু ব্রাহ্মণদের জন্য। মতিব পদবি পাল, সে ব্রাহ্মণ নয়, তবু অনায়াসে ওই ঘরে ঢুকে গেল। আমি খুব ইতস্তত করে তার পাশে স্থান নিলাম। মেঝেতে আসন পাতা, সামনে থালা উপুড় করে রাখা রয়েছে। পরিবেশনকারীরা অত্যন্ত তৎপর। যে যখন আসছে বসে যাচ্ছে, পরিবেশনকারীদের খেয়াল থাকছে, কোনও পদ বাদ পড়ছে না। ভাত, ডাল, এক চামচ গাওয়া ঘি, একটা ভাজা, দুটি মৎস্য খণ্ডের ঝাল অথবা কালিয়া এবং শেষে দই। চমৎকার রান্না। প্রথম দিনেই ভাল লেগে গিয়েছিল।

ভুল ঘরে বসে খাওয়ার জন্য মনে বেশ সংকোচ ছিল সেটা কাটিয়ে উঠতে ক'দিন সময় লেগেছিল। পাশের ঘরটার দরজার মাথায় বুঝি লেখা ছিল, কায়স্থদের জন্য। দেখলাম এ-সব নিয়ে কেউ মাথা ঘামায় না। যে ঘর খালি আছে, যেখানে বন্ধুবান্ধবদের দল সেই ঘরে বসে খাওয়া হত।

আমার মফস্‌সল শহরে দেখেছি, পালা পার্বণ উৎসবে ব্রাহ্মণদের জন্য স্বতন্ত্র পাতা পড়ে। বাকি অব্রাহ্মণরা অন্যত্র। কলকাতার অন্য রীতি আমার মনোমতো হয়েছিল। পরে দেখেছি, কলকাতার মানুষ যেমন স্বার্থপর হয়, অন্যের ওপর টেক্কা দেবার জন্য সর্বদা ব্যাকুল, তেমনি সমাজের অন্যান্য বাধা নিষেধগুলি অগ্রাহ্য করতে পারে অনায়াসে। এটা বোধহয় বড় শহরের চরিত্র লক্ষণ। এইসব অর্থহীন রীতি ভাঙবার জন্য যে একটা মহাযুদ্ধ আসছে, তখন এ-কথা বুঝতে পারিনি। পথেঘাটে তখনই মেয়েদের দেখা যাচ্ছে। ট্রামে বাসে উঠে কেউ কেউ অফিসও যাচ্ছেন আসছেন। তখনও মেয়েদের জন্য স্বতন্ত্র আসন। সে আসন ভর্তি থাকলে পুরুষেরা আসন ছেড়ে দিয়ে উঠে দাঁড়াচ্ছেন।

কলকাতার হস্টেলে এসে আমার সব থেকে বড় প্রাপ্তি হল, আমি ইংরেজি ও বাংলা পড়তে শিখলাম। বাংলা অবশ্য দেশে থাকতেও পড়েছি, সন্দেশ, রামধনু, মৌচাক মাসপয়লা হাতে পেলেই পড়ে ফেলতাম। স্কুল ছাড়বার সময় বোধহয় রংমশাল প্রথম প্রকাশিত হল। পত্রিকাটির নতুনত্ব আমাদের সবাইকে মুগ্ধ করেছিল।

মেদিনীপুরের বাড়িতে বই পড়ার আবহ ছিল না। বাংলা খবরের কাগজ আসতে আরম্ভ করেছিল ভাওয়াল সন্ন্যাসীর মামলার সময়। তার আগে শুধু অমৃতবাজার পত্রিকা আসত। ঠাকুমা যদিও নিয়মিত অশেষ মহাভারত পড়তেন। নীচে কাছারি ঘরের এক কাচের আলমারি ভর্তি কিছু পুরনো বই ছাড়া, পড়বার আর কিছু ছিল না। কাচের আলমারি খুলে বইগুলো মাঝে মাঝে নাড়াচাড়া করেছি—কিন্তু মনোমতো হয়নি বলে তাদের নামও মনে নেই। শুধু মনে আছে মিলটনের প্যারাডাইজ লস্ট ছিল। আর শেক্সপিয়রের দুটি তিনটি নাটক। এদের কোনওটাতেই দাঁত ফোটাতে পারিনি।

ছোটকাকা অবশ্য লাইব্রেরি থেকে নিয়মিত বই নিয়ে আসতেন। বাইরে যাবার সময় বইগুলি তুলে রেখে যেতেন, যাতে অর্বাচীন আমি নাটক নভেল না পড়ে ফেলি।

দোতলায় মা'র ঘরে দু'-তিন থাক বই থাকত শেলফে। সেখানেই গল্পগুচ্ছের দু'খণ্ড আমাব পড়া হয়ে গিয়েছিল। আমার বয়স তখন বারো-তেরো। রবীন্দ্রনাথের নাটক নভেল পড়ার বাধা ছিল না। মা'র পাশে শুয়ে গল্পগুচ্ছ পড়েছি। কিছু যে বুঝতে পারিনি, সেটা জানতে পারলাম কলকাতায় পড়তে এসে।

প্রেসিডেন্সি কলেজের একটি ত্রৈমাসিক ম্যাগাজিন ছিল। সেখানে কলেজের ছাত্র ও অধ্যাপকদের লেখা ছাপা হত। অশোক মিত্র বা নির্মল সেনগুপ্ত, আমার থেকে চার বছর ওপরে, দু'জনেই আই সি এস হয়েছিলেন। এঁদের একজন রবীন্দ্রনাথের নষ্টনীড় গল্পটির ওপর একটি পাণ্ডিত্যপূর্ণ প্রবন্ধ লিখেছিলেন।

সেই প্রবন্ধ পড়ে আমি তো হতবাক। আমার পড়া গল্পের মধ্যে এত কাণ্ড ছিল। বারো বছরের আমি ঘুণাক্ষরে বুঝতে পারিনি চারু আর অমলের সম্পর্কের কথা।

আমার বোধশক্তি বরাবরই কম।

এই এত বয়সে সেদিন টেলিভিশনে একটা বার্তালাপ শুনছিলাম বাংলা ছবির সফল এক অভিনেত্রীর সঙ্গে। সত্যজিৎ রায় প্রসঙ্গে অভিনেত্রী বললেন, মানিকমামা সব রচনাতেই আমাদের অন্ধ বিশ্বাস ও মূর্খ রীতিনীতিকে কশাঘাত করেছেন—এই জন্যই মানিকমামা স্বতন্ত্র।

সত্যজিৎ রায়কে মানিকদা না বলতে পারলে জানি, কোনও রচনাই উতরোয় না। অনেক রচনাতেই পড়েছি সত্যজিৎ রায়ের সম্বন্ধে প্রথম বাক্যের পরই তিনি আর সত্যজিৎ থাকেন না, মানিকদা, মানিক অথবা মানিকমামা হয়ে যান। যেন অমন নিকট, সম্বোধন করতে না পারলে তাঁর সম্বন্ধে লেখার অধিকারই থাকে না। আমার সে-সুযোগ হয়নি। এক ক্লাসে পড়েছি যদিও কিছুদিন, পরিচয় বন্ধুত্ব পর্যন্ত পৌঁছয়নি।

যাই হোক, ওই প্রসঙ্গে অভিনেত্রী আগন্তুক ছবিটির কথা তুললেন। আগন্তুক ছবিটি একাধিকবার দেখেছি। আমার মনে হয়েছে ছবিটি অপূর্ব। আগন্তুক নিঃসন্দেহে সত্যজিৎ রায়ের অন্যতম ভাল ছবি। এমন নির্ভার সুপরিচালিত, সুঅভিনীত বাংলা ছবি সত্যজিৎ রায়ও বেশি তোলেননি।

অভিনেত্রী শিউরে উঠে বললেন, আগন্তুকে সত্যজিৎ রায় আমাদের কী চাবুকটাই না মেরেছেন। মানিকমামার সব ছবিই অমনি।

আমি চমকে উঠেছিলাম। আগন্তুক, আমার ধারণায়, অতি মনোহর, পরিচ্ছন্ন সুস্থ স্বাভাবিক সমাজ ও জীবনের ছবি। তার মধ্যে যে তত্ত্বকথা আছে, আমি বুঝতেই পারি না, যার জন্য দর্শকদের চাবুক মারার প্রয়োজন হয়েছিল। অর্থাৎ আমার বোধশক্তি হয়তো সত্যিই কম।

বাবাকে মাঝে মাঝে কাজে আসতে হত কলকাতায়। আমি বাবাকে বললাম, হস্টেলে একটা ভাল লাইব্রেরি আছে। আমি বাংলা, ইংরেজি বই সব পড়ছি। সকাল সন্ধ্যা দিনে দু'বার বই বদলানো যায়।

বাবা আমাকে একটা 'উডহাউস সমগ্র' বই কিনে দিয়ে গেলেন। অকস্মাৎ ইংরেজি ভাষা তার সব অলংকার সব সৌন্দর্য নিয়ে যেন আমার কাছে ধরা দিল। একদিন, উঁচু ক্লাসের একটি ছেলে বলল, ইংরেজি পড়া শুরু করবার আগে ব্যারনেস অর্কজির স্কারলেট পিম্পার্নেল পড়লে আনন্দ পাবে, পড়াও সহজ হয়ে যাবে। এ যেন আমার কাছে আবার আলিবাবার গুহা তার সমস্ত সম্পদ নিয়ে উন্মুক্ত হয়ে গেল। তারপর থেকে ইংরেজি পড়া সহজ। বেছে বেছে প্রথম স্ক্যান্ডিনেভিয়ার লেখকদের রচনাগুলি ধরলাম, নুট হ্যামসন,

সেলমা লগেরলফ। এঁরা আদি রসাত্মক ঘটনার বর্ণনায় অকারণ কুণ্ঠিত হন না। আমার সদ্য কৈশোর শেষে এই সব বই এক আশ্চর্য পৃথিবী খুলে দিল। তারপর অবশ্য নির্বিচারে এলডাস হাক্সলে, বার্নার্ড শ ইত্যাদি পড়েছি। আমাদের ছাত্র জীবনে বার্নার্ড শ খুব ফ্যাশনেবল পাঠ্য ছিলেন। মস্ত মস্ত ভূমিকা বা প্রিফেসগুলি সুখার্জনে কিঞ্চিৎ অন্তরায় ঘটাত।

বাংলা পড়াও চলতে লাগল খুব। বাধাবন্ধহীন। যে বই পড়তে চাই লাইব্রেরি থেকে আনলেই হল। কেউ আটকায় না, কেউ বলে না, ছোটদের নবেল পড়তে নেই। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের রচনার সঙ্গে সেই পরিচয় হল। পরশুরামের রচনার সঙ্গে আগেই আমার ঈষৎ পরিচয় ছিল।

বাবা মেদিনীপুরে এলেই তাঁর বন্ধু মহলে পরশুরামের রচনার খুব আলোচনা হয়। আমি বইগুলো পড়বার আগেই জেনে গিয়েছি রায়বাহাদুর রাত্রে লুচির বদলে কচুরি খান, অথবা আমি মরছি টাকার শোকে আর আপনি বলছেন জোলাপ খেতে, অথবা স্পষ্ট দেখলুম মেমসাহেবের পরনে বাঁদিপোতার গামছা।

শোনা কথাগুলো এখন স্বচক্ষে পড়ে আনন্দের সীমা থাকল না।

কলকাতায় এসে বাংলা ও ইংরেজি সাহিত্যের সঙ্গে পরিচয়ের সঙ্গে আর একটি নব পরিচয় ঘটল। আমার বাবার সঙ্গে পরিচয়। আমি যেহেতু ঠাকুমা ঠাকুরদার কাছে থাকতাম, ছুটিছাটার সময় বাবা এলে তখনই দেখা হত। দেখাই হত। জানা হত কতটুকু। শুনেছিলাম, বাবা ইংরেজির ভাল ছাত্র ছিলেন। ইংরেজি জানেন খুব ভাল। লেখেন সুন্দর, বাংলা, সংস্কৃত, হিন্দিতে তাঁর গভীর জ্ঞান। তার ওপর উর্দু জানেন ভাল, সামান্য পারশিয়ানও জানেন। আমি তার সামান্যই পরিচয় পাই।

বাবাও মেদিনীপুর স্কুলে পড়া শেষ করে প্রেসিডেন্সি কলেজে পড়তে গিয়েছিলেন। শহরে বাবার বাল্যবন্ধু এবং সহপাঠী অনেকেই বর্তমান। তাঁরা সবাই আসতেন, ওঁদের গল্প তর্ক আলোচনায় আসর উদ্দাম হয়ে উঠত। আমি বাইরে থেকে শুনতাম। এ ছাড়া বাবার ব্রিজের শখ ছিল। বলতেন ভাল ব্রিজ এবং টেনিস খেলতে না পারলে সভ্য ভদ্র সমাজে প্রবেশ হয় না। দুই বিষয়ে আমার সম্পূর্ণ অক্ষমতা নিয়ে তাঁর দুঃখ ছিল। টেনিসের তবু চেষ্টা করেছিলাম। ব্রিজ আমাকে কোনওদিনই আকর্ষণ করেনি।

বাবা এলে বাড়িতে অথবা পাশের গোষ্ঠবাবু ডাক্তারের বাড়িতে ব্রিজের দীর্ঘ

আসর বসত। ছেলের সঙ্গে বাবার কথা বলার সময় কোথায়? আমি কলকাতায় এসে দেখলাম, বাবা কলকাতায় এলে বড়বাজারে তাঁর অফিসের একটা বাড়িতে থাকেন। সন্ধ্যায় বা বিকেলে আমাকে নিয়ে বাইরে যেতেন। রাত্রের ভোজন বাবার সঙ্গে হত। বাবার অতিথিশালা নিরামিষ-পন্থী। তাঁর পক্ষে সেখানে জলগ্রহণ করাই কষ্টসাধ্য।

বাবার সঙ্গে যে-সব জায়গায় ভোজনের জন্য গিয়েছি, তারা আমার কাছে অন্য জগতের। বড়মামার সঙ্গে যে-সব ভোজনশালায় গিয়েছি, তারা বাঙালি পাড়ায় এবং মূলত বাঙালি ভোজ্য পরিবেশন করে, বিদেশি নাম থাকা সত্ত্বেও।

বাবা আমাকে প্রথম চিৎপুর রোড এবং হ্যারিসন রোডের সংযোগস্থলে একটি দোকানে নিয়ে গেলেন। নাম দেখলাম লেখা আছে পাঞ্জাবি খালসা হোটেল। এ তো আমার পরিচিত বিহারির দোকানের চেয়ে মলিন। এখানে সুখাদ্য কী পাওয়া যাবে ভেবে কূল পাই না। বাবা প্রথমেই এক বাটি রোগনজোস আদেশ করলেন, নামটাও আমার কাছে অজানা। এবং তন্দুরি রোটি। সর্দারজি একটা উনুনের পাশে বসেছিলেন। প্রায় উনুনের গহ্বরে দুটো হাতে গড়া রুটি সেঁকবার জন্য পাঠিয়ে দিলেন।

রোগনজোস দেখলে আমাদের রান্না মাংস বলে ভুল হতে পারে। কিন্তু এ কী স্বর্গীয় স্বাদ, সম্পূর্ণ কল্পনাতীত এক সুখের জগতে মুহূর্তে উত্তীর্ণ হলাম। অতি তপ্ত, কিঞ্চিৎ মোটা তন্দুরি রোটির সঙ্গে অপূর্ব ঐকতানের স্বাদ পেলাম। তারপর মটন কোর্মা। তার স্বাদ আবার অন্য জগতের। মানুষের মস্ত একটা অভাব আছে, তার এত সমৃদ্ধ ভাষা যার ব্যঞ্জনা বক্তব্যকে কত রূপেরসে তুলে ধরে, সেই ভাষাও ভোজ্যের স্বাদের বর্ণনা করতে পারে না। শুধু সুপারলেটিভ বিশেষণ ছাড়া তার কলমে বর্ণনার কোনও ভাষা নেই।

পাঞ্জাবি খালসা হোটেলে রোগনজোস এবং কোর্মার স্বাদ আমাকে মাতিয়ে রেখেছিল। একা যাবার সাহস হয় না, আর কাউকে এই রত্নখনির সন্ধান দেবার ইচ্ছে হত না। বাবার অপেক্ষায় থাকতাম, বাবা আবার কবে আসবেন।

প্রত্যেকবার বাবা নতুন নতুন পাঞ্জাবি হোটেলে নিয়ে যেতেন।

পাঞ্জাবি মুসলমানদের রন্ধনধারা আবার অন্য এক জগতের। তাঁদের বিরিয়ানির তুলনা আজও পেলাম না।

আমি জানতাম না বাবা এমন ভোজনবিশারদ। খেতে খেতে নানা গল্প হত। বাবা হিন্দি, উর্দু বয়েত শোনাতেন। আর উপযুক্ত সংস্কৃত শ্লোক।

অসাধারণ স্মৃতিশক্তি ছিল, রবীন্দ্রনাথের বিদ্যাসাগরের ওপর গদ্য রচনাটি সম্পূর্ণ মুখস্থ বলতে পারতেন। বাবার সুখাদ্যে অনুরাগ ছিল। বাবা এলে বাড়িতে অথবা আমার মামাবাড়িতে নানাবিধ মাছ রান্না হত। গেরস্ত বাড়িতে মাংসের অত চলও ছিল না। একটা মাংসের পদই যথেষ্ট ছিল। কিন্তু বাইরে বাবাকে কখনও মাছ আদেশ করতে শুনিনি। সব জায়গায় পাওয়া যেত না, হয়তো বাবা নিঃসংশয় জানতেন মাছের রান্না বাড়ির বাইরে ভাল হয় না, হবার নয়।

মেদিনীপুরের সঙ্গে সম্পর্ক ঢিলে হয়ে আসছে বুঝতে পারি। কলেজে ভর্তি হবার বছর মেদিনীপুরের কারও সঙ্গে আমার দেখা হয় না। পুজোর ঠিক বাদে কোনও একটা ছোট ছুটিতে মেদিনীপুরে গিয়েছিলাম। সবই যেন সেই পুরনো নিয়মে চলছে। সকালে নীচে নেমে দেখি দাদা তৈরি হয়ে কাছারিতে বসবার জোগাড় করছেন, ঠাকুমা স্নানে গিয়েছেন। কাজের লোকেরা ছাড়া আর কোথাও সাড়াশব্দ নেই। দাদা এসে কাছারির ঘরে বসলেন। শীতের ক'মাস বাদ দিয়ে ওই ঘরটাই তাঁর বসবার জায়গা। সদরের বড় লম্বা দালানটির পর, উত্তর দিকে এই ঘর। প্রায় সারা ঘর জুড়ে নিচু তক্তপোশ। সেখানে শতরঞ্চির ওপর সাদা চাদর, দুটো বড় তাকিয়া। উত্তরের ঘর বলে এখানে রোদ ঢোকে না। অপেক্ষাকৃত ঠান্ডা।

তখনও মুহুরি আসেননি। দাদা একটা তাকিয়া ঠেসান দিয়ে তাঁর নোটবইতে ল-রিপোর্ট থেকে কিছু একটা লিখলেন। ছাড়া ছাড়া কথাবার্তা হচ্ছে, বুঝতে পারছি এই তিন-চার মাসেই দু'জনের মধ্যে পরিচয়ের অন্তরঙ্গতা কেমন যেন কমে গিয়েছে, যেন কোনও অল্প পরিচিত মানুষের সঙ্গে কথা বলছি। অথচ মাত্র ক'মাস আগে দাদাকে ঘিরেই আমার জীবন ছিল। সকাল-সন্ধ্যা সর্ব কাজে আমার সহায়ক।

হঠাৎ দাদা বাইরে কী যেন শুনলেন, তাড়াতাড়ি উঠে বাইরের দালানে বেরিয়ে এলেন। পচা, ওরে পচা বলে হাঁক দিতেই মনে হল আমি আমার কলকাতার নবলব্ধ সর্ব অভিজ্ঞতা ছাপিয়ে আমার পুরনো, নিস্তরঙ্গ সুরক্ষিত জীবনে ফিরে গিয়েছি।

শীতকালে উত্তুরে হাওয়া বইতে শুরু করলে, রোদ যখন ভাল লাগতে শুরু করেছে, নিশ্চয় তার কোনও একটা নির্দিষ্ট দিন ছিল, দাদার কাছারি উত্তরের ঘর থেকে সদরে উঠে আসে। সে-ঘরে তক্তপোশ ছোট, তার ওপর শতরঞ্চি

এবং একটা কম্বল এবং তারও ওপরে চাদর। বড় জানলা আর সদর দরজা দিয়ে সূর্যের প্রথম কিরণ এসে পড়ছে, দাদা সেখানে বড় তাকিয়া হেলান দিয়ে বসে কোনও একটা ল রিপোর্ট পড়ছেন। আমি সামনে বইখাতা খুলে বসে আছি। হঠাৎ দাদা বাইরে কাকে হাঁক দিলেন, পচা, ওরে পচা, কী মাছ নিয়ে যাচ্ছিস।

পচা জেলে মস্ত বাঁক কাঁধে, দ্রুত কোতয়ালি বাজারের দিকে যাচ্ছিল, থেমে দাঁড়াল, বলল, ছোট চিংড়ি মাছ আছে। দাদা বেরিয়ে এসে খানিকটা চিংড়ি মাছ কিনলেন, শাল পাতায়-মোড়া সেই মাছ নিয়ে ভেতরের দালানে পৌঁছলেন। ওগো শুনছ, পচা জেলে মাছ এনেছে, চিংড়ি। দামটা দিয়ে দাও।

দাদা মাছ-মাংস খান না। ছাত্রাবস্থা থেকে নিরামিষ আহার করেন, এখন একবেলা হবিষ্যি, সেই মানুষ বিনা দ্বিধায় মাছ বাড়িতে দিয়ে ঠাকুমার কাছ থেকে পয়সা নিয়ে পচাকে দিলেন। পচা আবার বাঁক দুলিয়ে চলে গেল।

চিংড়ি মাছ কেনা হল আমার জন্য। কারণ আমি অন্য কোনও মাছ খাই না। ইলিশ ছাড়া। বাজার আসতে অনেক বেলা হবে। আমার ইস্কুলে যাবার আগে চিংড়ি ইলিশ থাকলেও এসে পৌঁছবে না।

সেদিন সকালেও দাদা শালপাতায় মোড়া চিংড়ি মাছ নিয়ে ভেতরে দিতে গেলেন, আমার কাছে অকস্মাৎ পুরনো দিনগুলো জীবন্ত হয়ে উঠল। শীতকালে সদর দালানে বসলে রাস্তা দিয়ে লোক চলাচল দেখা যায় প্রচুর। আমার দেখে আশ মেটে না। প্রবল চিৎকারে পাড়া মাতিয়ে দিয়ে একটা ছেলে চলেছে, চলেছে নয় তাকে চ্যাংদোলা করে ধরে নিযে যাচ্ছে দু'জন। দাদা বললেন, দেখেছ ভাই, নেউল দাদাকে ধরে পাঠশালায় নিয়ে যাচ্ছে। নেউলকে নিয়ে এই নাটক প্রায় নিয়মিত দেখছি।

আর একটু বেলা হলে, একটি খর্বকায় ঈষৎ স্থূল ব্যক্তি, ক্ষুদ্র একটি বাটি হাতে বাজারের পথে চলেছেন। তাঁর পায়ে জুতো নেই, ঊর্ধ্বাঙ্গ অনাবৃত, খাটো ধুতি। দাদা বললেন, ওই দেখো ভাই রাখাল যাচ্ছে, রাখাল দত্ত।

দাদার কাছে রাখালের কাহিনী আমি খণ্ড খণ্ড শুনেছি। ছোট ছেলেকে গল্প বলে ভোলাবাব ভঙ্গিতে আবার বললেন, জানো ভাই, রাখালের বাড়ির লোকেরা ওই পথ দিয়ে হাতি চড়ে যেত। সেই রাখাল, কী দশা হয়েছে দেখো। মন দিয়ে পড়াশুনা করো, কখনও অবস্থার ফেরে পড়তে হবে না।

রাখাল মন না দিয়ে কতটুকু পড়াশুনা করেছেন, শুনে থাকলেও আমার মনে

নেই। ১৯০৮ সালের ঘটনা। পঁচিশ-ছাব্বিশ বছর আগে। মেদিনীপুরে একদল অগ্নিপথের যাত্রী ধরা পড়েছিল, মল্লিকের চকের কাছে দাসেদের বাড়িতে। দাদা বলতেন ঘটনাটা সাজানো। পুলিশ এসে সার্চ করে খাটের তলা থেকে কালো রঙের নারকেলের আকারে কী একটা বার করে বলল, এই তো বোমা। উপস্থিত সবাই কথা বলতে পারছে না, দাসের মা দৌড়ে এসে পুলিশের হাত থেকে বোমানামক পদার্থটা ছিনিয়ে নিলেন। চিৎকার করতে লাগলেন এটা বোমা নয়, মাটির তৈরি। বোমাটা ঠকঠক করে নিজের মাথায় ঠুকতে লাগলেন। এই তোদের বোমা? মিথ্যে কথা।

কিন্তু কে শোনে কার কথা, পুলিশ একটা অন্তর্ঘাতের মামলা শুরু করে দিল কয়েকজন বিপ্লবীর নামে। রাখাল, তাদের একজন। এবারে পুলিশ সাক্ষ্যপ্রমাণ সাজাতে নামল। রাখালকে পাড়ার একটা খালি বাড়িতে আটকে রাখা হয়েছিল। অত্যাচারের দরুন অথবা ভয়ে রাখাল বুঝি রাজসাক্ষী হতে রাজি হল।

পুলিশ মামলা সাজিয়ে রাখালকে শেখাতে লাগল, কোর্টে কী বলতে হবে। শুধু বললে হবে না, উপযুক্ত প্রমাণও চাই। রাখালকে দিয়ে পুলিশ একটা ডায়েরি লেখাতে শুরু করে। কবে কলেজের খেলার মাঠে তারা সবাই ঠিক করেছিল বোমা বানাতে হবে। সেই বোমার ঘায়ে ইংরেজ তাড়ানো শুরু হবে। পরের পর ডায়েরিতে লেখা হতে লাগল, কোন দিন কে কে এসেছিল। কে বোমার মশলা কিনতে গেল, কোন দিন। কবে গোপনে প্রথম বোমা ফাটিয়ে পরীক্ষা করা হয়। অনুপুঙ্খ বিবরণ মিলে একটা পুরো কাহিনী তৈরি হতে লাগল।

ইতিমধ্যে বাইরে খবর জানাজানি হয়ে গেছে। বিপ্লবীরা রাখালকে খবর পাঠাচ্ছে। তুমি এমন সাক্ষ্য দিয়ো না। বিপ্লবের এবং অনেক বিপ্লবীর সর্বনাশ হয়ে যাবে। তুমি গোপনীয়তার প্রতিজ্ঞাবদ্ধ, এ কথাটা মনে রেখো।

রাখাল ক্ষণিক মতিভ্রম থেকে জেগে উঠল। এবারে সে যা করতে লাগল, সেটা জানা গেল অনেক পরে, কোর্টে মামলার সাক্ষ্যপ্রমাণ দাখিলের সময়। রাখালের ডায়েরি, তার জবানবন্দি আদালতে পেশ করা হল। উপস্থিত উকিল মোক্তার, স্বয়ং জজসাহেব সবাই হতভম্ব। রাখালের ডায়েরিতে স্বীকারোক্তির মাঝে মাঝে তার হাতেই লেখা, এ পর্যন্ত যাহা লিখিয়াছি সব মিথ্যা। পুলিশের নির্দেশেই ওই মিথ্যা কথা লিখিয়াছি।

মামলা তো ফেঁসে গেলই, অল্প কয়েকজনের নানা কারণে, নানা আইনের ধারায় সামান্য শাস্তি হল। বাকি সবাই মুক্ত বেরিয়ে এলেন। রাখালও।

দাদার কাছে শুনেছি, হতভম্ব পুলিশ রাখালের নামে মামলা করেছিল। আদালতে মিথ্যা সাক্ষ্যদানের অভিযোগে। তার জন্য রাখালের শাস্তি হল, জেল খাটতেও হয়েছিল।

শহর থেকে মাইল পঁচিশ দূরে আমাদের কিছু জমিজমা ছিল। কাকারা বলতেন জমিদারি। প্রতি বছরের তেইশে ডিসেম্বর দাদা সেখানে যেতেন। বাৎসরিক খাজনা আদায় হত। ভাগচাষিদের কাছ থেকে ধান চাল পাওয়া যেত।

মেদিনীপুর থেকে ষোলো মাইল দূরে, এক স্টেশন পার হয়ে শালবনি। সেখান থেকে গোরুর গাড়িতে চার ক্রোশ। চার-পাঁচদিনের জন্য সে যাত্রা।

এটিও আনুষ্ঠানিক ঘটনার পর্যায়ে উঠে এসেছিল। যাত্রার পাঁচ-ছ'দিন আগে থেকে ভারী লেপ কম্বল বার করে রোদে দেওয়া হত। দাদার সিন্দুক থেকে বেরোত উলের গেঞ্জি, একটা বিচিত্র তুলোর জামা, তার ওপর পরবার লম্বা গরম কোট, এবং একটি প্রাচীন শাল। ইস্কুলে ভর্তি হবার বছর থেকে আমিও দাদার সঙ্গে গিয়েছি। সঙ্গে একজন রান্না করার লোক, সরকার দাদু। এবং পরে তাঁর জায়গায় ছোটকাকা।

আমাদের বাড়ি থেকে রেলস্টেশন কুড়ি-পঁচিশ মিনিটের পথ। এগারোটা বেজে তিন মিনিটে গোমো প্যাসেঞ্জার আমাদের নিয়ে যাবে, আধ ঘণ্টার পথ শালবনি। তার প্রস্তুতি চলেছে ক'দিন ধরে। বিছানাপত্র, বাক্সপেঁটরা, বাসনকোশন, মশলাপত্র বাঁধাবাঁধি হচ্ছে। ডাল চালও কিছু যাবে। জংলায় মুগের ডাল পাওয়া যাবে না, ভাল আতপ চাল যদি না পাওয়া যায়। নৈনিতাল আলু, কপিও নিতে হবে।

হিসাব করে প্রত্যেকটি জিনিস যথাযথ ভাবে বেঁধে নেওয়া হয়েছে আগের রাত্রে। অতি প্রত্যূষে বাড়িসুদ্ধু সবাই উঠে পড়েছে, ব্যস্তসমস্ত বাড়ি ধোয়ামোছা হচ্ছে। উনুনে আগুন পড়ল। রান্না চড়তে দেরি নেই। ন'টার মধ্যে আমরা সবাই তৈরি, সব শীতবস্ত্র পরে নিয়েছি। হামিদ গাড়োয়ানকে আগেই বায়না দেওয়া হয়েছিল, সে ন'টার আগেই এসে পড়ল। মালপত্র নিয়ে আমরা যখন স্টেশনে পৌঁছলাম তখনও দশটা বাজেনি।

শালবনিতে নেমেই চেনা মুখ দেখতে পাব। আমাদের গোরুর গাড়ির গাড়োয়ান এবং একজন পুরনো মুনিশ এসেছে স্টেশনে। তারা হিরাশোল থেকে সকালেই শালবনি পৌঁছে আমাদের অপেক্ষা করছে। তারা মোটঘাট নিয়ে পিছনে আসবে।

আমরা সুরেনদাদুর বাড়ি পর্যন্ত হেঁটে গেলাম। ঠাকুমা রান্নাবান্না করে আমাদের জন্য অপেক্ষা করছেন। রেললাইনের ধারে তাঁদের বাড়ি। টিনের চালা দু'দিকে, রান্নাঘরে খড়েব চাল, মাঝখানে মস্ত উঠোন।

আমরা একটু আগেই খেয়ে এসেছি। তাতে কী? আবার বসে পড়া গেল। দাদা ছাড়া। মাসকলাইয়ের ডাল, পোস্ত বড়া—কাঠের আঁচের অবর্ণনীয় সৌরভ তার। সামান্য দু'-একটা তরকারি, হয়তো বা মাছের একটা।

শালবনি জায়গাটা ভাল লাগল। অনেক খোলামেলা। দূরে দূরে দু'-একখানা বাড়ি। স্টেশনের সামনে অল্প মানুষের বাস। কাঁকুরে লাল মাটি, শীতের মিষ্টি রোদ।

গাড়োয়ান তাড়া দিচ্ছে। দেরি হলে অন্ধকার হয়ে যাবে। কবে যেন রাহাজানি হয়েছিল, সে গল্প শুনেছি শিউরে শিউরে। ছই লাগানো গোরুর গাড়িতে শতরঞ্জির ওপর কম্বল পাতা। দুটি ছোট তাকিয়া। যতবার গিয়েছি, সবই চিরকালের, কোনও বদল নেই। বলা হত, জংলায় যাচ্ছি।

জংলায় মাটির ঘর, খড়ের চাল, প্রচণ্ড শীত। দুপুর না গড়াতেই সন্ধ্যা হয়ে আসে। হ্যারিকেন লণ্ঠন জ্বালিয়ে চলাফেরা করতে হয়। আমার গা ছমছম করে। সন্ধ্যার পর আহারাদি শেষ করে দাদার সঙ্গে একটা বড় খাটে লেপ মুড়ি দিয়ে শুয়ে পড়ি।

ধান কাটা হয়ে গিয়েছে। বাড়ির সামনে নিকানো চত্বরে ধান ঝাড়াই হচ্ছে। ইয়াসিন আলি মস্ত একটা নিচু কানার কড়ায় খেজুর রস জ্বাল দিচ্ছে। সকালে উঠেই একপাত্র শীতল নরম সুস্বাদু খেজুর রস খেয়েছি। বেশিক্ষণ রাখা যায় না। রস মজে যায়।

সদ্য খেত থেকে তুলে আনা কচি কড়াইশুঁটির দানা, রসালো ছোট কাঁচা মুলো সাজানো হচ্ছে। সবার প্রাতরাশ হবে। ধামাধামা মুড়ি এসেছে। কখনও অনুপানের মতো বেগুনপোড়া যুক্ত হয়। তপ্ত, ঝাঁঝালো সরষের তেল, কাঁচালঙ্কা এবং খুদে পিঁয়াজ সহযোগে শীতের সকালবেলায় মুড়ির আয়োজন আমাকে মাতিয়ে দিয়েছিল। আমার জন্য এবার লুচিভাজা হবে। কিন্তু সেটা মুখে

তুলতে ইচ্ছা করে না। মুড়ির মহাভোজে পরম আনন্দে সবার সঙ্গে যোগ দিই।

মানুষগুলি, আবহাওয়া, সাধারণ চাষির ঘর গেরস্থালি খুব ভাল লেগেছিল।

কলেজে ভর্তি হয়ে সে-বছর আর জংলা যাওয়া হল না। বড়দিনের ছুটিতে বাবা-মা'র কাছে বিহারে চলে গেলাম। কয়েকমাস পরে দাদার অসুখের খবর পেয়ে মেদিনীপুর গিয়েছিলাম। পাঁচ-ছ'দিনের অসুখে দাদা মারা গেলেন। তারপরও ক'দিন মেদিনীপুরে ছিলাম। সেই প্রথম দেখলাম বাড়ির নিয়মকানুন কেমন শিথিল হয়ে গেল। দুই কাকা সর্বদা ঠাকুমাকে ঘিরে আছেন। ঠাকুমাকে যেন শোকের থেকে আগলে রেখেছেন।

ঠাকুমার স্বাস্থ্য খুব ভাল ছিল না। পেটের অসুখে ভুগতেন বলে আফিম ধরানো হয়েছিল। একটা ছোটগুলি আফিম খেয়ে সন্ধ্যার পর একটু ঝিমিয়ে থাকতেন। দাদাই আফিম ধরিয়েছিলেন।

ঠাকুমার কাজ করবার জন্য ক'বছর আগে জংলা থেকে একটি মেয়ে এসেছিল। আমরা বলতাম সিন্ধুপিসিমা। ঠাকুমার কোনও গুরুজনের নাম বুঝি সিন্ধু। তাই ঠাকুমা সে-নাম উচ্চারণ করতে পারেন না। বলতেন বিন্দু, বিন্দি। দাদার অসুখের সময় দেখলাম সিন্ধুপিসি নেই। সিন্ধুপিসি খুব কর্মঠ, আঁটোশরীরের যুবতী, সকলের কাজ করে দেবার জন্য সদাপ্রস্তুত। সেলাই ফোঁড়াই জানে, বুনতে পারে, সব সময়ে পরিচ্ছন্ন সাদা থান পরে। অল্পবয়সে বিধবা হয়েছিল। আমাদের এক প্রজার বোন। তাকে দাদা জমিদারি থেকে এনে আশ্রয় দিয়েছিলেন বাড়িতে। বাড়ির লোকের মতো হয়ে গিয়েছিল। আমার খুব পছন্দ হত সিন্ধুপিসিকে। দাদার অসুখের সময় সিন্ধুপিসিমা নেই দেখে আমি খুব আশ্চর্য হলাম।

লুদিঝি চোখ মটকে, মুখ বাঁকিয়ে বলল, সে আসবে কোন মুখে। তাকে তো তাড়িয়ে দিতে হল। তুমি জান না?

আমি লুদিঝির কাছে জানতে চাই না। আমি ওকে পছন্দ করি না। যুবতী শরীর। দেহ দুলিয়ে হাঁটে। ওর ধরনধারণ আমার ভাল লাগে না। তবু রাত্রে দোতলায় শুতে যেতে হয় লুদিঝির সঙ্গে। দুটো লম্বা ছাত পেরিয়ে দোতলার ঘর। একা যেতে ভয় পাই। লুদিঝি লণ্ঠন হাতে নিয়ে পৌঁছে দেয়। তারপরে মশারি ফেলে আমার পায়ে হাত বুলিয়ে দেয়। জানু পার হলেই আমার গা শিরশির করে ওঠে। থামতে বললে, থামতে চায় না। ভাগ্যিস আমার ঘুম এসে যায় খুব তাড়াতাড়ি।

অনেক রাত্রে ছোটকাকা এই খাটেই শুতে আসেন। আমি জানতেও পারি না।

আমি দেখেছি, সিন্ধুপিসিকে নিয়ে বাড়িতে একটা প্রচ্ছন্ন রেশারেশি চলত। সিন্ধুপিসি সবসময়ে ছোটকাকার কাজ আগে করে দিত। ছোটকাকার কাচা ধুতি-গেঞ্জি গুছিয়ে রাখছে। ছোটকাকার গামছা, মাথায় মাখবার তেল এগিয়ে দিচ্ছে। আমার মনে হত মেজোকাকার সেটা ভাল লাগছে না। তিনিও কথায় কথায় সিন্ধুকে ডেকে পাঠাতেন। এতকথা আমার তখন বোধহয় মনে হয়নি। কিন্তু এবার যখন এলাম, তখন আমার, শরৎচন্দ্রের চরিত্রহীন পড়া হয়ে গিয়েছে। নাটক, নভেল পড়ার জন্য হস্টেল অবারিত। সাবিত্রী-সতীশের সম্পর্ক আমাকে রোমাঞ্চিত করেছে। এখন মনে হল, সিন্ধুপিসি কি সাবিত্রীর বাস্তব চরিত্র? খুব রোমান্টিক মনে হয়েছিল।

আমি লুদিঝিকে কথা বাড়াতে দিলাম না। ওর ধরনধারণ, শরীর দুলিয়ে চলাফেরা আমার আদৌ পছন্দ হয় না।

দাদার মৃত্যুর পর বাড়ির চালচলন কেমন বদলে গিয়েছিল। নির্লিপ্ত, নির্বিরোধ একজন মানুষের আকস্মিক প্রস্থানে সংসারে এমন পরিবর্তন আসবে ভাবতে পারিনি। দিনে তিনবার স্নান, প্রত্যুষে ও সন্ধ্যায় অন্ধকার ঠাকুরঘরে দীর্ঘ আহ্নিক, দিনে আতপচালের হবিষ্যি, রাত্রে সামান্য আহার, কারও সঙ্গে বিশেষ কথাবার্তাও হয় না দাদার। যেন নিজের নিয়মে নিজের মনে থাকতেন। অথচ, তাঁকে ভয়ও করত না কেউ। তাঁর প্রয়োজন সামান্য ছিল। কারও ওপর নির্ভরশীল নয়। সকাল সন্ধ্যায় অন্ধকার ঘরে বসে কার আরাধনা করতেন, কী তিনি চাইতেন জীবনের কাছে। কেউ জানত না। শুধু তাঁর কাঠের খড়মের শব্দে জানা যেত তিনি কোথায় যাচ্ছেন. কাছারিঘরে, কুয়োতলায় না শোবার ঘরে। আমরা গোলমাল বন্ধ করে, একটু স্থির হয়ে বসতাম। কারও সম্বন্ধে কোনও অভিযোগ নেই, জীবনকে সহজে স্বীকার করেছিলেন। যাবার সময় খড়মের শব্দও শোনা গেল না। আশ্চর্য নীরবে চলে গেলেন।

আমি পরে অনুভব করেছি, তাঁর জীবন পরম সুখের ছিল না। মনে হয়েছে সুখের উপকরণগুলি অনুপস্থিত ছিল। বড় ছেলে লেখাপড়ায় ভাল, কাজও ভাল করে। কিন্তু প্রবাসী। অন্য দুই ছেলে লেখাপড়ায় বেশি দূর গেল না। ছোটছেলে তো কোনও কাজেরও চেষ্টা করল না। ভাল ব্রিজ খেলেছে, মেডেল পেয়েছে অনেক। অভিনয়ে শহরে খুব নাম ছিল। সেখানেও অনেক মেডেল পেয়েছে। মেজোকাকাও মেডেল কম পাননি, তাঁরও থিয়েটারে নাম ছিল। দুই ভাইয়ের মধ্যে

এখানেও বেশ রেশারেশি ছিল। মেজোকাকা গান গাইতে পারতেন, চণ্ডীদাস পালায় চণ্ডীদাসের ভূমিকা বিনা ব্যতিক্রমে তাঁরই জন্য। যেখানে অভিনয় দক্ষতা বেশি প্রয়োজন সেখানে ছোটকাকা এগিয়ে ছিলেন। শকুনির ভূমিকা সবসময়ই তাঁর জন্য। হাসির নাটক, আগে বলা হত ফার্স, সেখানে ছোটকাকার তুলনা ছিল না। তবু চক্রে চাকী নাটকে চাকীর ভূমিকায় মেজোকাকা অনন্য ছিলেন। সন্তানের এই গুণগুলির জন্য কোনও পিতার সুখী হবার কারণ আছে বলে তখন আমার বিশ্বাস হয়নি।

আমি বিষণ্ণ মনে কলকাতা ফিরে এলাম। প্রিয়জনের মৃত্যু এই প্রথম দেখলাম। মনে হল প্রয়াত মানুষটার এত নিকটে থেকেও, তাঁকে ভাল করে চিনতে পারিনি। আর কেউ যে চিনতে পেরেছিল, তাও নয়।

সাত-দশদিন বাবার চিঠি না এলে দাদা কখনও জিজ্ঞাসা করতেন, নেড়ুর চিঠি এসেছে কি না। তার অধিক দুশ্চিন্তা করতে দেখিনি। চিঠি এলে পড়ে নিয়ে ঠাকুমাকে দিতেন। ঠাকুমা সেই চিঠি সবাইকে পড়ে শোনাতেন। বাবা যখন ছুটিতে বাড়িতে আসতেন, তখনও বাবার সঙ্গে সামান্যই কথাবার্তা হত। অথচ গম্ভীর প্রকৃতির মানুষ বলতে পারব না। তাঁর গাম্ভীর্যের মধ্যেও সবার জন্য তাঁর ভাবনা অনুভব করতে পারতাম।

কলকাতায় ফিরে এসে নতুন নতুন অভিজ্ঞতার চমকে দিন কাটতে লাগল। ঠাকুমাকে কখনও সখনও চিঠি দিয়েছি। ছোট ছোট অক্ষরে পোস্টকার্ড ভর্তি উত্তর আসত ঠাকুমার কাছ থেকে।

দাদার মৃত্যুর অনেকদিন পরে একবার গিয়েছিলাম। বাড়ির নিয়ম আবার ফিরে এসেছে। ঠাকুমা কোন সকালে উঠে বাগানে গাছের পরিচর্যা করছেন। এখন তাঁর জন্য রান্না হয় ঠাকুরঘরের সামনের ছোট বারান্দায়। কাকারা মায়ের সঙ্গে নিরামিষ খাচ্ছেন। তাঁরা বুঝি একবছর হবিষ্যিও করেছিলেন। দাদার কথা কেউ বলছে না। কাছারি ঘরটা খালি পড়ে থাকে।

আমার মনে একটা ক্ষোভ ছিল। ডাক্তার দাদার অসুখের সময় ইনজেকশন দিতে চেয়েছিলেন। কাকারা দিতে দেননি। সাত্ত্বিক মানুষকে নাকি ওই জাতীয় পৈশাচিক চিকিৎসা করতে নেই।

মেদিনীপুরের সঙ্গে আমার সম্পর্ক ছিন্ন হয়ে গেল। স্কুলের বন্ধুদের মধ্যে একজনই মাত্র কলকাতায় পড়তে এসেছিল। তার সঙ্গেও বিশেষ দেখাসাক্ষাৎ হল না। ক্রমশ কলকাতা আমাকে আচ্ছন্ন করে ফেলল।

একে হস্টেলের স্বাধীনতা, তার ওপর এই শহরের চাকচিক্য। তখন সবে মেট্রো সিনেমা হয়েছে। এয়ারকন্ডিশনিংয়ের সঙ্গে সেই প্রথম পরিচয়। প্রতি সপ্তাহে ছবির বদল হয়। খসখস ধরনের কোনও সুগন্ধ পাওয়া যায় হলে ঢুকলেই। টেলিফোনে আসন সংরক্ষণ হয়। ছবি শুরু হবার আগে টাকা দিলেই টিকিট পাওয়া যাবে। নাম লেখা একটা খামে টিকিট রাখা থাকে। দুপুরের শো-তে দাম কম। বন্ধুদের সঙ্গে ছবি দেখে, সন্ধ্যায় ময়দানে বেড়িয়ে বেড়ানো, অথবা কোথাও ঘাসের ওপর নিরিবিলি বসে থাকা। মাসের শুরুর দিকে হলে, যখনও মাসহারার কিছু অবশিষ্ট আছে, দল বেঁধে যাওয়া হত নতুন এক ভোজনালয়ে, অনাদি কেবিন।

সেই সময় থেকেই আমার ধারণা হয়েছিল, সব ভোজনশালাতেই বিশেষ বিশেষ পদের বিশিষ্ট স্বাদ থাকে। নামী ভোজনশালা হলেই যে সেখানের সব ভোজ্য সুখদায়ক হবে তা নয়। অনাদির দুটি পদ বিশিষ্ট ছিল। মোগলাই পরটা এবং ফাউল কবিরাজি কাটলেট। মোগলাই পরটার সঙ্গে সেই প্রথম সাক্ষাৎ এবং অচিরে প্রগাঢ় প্রেম। তেমনই সুখের আকর ছিল ফাউল কবিরাজি কাটলেট। কোন কবিরাজের প্রকরণে এই কাটলেটের উদ্ভাবন অনেক চেষ্টা করেও জানতে পারিনি। তাতে কোনও ক্ষতি হয়নি। আসন নিয়ে, পদ দুটির আদেশ করলেই পাচকের উদ্দেশে পরিচারকের হাঁক শুনতাম, দুটো বা চারটে সিনার কবিরাজি দাও। আর মোগলাই কড়া করে ভেজে। সে ডাক কেউ শুনেছে বলে কখনও মনে হয়নি। তবু আমাদের জন্যই যে বিশেষ বিজ্ঞপ্তি হল, জেনেই আনন্দ হত।

নিকটেই কাফে ডি মনিকো। সেখানেও আমাদের যাতায়াত ছিল। তার জন্য অবশ্য আরও সচ্ছল অবস্থার দরকার। সেখানে বসবার আয়োজন অভিজাত, আসন ক'টি পরিচ্ছন্ন, পেয়ালা-পিরিচও রুচিসম্পন্ন। কাফে ডি মনিকোর

হৃদয়হরণ পদ ছিল মটন চপ। এ আমাদের চেনা উত্তর কলকাতার চপ নয়। ইনি সম্পূর্ণ অন্য জাতের। চিনেমাটির রেকাবির ওপর এক খণ্ড ছাগ-মাংস পরম সুস্বাদু তারল্যে নিষিক্ত।

যদিও সচরাচর যাওয়া হয় না, সেখানে গেলে আনন্দের সীমা থাকত না। সে স্থানের নাম, চাচার হোটেল। তখনকার কর্নওয়ালিশ স্ট্রিটের ওপর, হেদোর কাছাকাছি। জীবনে অনেক ভোজন হয়েছে, নানা দেশে নানা পদ, কিন্তু তেমনটি আর হল না, যেমন পাওয়া যেত চাচার হোটেলে ফাউল কাটলেট ছদ্মনামে স্বর্গচ্যুত কোনও আহার্যের। রূপে, গন্ধে, স্বাদে এমন পদ মনে হত বুঝি এ জগতের নয়। সুবর্ণকান্তি সেই কাটলেট আকারে ব্যতিক্রমী ছিল। সম্পূর্ণ গোলাকার। চাচার হোটেল দাবি করেন তাঁদের ওই পদের জন্যই একশো বছর ধরে গ্রাহকদের মনোহরণ করে আসছেন। একশো বছর হয়েছে কি না বলতে পারব না। মনোহরণ নিশ্চয় করেছিলেন, অন্তত সেকালে।

দিলখুশা কেবিন আমাদের হস্টেলের কাছে, এখনও আছে, যত ভালই হোক এবং নিশ্চিত ভাল ছিল তখন, ঘরের প্রতি আকর্ষণ অপেক্ষা মানুষেব মোহ তো বাইরের জন্যই বেশি হয়। তাই খুব বেশি যাওয়া হত না দিলখুশায়।

কলকাতায় আসবার আগে মেদিনীপুরে বোধহয় সাকুল্যে চার-পাঁচটি ছবি দেখেছি। একবার দেখানো শুরু হলে তারা সহজে যেতে চাইত না, আর এখানে দেখি প্রতি সপ্তাহে শুক্রবারে নতুন ছবি শুরু হচ্ছে। বস্তুত, হস্টেলে দাখিল হবার আগে কলকাতাতেও বিশেষ সিনেমা দেখতে যাওয়া হত না। বারণ ছিল। ওই সময় মানময়ী গার্লস স্কুল ছবিটি দেখানো হচ্ছিল। আমি কারুকে না বলে একটা টিকিট কেটে একদা বিকালে ছবিটি দেখতে গিয়েছি। হাসির ছবি, আকুল হয়ে হাসছি, আমার দু'পাশে প্রৌঢ় দুই ভদ্রলোকের সেটা ভাল লাগছে না। কিন্তু হাসি পেলে থামাই কেমন করে। শুধু মনে ভয় এই দুই ব্যক্তি কাউকে ডেকে আমাকে বার করে না দেয়। সম্পূর্ণ মনোযোগ দিয়ে ছবিটি দেখছি। এক দৃশ্যে নায়িকা ড্রেসিং টেবলের সামনে বসে পোশাক পরিবর্তনের সূচনায়, শাড়ি সরিয়ে ব্লাউজ খুলতে যাচ্ছেন, আমার চোখের পাতা নড়ছে না, নিশ্বাসও হয়তো রুদ্ধ। যদিও ভেতরে অতি শালীন অন্তর্বাস আছে, আমার দু'পাশের দুই প্রবীণ এমন ছি, ছি ছি বলে চিৎকার করে উঠলেন যে আমি ভয়ে চোখ বন্ধ করে ফেললাম। তাঁরা কী করেছিলেন

জানি না, কিন্তু ঘটনাটা মনে পড়লে এখনও বঞ্চিত হবার কষ্ট পাই।

সিনেমা দেখার ইতিহাস যদি এই হয়, তা হলে থিয়েটার দেখার ইতিহাস কিন্তু খোলামেলা। মেদিনীপুরে কাকারা থিয়েটার করতেন, আমি তখন নিচু ক্লাসে, সারাদিন বা সারা সকাল ও বিকাল স্টেজ তৈরি করা, সিন টাঙানো রোমাঞ্চিত হয়ে দেখেছি। শুরুতে সবার আগে সামনের সারির দিকে শতরঞ্চির ওপর বসে আছি। আরম্ভ হবার কথা হয়তো সন্ধ্যা সাতটায়, কিন্তু এমনই অব্যবস্থা যে ন'টাতেও শুরু হতে চায় না। ভেতরে কাঠকুটো কোথাও লাগানো হচ্ছে, তার খটখট শব্দ পাচ্ছি। মাঝে মাঝে একবার হারমোনিয়াম বেজে উঠল, কিংবা তবলায় চাঁটি পড়ল, আমরা আগ্রহে টানটান বসে আছি। বাড়ি থেকে খেতে যাবার ডাক পড়েছে, তার আগেই শতরঞ্চির ওপর ঘুমিয়ে পড়েছি। অনুরূপা দেবীর মন্ত্রশক্তির কত রিহার্সেল দেখেছি, আকুল আগ্রহে অভিনয়ের অপেক্ষা করে আমি গভীর ঘুমে অচেতন। কে কখন বাড়ি নিয়ে গেল, তারপর কী হল মনেই পড়ে না। বহুবারই এমন হয়েছে।

আমি মেদিনীপুরের স্কুলে পড়েছি ছ'বছর। তার প্রথম তিন-চার বছর মেদিনীপুরে অনেক উজ্জ্বল ঘটনা ঘটলেও, মানুষের জীবনযাত্রা স্বাভাবিক ধীর প্রবাহে চলেছিল। আমার স্কুল জীবনের দ্বিতীয় বছর জেলা ম্যাজিস্ট্রেট পেডিসাহেব খুন হলেন আমাদের স্কুলে। উত্তেজনা আশঙ্কার আবহাওয়ায় একটা বছর কাটতে না কাটতেই দ্বিতীয় জেলা ম্যাজিস্ট্রেট বিপ্লবীদের গুলিতে প্রাণ হারালেন। তাঁর নাম ডগলাস।

শহরবাসীরা মনে করতেন ডগলাস অতি পৈশাচিক প্রকৃতির মানুষ। তমলুক না কাঁথিতে কয়েক বছর ডগলাস স্বাধীনতাকামী মানুষের ওপর অনেক অত্যাচার করেছেন। মেদিনীপুরে প্রমোশন হয়ে এসে সাহেব তাই অতি সাবধানে থাকতেন। বাইরে কম বেরুতেন। প্রচুর পাহারা থাকত। সেদিন সন্ধ্যায় তিনি জেলা বোর্ডের অফিসে মিটিং করছিলেন। বশংবদ কর্মচারী এবং রাজভক্ত কয়েকজন বোর্ডের সদস্যকে নিয়ে মিটিং। দু'পাশে বন্দুকধারী পাহারাদার।

অকস্মাৎ গুলির শব্দ। আহত ডগলাস মাটিতে লুটিয়ে পড়লেন। আততায়ীরা অন্ধকার মাঠ দিয়ে পালাতে লাগল। একজন পালিয়ে আত্মগোপন করতে পেরেছিল। দ্বিতীয় জন পুলিশের গুলিতে প্রাণ হারাল। আবার শহরে দ্রুত উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ল। জানতে পারলাম, একজন বিপ্লবী আততায়ী

মেদিনীপুরের কলেজের ছাত্র, দ্বিতীয় বর্ষের। কলেজ আর স্কুল এক হাতার মধ্যে। আমাদের বন্ধুদের কেউ কেউ তাকে চিনত! আমি তাকে চিনতাম না। বন্ধুরা বর্ণনা দেবার পরও তাকে স্মৃতিতে সনাক্ত করতে না পারায় নিজের কাছে যেন ছোট হয়ে গেলাম, হতমান।

পুলিশ বহু যুবককে প্রমাণ থাক বা না থাক, গ্রেফতার করেছিল, মামলাও সাজানো হল। শহর আবার তার নিস্তরঙ্গ প্রবাহে ফিরে গেল। তৃতীয় বছরে আরও দুঃসাহসিক ম্যাজিস্ট্রেট হত্যা হল। মেদিনীপুরের নাম তখন খবরের কাগজের প্রথম পাতায়। এই ম্যাজিস্ট্রেটের নাম বার্জ। ইনি বুঝি অত্যাচারের পথ না ধরে, আপাত মৈত্রীর পথে শহরে শান্তি আনতে চাইতেন। পাহারা থাকত অবশ্যই, তবু শহরের অনেক অনুষ্ঠানে যেতেন। ইংরেজ নৃশংসতার পুরনো স্মৃতি বুঝি ভোলাতে চেয়েছিলেন। সাহেব খেলাধুলা পছন্দ করতেন। তাঁর দল ছিল ফুটবল খেলার। সাধারণের খেলার মাঠে নামতেন। সে-বিকালে পুলিশ লাইনসের খেলার মাঠে সাহেব খেলতে নেমেছেন। দুই কিশোর বিদ্যুৎগতিতে সামনে পিস্তল উঁচিয়ে বার্জকে গুলি করল। বার্জ লুটিয়ে পড়লেন। মৃত। একটি কিশোর সেখানেই বার্জের দেহরক্ষীদের গুলিতে প্রাণ হারাল। দ্বিতীয় কিশোরও মাঠেই নিহত হল।

ওই খেলা দেখতে আমি যাইনি। প্রথমে খবরটা জানতেও পারিনি। পরে জানলাম, বিপ্লবীদের একজন আমাদের স্কুলের ছাত্র। আমার থেকে মাত্র দু'ক্লাস ওপরে পড়ত। এবং তাকে আমি চিনতাম, পরিচয় ছিল না যদিও, আটপৌরে চেহারার ছেলে, পড়াশুনাতেও দিগগজ কিছু নয়। তাকে চিনতাম বলে ভারী গর্ব হল। আমার জীবনের এ আক্ষেপ কিছুতেই মিটল না, সর্বসমক্ষে অনুষ্ঠিত এমন একটা ঘটনায় আমি উপস্থিত ছিলাম না।

ডগলাসের হত্যাকাণ্ডের পরই শুরু হয়েছিল, বড়রা বলতেন পিটুনি ট্যাক্স, পিউনিটিভ ট্যাক্স। শহরের শান্তি বিঘ্নিত করার জন্য জরিমানা। তাও মানুষ সহ্য করেছিল। বরং বুদ্ধিমান মানুষেরা ট্যাক্স মকুব করাবার জন্য, ব্রিটিশ সরকারের প্রতি আনুগত্যের প্রমাণ সহ পরের পর দরখাস্ত করেছিলেন। এমন সময় তৃতীয় ম্যাজিস্ট্রেট বিপ্লবীদের বাৎসরিক খাজনা মিটিয়ে তৃতীয় বছরে নিহত হলেন।

শহরের ওপর যেন শয়তান ঝাঁপিয়ে পড়ল। প্রথম শাস্তি হল কারফিউ। সূর্যাস্ত থেকে সূর্যোদয় পর্যন্ত পনেরো থেকে চল্লিশ বছরের কোনও মানুষ

বাড়ির বাইরে পা দিতে পারবে না। আমার বয়স তখনও পনেরো হবার কয়েক বছর বাকি আছে, তবু সন্ধ্যার পর রাস্তায় বেরুতে ভয়ভয় করত। শহরে অনেক নতুন মুখ দেখা যেতে লাগল। তারা নাকি সব টিকটিকি, ডিটেকটিভ। প্রকাশ্য জমায়েত, মিটিং বারণ, মানুষ নিশ্চিন্তে কথা বলতে পারে না, টিকটিকি শুনে ফেলবে। বড়দের সাইকেল চড়াও বারণ। আমাদের স্কুলের ওপরের ক্লাসের ছেলেদের একদিন মার্চ করিয়ে কোতায়ালি থানায় নিয়ে যাওয়া হল। সবাইকে কয়েক সারিতে দাঁড় করিয়ে দেওয়া হয়েছে, আগাপাশতলা বোরখাপরা দুই মূর্তি ধীরে ধীরে আমাদের সামনে দিয়ে যাচ্ছে পুলিশের সঙ্গে। তারা বুঝি ষড়যন্ত্রের বাইরের বৃত্তের লোক, আমাদের স্কুলের কাউকে হয়তো বিপ্লবীদের সঙ্গে দেখেছে, আমাদের মধ্যে কেউ ছিল কিনা শনাক্ত করছে। আমাকে কেউ চেনে না, আমি বিপ্লবীদের কাউকে চিনতাম না, তবু আমার কেমন আশঙ্কা হল, যদি আমাকে শনাক্ত করে। আমার বন্ধুরাও পরে বলেছে তাদেরও অমন অনুভূতি হয়েছিল।

অত্যন্ত চিন্তিত হয়ে আমরা ক্লাসে ফিরে এলাম। বাড়িতে ঘটনা শুনে কাকারা বললেন, ওদের উদ্দেশ্যই ছিল তোমাদের ভয় পাওয়ানো, কারুকে শনাক্ত করা নয়। হতে পারে, কিন্তু আমাদের সংশয় কাটল না।

পনেরো থেকে চল্লিশ বছর বয়সের মানুষের পরিচয়পত্র চালু করা হল। সবাইকে দরখাস্ত করে পরিচয়পত্র নিতে হবে। শোনা গেল, পরিচয়পত্রও নাকি তিন প্রকারের। যাদের সম্বন্ধে এখনও কোনও সন্দেহের কারণ ঘটেনি, তাদের পরিচয়পত্র হবে সবুজ রঙের। যাদের হলদে রঙের পরিচয়পত্র, তাদের সম্বন্ধে মহামান্য সরকারের কিছু সন্দেহ আছে। আর যাদের লাল রঙের পরিচয়পত্র তারা নাকি মার্কামারা। তারা সকলেই পুলিশের হেফাজতে। আমার পরিচয়পত্র হয়নি বলে আমার বেশ অস্বস্তি হয়েছিল।

কারও বাড়িতে বাইরে থেকে কেউ এসে তৎক্ষণাৎ পুলিশকে জানাতে হবে। পরিচয়পত্রওলা কেউ শহর ছাড়লে এবং শহরে ফিরে এলে থানায় রিপোর্ট করতে হবে।

এইসব কঠিন আদেশে শহর নির্জীব হয়ে পড়েছিল। আরও বাকি ছিল। মানুষের মেরুদণ্ড ভেঙে দেবার জন্য এবারে যা হল তার তুলনা ভারতবর্ষের অন্য কোথাও নেই। সেদিন ঘুম ভেঙে দেখি বিছানায় ঠাকুমা নেই, দাদাও আমাকে ডেকে দেননি। বাড়ির কেমন থমথমে ভাব। আমাদের বাড়ি লম্বা

ধরনের, ঘরগুলো পরের পর। শেষ প্রান্তে মেজোকাকার ঘর। দাদাকে কখনও সেখানে যেতে দেখিনি। আজ সকালে সবাই সেই ঘরে জড়ো হয়েছেন, দাদাও। আমি ঢুকতে কেউ কিছু বলল না। আশ্চর্য হয়ে দেখলাম, আমাদের কয়েকজন আত্মীয়ও বসে আছেন সেখানে। ভেলুকাকা, আমার বাবার পিসতুতো ভাই, সপরিবারে উপস্থিত। এত সকালে তাঁরা সবাই এ-বাড়িতে কেন? ভীত, সন্ত্রস্ত চেহারায়। কথা বলতে পারছেন না, তবু ধীরে ধীরে ঘটনা স্পষ্ট হল।

মাঝরাত্রে হঠাৎ সামনের বাড়িতে আর্ত চিৎকারে তাঁরা জেগে উঠেছিলেন জানালা দিয়ে দেখলেন, রাস্তার ওপারে একদল সশস্ত্র সৈনিক ওই বাড়ির দরজা ভাঙছে। কল্পনাতীত সন্ত্রাসের সামনে নিরস্ত্র তাঁরা। বন্ধ সদর দরজা অর্গল লাগানো। প্রবেশপথে আর একটা দরজা ভাল করে বন্ধ করলেন। ততক্ষণে তাঁদের সদর দরজা ভাঙা আরম্ভ হয়েছে। চোর ডাকাত গুন্ডা নয়, সৈনিকদল তাঁদের বাড়ি আক্রমণ করেছে। আশেপাশের বাড়ির গৃহস্থরা জেগে উঠেছেন, কিন্তু কিছু করবার ক্ষমতা নেই, সাহসও নেই। তা ছাড়া, এক্ষেত্রে সাহস তো বাতুলতা। ভেলুকাকার পরিবার, তাঁরা পাঁচজন একবস্ত্রে বাড়ির খিড়কি দরজা দিয়ে পালিয়ে এলেন। ততক্ষণে আক্রমণকারীরা বাড়ির ভেতর ঢুকে পড়েছে। কোথায় যাবেন? নিকটে আমাদের বাড়ি। পিছন দিকে বাগানের বেড়া ভেঙে তাঁরা আমাদের গোয়ালে লুকিয়ে ছিলেন। ভীত এবং হতবুদ্ধি। কে আক্রমণ করেছে, কেন? বুঝতে পারছেন না।

সকালে আমাদের গোয়ালের পরিচারক প্রথম তাঁদের দেখতে পায়। তারপর সবাই উঠলে তাঁদের বাড়ির ভেতরে আনা হয়েছে।

আমাদের বাড়িতে প্রথম প্রতিক্রিয়া ছিল ভয়। সৈন্যেরা যাদের বাড়ি আক্রমণ করেছে, তাদের আশ্রয় দেবার তাৎক্ষণিক সাহস ছিল না কারও। দাদা অল্প কথায় সবাইকে সাহস দিলেন। কিন্তু ভেলুকাকারা পিছন দিকের ঘরেই থাকলেন। তাঁদের অবস্থা পাড়ার সবাইকে না জানানোই বোধহয় ভাল।

বেলা বাড়তে ক্রমশ কিছুটা স্বাভাবিক হল সবাই। কিঞ্চিৎ জলযোগের পর, পিছনের রাস্তা দিয়েই ভেলুকাকা, আমার দুই কাকা এবং আমি সন্তর্পণে ভেলুকাকার বাড়ি গিয়েছিলাম। এমন বিধ্বস্ত চেহারা একটা সংসারের আমার কল্পনায় ছিল না। খাট-আলমারি ভাঙা, বাক্স-পেঁটরা ডালাখোলা, সব জিনিস ছিন্নভিন্ন ছত্রখান। সুরেনদাদু, ভেলুকাকার বাবার নানা হস্তশিল্পে অনুরাগ ছিল।

তাঁর কার্পেটবোনার তাঁত টুকরো টুকরো পড়ে আছে। কিছু লুট হয়েছে বলে মনে হল না ভেলুকাকার।

ক্রমশ জানা গেল, আরও কয়েকটি বাড়িতে এই ধরনের কারণহীন অত্যাচার হয়েছে। ভেলুকাকার বাড়ির মুখোমুখি ভুতুকাকার বাড়ি। ভুতুকাকা ব্রাহ্ম। রাজনারায়ণ বসুর পৌত্র। তাঁর বাড়ির দরজা ভেঙে আক্রমণকারী ঢুকলে, তিনি বাধা দিতে গিয়েছিলেন। ফলে তাঁকে প্রচণ্ড প্রহার করা হয়। তাঁরও সব অস্থাবর সম্পত্তি ভেঙেচুরে দেওয়া হয়েছে। ভুতুকাকা অসুস্থ হয়ে পড়েছেন। হাড় ভেঙেছে হয়তো, যন্ত্রণা হচ্ছে। ভুতুকাকা যন্ত্রণার মধ্যেও ঘটনার বিবরণ সবাইকে শোনাচ্ছেন। বলছেন, এ কী মগের মুলুক নাকি। তিনি এর বিহিত না করে ছাড়ছেন না। নেভার।

ভুতুবাবু কথায় কথায় ইংরেজি বলেন। সবজান্তা গোছের মানুষ। সব বিষয়ে কথা বলতে পারতেন এবং বলতেন। তর্কে বিপক্ষরা তাঁর কাছে হেরে যেতে বলে সবাই তাঁকে পছন্দ করত না। আমার কিন্তু মানুষটাকে ভাল লাগত। এত খবর রাখতেন। কিন্তু বিহিত কিছু করতে পারলেন না। অসম যুদ্ধে কে কবে জয়ী হয়েছে?

কলকাতা থেকে বড় বড় ব্যারিস্টার এসে সরকারের বিরুদ্ধে অত্যাচারের মামলা লড়লেন। কিন্তু কিছু প্রমাণ করা গেল না। শহরের মানুষকে ভয় দেখাবার জন্য যে এই সরকারি আয়োজন, বুঝতে অসুবিধা নেই। কিন্তু প্রমাণ? সে তো অন্য জিনিস। মানুষ ভয়ে ভয়েই থাকল। কার বাড়িতে কখন আক্রমণ হতে পারে কে জানে। ভেলুকাকা বা ভুতুবাবুর সঙ্গে রাজনীতির কোনও যোগ নেই। তাঁরা নির্বিরোধ নিরীহ মানুষ। তাই নির্বিরোধ, নিরীহ সাধারণ মানুষ ত্রস্ত হয়ে থাকলেন।

ক্রমশ সে ভয়ও কেটে গেল। শহর আবার স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরে এল। ইতিমধ্যে আর একটা মনস্তাত্ত্বিক অস্ত্রের প্রয়োগ হয়েছিল। প্রত্যেক স্কুলে প্রতি সপ্তাহে একদিন বক্তৃতা করবার জন্য লোক পাঠানো হত। শুনলাম তাদের বলা হয় পেরিপ্যাটাটিক লেকচারার, অর্থাৎ ভ্রাম্যমাণ বক্তা। স্কুলে তাঁদের বক্তৃতা শোনা আবশ্যিক ছিল। তাঁরা ব্রিটিশ প্রশাসনের গুণাবলি ছাত্রদের বোঝাতেন। তুলনায় আমাদের হিন্দু-মুসলমান রাজত্বকাল যে অতি নিম্নস্তরের ছিল বহু উদাহরণ দিয়ে বোঝানো হত। একদিন আমরা কত জ্ঞানী হয়েছি পরীক্ষা

করবার জন্য স্কুলে একটা বিতর্ক সভা হয়েছিল। বিতর্ক নয়, ব্রিটিশ রাজত্বের গুণগান। এতদিন সাপ্তাহিক বক্তৃতার যা শুনেছিলাম তাই আমরা নির্ভেজাল উগরে দিয়ে প্রশংসিত হলাম।

সরকার অনুমান করতে পারেননি এ-সবের একটা প্রতিকূল প্রতিক্রিয়া হচ্ছে। ক্ষুদিরামের সঙ্গে আমাদের একটা লতায়পাতায় সম্বন্ধ ছিল। বাড়িতে ক্ষুদিরামকে নিয়ে আগে খুব আলোচনা হয়েছে মনে করতে পারি না। দাদার খুড়তুতো ভাই অমৃতলাল রায়ের স্ত্রীর ভাই ছিলেন ক্ষুদিরাম। অমৃতদাদুকে আমার বলতাম মশলাদাদু। তাঁর পকেটে সর্বদা সুগন্ধি মশলার ডিবে থাকত। প্রায়ই কৌটা খুলে তার সৌরভ ছড়িয়ে মশলা মুখে দিতেন। আমরা যারা আশপাশে লোলুপ ঘোরাঘুরি করতাম, তার ভাগ পেতাম। ইদানীং তিনি এলে আমরা বলতাম ক্ষুদিরামের জামাইবাবু এসেছেন। ক্ষুদিরাম আমাদের কাছে অকুতোভয় বীরত্বের প্রতীক হয়ে উঠলেন।

আমার স্কুলের শেষ দু'বছর নিরুত্তাপ কেটেছিল। সে বছর প্রেসিডেন্সি কলেজে বিজ্ঞানের প্রথম শ্রেণীতে শুরুতে একটি মাত্র সেকশন হয়েছিল। সামনের দিকে একটা বেঞ্চে আমি বসতাম। আমার পাশের ছেলেটি খুব লম্বা, লম্বা বলেই আরও কৃশ দেখায়, ময়লা রং, বুদ্ধিদীপ্ত চোখ এবং ব্যক্তিত্বসম্পন্ন। কারও সঙ্গেই বেশি কথাবার্তা বলে না। অধ্যাপক ক্লাসে ঢোকবার আগে, কখনও আসবার পরেও নিজের খাতায় আপন মনে নানা ধরনের অক্ষর লিখত। বাংলা অক্ষর, হয়তো 'ম' অক্ষরটিই তিনরকম রূপে লিখল। তারপর আর একটা অক্ষর। কলেজে পড়তে এসে কেন এক ছাত্র হাতের লেখার প্র্যাকটিস করে ঠিক বুঝতে পারতাম না। আমরা যেমন খাতা পেনসিল হাতে থাকলে অলস সময়ে হিজিবিজি কাটি অনেকটা তেমনই, আবার ঠিক তেমন নয়। যেন এক একটা অক্ষরকে কত ধাঁচে, কত রূপে আঁকা যায়, ছেলেটি বুঝি তাই পরীক্ষা করছে।

পরিচয় হল। নাম বলল, সত্যজিৎ রায়। পরে জেনেছিলাম সে সুকুমার রায়ের ছেলে। সুকুমার রায়ের অনেক লেখাই পড়া হয়ে গিয়েছিল। অনেক কবিতা মুখস্থ বলতে পারতাম। শহরে এক প্রতিযোগিতায় "সৎপাত্র" কবিতাটি আবৃত্তি করেছিলাম। তাঁর ছেলে সত্যজিতের প্রতি আমার শ্রদ্ধা বেড়ে গেল।

আট-দশদিনের মধ্যেই ক্লাস দুই সেকশনে ভাগ হয়ে গেল। সত্যজিৎ এ সেকশনে, আমি বি সেকশনে। তারপরও দেখা সাক্ষাৎ হত কখনও সখনও। সত্যজিৎ কেন বিভিন্ন রূপের অক্ষর রচনা করতেন, তার প্রথম প্রকাশ দেখলাম প্রায় দশ বছর পরে। সিগনেট প্রেসের বইয়ের মলাটে। সত্যজিতের সৃষ্টি করা মলাটগুলো বিশিষ্ট ছিল, বাংলা বইয়ের মলাটের একঘেয়ে ধারা থেকে বেরিয়ে এসেছিল। তারপরও ছিল তার অক্ষর রচনার কাজ। বাংলা অক্ষরকে যে কতভাবে লেখা যায়, কত সুন্দর করে, প্রয়োজনের

সঙ্গে সাযুজ্য রেখে, সত্যজিতের অক্ষর রচনায় আমরা প্রথম দেখলাম।

সত্যজিতের সৃজনক্ষমতার ছাপ ছিল ইংরেজি অক্ষরের পরিকল্পনাতেও। রোমান অক্ষরের বিভিন্ন রূপ পাঁচশো বছর ধরে বিভিন্ন অক্ষরশিল্পী করেছেন। মুদ্রণ শিল্পে তাঁদের নাম গত পাঁচশো বছর ধরে শ্রদ্ধার সঙ্গে উল্লেখিত হয়। সত্যজিৎও রোমান হরফের একটা রূপ সৃষ্টি করেছেন। মুদ্রণ শিল্পের পাঠ্যবইতে সেই অক্ষরগুলির প্রতিলিপি দেখেছি পরে। নাম দেওয়া হয়েছিল 'রে রোমান'। সন্দেহ নেই যে এই দিকে মন দিলে সত্যজিৎ প্রাচীন সুখ্যাত অক্ষর শিল্পীদের সঙ্গে একাসনে স্থান পেতেন।

কলেজের সেই বছরেই এক ঝাঁক বাঙালি ছেলে ভর্তি হয়েছিলেন, যাঁরা উত্তরজীবনে খ্যাতনামা হয়েছেন। আমার সঙ্গে যাঁরা পড়তেন তাঁদের তালিকা দেখলে মনে হবে বিংশ শতাব্দীর তিনের দশকের হুজ হু (Who's who) ডাইরেক্টরি দেখছি। তবু নামগুলি বলে রাখা ভাল। সিদ্ধার্থশঙ্কর রায়, প্রতাপচন্দ্র চন্দ্র, মৃত্যুঞ্জয় বন্দ্যোপাধ্যায়, অমলেশ ত্রিপাঠী, সুবোধ মুখোপাধ্যায়, বাংলাদেশের রাষ্ট্রপতি আবু সৈয়দ চৌধুরী এবং আরও অনেকে।

এক ক্লাসে পড়ি, তখনও স্নবারিতে সিদ্ধ হইনি কেউই। সহজেই পরিচয় হয়, শ্রেণীচেতনার কেউ স্বতন্ত্র হয় না। সিদ্ধার্থশঙ্কর ছিল নানাগুণে দ্যুতিয়ান। দীর্ঘ সুগঠিত শরীর। সব খেলাতেই পারদর্শী, তার মাথা সর্বদা সবাইকে ছাপিয়ে থাকে। প্রতাপচন্দ্র চন্দ্র অন্য চরিত্রের মানুষ। লেখাপড়ায় শীর্ষস্থানে, নিজেকে কোথাও জাহির করে না, অনায়াসে শ্রদ্ধাভাজন এবং সবার প্রতি শ্রদ্ধাশীল। তার বাড়িতে শনিবারের বৈঠক বসে। বিভিন্ন চরিত্রের ছাত্ররা সেখানে যায়, সবার জন্য উন্মুক্ত দ্বার। পাঠক্রমের বাইরেও যে আর একটা জগৎ আছে, তার সঙ্গে শনিবারেব বৈঠকে আমার পরিচয় হল।

অমলেশ ত্রিপাঠী আবার আর এক ধরনের মানুষ। কিছুটা সিরিয়াস। মফস্‌সলের স্কুল থেকে এসেছে, যদিও ম্যাট্রিকে ফার্স্ট, কেমন নিজের মধ্যে থাকতে চায়। বিনীত, ভদ্র, দীর্ঘদেহী মানুষটা লেখাপড়ায় বেশি সময় দেয়। তার বাইরে তাকে বেশি দেখা যায় না।

উত্তর জীবনে আমাদের আশ্চর্য করেছিল আবু, আবু সৈয়দ চৌধুরী। সবার সঙ্গে মিশতে ভালবাসত, পরিচয়ের পরিধি বিস্তৃত ছিল, নম্র, বন্ধুবৎসল। বন্ধুত্বের কতটা দাম দিত আবু সেটা বোঝা গিয়েছিল বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠার পর। মুজিবর রহমানের স্বল্পকাল রাষ্ট্রপতিত্বের পর আবুর রাষ্ট্রপতি হবার খবর

পড়ে চমকে উঠেছিলাম। সে কবে রাজনীতিতে প্রবেশ করল, নিজের স্থান করে নিল প্রথম সারিতে তার কোনও খবর কোনওদিন রাখিনি। অবাক হবার কথাই। আরও অবাক হলাম যখন বম্বেতে বসে শুনলাম, আবু রাষ্ট্রপতি হবার পর প্রথম কলকাতা এসে তার সহপাঠীদের সঙ্গে দেখা করতে চেয়েছিল। সবাইকে নিমন্ত্রণ করেছিল ডিনারে। আমি কলকাতার বাইরে, আমার নিমন্ত্রণ হয়নি। যারা গিয়েছিল তাদের কথা ভেবে ঈর্ষান্বিত হয়েছিলাম। আবু এখনও, আমাকে না হোক, আমাদের মনে রেখেছে, সার্বভৌম বাংলাদেশের রাষ্ট্রপতি হবার পরও।

আরও যারা ছিল আমাদের সঙ্গে এক বছরে প্রেসিডেন্সি কলেজে, তাদের মধ্যে ড. বিজয় বসাক তো প্রেসিডেন্সি কলেজের অধ্যক্ষ হয়েছিল। তারও আগে ওই কলেজের অধ্যক্ষ হয়েছিল প্রতুল মুখোপাধ্যায়, সেও আমাদের বছরের। প্রতুলের সঙ্গে আমার প্রথম পরিচয় যখন আমরা স্কুলের নিচু শ্রেণীর ছাত্র মেদিনীপুর শহরে। প্রতুলের বাবা সিভিল সার্জেন, মেদিনীপুর হাসপাতালের প্রধান, প্রতুল আমাদের ক্লাসে ভর্তি হল। গৌরবর্ণ রোগা ছেলেটাকে আমার ভাল লেগেছিল, বন্ধুত্বও হয়েছিল সঙ্গে সঙ্গে। অল্প কয়েক মাস পরে প্রতুলের বাবা মেদিনীপুর হাসপাতাল থেকে অন্য কোনও হাসপাতালে বদলি হয়ে গেলেন। প্রতুলের সঙ্গে বন্ধুত্বের ছেদ পড়ল। কয়েক বছর পরে প্রেসিডেন্সি কলেজে এসে দেখি সেই প্রতুল আমাদের ক্লাসে ভর্তি হয়েছে। প্রতুল পরে কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইসচ্যান্সেলার হয়েছিল। তারপর দিল্লিতে গিয়েছিল, দিল্লি বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রো-ভাইসচ্যান্সেলার হয়ে।

প্রতুলের মতো সুবোধ মুখোপাধ্যায়ও রসায়নের ছাত্র। কলকাতার ছেলে, তার বন্ধু-বান্ধব অনেক, তার স্কুলের কয়েকজন তার সঙ্গে ভর্তি হয়েছে কলেজে। রসায়নের মেধাবী ছাত্র ছিল সুবোধ। ফার্টিলাইজার কর্পোরেশনের সর্বোচ্চ পদে উঠেছিল। সেখান থেকে সংযুক্ত রাষ্ট্রের কনসালটেন্ট হয়ে দেশ-বিদেশ ঘুরে বেড়াত।

সবার সঙ্গেই আমার পরিচয় ছিল। বন্ধুত্ব হল সামান্য ক'জনের সঙ্গে। তখন তাৎপর্য অবহেলা করেছিলাম। বিড়লা পরিবারের দুই সন্তান, আমাদের ক্লাসে পড়েছে। ভারতীয় শিল্প জগতের অবশ্যম্ভাবী জ্যোতিষ্কদের সঙ্গেও বন্ধুত্ব হল না।

আমার বোধশক্তি যে কম আমি বুঝতে পেরেছিলাম। এই সব পুরুষদের সামান্য সঙ্গ পাবার সুযোগের অধিক চেষ্টা করতে পারিনি।

কলেজে আমাদের জীবন দুই ভাগে বিভক্ত ছিল। কলেজের জীবন আর হস্টেলের জীবন। হস্টেলের সঙ্গীদের সঙ্গে মেলামেশা অধিক হয়। পরস্পরকে জানবার অধিক সুযোগ পাই। হিন্দু হস্টেলে নিয়মিত ফুটবল খেলা হত। কমনরুমে টেবল টেনিস ছিল। আর ছিল একটি ভাল লাইব্রেরি। বাংলা-ইংরেজি সাহিত্যের গল্প উপন্যাস প্রচুর ছিল। প্রতি বছর দু'-দশ ডজন নতুন বই যুক্ত হত লাইব্রেরিতে।

কলেজে খেলার আয়োজন অপরিমেয়। টেবল টেনিস তো ছিলও, আর ছিল বিলিয়ার্ডস। বিলিয়ার্ডস খেলা আগে দেখিনি। কিঞ্চিৎ দূরে থাকতাম। কেন জানি না মনে হত এই খেলাটি আমাদের মতো সাধারণ গৃহস্থ বাড়ির ছেলেদের জন্য নয়। সিনেমায় দেখেছি, অভিজাত ধনাঢ্য পরিবারের বাড়িতে বিলিয়ার্ড টেবিল। তাই ধারণাটা বদ্ধমূল হয়ে গিয়েছিল।

বাবার খুব ইচ্ছা ছিল টেনিস এবং ব্রিজ খেলায় পারদর্শিতা অর্জন করি। এখন যেমন কোনও কোনও সমাজে, জাপানে বিশেষ করে, সমাজে কলকে পাওয়া যায় না গল্ফ না খেললে। অতএব কলকাতা পৌঁছে দুটো সাদা জিনের প্যান্ট করানো হল। বউবাজারের এক দরজির কাছ থেকে। সঙ্গে দুটো শার্ট। বাবার পুরনো ঈষৎ বিবর্ণ র‍্যাকেটে নতুন তাঁত লাগিয়ে একদিন কলেজের মাঠে নামলাম। এমনিতেই খেলাধুলায় আমার স্বাভাবিক প্রবৃত্তি নেই, তারপর অচেনা জায়গা, অচেনা পরিমণ্ডল। স্বভাবতই আড়ষ্ট হয়ে থাকি। আদৌ খেলতে পারি না। আর যাঁরা খেলছেন, তাঁদের সপ্রতিভ চেহারা আমাকে আরও ম্লান করে দেয়। তাঁদের পোশাক আবার ম্যাড়মেড়ে নয়, মাখন জিনের ট্রাউজার, সিল্ক টুইডের শার্ট। তার ওপর আবার তাদের পরস্পরের সঙ্গে জানাশোনা আছে, তারা কলকাতার ছেলে। হাসিতে, উচ্ছলতায় কথাবার্তা সর্বদা সপ্রতিভ। হংসমধ্যে বকের মতো দু'-চারদিন বল চালাচালি করবার পর স্থির সিদ্ধান্তে পৌঁছেছিলাম, এ মণিহার আমায় নাহি সাজে। তা ছাড়া ভেবে দেখলাম, এত সাজগোজ করে অপরিচিত গোষ্ঠীর মধ্যে বিচরণ না করাই সমীচীন।

বিলিয়ার্ড রুমে নয়, টেনিস কোর্টে নয়, তা হলে কলেজের খালি সময়টা কোথায় কাটাই। সময় কাটাবার যে এমন একটা কাম্য স্থান কলেজের মধ্যেই আছে সেটা বুঝতে দু'-চারদিন সময় লাগল। স্থানটি কলেজের পিছন দিকে, রায়মশায়ের রেস্টুরেন্টে। প্রথম দিন কারও সঙ্গে গিয়েছিলাম, তারপর থেকে

অনায়াস প্রবেশ। এত সহজে খালি সময়টা কাটিয়ে দেওয়া যায় সেখানে। প্রায়ই পিরিয়ড শুরু হবার পরও ক্লাসে যাবার কথা মনে থাকে না। রায়মশায়ের রেস্টুরেন্টে তো শুধু ভোজনশালা নয়, সময় কাটানোর প্রশস্ত পরিমণ্ডল সেখানে। স্বয়ং রায়মশায়ের সঙ্গে পরিচয় হতে সময় লাগল না। রায়মশায় ক্যাশিয়ারের কাছে বসে থাকেন। সবাইকে চেনেন, সকলের সঙ্গে সমান হৃদ্যতার সঙ্গে কথা বলছেন। ইস্ত্রি-করা সাদা ধবধবে আদ্দির পাঞ্জাবি, পাটভাঙা ধুতি পরনে, সদা হাস্যমুখ, আমাদের সবাইকে নাম ধরে ডাকেন। তুমি বলে সম্বোধন করেন। করবেনই তো, তাঁর বয়স পঞ্চাশোর্ধ্ব, আমাদের সবে পনেরো পেরিয়েছে। আশ্চর্য লাগল সবাই রায়মশায়কে রায় বলে সম্বোধন করে এবং তুমি বলে। বয়সের বাঁধ ভেঙে রায় এমন সহজভাবে আমাদের বন্ধু হয়ে গেলেন। সর্বোপরি, রায়ের রেস্টুরেন্টে নগদ পয়সা না দিলেও চলে, রায় ধারে দিতে দ্বিধা করেন না। মাসে মাসে টাকা আদায়ের কাজে হস্টেলের ছেলেদের কাছে আসতেন, তখনও সুগৌর মুখটি স্মিত হাস্যে উদ্ভাসিত, আপনজনের মতো। টাকা সেদিন না পেলেও বিরক্ত হতেন না, আবার পরের দিন হাসিমুখে আসতেন।

রায়ের রেস্টুরেন্টে খাবারদাবারও বেশ ভাল। মাংসের শিঙাড়া হত রায়ের রেস্টুরেন্টে। তার আগে মাংসের শিঙাড়ার সঙ্গে আমার যোগাযোগ হয়নি। নতুনত্ব এবং সুস্বাদের স্বাতন্ত্র্যে আমাকে ওই পদটির প্রতি স্থায়ী আকর্ষণে বাধ্য করেছিল। আবার চপ-কাটলেট জাতীয় অন্যান্য ভোজ্য প্রস্তুত হত রায়ের ভোজনশালায়, তার মধ্যে অন্যতম ছিল মিট অমলেট। অর্থাৎ, মামলেটের ভিতর কিমার পুর দেওয়া—সেটিও আমাদের প্রিয় পদ।

রায়ের রেস্টুরেন্টে নিরুপদ্রব ধূমপান কবা যেত। আমাদের মধ্যে অনেকেই তখন ধূমপান ধরে ফেলেছে। ক্লাসের বাইরে বারান্দায়, কিংবা মাঠে ওই লোভনীয় কাজটি করা যায় না, তা নয়। কিন্তু সর্বদা কোনও অধ্যাপক এসে পড়বেন, বা দেখে ফেলবেন তার আশঙ্কা থাকে। রায়ের রেস্টুরেন্ট সে হিসেবে অতি নিরাপদ আশ্রয়। রায়ের সামান্য অনিচ্ছা সত্ত্বেও আরও একটি অন্যায় এবং অনৈতিক কাজ ওই ভোজনশালায় করা হত।

কে না জানে, সব ছাত্র সর্বদা মন দিয়ে অধ্যয়ন করতে পারে না। আরও নানা তাৎক্ষণিক আকর্ষণ তাদের পড়াশুনায় সাময়িক বিঘ্ন ঘটায়। তার জন্য পরীক্ষার ফল খারাপ হবে, হতেই হবে, এমন কোনও নিয়ম নেই! পরীক্ষার

সময় ওই ভোজনশালায় বসে বুদ্ধিমান, পাঠনিষ্ঠ ছাত্রেরা অপরের খাতা লিখে দিতেন। যে ছেলেরা ঠিকমতো উত্তর লিখতে পারছে না, তারা এক সময়ে বেরিয়ে এসে তৈরি উত্তরপত্রগুলি নিয়ে যাবে। কেমন করে প্রশ্নপত্র বাইরে পাচার করে দেওয়া হয় সঙ্গে সঙ্গে, কেমন করে নতুন উত্তরপত্রটি ছাত্র ভেতরে নিয়ে যায় এবং তার লেখা অসম্পূর্ণ উত্তরপত্রটি সরিয়ে ফেলে, তার সব খবর আমার জানা নেই। রায়মশায়ের দোকানে বসে, অথবা হস্টেলের ঘর থেকে উত্তরপত্র লিখে ফেলার অভিজ্ঞতা হয়ে গিয়েছিল।

একবার বাবা কলকাতায় আসতে বাবাকে আমাদের অভিন্ন হৃদয় বন্ধু রায়ের কথা বললাম। বাবা বললেন, রায়ের দোকান তাঁর সময়েও ছিল। বাবা এবং তাঁর বন্ধুরা রায়কে নাম ধরেই ডেকেছেন। তখন খেয়াল হল.যে রায় বয়সে আমার বাবার থেকেও বড়। পরের দিন রায়কে বললাম, জানো হে রায়, আমার বাবা তোমার দোকানে খেয়েছেন, তোমাকে চেনেন।

রায় বলল, দেখ ভাই, সব যদি ভালয় ভালয় চলে, তোমার ছেলেকেও খাওয়াতে পারব আশা করছি।

রায়ের সঙ্গে পরে আরও ঘনিষ্ঠতা হয়েছিল। আমার বন্ধুরা এবং আমি যখন হিন্দু হোটেলের মেস কমিটির সেক্রেটারি হলাম, আমরা মাঝে মাঝেই হোস্টেলের বিশেষ ভোজের রাত্রে রায়ের কাছ থেকে একটি বা দুটি পদ আনাতাম। হস্টেলে আমরা একশো কুড়িজন ছাত্র থাকি। সকলের জন্য সেইদিনের বিশিষ্ট খাবার আসত, বৈঠকখানা বাজারে রায়ের রেস্টুরেন্ট থেকে। রায় কল্লকাতার সেই রেস্টুরেন্টে নিয়ে গিয়ে একবার আমাদের খুব খিদমৎ করেছিল। সেখানে সেদিন কোনও বিশেষ পদ প্রস্তুত হয়েছিল। রায় বলত তোমরা আমার বড় কাস্টমার। তোমাদের খিদমৎ করাই তো আমার কাজ।

অনেক কাল বাদে কলকাতায় ফিরে শুনলাম, কলেজের রায়মশায়ের রেস্টুরেন্ট আর নেই। বৈঠকখানা বাজারের কাছে রায়ের ভোজনশালা খুঁজেই পেলাম না। কেউ বলতে পারল না, কোথায় রায়ের রেস্টুরেন্ট ছিল।

হিন্দু হস্টেলে রায়ের ভোজ্যের প্রবেশের আগেও যে ভোজনের আয়োজন ছিল, তাও অসামান্য। বস্তুত, সে সময় লেখাপড়া এবং আবাসনের খ্যাতি অপেক্ষা হিন্দু হস্টেলের ভোজনের আভিজাত্য এবং সুনাম সবাই জানত। তার অবশ্য একটা কারণ ছিল দু'বেলা ভোজনের জন্য যে টাকাটা ব্যয় হত, তার সবটাই কাঁচা আনাজ, মাছ-মাংস এবং ঘি-তেল-মশলার জন্য। কর্মচারীদের

মাইনে, বাসনপত্রের খরচের সবটাই বহন করত হস্টেল কর্তৃপক্ষ, অর্থাৎ সরকার। এর ফলে খাবারের মান উঁচু হওয়া স্বাভাবিক ছিল। ছেলেরাই সেই আয়োজনের দেখাশোনা করত। এদিক ওদিক কিঞ্চিৎ অপব্যয় এবং অনাচার ছিল না, এমন নয়। তবু সেকালের হিসাবেও অত্যন্ত অল্প খরচে অতি আনন্দের ভোজন পরিবেশন হত। বলতে পারি, বাহুল্যই ছিল।

মাসে একদিন গ্রান্ডফিস্ট। অন্যান্য হস্টেল থেকে অনেকে অতিথি হয়ে আসত সে রাত্রে। অতিথির মাশুল এক টাকা চার আনা। সাধারণ দিনে কোনও অতিথি আনলে দিতে হত ছ'আনা। গ্রান্ড ফিস্ট ছাড়াও এক বা দু'দিন ফিস্ট হত, আমরা বলতাম ইমপ্রুভড ডায়েট। ইমপ্রুভমেন্টের জন্য সেদিনের অতিথি মাশুল আট আনা থেকে এক টাকার মধ্যে।

গ্রান্ড ফিস্টে লুচি এবং পোলাও আবশ্যিক। ভাজা দুই বা তিন প্রকারের। ভেটকি ফ্রাই, চিংড়ির কাটলেট, মাংসের চপ, হয়তো বা রায়মশায়ের সাপ্লাই মিট ওমলেট। মাছের ঝাল এবং কালিয়া। সর্বোপরি মাংস। হস্টেলে অলিখিত নিয়মে মুরগি নিষিদ্ধ ছিল। রায়ের প্ররোচনায় আমরা একবার পাখির মাংস বলে রায়ের দোকান থেকে মুরগি পরিবেশন করে, সমালোচনা এবং তিরস্কার সয়েছি।

এখনও মিষ্টির কথা বলা হয়নি। আলাদা মাটির রেকাবিতে মিষ্টান্নের পরিবেশনও চমকপ্রদ ছিল। সন্দেশ অন্তত দুই প্রকার, রসগোল্লা বা লেডিকিনি, অথবা উভয়ই, ক্ষীর কিংবা রাবড়ি। আরও ছিল কিছু ফল। বলা বাহুল্য, এই ভোজনের উপযুক্ত মর্যাদা দিতে গিয়ে আমরা আর মিষ্টান্নের রেকাবি পর্যন্ত পৌঁছতে পারতাম না। প্রায় সবাই রেকাবি হাতে ঘরে ফিরতাম, পরের দিনের নিশ্চিত প্রাতরাশ হাতে নিয়ে।

যেমন সব গোষ্ঠীরই থাকে, আমাদের মধ্যে সবার এত ভোজন সহ্য হয় না। লেখাপড়ার ক্ষেত্রেও তাই। অনেকে মেধাবী ছাত্র, মনোযোগী স্বভাব, আবার অনেকে লেখাপড়ায় বীতরাগ, হস্টেলের অপার স্বাধীনতায় অন্য বহু বিষয়ে মনোনিবেশ করেছেন, অধ্যয়ন ছাড়া। উঁচু ক্লাসের ভাল ছাত্ররা অনেকে নীচের ক্লাসের ছাত্রদের লেখাপড়ার তদারক করে, এ তাঁদের স্বভাবগত। অর্থাৎ যে ভবিষ্যতের কথা ভেবে মন দিয়ে লেখাপড়া করতে চায়, তার অবাধ সুযোগ। আবার যে সাধারণ লেখাপড়ার কাজে অতিনিবিষ্ট না হয়ে পৃথিবীর দশরকম আনন্দের চাবিকাঠির সন্ধান করছে তারও সুযোগ অপ্রতুল নয়।

শেষ শো-তে সিনেমা দেখে রাত বারোটায় হস্টেলে ফেরা আধুনিকতার লক্ষণ বলে গণ্য হত এবং সাহসিকতারও। রাত্রি দশটার পর হস্টেলে ফিরলে খাতায় সময় দিয়ে নাম সই করতে হয়। পরদিন সকালে সুপারিনটেন্ডেন্ট তাকে ডেকে পাঠিয়ে তিরস্কার করবেন। কিন্তু কখনও কেউ তিরস্কৃত হয়েছে বলে শুনিনি। তার কারণ, আমরা কখনও সেই খাতায় নাম সই করিনি, যত রাত্রেই না হস্টেলে ফিরি। দারওয়ানেরা সবাইকে চেনে, জানে চুরি ডাকাতি খুন আমাদের সাধ্যের বাইরে, খাতার দিকে ইঙ্গিত করত শুধু, সই করতে বলত না। এই সুযোগ, আমাদের জন্য নিয়মলঙ্ঘন, তার জন্য কোনও ট্যাক্স দিতে হয় না দারওয়ানদের। কখনও বখশিশ দিয়েছি, অথবা তারা চেয়েছে, মনে পড়ে না।

দারওয়ানদের এই বদান্যতার সুযোগে আমরা একদা ভোর পাঁচটায় হস্টেলে ফিরলাম। আমরা মানে, মনোরঞ্জন এবং আমি। মনোরঞ্জন আমার ওপরের ক্লাসের ছাত্র। সে কিছুদিন স্কটিশ কলেজে বা স্কুলে পড়েছিল। তখন তার বন্ধুত্ব হয়েছিল বীরেন্দ্র মল্লিকের সঙ্গে। বীরেন্দ্র রাজেন্দ্র মল্লিকের পরিবারের ছেলে, বন্ধুবৎসল, সুদর্শন, সুন্দর ইস্ত্রি করা ধুতি-পাঞ্জাবি পরে—আমার মনে হয়েছিল রাজপুত্রের সগোত্র। মল্লিক প্যালেসের উত্তরপশ্চিম অংশে তার লীলাক্ষেত্র। আমরা সেখানে অবাধে বিচরণ করি। তখনই মল্লিক পরিবারের ভাঙনের দশা শুরু হয়েছে—সম্পত্তি বুঝি কোর্ট অফ ওয়ার্ডসের তদারকের অধীনে। তখন এত কথা জানি না, বীরেন্দ্রকেই সাম্রাজ্যের একচ্ছত্র মালিক বলে জানতাম।

সন্ধ্যায় বীরেন্দ্রর পাঠানো গাড়ি এল। ট্রাম বাসের যাত্রী সহবাসিন্দা ছাত্রদের দেখিয়ে আমরা সেই গাড়িতে উঠেছি, যেন আমাদের জমিদারি থেকে গাড়ি এসেছে। পৌঁছতে সময় লাগে অল্পই, তখনও কলকাতার পথে পৃথিবীর তাবৎ জনসংখ্যা নামেনি, আরও বেশিক্ষণ চললে সুখের ভরা পূর্ণ হত।

মার্বেল প্যালেসে উৎসবের রাত্রে বাড়ির প্রশস্ত উঠানে যাত্রার আয়োজন হত। সামনের একদিকে মেয়েদের জন্য সংরক্ষিত জায়গা। অন্য সর্বত্র যে কেউ যেমন ইচ্ছা বসতে পারে। যাত্রা আরম্ভ হবে অনেক রাত্রে। সারা উঠোন আলোয় ঝলমল করছে। আমরা বন্ধুরা উত্তরদিকের চওড়া বারান্দার লাগোয়া ঘরটায় আড্ডা জমিয়েছি। এই অঞ্চলটা বীরেন্দ্রের অভয়াঅরণ্য। এখানে কেউ তাকে বিরক্ত করবে না। প্রথমে কচুরি শিঙাড়া সহ জলযোগ। যাত্রা শুরুর আগে রাত্রের ভোজন। আমাদের খাবার এই ঘরেই পরিবেশন হবে। শ্বেত পাথরের টেবিলের ওপর কলাপাতায় ভোজন পরিবেশন। সুবর্ণবণিকদের বাড়িতে আহারাদির বিশিষ্ট ঐতিহ্য ছিল। এখনও কোনও খানদানি বেনে বাড়ির পাতে তার কিছু কিছু দেখা যায়। পাতের এক কোণে ভিজানো মুগের ডাল এবং লেবুতে জারানো আদাকুচির উপস্থিতি অনিবার্য। দীর্ঘ বেগুনের লম্বা করে কাটা এক ফালি ভাজা, ছোলা সংযোগে পালং শাক ভাজা, সোনা মুগের সুগন্ধি ঘন ডাল, আর কলকাতার আভিজাত্যের প্রতীক দু' খোলে ফোলা সাদা মেঘের মতো হালকা গরম লুচি। নানাবিধ নিরামিষ ব্যঞ্জন এবং সর্বোপরি সন্দেশ রসগোল্লা ক্ষীর ও রাবড়ি।

বীরেন্দ্রের সংরক্ষিত এলাকায় আমরা দীর্ঘকাল নিরুদ্বেগ আড্ডা দিয়েছি। কিশোর এবং যুবকেরা তখনও মদ্য পানের স্বাদ পায়নি। জাফরান মেশানো পেস্তা বাদাম সংযুক্ত সিদ্ধির পরম স্বাদিষ্ট শরবতও আমরা সাহস করে পরখ করছি না।

আলোচনার বা আড্ডার বিষয়বস্তুও তেমন বুদ্ধিজীবীদের এখতিয়ারের নয়। আসলে, তখনও বুদ্ধিজীবীরা দেখা দেননি। তখন আমরা শুধু অধ্যয়নশীল, জ্ঞানী পণ্ডিতদের নিয়েই সন্তুষ্ট ছিলাম। তাঁদের খেতাব অনেক অধ্যয়নের দ্বারা অর্জন করা। তাঁরা নিজের জ্ঞান ভাণ্ডারের সঞ্চয় বাড়াতেই ব্যস্ত থাকতেন। বুদ্ধির বিচ্ছুরণে সাধারণ মানুষকে বিস্মিত করতেন না।

সদ্য পঠিত কোনও উপন্যাস নিয়ে হয়তো আলোচনা করি অথবা সদ্য দেখা কোনও ছবি। থিয়েটারে যাওয়া বেশি হত না। গ্রুপ থিয়েটার তখনও ভ্রূণাবস্থায়। ক্রিকেটের আলোচনা হত সামান্যই। বড় আলোচ্য বিষয় ছিল ফুটবল। তখনও দুই স্পষ্ট দলে বিভক্ত ছিল ফুটবল-প্রেমীরা—ইস্টবেঙ্গল আর মোহনবাগান। এরিয়ান, হাওড়া ইউনিয়ন, মহমেডান স্পোর্টিং, মোহনবাগান ও ইস্টবেঙ্গলকে স্থানচ্যুত করতে বদ্ধপরিকর। ক্যালকাটা ফুটবল ক্লাব আলোচনায় স্থানের যোগ্য নয়।

কবিতারও সামান্য অনুপ্রবেশ ছিল আমাদের আড্ডায়। কলেজ শেষ করবার পর বীরেন্দ্রের কবি হিসাবে বেশ নাম হয়েছিল।

আমরা বীরেন্দ্রর বৈঠকখানায় আহারাদিতে মনঃসংযুক্ত, মাঝে মাঝে কানে আসছে তবলা পাখোয়াজ বাঁধার আওয়াজ। একবার ক্ল্যারিওনেট বেজে উঠল, ঘুঙুরের শব্দ শোনা গেল কখনও। অর্থাৎ প্রবল বেগে প্রস্তুতি শুরু হয়েছে। উঠোনে জনসমাগম হচ্ছে। তার মিশ্র কলরব কানে আসছে। সব ছাপিয়ে হঠাৎ যুবতী কণ্ঠে উচ্ছ্বসিত কলধ্বনি শোনা গেল। আমরা সেদিকে কান পেতে রয়েছি।

সুবর্ণবণিক পরিবারের স্ত্রী পুরুষ সৌন্দর্যে সর্বদা আকর্ষণীয়। এমন সুসজ্জিত রূপবান পুরুষ, এমন সালংকারা মূল্যবান প্রচ্ছদ শোভিতা রূপবতী যুবতীর সমাবেশ আমি আগে দেখিনি। এদের এখনও দেখা যাচ্ছে না, শুধু পাশের ঘরে নূপুর নিক্কণের মতো তাদের কলকাকলি শোনা যাচ্ছে।

আমরা স্ত্রী ভূমিকাবর্জিত সমাজের মানুষ। কলেজ হস্টেলের ত্রিসীমানায় নারী চরিত্র দেখা যায় না। কলেজ শুধুই ছাত্রদের জন্য, ছাত্রীদের প্রবেশ সেখানে নিষিদ্ধ। ট্রামে কদাচিৎ একদল মহিলা যাত্রী দেখা যায়। তাঁদের আসন ছেড়ে দিতে উঠে দাঁড়িয়ে আনন্দ পাই। এই সময় এক মহিলা যাত্রীকে প্রায়ই দেখেছি। যুবতী, তন্বী, সুন্দরী বলা যায় না হয়তো, তবু সবার নজর কেড়ে নেন, সোজা সপ্রতিভ চলন, কোথাও বিন্দুমাত্র আড়ষ্টতা নেই। অনেক পরে পনেরো বছর পরে সম্ভবত, সেই মহিলার সঙ্গে পরিচয় হল লন্ডনে, পরে তিনি দিল্লি ফেরার পর বন্ধুত্ব হয়েছিল, তিনি নীলিমা সান্যাল। তাঁর স্বরমাধুর্যের সঙ্গে আগেই পরিচয় হয়েছিল, যখন তিনি কলকাতা বেতার কেন্দ্রে নিযুক্ত ছিলেন।

বীরেন্দ্রের বাড়িতে আরও একটা মজা ছিল। ধর্মতলা স্ট্রিটের মোড়ে মেট্রো সিনেমা যাবার পথে সন্ধ্যার মুখে কিছু মানুষ ঘুরে বেড়াত। বোকাসোকা মানুষকে তারা সুন্দরী রমণীর সঙ্গের প্রলোভন দেখাত, নিকটেই, অতি কচি বয়সের, অবশ্যই সামান্য অর্থের বিনিময়ে, চলুন না। পছন্দ না হয় ফিরে আসবেন। আশ্চর্য হয়েছি সদ্য কৈশোর উত্তীর্ণ আমাদেরও প্রায় সম্বোধন হত ওই পরম রমণীয় সুযোগের স্বপ্ন দেখিয়ে। আরও কিছু মানুষ, আমরা বলতাম দালাল, অন্য আর এক পেশায় লিপ্ত ছিল। তারা আমাদের যৌনক্রিয়ার নানা

ছবি অতি স্বল্পমূল্যে দেবার প্রলোভন দেখাত। সাহসের অভাবে, সেই সুযোগও কোনওদিন গ্রহণ করতে পারিনি। তারা বলত, প্যারিস পিকচার।

আমাদের এক বন্ধু একবার খামে বন্ধ করা ক'টি ছবি সন্তর্পণে কিনে এনেছিল। বলল, পাশের একটা গলিতে নিয়ে গিয়ে, দু' টাকা না চার টাকার বদলে হাতে একটা খাম গছিয়ে দিয়ে মানুষটা দ্রুত অন্তর্ধান করল। আমাদের বন্ধু দুরু দুরু অধীর হৃদয়ে হস্টেলে ফিরেছে, আর কয়েকজন বন্ধুকে ডেকে খাম খুলে দেখে আদৌ কোনও ছবি নেই, শুধু কয়েক টুকরো মোটা কাগজ।

বীরেন্দ্রের কাছে অনেক মৈথুন চিত্র ছিল। একদিন আমাদের দুঃখের কথা শুনে তার ছবিগুলি আমাদের দেখাল। মনে হয়েছিল যেন কোনও বিস্ফোরকের সামনে দাঁড়িয়ে আছি। বীরেন্দ্র বেশ নিরাসক্তভাবেই ছবিগুলি বের করেছিল। এমনভাবে বলল যে মনে হল এই সামান্য ছবিগুলি পারিবারিক সংগ্রহ, পুরুষানুক্রমে সঞ্চিত। আমাদের আগ্রহ দেখে আমাকে দুটি ছবি দিতেও চেয়েছিল। বুদ্ধিজীবীজনোচিত দার্ঢ্যের সঙ্গে তার প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করব, এমন মনোবল আমার ছিল না। শেষ পর্যন্ত বীরেন্দ্র ছবিগুলি দিতে ভুলে গেল। আমি লজ্জার বশে উল্লেখে নীরব থাকলাম, কিন্তু আমার আক্ষেপ অনেকদিন থেকে গিয়েছিল। এখন যেমন কামসূত্রের উদারতায় এই সব মিথুনচিত্র ফুটপাথে দোকানে বিক্রি হয়, তখন তেমন ছিল না, বলাই বাহুল্য।

যাত্রাপালা শেষ হত সূর্যাস্তের ঠিক আগে। যদিও সেকালের সুবিখ্যাত যাত্রা দল অভিনয় করত মল্লিকপ্রাসাদে, আমাদের সেদিকে তত মন ছিল না। সামনের বাঁদিকে সুন্দরী মেয়েরা বসে আছেন, কথায় কথায় হেসে উঠছেন, আমরা সেখান থেকে নজর ফেরাতে পারি না। কয়েকবার যাত্রা দেখার কারণে এঁদের অনেককে চিনে গিয়েছিলাম, কিন্তু পরিচয় হল না কখনও।

একবার চলে আসবার আগে ভোরবেলায় বীরেন্দ্রর সঙ্গে আমাদের একটা ছবি তোলা হয়েছিল। আদ্দির পাঞ্জাবি-পরা দৃপ্ত বীরেন্দ্রর পাশে আমাদের নেহাৎ বশংবদ কোনও গ্রাম্য প্রজার মতো দেখিয়েছিল। তবু কার্ড-বোর্ডের ওপর লাগানো সে-ছবিটা আমি দীর্ঘদিন সযত্নে রেখে দিয়েছিলাম।

মল্লিকপ্রাসাদে যাত্রাভিনয়ের প্রসঙ্গে হিন্দু হস্টেলের যাত্রা অনিবার্য মনে পড়বে। এই যাত্রা একটি বিশিষ্ট ঘটনা ছিল। হস্টেলে খুব ঘটা করে সরস্বতী পূজা হত। আবাসিকেরা সে রাত্রে একটা নাটকও মঞ্চস্থ করে। খেলার মাঠের পশ্চিমদিকে স্টেজ বাঁধা হবে। পাশেই আমাদের কমন রুম, সেখানে সাজঘর।

নিজেদের নাটক ছাড়া আর একটি অনুষ্ঠানের জন্য আমরা সাগ্রহে অপেক্ষা করতাম। যাত্রা। পূজার আগের রাত্রে ওই স্টেজে পেশাদার যাত্রার অভিনয় হত। যে পেশাদারেরা মল্লিকবাড়িতে যাত্রা করেন, তারা উঁচুদরের দল। প্রতি রাত্রে কোন না দু'-চার শো টাকা দিতে হয় তাঁদের। হিন্দু হস্টেলে যে যাত্রার দল আসে তারা অতি সাধারণ মানের। ছোটখাটো গ্রাম-গঞ্জে অভিনয় করে। এক রাত্রির জন্য তাদের পঞ্চাশ পঞ্চান্ন টাকা দিতে হত। জন চারেক বাজনদার, একজন পেন্টার আর আট-দশজন অভিনেতা এবং নাচের দল। তখনও যাত্রাপালায় অভিনেত্রীর প্রবেশ হয়নি, যদিও তার অনেক আগেই পেশাদার রঙ্গমঞ্চে অভিনেত্রীরা অংশ নিতে শুরু করেছেন। সেই সন্ধ্যায় আবাসিকেরা এবং তাঁদের বন্ধুরা সাগ্রহে অভিনয় দেখার অপেক্ষায় থাকেন। তখন মনে হয়নি, এই যাত্রাভিনয় ছেলেদের বড় নিষ্ঠুর খেলা ছিল। যাত্রা দেখতে নয়, সবাই সেই খেলা দেখতে জড়ো হয়েছে।

সেই রাত্রে উত্তরা-অভিমন্যু পালা হচ্ছিল। পরের রাত্রে আমাদের সহবাসীরা মেঘমুক্তি অভিনয় করবে। তার জন্য স্টেজে সিন টাঙানো হয়েছে। কলকাতা শহরের কোনও ধনী পল্লীর ছবি আঁকা পশ্চাৎপটে। তার সামনে দাঁড়িয়ে যুদ্ধে যাবার প্রস্তুতি পর্বে উত্তরা অভিমন্যুকে করুণ আকুতি জানাচ্ছে, কোথায় যাচ্ছ। কোন শত্রু পরিবেশে, কেন যাচ্ছ? সবে নতজানু হয়ে কান্নাভেজা গলায় আবেদন করছে, নাথ, তুমি যেয়ো না. না, না, না।

এমন সময় সবাইকে চমকে দিয়ে মঞ্চে প্রবেশ মালকোচা-মারা ধুতি পরা, অঙ্গে রঙিন শার্ট আমার দু' ক্লাস ওপরের পরেশ সামন্তের। তার হাতে উন্মুক্ত তরবারি। সে প্রবেশ করেই কঠিন তিরস্কার করল উত্তরাকে, ললনা, এ তুমি কী করছ? ক্ষত্রিয়ের ধর্মপত্নী হয়ে? হাত ধরে উত্তরাকে দাঁড় করিয়ে তার হতভম্ব হাতে তরবারি ধরিয়ে দিয়ে বলল, যাও স্বামীর সঙ্গে যুদ্ধে চলে যাও। যুদ্ধে জিতে এসো। অসহায় সন্ত্রস্ত রমণীদের মতো অভিমন্যুকে তার কর্তব্য থেকে বিচ্যুত কোরো না।

দর্শক-আসন থেকে প্রচণ্ড হাসির রোল উঠল। পরেশ বলল, ওই শোনো, যুদ্ধক্ষেত্রের চিৎকার, সেখানের অস্ত্রের ঝঞ্ঝনা।

সবলে উত্তরার হাত ধরে পরেশ বলল, এই নাও তরবারি। আর দেরি কোরো না. যাও। উত্তরা হাত ছাড়িয়ে নেবার ব্যর্থ চেষ্টা করছে, চিৎকার করছে,

'আমায় ছেড়ে দিন, আমায় ছেড়ে দিন, আমি বাড়ি যাব।' সভায় আবার প্রচণ্ড হাস্যরোল উঠল। অভিমন্যু প্রস্তরবৎ স্থির, কিংকর্তব্যবিমূঢ়, উত্তরা তরোয়াল হাতে নিয়ে শিলীভূত অহল্যার মতো। উইংসের পাশ থেকে একজন বাজনাদার উঠে এসেছে। নাটক বহির্ভূত পরেশ সামন্তকে নিবারণ করতে। সভাস্থ দর্শকদের হাস্যরোল বিস্ফোরণের মতো যুদ্ধক্ষেত্রকে আচ্ছন্ন করেছে।

ইতিমধ্যে বাজনাদার এবং অধিকারীকে নিরস্ত করতে আরও দু'জন ছাত্র দর্শক মঞ্চে উঠে এসেছে।

এই ছিল হিন্দু হস্টেলের যাত্রার চেহারা। যাত্রার অভিনেতারা এই অভিজ্ঞতার জন্য প্রস্তুত ছিল না বলেই, আরও মজা পাচ্ছে দর্শকবৃন্দ। পুরনো বাসিন্দারা তো জানেই এমন কোনও অঘটন ঘটবে। তারা ছাড়া আমাদের মতো নতুন যারা, তারাও হতবাক।

এইরকম ক্ষণে ক্ষণে বাধার মধ্যে যাত্রা চলতে থাকে, দু'-চারটে সিন বাদ যায়। ভুল জায়গায় নাচ-গান আরম্ভ হয়। পঞ্চাশ বা পঞ্চান্ন টাকার বিনিময়ে যাত্রাপার্টির জন-পনেরো অপ্রস্তুত কুশী-লব ও বাজনাদারেরা কোনও প্রকারে যাত্রা পালা শেষ করে। ভোজনান্তে নিশ্চয় মনে মনে প্রতিজ্ঞা করে, হিন্দু হস্টেলে আর নয়, এবার মানে মানে বাকি ক'টা টাকা নিয়ে প্রস্থান করাই বিধেয়।

উত্তরা-অভিমন্যু নাটক প্রচণ্ড কোলাহল, হাততালি ও প্রোৎসাহনের চিৎকারের মধ্যে শেষ হল।

কুশী-লবেরা এতক্ষণে নিশ্চিন্ত হয়ে খাবারের সন্ধানে যাবে। সাজঘরের পাশেই খাবারের আয়োজন। আমার ওপর তাদের তদারকির ভার ছিল। মঞ্চের পিছনে সাজঘরে গিয়ে দেখি, সবাই পোশাক খুলে ফেলে টিনের বাক্সে বন্ধ করছে। সদ্য কৈশোর-উত্তীর্ণ ছেলেটি যে উত্তরার ভূমিকা করছিল, আদুড় গায়ে একটা বাক্সের ওপর বসে অঝোরে কাঁদছিল। আর সবাই নিজেদের কাজে ব্যস্ত, কেউ ছেলেটির দিকে তাকাচ্ছেও না। প্রথমে আমিও বুঝতে পারিনি, এখন, আজও বুঝতে পেরেছি কিনা জানি না। পরে মনে হয়েছিল, নতুন ছেলে, নতুন অভিনয় করছে, আমাদের ব্যবহারে হতচকিত, অপমানিত, বিভ্রান্ত, নিজের দুঃখে অশ্রুপাত করছিল। ছেলেটার জন্য একটু কষ্টও হয়েছিল তখন। কোথায় মঞ্চে দাঁড়িয়ে অভিনয় কুশলতায় সবার হাততালি পাবে, আর তার বদলে এ কী অসম্মান, হেনস্থা। এমনও মনে হয়েছিল, হয়তো ছেলেটা

নতুন, সবে যাত্রাদলে যোগ দিয়েছে। হয়তো আজ সন্ধ্যায় তার অভিনয় দেখাবার সুযোগ হল না বলে তার প্রাপ্য এক টাকা বা দু' টাকা দেবে না অধিকারী। সেই আশঙ্কায় হাপুস নয়নে কেঁদেছিল।

আমার কষ্ট নেহাত-ই সাময়িক ছিল। কারণ, পরের বছর এবং তারও পরের দু' বছর আমিও ওই তামাশায় যোগ দিয়েছি উৎসাহের সঙ্গে, হাততালি দিয়েছি, গলা ফাটিয়েছি, মহাবলশালী ভীমকে গান গাইতে বাধ্য করার জন্য আর সকলের সঙ্গে চিৎকার করেছি। আমি নিজে মঞ্চে উঠে উদ্ভট কোনও প্রস্তাব করে সবাইকে হাসাতে পারিনি, তার কারণ আমার উদ্ভাবনী শক্তির অভাব, আমার মঞ্চভীতি। অনিচ্ছা কখনও নয়।

সরস্বতী পূজার রাত্রে প্রথমদিকে গান বাজনার আসর বসত। তখনকার অনেক বিখ্যাত গাইয়ে হিন্দু হস্টেলের মঞ্চে গান করেছেন। পঙ্কজ মল্লিক, শচীনদেব বর্মন, এমনকী পাহাড়ি সান্যালও একবার আমাদের গান শুনিয়েছেন। এঁদের আসরে উপস্থিত করানো একটা বড় কাজ ছিল। স্বভাবতই ওই রাত্রে তাঁদের নানাস্থানে যাবার নিমন্ত্রণ হত। যে সময়টা আমাদের দিয়েছেন, তখন তাঁর বাড়িতে গিয়ে শোনা গেল, তিনি তো এখন সাতের পল্লীতে অথবা সতেরোতে। সুতরাং তৎক্ষণাৎ সেখানে গিয়ে তাঁকে যদি দেখা গেল, তা হলে শিকারি বাঘের মতো ওত পেতে দাঁড়িয়ে থাকো, এখানের অনুষ্ঠান শেষ হলেই তাঁকে ধরে ফেলতে হবে। হয়তো আরও কোনও দল একই কারণে ওইখানে তাঁর জন্য দাঁড়িয়ে আছে, তাদের থেকে আমাদের প্রয়োজন যে আরও বেশি, কথাটা জোরের সঙ্গে বলতে না পারলে শিল্পী আবার হাতছাড়া হয়ে যাবেন।

আমন্ত্রিত শিল্পীরা শেষ পর্যন্ত আসতেন, আসরও মাতিয়ে দিতেন। ব্যবস্থাপনার কর্তাদের বুক গর্বে ভুলে উঠত। এঁদের কাউকে কখনও পারিশ্রমিক দিতে হয়নি। এমনও বলেননি কেউ আমার তবলচিকে একশো আর তানপুরায় যিনি পিড়িং পিড়িং করলেন, তাঁকেও পঞ্চাশটা টাকা দিয়ে দেবেন। সে দিনকালই আলাদা ছিল।

তখনও বোধহয় গ্লোবাল ওয়ার্মিং শুরু হয়নি। বসন্তের প্রথম কয়েক দিন বাতাসে শীতের আমেজ থাকত। প্রত্যুষেই ঠান্ডা জলে স্নান করে, সম্ভব হলে বাসন্তী রঙের পাঞ্জাবি পরে, সকাল থেকেই মাঠে বসে সারা সকাল আড্ডা। পূজা এবং তারপর প্রসাদ পাওয়া যেত। পরে ভোজনের আয়োজনও বিশিষ্ট

ছিল। অবশ্যই খিচুড়ি, সুগন্ধ সোনামুগের ডালের সঙ্গে গাওয়া ঘিয়ের যুগলবন্দি, সুখের যাবতীয় উপকরণ এত সহজলভ্য ছিল। অবশ্যই গরম বেগুনি, হয়তো ইলিশ মাছ ভাজাও পাওয়া যেত, ঠিক মনে পড়ছে না। আর থাকত পরম উপাদেয় বস্তু নারকেল ভাজা। সরস্বতী পূজার খিচুড়ির সঙ্গে ছাড়া এমন উপাদেয় নারকেল ভাজার দেখা কেন পাওয়া যায় না, বুঝি না।

সরস্বতী পূজার রাত্রে আবাসিকদের একটা উপরি পাওনা ছিল। সে রাত্রে দর্শকমণ্ডলীতে হিন্দু হস্টেলের সুপারিনটেন্ডেন্ট বেশ কিছুক্ষণ উপস্থিত থাকতেন। সুপারিনটেন্ডেন্ট অধ্যাপক দুর্গাপতি চট্টরাজ নির্বিরোধী মানুষ ছিলেন। হস্টেলের দক্ষিণ পশ্চিম প্রান্তে তাঁর বাসস্থান। সেখানে তিনি সপরিবার থাকতেন। হস্টেলে চার বছর বাস করেও কখনও অধ্যাপক চট্টরাজকে দেখেনি এমন অনেক ছাত্র ছিল। তার কারণ, অধ্যাপক চট্টরাজ তাঁর বাসস্থান থেকেই হস্টেল পরিচালনা করতেন। রক্তকরবীর রাজার তবু সাক্ষাৎ না পাওয়া গেলেও কণ্ঠস্বর শোনা যায়। কিন্তু অধ্যাপক চট্টরাজের কণ্ঠধ্বনি কলেজের পাঠ-কক্ষে ছাড়া আর কোথাও কেউ শুনেছে বলে জানি না। তাঁর যাতায়াতের পথও স্বতন্ত্র ছিল, অর্থাৎ আমাদের গেট দিয়ে তিনি যাতায়াত করেন না। ছেলেরা বলত, তাঁর দুটি সোমত্থ কন্যা আছে বলে তিনি ছাত্রদের সঙ্গে যোগাযোগ রাখেন না। হস্টেল বিনা সমস্যায় নির্বিঘ্নে চলত।

দুর্গাগতি চট্টরাজ নরম প্রকৃতির মানুষ। কারও চোখে চোখ রেখে কথা বলেন না। সব সময়ে ওপর দিকে তাকিয়ে কথা বলেন, কাকে সম্বোধন করছেন বুঝে নিতে হয়। সম্ভবত ছাত্রদের সঙ্গে সাক্ষাৎ পরিচয় রাখার প্রয়োজনও হত না। কর্মচারীরা প্রাচীন, অনুগত এবং নির্বিবাদী, হস্টেল তেল-খাওয়া চাকার মতো মসৃণ গতিতে চলত।

ছেলেদের সঙ্গে যোগাযোগ হয়তো খুব সুখকর কিছু হবে না মনে করতেন অধ্যাপক চট্টরাজ। অন্তত একবার, আমার অভিজ্ঞতায় সেই প্রথম এবং শেষবার, সুপারিনটেন্ডেন্টের হস্টেল পরিদর্শন খুব সুখের হয়নি, সে খবর আমি জানি।

কারণ মনে নেই, থিয়েটারের অনুশীলনের সময় দুই ছাত্র দলের মধ্যে মন কষাকষি হয়ে যায়। ফলে একদল ছাত্র অনুশীলন পরিহার করেছিল। হস্টেলের নাটকে সুপারের প্রভূত আগ্রহ, তিনিই আমাদের মোশান মাস্টার ঠিক করে

দেন, কখনও সখনও অনুশীলনে উপস্থিত হন। একদল ছাত্রের রিহার্সেল বর্জন মানে কয়েকজন অভিনেতার আকস্মিক অন্তর্ধান। বিরক্ত, আহত ছাত্রদের মান ভাঙাতে এক সন্ধ্যায় অধ্যাপক চট্টরাজ বিনা নোটিশে চার নম্বর ওয়ার্ডের পঞ্চাশ নম্বর ঘরে এসে উপস্থিত হলেন। কে বা কারা বেশি বজ্রাহত হল মাপা হয়নি। পঞ্চাশ নম্বর ঘর তখন তামাকের ধোঁয়াতে প্রায় অন্ধকার। কলেজ থেকে তুলে আনা উলফ্‌স বটলের একমুখে কাচের নল লাগানো, তার ওপর হুঁকা চড়ানো হয়েছে, অন্য মুখে তামাক টানবার জন্য রবারের নল।

বিভিন্ন ক্লাসের ছেলেদের একদল, হুঁকো ঘিরে বসে আছে, রবারের নল এক হাত থেকে অন্য হাতে ফিরছে। আমরা নীচের ক্লাসের ছাত্র, বড়দের সামনে ধূমপান না করা পরম্পরা, নীতি, কিন্তু কল্কে চড়াবার পর ভালভাবে তামাক তৈরি করার জন্য যেভাবে ফুসফুসকে খাটাতে হয়, তাতে বড়রা রাজি নয়। তাই ওই ভারটা আমাদের ওপর পড়ে। অনেক দীর্ঘ টান দিয়ে হাঁপিয়ে যাবার পর, কলকে যখন গনগনে জ্বলে ওঠে, তখন বড়দের পালা। হিন্দু হস্টেলের পরম্পরা, এই ক্ষেত্রে বড়দের সামনে ধূমপানে আমাদের বারণ নেই।

মৌতাত যখন জমে উঠেছে, দশ-বারো জন ছাত্র ধূম্রজালে ঘরটি পূর্ণ করে ফেলেছে, এমন সময় বিরিঞ্চিবাবার মতো সুপার দুর্গাগতি চট্টরাজের প্রবেশ। দু'পক্ষই হতচকিত, কিংকর্তব্যবিমূঢ়। দুর্গাগতিবাবু যতই ওপর দিকে তাকিয়ে থাকুন, অবস্থা বুঝতে তাঁর দেরি হল না, কিন্তু তিনি ন যযৌ ন তস্থৌ, বাক্‌রহিত। আমরা হুঁকোটা সরিয়ে ফেলার জন্য বদ্ধপরিকর। কিন্তু জ্বলন্ত কলকে সরাব কী প্রকারে। হঠাৎ কার মাথায় বোধহয় ধারণাটা এল, জানালা গলিয়ে হুঁকো কলকে এবং যাবৎ সাক্ষ্যপ্রমাণ বাইরে ফেলে দেওয়া যায়। এমনই আমাদের দুর্ভাগ্য এই সুবুদ্ধি একই সময় আরও একজনের মাথায় এল। হঠাৎ দু'জনে হুঁকো নামের বোতলটিকে দু'দিকে টানতে লাগল। অব্যবস্থিত টানাটানির ফলে কলকেটি স্থানচ্যুত হয়ে বিছানার ওপর পড়তেই অনেকের সংবিৎ ফিরে এল। কে যেন চেঁচিয়ে উঠল, আগুন আগুন। সুপারও হঠাৎ ঘোর কাটিয়ে উঠলেন, তোমরা ব্যস্ত হয়ো না। শান্ত হয়ে কলকেটা মাটিতে ফেলে দাও। হুঁকোর জলটা আগুনের ওপর ফেলো।

শেষ পর্যন্ত কী পরিস্থিতিতে আমাদের উদ্ধার হয়েছিল সম্পূর্ণ মনে নেই। যুদ্ধক্ষেত্র শান্ত হবার পর আমরা চুপচাপ অনুশীলনে ফিরে গিয়েছিলাম। সুপারের তিরস্কারও শুনতে হয়নি।

অগ্নি নির্বাপণের যৌথ উদ্যোগে অংশ নেবার পর আর কখনও অধ্যাপক চট্টরাজের সঙ্গে দেখা হয়নি। একমাত্র সরস্বতী পূজার রাত্রে ছাড়া, যে রাত্রে তিনি স্বয়ং সভাস্থ হতেন।

কলেজের অধ্যক্ষের সঙ্গেও আমাদের অনুরূপ সম্পর্ক ছিল। আমরা নিচু ক্লাসের ছাত্র, আমাদের পাঠের বিষয়ও নয় গণিত, যে বিষয়ে বুঝি অনার্স ক্লাস নিতেন অধ্যক্ষ বি এম সেন। তিনি গণিতের দিগ্বিজয়ী ছাত্র, কেমব্রিজের র‍্যাংলার। গম্ভীর মুখে নিজের অফিসে প্রবেশ করতেন। দিনান্তে গম্ভীর মুখেই প্রস্থান করতেন। তাঁর সঙ্গে আমাদের যোগাযোগের কারণ নেই। কখনও আসতে যেতে দেখেছি, সমীহার সঙ্গে পথ ছেড়ে দাঁড়িয়েছি। তিনি নীরবে নিজের অফিসে চলে গিয়েছেন। তবু মাঝে মাঝে তাঁর সঙ্গে দেখা হত।

কলেজের মাসিক ফি ছিল পনেরো টাকা। উঁচু ক্লাসে বুঝে সতেরো টাকা হয়েছিল। সময়ে ফি জমা না করলে এক টাকা বা দু' টাকা জরিমানা দিতে হবে। সময়ে টাকাটা জমা দেওয়া মাঝেমাঝেই হয়ে উঠত না। আবার, জরিমানা দিলে পক্ষকালের জলখাবারে টান পড়ে। তাই নিরুপায় আমাদের অধ্যক্ষের ঘরে যেতে হত। তিনিই জরিমানা মকুব করতে পারেন। তখনই অধ্যক্ষের সঙ্গে আমাদের মতো সামান্য ছাত্রদের দেখা হত। দেখা হওয়া মানে যদি চার চক্ষুর মিলন হয়। তা হলে দেখা হত বলা যাবে না। কারণ অধ্যক্ষ আমাদের দিকে চোখ তুলে তাকাতেন না।

তাঁর ঘরের দরজার পর্দা ঠেলে মে আই কাম ইন সার বলেছি। তিনি মাথা নিচু করে কিছু লিখছিলেন বা পড়ছিলেন, বলবেন, কাম ইন। আমরা তৎক্ষণাৎ টেবিলের কাছে গিয়ে ফি জমা দেবার খাতাটা তাঁর সামনে এগিয়ে দিয়েছি, তিনি মাথা না তুলেই তার ওপর একটা সই করে দিয়েছেন। জরিমানা মকুব হয়ে গেল। আমরা অস্ফুটে থ্যাঙ্ক ইউ বলে দ্রুত পশ্চাদপসারণ করেছি। এই ছিল রুটিন, কখনও তার ব্যতিক্রম হয়নি।

অধ্যক্ষ সেনও শান্ত এবং নির্বিবাদী মানুষ ছিলেন। কিন্তু দোর্দণ্ড না হোক, তাঁর প্রতাপ অবশ্যই অনুভূত হত, কারণ কলেজ চলত মসৃণ গতিতে, কোথাও কোনও আলোড়ন ছিল না। তাঁর স্ত্রী সার নীলরতন সরকারের মেয়ে। আমরা মাসিমা বলতাম। তিনি হস্টেলেও এসেছেন কখনওসখনও। অনেক আবাসিককে ব্যক্তিগতভাবে চিনতেন। কল্যাণময়ী মাতৃমূর্তি—সব অনুষ্ঠানে আসতেন। ছেলেদের উৎসাহ দিতেন। আর কোনও অধ্যাপকের স্ত্রীকে আমরা দেখিনি।

সেদিনের প্রেসিডেন্সি কলেজ বিক্রমাদিত্যের নবরত্ন সভার চেয়ে নিঃসন্দেহে উজ্জ্বল ছিল। অধ্যাপকেরা দু'-চারজন বাদ দিয়ে সবাই, নানা ডিগ্রিতে শোভিত। পি আর এস, পি এইচ ডি, ডিলিট, ডি এস সি-র মুকুটপরা রাজন্যবর্গের মধ্যে অধ্যক্ষ বি এম সেন। পড়ানোতে সবার দক্ষতা সমান ছিল না। সবাই হয়তো জানতেনও না কীভাবে তাঁদের জ্ঞানভাণ্ডার আমাদের সামনে উন্মোচন করলে, আমরা তার ভাগ নিতে পারব।

চারুচন্দ্র ভট্টাচার্য আমাদের পদার্থবিদ্যা পড়ান। এম এ-র ওপরে তাঁর কোনও ডিগ্রি ছিল না। বিষ্ণুপুরি তসর বা সিল্কের পাঞ্জাবি পরে কোঁচা দুলিয়ে ক্লাসে আসতেন। সদয়, অনুভূতিশীল মুখ। রসবোধ ছিল, মাঝে মাঝে এক আধটা হাসির কথা বলেন। তাঁর ক্লাসে খুব টেনশন ফ্রি আবহ থাকত। কিন্তু তাই বলে তাঁর সহৃদয়তার অপব্যবহার করবার ক্ষমতা ছিল না কারও। উচ্চকণ্ঠে গল্প বা হাসি শুনলে, পড়া থামিয়ে আমাদের দিকে শীতল কঠিন চোখ তুলে তাকালে বুকের ভিতর হিম হয়ে যায়, এমন ব্যক্তিত্ব। দুষ্টু ছেলেরা তামাশা করে বলত, 'ওঁর জ্ঞানের পরিধি খুব বিস্তৃত নয়. কোনও বাড়তি ডিগ্রির বোঝা নেই তাঁর নামের পাশে।' অন্যান্য অধ্যাপকদের চেয়ে বয়সে বেশি ছিলেন। দুষ্টু ছেলেরা আরও বলত, ওঁর সময়ে এম এ আর এস সি এক ডিগ্রি ছিল। পদার্থবিদ্যা আর রসায়ন নাকি এক বিষয়ের দুটি অংশ তখন। তখনও নিউক্লিয়ার ফিজিক্স পড়ানো শুরু হয়নি। চারুচন্দ্রের পড়ানোর ধারা এইসব মন্তব্যকে অলীক প্রমাণ করেছিল। এ জীবনে অনেক পাঠ নিয়েছি, নিতে বাধ্য হয়েছি। কিন্তু চারুচন্দ্র যে সহজ ভঙ্গিতে সরল ভাষায় তাঁর বক্তব্য বুঝিয়ে দিতেন, এমনটি আর দেখলাম না। আমার অভিজ্ঞতায় তাঁর মতো অধ্যাপক আর পাইনি।

তখনও জানতাম না, চারুচন্দ্র শুধু বিজ্ঞানের অধ্যাপক নন, সাহিত্য জগতে, এমনকী খোদ রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে তাঁর বিশেষ সম্বন্ধ ছিল। শ্রীনিকেতনে নানা কাজে সহযোগিতা করেছেন, রবীন্দ্রনাথের কিছু বইয়ের প্রকাশকও ছিলেন, অবশ্যই বিশ্বভারতীর পক্ষে। কলেজে আমাদের প্রথম দু'বছরের পরই বোধহয় তিনি অবসর নিয়েছিলেন। তাঁর কাছে আর পড়বার সুযোগ পাইনি। পেলে হয়তো লেখাপড়ায় আর একটু ভাল হতে পারতাম।

এখন যেটা অনেক অধ্যাপকেরই শিরোভূষণ, তেমন অধ্যাপকও কয়েকজন ছিলেন, যাঁরা নির্বিকার ক্লাসে পড়িয়ে যেতেন, ছাত্ররা কী শুনছে তা নিয়ে

অকারণ মাথা ঘামাতেন না। আমাদের এক অধ্যাপক ক্লাসে হাজিরা নেবার পর, ঘোষণা করতেন, যারা ক্লাস ছেড়ে যেতে চাও, যেতে পারো। বলা বাহুল্য অনেক ছাত্রই বেরিয়ে পড়ত। বাইরে কত আকর্ষণ, কমন রুম, খেলার মাঠ, রায়মশায়ের রেস্টুরেন্ট এবং পাশের হিন্দু হস্টেল। অধ্যাপক অল্প ছাত্রে ও নিরুপদ্রব ক্লাস নিয়ে সন্তুষ্ট থাকতেন।

চার বছর কলেজে পড়ে কোনও অধ্যাপকের সঙ্গে ব্যক্তিগত পরিচয় হয়নি। আবার, অন্যদিকে এমন অধ্যাপকও ছিলেন, যিনি বা যাঁরা ছাত্রদের কণ্ঠস্বরও চিনতেন। গণিত অধ্যাপক্ষ, খগেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী তাঁর মধ্যে অন্যতম। মাথা নিচু করে রোল কল করছেন, হঠাৎ একজনের ইয়েস সার শুনে চোখ তুলে তাকালেন, আবার নামটা ডাকলেন, যে প্রক্সি দিয়েছিল সে আর দ্বিতীয়বার ইয়েস সার বলবার সাহস পেল না।

কলেজের সবার থেকে সম্মানিত অধ্যাপক ছিলেন, প্রফুল্লচন্দ্র ঘোষ। ডাকসাইটে ইংরেজির অধ্যাপক। তাঁর অবস্থান কিংবদন্তির পর্যায়ে। তাঁর কাছে পড়বার সুযোগ হয়নি, শুধু বুঝি ইংরেজি অনার্সের ক্লাসে পড়াতেন। তিনি অধ্যক্ষেরও গুরুস্থানীয়, সবাই তাঁকে সমীহ ও শ্রদ্ধা করে। মাথায় কাশফুলের মতো এক রাশ চুল, পরিধানে ধুতি পাঞ্জাবি, পায়ে ফিতেবাঁধা জুতো। দেখেছি মন্থর গমনে ক্লাসরুমে যাচ্ছেন। আমরা সন্ত্রস্ত সরে দাঁড়িয়েছি। তাঁর শেক্সপিয়রের রচনার অনুভব, প্রাঞ্জল পড়ানোর ভঙ্গি সবই অসাধারণ ছিল। অন্য কলেজ থেকে ছেলেরা তাঁর পড়ানো শুনতে আসত। আমাদের তাঁর ক্লাসে ঢোকবার সাহস হল না।

আমাদের যাঁরা ইংরেজি পড়াতেন তাঁদের মধ্যে তারক সেন অন্যতম। মাত্র কয়েক বছর আগেই বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বেরিয়েছেন, অধ্যাপনার জন্য তখনই প্রভূত সুনাম হয়েছে। আরও যাঁরা ছিলেন, পাণ্ডিত্যে এবং পড়ানোয় তাঁরাও কম নয়। সাহেবি মানুষ এচ কে ব্যানার্জি বাইবেল পড়াতেন। সুবোধ সেনগুপ্ত, তারাপদ মুখোপাধ্যায়, সোমনাথ মৈত্র ইংরেজির বিভিন্ন বই পড়িয়েছেন।

খুব আধুনিক বইয়ের সঙ্গে আমাদের পাঠ্যের যোগ ছিল না। পাঠ্যপুস্তকের বাইরের ইংরেজি বই তাই অনেক বেশি আকর্ষণ করত। তা ছাড়া, ফরাসি, স্ক্যান্ডিনেভীয় এবং রুশ সাহিত্যের অনেক বইয়ের অনুবাদ সহজলভ্য ছিল। হস্টেলের লাইব্রেরিতে তার মস্ত ভাণ্ডার।

পেঙ্গুইন ও পেলিক্যানের কাগজের মলাটে সস্তায় বই সেই সবে চালু

হয়েছে। সম্পাদকমণ্ডলীতে কৃষ্ণ মেননের নাম দেখে আমরা উল্লসিত। পৃথিবীর সঙ্গে আমাদের যেটুকু যোগাযোগ হল, তার প্রধান সূত্র এই দুই প্রকাশকের অল্পমূল্যের বই। ছ' পেনি, অর্থাৎ সাড়ে পাঁচ আনা দাম ছিল বইয়ের। তিনটে বই একসঙ্গে কিনতে পারলে এক টাকাতেই পাওয়া যায়, সেখানে দু' পয়সার সাশ্রয়। যদিও বইয়ের জন্য একসঙ্গে এক টাকা ব্যয় করা সহজ কাজ ছিল না।

কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় তখন বিদ্যাপীঠ হিসাবে ভারতবর্ষে অগ্রগণ্য। অন্য প্রদেশ, বিহার, ওড়িশা, অসম থেকে ছাত্রেরা এখানে পড়তে আসে। হিন্দু হস্টেলেও তাই সংখ্যায় সামান্য হলেও অন্য প্রদেশের ছাত্র থাকত। চার নম্বর ওয়ার্ডে এমন একজন ছিল। তার বাড়ি দিল্লিতে, নাম কৃষ্ণ সাইগল। সে নাম বলত কিষণ সাইগল। কিষণ আমার তিন ক্লাস ওপরে, অর্থাৎ স্নাতক পর্যায়ে, সেটাই তার শেষ বছর। সকলের সঙ্গে ভাল মিশতে পারে না, একটু আলাদাই থাকে। বাংলা বলতে পারে, বলেও। আমরা তাকে নিয়ে আড়ালে একটু হাসাহাসি করি। কারণ সে ডোরাকাটা কাপড়ের আন্ডারওয়ার পরে। নিজের ঘরে ওই পরিধানেই সকালটা কাটিয়ে দেয়। ছোটখাটো কাজে ডোরাকাটা ইজের পরে বারান্দায় আসতে দ্বিধা করে না। আমরা শহুরে লোক, খেলার সময় ছাড়া হাফপ্যান্ট পরি না।

আমার সঙ্গে কিষণের ভাব ছিল। সম্ভবত এই জন্য যে আমি সামান্য হিন্দি জানি, এবং আমার হিন্দি উচ্চারণ অন্যদের মতো শ্রুতিকটু নয়। কলেজ থেকে ফেরার পর মাঝে মাঝে বারান্দায় বসে কিষণের সঙ্গে গল্প হয়। আমি তখনও দিল্লি দেখিনি। রাজধানীর গল্প আগ্রহের সঙ্গে শুনি। লালকেল্লার পশ্চিম তোরণ থেকে সদর বাজার খারি বৌলি পর্যন্ত শাহজাহানের তৈরি করা রাস্তা। চাঁদনি চৌক আমার মনে মোহ বিস্তার করে। একদা দুর্গের ভেতরে পশ্চিম তোরণের কাছ থেকে মিনাবাজার বসত সপ্তাহে একদিন, শুধুই মেয়েদের প্রবেশ সেখানে, কেনাবেচা দু' কাজে শুধুই মেয়েরা। সুলতান ছাড়া আর কোনও পুরুষের সে বাজারে প্রবেশ নেই। আমি অবাক হয়ে দিল্লির কাহিনী শুনেছি।

একদিন, বারান্দায় বসে আছি, কিষণ বলল, একবার আমার ঘরে এসো, কিছু কথা আছে। আশ্চর্য হলাম, এমন কী কথা থাকতে পারে যা বারান্দায় বলা

যায় না। ঘরে গিয়ে কিষণ যা বলল, তাতে আরও আশ্চর্য হলাম। কিষণের সম্প্রতি এক বাঙালি মেয়ের সঙ্গে প্রণয় হয়েছে। দেখা সাক্ষাৎ বেশি হয় না। মেয়েটির বাড়ির লোক খুব সনাতনপন্থী, কিষণের আসা-যাওয়া ভাল চোখে দেখেন না। তাই কিষণকে মেয়েটির সঙ্গে চিঠির আদানপ্রদান করে সন্তুষ্ট থাকতে হয়।

কিষণ এবার আমার হাত ধরে বলল, তুমি আমাকে এই দুর্দৈব থেকে বাঁচাতে পার। আমি নিজে গোটা ক'য় চিঠি লিখেছি। কিন্তু প্রীতি সেদিন আমাকে লিখেছে আমার একটা চিঠি তার কাকার হাতে পড়েছে, খুব খোঁজাখুঁজি হচ্ছে, কার হাতে লেখা সেই চিঠি।

এখন আর নিজের হাতে চিঠি লেখবার সাহস নেই কিষণের। আমি যদি তার হয়ে চিঠি লিখে দিই, তা হলে কিষণ সেই চিঠি নির্ভয়ে তার প্রিয়তমাকে পাঠাতে পারে।

প্রস্তাব শুনে প্রথমটা আমি চমকে গিয়েছিলাম। তারপরই মনে হল, এ তো মস্ত সুযোগ। প্রেমপত্র লেখায় হাত পাকানোর এমন নির্ভয় সুযোগ আমি কোথায় পাব।

আমি রাজি হয়ে গিয়েছিলাম। তার একটা গূঢ় কারণ ছিল। কিছুদিন আগে, লাইব্রেরিতে একটা বই দেখেছিলাম। ফেমাস লাভলেটার্স। বইটা তৎক্ষণাৎ পড়বার উদগ্র বাসনা হয়েছিল। কিন্তু তখন সবে হস্টেলে ভর্তি হয়েছি। প্রবীণ লাইব্রেরিয়ানের কাছে গিয়ে বইটা খাতায় লিখে নিতে লজ্জা করল। যখনই লাইব্রেরিতে যাই, সতৃষ্ণ নয়নে আলমারিতে বইটা দেখি। শেষ পর্যন্ত একদিন সাহস করে বইটা নিয়ে ফেলেছিলাম। পড়ে দেখি যেন একটা রত্নখনিতে প্রবেশ করেছি। সব বিখ্যাত মানুষদের লেখা চিঠি। প্রণয়িনী অথবা স্ত্রীকে লেখা। ভালবাসা প্রকাশের এত বিচিত্র ধারা থাকতে পারে, আমার কৈশোর জীবনে তখনও পর্যন্ত তার আভাস পাইনি। স্ক্যান্ডিনেভীয় উপন্যাস এবং দু'-একজন অতি আধুনিক বাংলা লেখকের বই পড়ে আমার ধারণা হয়েছিল, বুকের কাপড় না সরালে প্রগাঢ় প্রণয় হয় না। লাভলেটার্সে সেই পদ্ধতির উল্লেখ ছিল না, তা নয়। যথেষ্টই ছিল, কিন্তু একেবারে নিকষিত হেম প্রেমের উদাহরণও অনেক ছিল। একজন অতি বড় লেখক, তাঁর নাম আজ মনে নেই, তিনি তাঁর প্রিয়তমার পদচুম্বনের আকুলতায় ছত্রে ছত্রে কেঁদে ভাসিয়ে ছিলেন। কোন ধরনের চিঠিতে কেমন ফল হয়েছিল, আমার দুর্ভাগ্য কোনও চিঠিতে

তার উল্লেখ ছিল না। সুযোগ পেলে প্রেমের কোন ব্রহ্মাস্ত্রটি প্রয়োগ করলে অব্যর্থ ফল হবে, তার পরীক্ষা করতে পারিনি।

কিষণের কথায় আমার সেই সুযোগ এসে গেল। প্রথমটায় অকল্পনীয় প্রস্তাবে থতমত খেয়ে গেলেও, আমি কিষণের প্রস্তাবে সানন্দে রাজি হয়ে গেলাম।

প্রথমেই কিঞ্চিৎ আশাভঙ্গ হল। ভেবেছিলাম, লাভলেটার্স থেকে উদ্ধৃতি যোগ করে মোক্ষম চিঠি তৈরি করে দেব। কিন্তু কিষণ বাদ সাধল। সে চিঠির মুসাবিদা করবে, আমি নিজের হাতে নকল করে দেব। অন্য পুরুষের অবাঞ্ছিত প্রেমের সাক্ষী হওয়া ছাড়া আমার কোনও বিশিষ্ট ভূমিকা থাকল না। তবু একটা জীবন্ত প্রেমের সঙ্গে জড়িয়ে থাকারও একটা মজা ছিল। কিষণ চিঠি লেখে বড় মাঠোমাঠো ভাষায়। কোনও সূক্ষ্ম বা জটিল অনুভূতির ছাপ থাকে না তার লেখায়। তা ছাড়া কিষণ যে চিঠি পায় তার প্রণয়িনীর কাছ থেকে, আমার হাতে লেখা চিঠির উত্তরে, তার উল্লেখ থাকলেও কিষণ সে-চিঠি আমাকে দেখায় না।

কিষণের কাছেই শুনলাম, আমার লেখা চিঠি ডাকে দেওয়া হয় না। মেয়েটি যে ট্রামে ওঠে কিষণ সেই ট্রামের দোরগোড়ায় রডের কাছে চিঠি হাতে দাঁড়িয়ে থাকে, মেয়েটি নামবার সময় কিষণের উদ্যত হাত থেকে চিঠিটা নিয়ে নেবে, এই হল পদ্ধতি। একই পদ্ধতিতে কিষণ চিঠি পায় প্রণয়িনীর কাছ থেকে।

অন্যের জবানে চিঠি কোনও না-দেখা মেয়েকে লেখার মধ্যে কোনও রোমাঞ্চ থাকবার কথা নয়। কিন্তু তাতেই সন্তুষ্ট থাকি। হঠাৎ ভাগ্যের চাকা ঘুরে গেল। কিষণ বলল, মেয়েটি ইংরেজিতে লেখা চিঠি আর পছন্দ করছে না, বলেছে বাংলায় চিঠি লিখতে হবে। সেও এবার থেকে বাংলায় চিঠি লিখবে। কিষণ বাংলা ভাল পড়তে পারে না। পড়ে ফেললেও বাংলা বুঝতে অসুবিধা হয়। মেয়েটির চিঠির সবটা মর্মোদ্ধার করতে পারে না, অংশ বিশেষ আমায় দেখাতেও হয়। আমি বাংলা চিঠি যত দূর সম্ভব রোমাঞ্চময় করে ছত্রে ছত্রে প্রেমের বান ডাকিয়ে দিই। কিষণ তার সবটা পড়ে উঠতে পারে না। আমার মকসো করা আমার হাতে লেখা চিঠি কোনও যুবতীকে শিহরিত করছে ভেবে আমার সে কী অপার সুখ। কিন্তু সুখ বেশি দিন সয় না। কিষণের ফাইনাল পরীক্ষার পর সে দেশে চলে গেল। বলেছিল, দিল্লি ফিরে চিঠি লিখবে, তাও লেখেনি। আমার পরকীয়া প্রেমচর্চা অকালে বিনষ্ট হল। সান্ত্বনা শুধু এইটুকু যে

একটা চিঠিতে আমি যথাযথ প্রেমজর্জর ভাষায় তার পদচুম্বনের জন্য আকুলতা প্রকাশ করেছিলাম। আশ্চর্য, তার অনেক পরে পড়েছিলাম, দেবি, দেহি পদপল্লবমুদারম! জয়দেব যখন পড়ি তখন আমি লাভলেটার্সের জাদু কাটিয়ে উঠেছি।

হিন্দি জানার কারণে আর একজন ভিনদেশি আবাসিকের সঙ্গে আমার বেশ জানাশোনা হয়েছিল। তার নাম বেণীপ্রসাদ। বাড়ি বিহার বা ইউ পি'তে, আমি তফাত জানতাম না। বেণীপ্রসাদ প্রথম শ্রেণীর ফুটবল খেলোয়াড়, মোহনবাগানের ফরোয়ার্ডে খেলে। সে তখন ষষ্ঠ বর্ষে, ছেলেরা বলত সে নাকি কিছুদিন যাবৎ ওই ষষ্ঠ বর্ষে অনড় বসে আছে। বেণীপ্রসাদ আমাকে অনেক ফুটবল ম্যাচ দেখিয়েছে। মোহনবাগানের খেলা থাকলে আমার কাছে অব্যর্থ ভাল আসনের পাস আসত। খেলা দেখেছি অনেক, কিন্তু ভক্তদের মতো আকুল হতে পারিনি। আরও একজন প্রথম শ্রেণীর খেলোয়াড় হস্টেলে ছিল। হাওড়া ইউনিয়নে, না এরিয়ানে খেলত। আমার সঙ্গে ভাসা ভাসা আলাপ ছিল। শুনে আশ্চর্য হয়েছি এই দু'জন নাকি তাদের ক্লাব থেকে আর্থিক সাহায্য পেত। নইলে কিঞ্চিৎ স্টাইলে থাকত কী করে?

যেদিন মোহনবাগানের খেলা থাকত, সেদিন দুপুরের পরে বেণীপ্রসাদের জন্য গাড়ি আসত। বেণীপ্রসাদ মাঠে যেত গাড়ি করে। এরা দু'জন এবং এদের আর এক বন্ধু তিনশো কিংবা চারশো টাকা দিয়ে একটা সেকেন্ডহ্যান্ড মরিস গাড়ি কিনেছিল। হস্টেলের সামনে থাকে। ঠেলে স্টার্ট করতে হত। বিকালে সন্ধ্যায় কয়েক বন্ধু মিলে সেই গাড়ি নিয়ে ঘুরত, আমার ঈর্ষা হত, এরা যেন পৃথিবী জয় করেছে। যেমন আকস্মিক আবির্ভাব হয়েছিল গাড়ির তেমনই অকস্মাৎ গাড়িটা অন্তর্হিত হল। শুনলাম, রাস্তায় খারাপ হয়ে গিয়েছিল, মিস্ত্রি বলেছিল চালু করতে শ' দুই টাকা লাগবে। খরচা অত্যধিক মনে হওয়ায়, বেণীপ্রসাদেরা গাড়িটা রাস্তায় ফেলে রেখে চলে এসেছে।

বেণীপ্রসাদকে বললেই মোহনবাগানের ম্যাচের একাধিক প্রবেশপত্র পাওয়া যেত। বন্ধুবান্ধবদের নিয়ে বহু ভাল ম্যাচ দেখেছি তখন। হারজিত যাই হোক, সেই খেলার আলোচনায় দীর্ঘকাল তর্কবিতর্ক হত। কেউ বলত দত্ত যদি ওই সময় গোলের ডান দিকে না থেকে বাঁ দিকে থাকত তা হলে অমনভাবে হারতে হত না। অন্য কেউ বলত, এ আলোচনা অর্থহীন, পরেশ তো অফ সাইডেই দাঁড়িয়েছিল, সেটা রেফারির নজরে পড়ল না কেন? পরের কোনও গুরুত্বপূর্ণ

ম্যাচ পর্যন্ত চাপানউতোর চলতেই থাকত। এত দেখে এবং এত শিখেও আমার খেলার ওপর আগ্রহের কোনও ওঠানামা হল না। খেলাও শিখতে পারলাম না, হিন্দু হস্টেলের এইট এ সাইড ফুটবলের নিয়মিত খেলোয়াড় হওয়া সত্ত্বেও। দ্বিতীয় বছরের পর চার নম্বর ওয়ার্ডে আবাসিকের সংখ্যা বেড়ে যাওয়ার পর, আমার আর খেলার দরকারই হল না। দু' বছর পরে বেণীপ্রসাদ হস্টেল থেকে এবং সম্ভবত খেলা থেকে বিদায় নেবার পর, আর ফুটবল খেলাও দেখতে হল না।

পৃথিবীতে চেষ্টা করলেই সব কিছু করা যায় বলে যে আপ্তবাক্যটি আছে সেটি সর্বাংশে অলীক। আমি নানা সময়ে ইংরেজি ভাল করে শেখবার চেষ্টা করছি, কিন্তু সফল হলাম না। বাবা ইংরেজি ভাল জানতেন, এখনও ইংরেজিতে লেখা বাবার পুরনো চিঠিপত্র দেখি, তাঁর লেখার বাঁধুনি দেখে অবাক হই। আমিও তো অনেক ইংরেজি পড়েছি, ভাল লেখা সহজে চিনতে পারি, এই ভাষার বর্ণনা করবার শব্দসম্ভার এবং তার উপযুক্ত প্রয়োগ দেখে তারিফ করি। হয়তো তারিফ করবার মতো বিদ্যা অর্জন করেছি বলেই, নিজে কখনও ইংরেজি লেখবার চেষ্টা করিনি। বলে রাখা দরকার আরও বাঙালি যুবজনোচিত অনেক কাজই করিনি, কবিতা লিখিনি কোনও দিন।

বাবার কাছে গল্প শুনেছি, তাঁদের ইংরেজি পড়াতেন অধ্যাপক পার্সিভ্যাল, ভাল পড়াতেন। ছাত্রেরা তাঁর অনুরক্ত ছিল। তিনি অবসর নেবার দিন নিজের ফেটন গাড়িতে উঠেছেন, ছাত্রেরা গাড়ির ঘোড়া খুলে দিয়ে সেই গাড়ি নিজেরা টেনে সাহেবকে বাড়ি পৌঁছে দিয়েছিল। এমনই জনপ্রিয় ছিলেন। অধ্যাপক ছিলেন অসাধারণ। সেকালের মানুষ যে শুদ্ধ ইংরেজি জানত, তার প্রধান কারণ আমার ঠাকুরদা বলতেন, সাহেব অধ্যাপকদের কাছে ইংরেজি শেখা।

আমরাও যদিও স্বল্পকাল সাহেব অধ্যাপকের কাছে পড়েছি, প্রেসিডেন্সি কলেজে। দেওয়ালে যে ক্লাস রুটিন টাঙানো ছিল, সেখানে লেখা দেখেছি, ইংরেজি কবিতা টি পি এম, গদ্য টি এন এস, অর্থাৎ প্রফেসরদের নামের আদ্যক্ষরই শুধু লেখা থাকত। টি পি এম মানে তারাপদ মুখার্জি, টি এন এস মানে তারকনাথ সেন। তেমনই একটা নাম দেখেছিলাম, ইংরেজি পদ্যের অধ্যাপকের এচ এচ। তাঁর নাম যে হামফ্রে হাউস, তিনি পড়াতে আসবার

পর জানতে পারলাম। দীর্ঘদেহী মিষ্টভাষী, সুপুরুষ সাহেব ক্লাসে আসতে আমরা সন্ত্রস্ত হয়ে নড়েচড়ে বসলাম। কী বলবেন অধ্যাপক, বুঝতে পারব তো। যেটুকু ইংরেজি শুনি ট্রেনের গার্ড বা অন্য কর্মচারীদের কণ্ঠে, অথবা রাস্তায় পুলিশ সার্জেন্টের, কোনও দিনই ভাল করে বুঝতে পারতাম না। ভাবে-ভঙ্গিতে বুঝে নিতে হত যে সাহেব তাড়না করছে। পরে অবশ্য জেনেছি, তারা আদৌ পুরো সাহেব ছিল না—আধা সাহেব।

অধ্যাপক হাউস পরিষ্কার বোধগম্য ইংরেজি বলেন, তিনি কেমব্রিজের স্নাতক, তাঁর বলার মধ্যে কেমন একটা ছন্দ থাকে, খুব ভাল লাগে। ক্লাসে তাঁর প্রথম দিনের পাঠ আজও মনে আছে। আমরা স্থিতাবস্থায় ফেরার পর বললেন, কোনও ভাষা ভাল করে জানতে হলে, তার ধ্বনি তার উচ্চারণভঙ্গি জানা উচিত। আমি আজ তাই দিয়েই শুরু করব।

খড়ি হাতে উঠে দাঁড়িয়ে বোর্ডে লিখলেন go। এবার আমাদের প্রশ্ন করলেন, বলতে পার কী লিখেছি?

আমরা অবাক, সাহেব বলছেন কী, আমরা রীতিমতো ম্যাট্রিক পাস করে এসেছি, সেখানে ইংরেজিতে দু'শো নম্বরের পরীক্ষা, আমরা go শব্দের উচ্চারণ জানি না? আমরা সমবেত কণ্ঠে গো গো বলে চিৎকার করতে লাগলাম। হাউসসাহেব বললেন, ইংরেজির স্বরবর্ণ অত সহজ নয়। সরল নয় তার উচ্চারণ। বহু স্বরবর্ণ যুক্তস্বর, সুতরাং go শব্দের উচ্চারণ হবে গৌ। বলে বোর্ডে লিখলেন বাংলায় গৌ। তারপর আর কিছু সরল অথচ গভীর জিনিস শিখেছিলাম তাঁর কাছে। পড়াতেন ভাল। সর্বোপরি সদাশয় মানুষটির উপস্থিতিই আনন্দময় ছিল। একবার হিন্দু হস্টেলে সরস্বতী পূজার সন্ধ্যায় তিনি স্বচ্ছন্দ ধুতিপাঞ্জাবি পরে এসেছিলেন।

দুষ্ট লোকেরা তাঁর সম্বন্ধে একটি গল্প বলত তখন। এদেশি ইংরেজিতে ছাপা একটি খবরের কাগজ তখন সাহেবদের ইংরেজির কাগজ স্টেটসম্যানের সঙ্গে পাল্লা দিচ্ছে। হাউসসাহেব নাকি বলেছিলেন, তিনি ওই বাঙালিদের প্রকাশিত কাগজটি নিয়মিত পড়েন। শুনে উল্লসিত প্রশ্নকর্তা জিজ্ঞাসা করেছিল, বাঙালিদের লেখা ওই কাগজটি বুঝি ইংরেজি এতই ভাল লেখে যে হাউসসাহেব সেই কাগজ পছন্দ করেন?

হাউসসাহেব বুঝি বলেছিলেন, না, ইংরেজির জন্য নয়। ওই ইংরেজি কাগজটি পড়লে বাংলা ভাল শেখা যায়, তাই পড়ি।

অধ্যাপক হাউস বেশিদিন থাকতে পারলেন না এদেশে। এদেশে ইংরেজ রাজের অনাচার দেখে তিনি একটি পুস্তিকা লিখেছিলেন, অ্যাজ আই স্পাই উইথ মাই লিটল আইস (As I Spy with my little eyes) সে সমালোচনা ইংরেজ রাজপুরুষদের পছন্দ হয়নি। হাউসসাহেবকে প্রেসিডেন্সি কলেজ ছেড়ে চলে যেতে হল। প্রেসিডেন্সি সরকারি কলেজ।

বছরখানেক খোদ ইংরেজ অধ্যাপকের কাছে ইংরেজি পড়ে আমার যদি কোনও ধারণা হয়ে থাকে যে আমি ইংরেজি ভাষা বুঝতে ও বলতে কিছুটা শিখেছি, সেই ধারণা ধূলিসাৎ হয়ে গেল কাশীতে পড়তে এসে।

তখনও আমি জানি না যে পরে বেনারস হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়তে যাব। সে তো চার বছর পরের ঘটনা।

কাশীর সবই ভিন্ন এবং অভিনব। কলকাতার সঙ্গে তার কোনও আত্মীয়তা নেই। তিন বা চার হাজার বছরের পুরনো শহর কাশী। কলকাতার তখন তো তিনশোর কম। কাশীর হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়টি নতুন, তখনও তার পঁচিশ বছর পূর্ণ হয়নি। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় এবং প্রেসিডেন্সি কলেজ আশি পার হয়ে গিয়েছে।

অবশ্য কাশী আমার অপবিচিত নয়। অনেক আগে মার সঙ্গে কাশী গিয়েছি। কিন্তু সেই কাশী, তীর্থযাত্রীর কাশী। আর আমাদের, ছাত্রদের কাশী—দুয়ের মধ্যে অনেক তফাত।

প্রথম যেবার কাশী যাই, তখন স্কুলে পড়ি। ম্যাট্রিক পরীক্ষা দেবার আগের বছর গরমের ছুটিতে বাবা আমাদের সবাইকে মুসৌরি বেড়াতে নিয়ে গিয়েছিলেন। ফেরার পথে, দেরাদুন, লখনউ আর অযোধ্যায় দু'-একদিন থাকা হল। কিন্তু কাশীতে নামা হল না। বাবার ডেহরি-অন-সোন অফিসে কী জরুরি কাজ রয়েছে।

গরমের ছুটি দীর্ঘ। তার শেষ দিকে মা আমাকে কাশী নিয়ে গেলেন। মুঘলসরাই ছাড়িয়ে গঙ্গার পুল পার হবার দৃশ্যটি আমার এখনও মনে আছে। গঙ্গার পশ্চিম তীরে কাশী। অনেক দূর থেকে ট্রেনের জানলা দিয়ে কাশী দেখা যাচ্ছে। কাছাকাছি পৌঁছতে প্রথম দেখলাম বেণীমাধবের দুই সমুচ্চ ধ্বজা। ক্রমশ কাশীর কয়েকটি স্নানের ঘাট স্পষ্ট হল। সাতসকালেই কত তীর্থযাত্রী

স্নান করতে নেমেছে। মানুষের কালো মাথাগুলি পানকৌড়ির মতো ডুবছে, উঠছে। দেখতে না দেখতেই গাড়ির চাকা গম্ভীর গমগমে আওয়াজ তুলে রেলপুলে উঠে পড়ল। পুলের থাম ও অন্য লোহালক্কড়ের ফাঁক দিয়ে মাঝে মাঝে কাশী দেখা যাচ্ছে। দূরে নদীর ওপরই লোক চলাচলের জন্য একটা পনটুন ব্রিজ।

ট্রেনের যাত্রীরা চঞ্চল হয়ে উঠেছে। আমরা গঙ্গার ওপর দিয়ে চলেছি। দু'হাত কপালে ঠেকিয়ে বিশ্বনাথের জয়ধ্বনি করছে যাত্রীরা। গঙ্গাকে উদ্দেশ করে কেউ কেউ পয়সা ছুড়ছে। হয়তো আনি দুয়ানিও। সব সোজাসুজি গঙ্গায় পড়ছে না। লোহালক্কড়ে লেগে নানা আওয়াজ তুলে জলে গিয়ে পড়ছে। রেললাইনের গুরুগম্ভীর ধাতব শব্দ, টাকা পয়সার ফিনফিনে শব্দ। এখনও ওই পুলে উঠলে যেন শুনতে পাই।

ছোট পুল, শেষ হয়ে গেল। ট্রেন এসে থামল কাশী স্টেশনে। আমরা কাশী স্টেশনে নামব না। আমরা নামব বেনারস ক্যান্টনমেন্ট স্টেশনে। সেখানে তেমন পাণ্ডাদের উৎপাত নেই, যেমন আছে কাশী স্টেশনে।

কাশী মা'র অতি পরিচিত স্থান। এখানে মা'র পুরুষ সঙ্গীর প্রয়োজন হয় না। কোনও প্রতিবেশিনী বা বান্ধবীকে সঙ্গে নিয়ে মা মাঝে মাঝে কাশীতে বেড়াতে আসেন। তিন-চার দিন থাকেন। এবারে আমি সঙ্গে এসেছি।

টাঙ্গা চড়ে গোধূলিয়ার মোড়ে হরসুন্দরী ধর্মশালায় নামলাম। এখানে আমরা থাকব। পাঁড়ের অর্থাৎ বীরেশ্বর পাণ্ডের বিশাল ধর্মশালাতেও মা কখনও থেকেছেন। হরসুন্দরী ধর্মশালা বুঝি কোনও ধনী বাঙালি প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। বাঙালিদের প্রথম পছন্দে তাই হরসুন্দরী। তিনতলা বাড়ি। ওপরের তলার ঘরগুলি কিঞ্চিৎ বিশিষ্ট। আমাদের জন্য সেখানে একটা ঘর খুলে দিল। এই সুবিধার জন্য আটআনা বা এক টাকা দিতে হত। নীচেই তোশক-বালিশ ভাড়া পাওয়া যায়। মা সঙ্গে চাদর এনেছেন। মাটিতে বিছানা পেতে, তার ওপর চাদর বিছিয়ে থিতু হওয়া গেল।

কাশীতে প্রথম কাজ বিশ্বনাথ দর্শন। মুখ হাত ধুয়ে, জামা-কাপড় বদলে বেরিয়ে পড়লাম। টাঙ্গা নিতে হবে না। আমরা হেঁটেই যাব। সারা পথটাই অভিনব। প্রচুর মানুষজন। দু'দিকে যারা চলেছে সবই বুঝি তীর্থযাত্রী। যারা ফিরে আসছে, অনেকের হাতে কমণ্ডলু বা ঘটি, পতিতপাবনী গঙ্গার জলে ভরা। তারই মাঝে টগবগিয়ে টাঙ্গা চলেছে। মোড় পেরিয়ে বাঁ দিকে বিশ্বনাথের

গলি। গলির মুখে গাছের তলায় ক'জন সাধু বসে আছেন, তাঁদের হাতে সধূম কলকে।

আমরা গলির ভেতর ঢুকলাম। সরু গলি। দু'পাশে সার সার দোকান। বাসনপত্র, জামা-কাপড়, বেনারসি শাড়ি, ছোটদের জন্য কাঠের খেলনা, বড়দের রান্নার যাবতীয় সরঞ্জাম, কী নেই সেখানে। সবাই সাদর ডাকাডাকি করছে। তার দোকানে সর্বশ্রেষ্ঠ জিনিসের সংগ্রহ। তার দোকানে একবার যেন যাই। এমন আত্মীয়তার সুরে ডাকছে যে আমার সব দোকানেই একটু দাঁড়াবার ইচ্ছা।

আরও এগিয়ে, অনেকখানি আঁকাবাঁকা পথ পেরিয়ে, মানুষের ভিড়, দোকান-বাজার, কেনাবেচা পার হয়ে বাঁ দিকে একটা দেউড়ির মধ্যে ঢুকে পড়লাম। বিশ্বনাথের চত্বর। লোক চলাচলের শেষ নেই। যত লোক যাচ্ছে, তত লোক আসছে। মা'র পরিচিত পাণ্ডা কোথায় ছিল, যেন ঝাঁপিয়ে পড়ল। আমাদের জুতো, চটি রাখবার ব্যবস্থা হল। ফুল বেলপাতা, পেঁড়া কিনে পাণ্ডার পিছন পিছন মন্দিরে প্রবেশ করলাম। ধূপধুনার ধোঁয়াতে প্রায়ান্ধকার মন্দিরে ফুল ও ধূপের সুগন্ধ। কয়েকজন পাণ্ডার মন্ত্রপাঠ শুনছি, ভক্তেরা সাধ্যমতো পুনরুচ্চারণ করছে। দূর থেকে দেখা নয়, এখানেই প্রথম শুনলাম মহাদেবকে স্পর্শ করতে হয়। তিনি প্রার্থনা পূর্ণ করেন। শিলার ওপর হাত রেখে আমার প্রার্থনা জানিয়েছিলাম। মনে হয়েছিল কাশী বাঙালিদের শহর। দোকানিরা সবাই বাংলা বলে। সর্বত্র বাংলা কথা শুনেছি।

অপরাহ্নে দশাশ্বমেধ ঘাটে এসে চমৎকৃত হয়েছিলাম। ঘাটের সিঁড়ির ধাপে ধাপে, চাতালে গুচ্ছ গুচ্ছ মানুষ জটলা করছে। তদ্গত হয়ে কথকতা শুনছেন একদল মানুষ, তার পাশে গম্ভীর সুরেলা গলায় গীতা পাঠের আসরেও সমান ভিড়। ক্রমে সন্ধ্যা হয়ে এল। আলো জ্বলে উঠল কয়েকটি। ছায়া ছায়া আসরগুলোয় লণ্ঠন জ্বলল। নদীতে তখনও মানুষ স্নান করছে, কয়েকটা ছোট বড় নৌকো ইতস্তত ভেসে বেড়াচ্ছে।

কাশীতে ভোজনের আয়োজনও আমার মনোমতো ছিল। ভাতের সঙ্গে সাক্ষাৎ নেই বললেই চলে। সকাল দুপুর সন্ধ্যা পুরি কচোরি এবং রাবড়ি। ধর্মশালার কাছেই একটা ভাত-ডালের ভোজনালয় ছিল। আসতে যেতে দেখতাম, স্লেটের ওপর খাবারের দাম লেখা রয়েছে। দু'পয়সায় ভাত-ডাল চচ্চড়ি, তিন পয়সায় মাছ। মা'র ইচ্ছা নয় ওখানে খাওয়া হোক। ওটা পাইস হোটেল, ঠিক ভদ্রজনোচিত নয়।

কলকাতা আর কাশীর দূরত্ব যেন সহস্র যোজন, কে বলবে মাত্র এক রাত্রের সফর। কলকাতায় সবাই ব্যস্ত। সব সময়। কাশীর মতো এখানে ঘড়ি থেমে নেই।

পরের বছর চার নম্বর ওয়ার্ডে বাসিন্দার সংখ্যা বেড়ে যাওয়াতে আমাকে আর ওখানে বি টিমে ফুটবল খেলতে হল না। টিম থেকে বাদ পড়ার কথা এক বন্ধুকে বলতে সে বলল, বা, এ তো ভাল হয়েছে, তুমি আমাদের সঙ্গে ক্রিকেট খেলবে চলো।

হকিতে দৌড়োদৌড়ি সার, টেনিসে ব্যর্থ, ফুটবলে বিবর্জিত আমাকে আদৌ যে কেউ খেলতে ডেকে যন্ত্রণা দেবে, আমি কখনও ভাবতে পারতাম না। কিন্তু যে আমাকে ক্রিকেট খেলার নিমন্ত্রণ করল, সে প্রেসিডেন্সি কলেজে আমার প্রথম বন্ধু। তার প্রস্তাব অস্বীকার করা সম্ভব ছিল না।

ক্রিকেট তখনও বাঙালির প্রিয় খেলা নয়। এই খেলায় ভারতবর্ষের অধিকার সামান্য। সবে আগের বছর বিলাতে টেস্টে ভারতীয় দল খেলতে গিয়েছিল। স্কুলে আমরা সে খবর পাইনি। কলেজেও খবরটা আলোচনা করবার মতো গুরুতর বিষয় হয়ে ওঠেনি। শুঁটে ব্যানার্জি সেই দলে গিয়েছিলেন বিলেতে, কিন্তু খেলার সুযোগ পাননি। এ-সব খবর আমার জানবার কথা নয়, অনেক পরে জেনেছি।

যে বন্ধুটি আমাকে ক্রিকেট খেলা শেখাতে চাইল, তার নাম সমরেন রায়। বেহালায় তাদের নতুন ক্রিকেট ক্লাব।

সমরেনের সঙ্গে আমার পরিচয় হয়েছিল, আমার কলেজে পদার্পণের প্রথম দিন, দোসরা জুলাই। কলেজের বিশাল সিঁড়ির পিছন দিকে নোটিশ বোর্ড পড়ে কিছুই অর্থ করতে না পেরে আরও বিভ্রান্ত হয়ে পড়েছি। স্মার্ট ছেলেরা এদিক ওদিক যাচ্ছে, কেউ একা, কেউ সদলে। অনুমান করছি সিঁড়ির নীচে টাঙানো নোটিশ বোর্ডে যারা রুটিন দেখছে, তারা সবাই আমার মতো প্রথম বর্ষের ছাত্র। কলকাতার ছেলে, হয়তো এক স্কুল থেকেই কয়েকজন এসেছে। তাদের কাছে সবই চেনাজানার মধ্যে, তাই কোনও আড়ষ্টতা নেই। কী করব বুঝতে পারছি না। ইংরেজি কবিতা প্রথম পিরিয়ডে। তার নীচে লেখা টি পি এম, আর বাইশ। অথবা, ট্রিগনোমেট্রি আর তিন, জি ডি বি। এ-সব সাংকেতিকের অর্থ আমি কোথা থেকে জানব।

এমন সময়, ত্রাণকর্তার মতো একটা ভারী সপ্রতিভ ছেলে আমাকে জিজ্ঞাসা করল, আপনি কি ফার্স্ট ইয়ার?

ছোটখাটো ছেলেটির উজ্জ্বল গৌরবর্ণ মুখ, ঠোঁটের নীচে ছোট এক চিলতে গোঁফ তার চোখের চটুলতার সঙ্গে পাল্লা দিচ্ছে। সে আবার বলল, আর্টস না সায়ান্স? কোন স্কুল আপনার?

আমি যেন একটা আশ্রয় পেয়ে গেলাম। তাড়াতাড়ি উত্তর দিয়ে বললাম, আপনি?

নিজের কানেই কেমন বিসদৃশ লাগল। পনেরো বছরের দুটি বালক, পরস্পরকে আপনি বলে সম্বোধন করছে। সমবয়সিদের কোনও দিন আপনি বলিনি। কিন্তু এ তো স্কুল নয়, কলেজ, এখানের নিয়মকানুনই তো আলাদা।

ছেলেটি তার নাম বলল, সমরেন রায়। আপনি বেশিদিন থাকল না। সেদিনই তুমিতে নেমে এলাম, তারপর ক'দিনের মধ্যেই তুই। এখনও।

সে কলকাতার ছেলে, বেহালার। পরে জেনেছিলাম সমরেন বেহালার বিখ্যাত পরিবার রায়েদের বাড়ির ছেলে। রায়েরা দীর্ঘদিন কলকাতার অধিবাসী, বেহালা অঞ্চলটাই একদা তাদের জমিদারি ছিল। তার পরিচিত অনেক ছেলে সে বছর এই কলেজে ভর্তি হয়েছে, তাদের বৃহৎ পরিবার থেকেই তারা তিনজন। সে তো স্বচ্ছন্দ হবেই।

সমরেন আমার সেকশনেই। ক্লাসে পাশাপাশি বসতাম। একদিন তাদের বাড়ি নিয়ে গেল। বিশাল প্রাসাদোপম বাড়ি। আগে ছ' আনার হোলডে টিকিট কেটে ট্রামে এই অঞ্চলে এসেছি। বাড়িটা তখন লক্ষ করিনি। দোতলার একান্তে সমরেনের পড়বার ঘর। পৌঁছবার কিছুক্ষণের মধ্যেই ঠাকুর অর্থাৎ পাচক একটা রেকাবিতে গোটা আষ্টেক সদ্য ভাজা ধবধবে লুচি, কিছু তরকারি আর একটি মিষ্টি দিয়ে গেল আমাকে। এই সমরেনদের দৈনন্দিন বৈকালিক আহার।

মা, বাবা, কাকিমা কাউকে দেখলাম না, ঠাকুরের দেওয়া খাবার সমরেন শেষ করে হাত ধুয়ে এল। গুরুজনদের শাসনমুক্ত এমন আয়োজন আমাকে চমৎকৃত করেছিল। আহারাদির পর খানিকক্ষণ গল্প করে হস্টেলে ফিরে এলাম।

পরে যতবার গিয়েছি, যখনই গিয়েছি, ওই একই জলখাবার নির্ভুল উপস্থিত হয়েছে। লুচির সঙ্গে আমার ঘনিষ্ঠ পরিচয় বাল্যকাল থেকে। আমারও সকালে

অভ্রান্ত জলখাবার ছিল লুচি। রাত্রের রেখে দেওয়া সে লুচি তৈরি হত আটার। কী কারণে ময়দা না হয়ে আটার হত কখনও জিজ্ঞাসা করিনি। সমরেনের বাড়িতে তেমনই ময়দার লুচি অব্যর্থ পেয়েছি। তারওপর, সদ্য কড়া থেকে তোলা হয়েছে। লুচির সঙ্গে আমার প্রণয়ের সূত্রপাত হয়েছিল মেদিনীপুরে, এখানে এসে সে প্রেম আরও গভীর ও স্থায়ী হল।

লুচি বাঙালির নিজস্ব। তার তুলনা হয় না। হাওয়ার মতো হালকা। সুখদর্শন, রুচিকর এই ভোজ্যটি বাঙালির জীবনে অনেক সুখের আকর।

হয়তো সে কারণেই, আমার বেহালা যাতায়াত খুব ঘনঘন হত। সেদিন বৈকালিক আহারের সময় সমরেন খবর দিল ওদের ক্রিকেট ক্লাব আবার জাঁকিয়ে উঠেছে। এখন হপ্তায় তিন-চার দিন সে ক্রিক্রেট খেলতে যাবে। প্রস্তাব করল, আমিও যদি তার সঙ্গে যাই, তা হলে আমাকেও ক্রিকেট খেলা শিখিয়ে দিতে পারে। বিশেষ করে এখন তাদের ক্লাবে ক্রিকেট খেলা শেখাবেন কমল ভট্টাচার্য। কমল ভট্টাচার্য তখন বাংলার ক্রিকেটে অন্যতম নাম। শোনা যাচ্ছে হয়তো ভারতীয় টিমেও তাঁর স্থান হবে।

আমার অত কথা শোনবার দরকার ছিল না। জানি আমার দ্বারা হবে না, খেলাধুলায় আমার তেমন ঝোঁকই নেই। তবু, সমরেন বলছে, রাজি হয়ে গেলাম।

প্রথম যেদিন গেলাম খেলার মাঠে, সেদিন কমল ভট্টাচার্য খেলার মাঠে আসতে পারেননি। আজ যেখানে টাঁকশাল, টাকা তৈরির কারখানা, সম্ভবত ওই জায়গাটিতেই সমরেনদের মাঠ ছিল। ভাল লাগল। খোলা জায়গা অতখানি, সমরেনের বন্ধু সবাই, আমাকে সহজেই গ্রহণ করল।

আমি ক্রিকেট আদৌ খেলিনি কখনও। ডাংগুলিতেও আমার ব্যুৎপত্তি ছিল না। কিন্তু ক্রিকেটের ব্যাট ডাণ্ডার থেকে অনেক চওড়া, বলও গুলির চেয়ে বড়। আশা করেছিলাম, এক্ষেত্রে হয়তো সম্পূর্ণ ব্যর্থ না হতেও পারি।

দীর্ঘদেহী কমল ভট্টাচার্য এলেন। আমার সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিল সমরেন। বলল, এ একেবারে নতুন। একে গোড়া থেকে শেখাতে হবে।

আমি আশা করেছি প্রথমেই আমার ব্যাট চালনার পরীক্ষা হবে। ব্যাট করব কিনা জিজ্ঞাসা করতেই কমল ভট্টাচার্য বললেন, ব্যাট নয়, আগে বল ছুড়তে শেখো। অনেক পরে ব্যাট, আগের কাজ আগে। না হলে কি চলে ভাই?

অতি মিষ্ট কণ্ঠস্বর কমল ভট্টাচার্যের। কথা বলেন ধীরে ধীরে। অথচ

শুনলাম তাঁর নাম ফাস্ট বোলার হিসাবে। আমাকে বললেন, তুমি ওই মাঠের ওই দিকে গিয়ে দাঁড়াও। বল পেলে উইকেটে কিংবা বোলারের কাছে ছুড়ে দেবে।

আমি ক্রিজ থেকে এক যোজন দূরে মাঠের এক ধারে দাঁড়ালাম। খেলা শুরু হল। মাঝে মাঝে খেলা থামিয়ে কমল ভট্টাচার্য বোঝাচ্ছেন, বোলিং-এ কী ত্রুটি হল, অথবা ব্যাটসম্যান কেন ব্যর্থ হলেন। আমার দিকে বল আর আসে না। যদি বা এল, তখন বুঝতে পারলাম বল ছোড়ার আগে বলটা ধরাও দরকার। সে-কাজটা আমার সাধ্যায়ত্ত নয়। যেন মাঠের বাইরে দাঁড়িয়ে আছি, এ কী রকম খেলা শেখা। তারপর আর দু'-চারদিন গিয়ে থাকব মাঠে। ক্রিকেটকেও বিদায় দিতে হল।

ক্রিকেট তারকা সুঁটে ব্যানার্জি কিন্তু অত সহজে বিদায় নিলেন না ক্রিকেট থেকে। ভারতীয় দলের হয়ে ইংল্যান্ড গিয়েছিলেন ওই বছরই। কিন্তু যাওয়াই সার, তাঁকে খেলানো হল না। সুঁটে ব্যানার্জি বাঙালির তখন একমেবাদ্বিতীয়ম ক্রিকেট বীর, আবার গিয়েছিলেন ইংল্যান্ডে খেলার জন্য ১৯৪৬ সালে। এবারও না খেলে ফিরে এলেন। তবু ভাগ্য সুপ্রসন্ন বলতে হবে ১৯৪৯ সালে ভারতীয় টিমে খেলেছিলেন ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিরুদ্ধে টেস্ট বম্বেতে।

একটা বিষয়ে সুঁটে ব্যানার্জি পথিকৃৎ। ফাস্ট বোলার হিসাবে নয়। প্রথম বাঙালি টেস্ট খেলোয়াড় বলেও নয়, তিনিই অথবা তাঁর জন্যই বাঙালির চিরন্তন খেদোক্তি ও প্রতিবাদের শুরু হবে বাঙালির বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র, অন্যায়ের জন্য। সে প্রতিবাদ এবং অভিযোগ সুঁটে থেকে সৌরভ আজও সমানে চলেছে।

সন্ধ্যার সময় বাড়ির আড্ডায় মাঝে মাঝে সমরেনের দাদার দু'-একজন বন্ধু আসতেন। তাঁরা রাজনীতির আলোচনা করতেন। সেখানেও বুঝি বাঙালিদের কোণঠাসা করে দেবার চক্রান্ত।

আশ্চর্য, হিন্দু হস্টেলে রাজনীতির আলোচনা সর্বব্যাপী ঘটনা ছিল না। ছাত্র সমাজের রাজনীতিতে তেমন অনুরাগ নেই। হস্টেলে লাইব্রেরিতে খবরের কাগজ আসত। পড়বার জন্য সচরাচর লাইব্রেরিতে যাওয়া হয়ে উঠত না। ওপরের ক্লাসের দু'-দশজন ছাত্র খবরের কাগজ নিতেন। তাঁরা কমপিটিটিভ পরীক্ষা দেবেন, আই সি এস বা বি সি এস, খবরের কাগজ তাঁদের না পড়লেই নয়। তাঁদের আলোচনার ছিটেফোঁটা কানে এসে পৌঁছত, কিন্তু বিশেষ প্রভাবিত করত না।

অগ্নিগর্ভ মেদিনীপুর তখন আপাত শান্ত অগ্নিগিরির মতো স্তব্ধ। ভিতরে ভিতরে আগুন জ্বলছে। বেয়াল্লিশের আসন্ন আগুন-জ্বলা আন্দোলন তখনও অনেক দূরে। ছাত্ররা সে আগুনের আঁচ পায় না। অথচ ব্যবধান মাত্র পাঁচ বছরের।

এমন ছাত্রও অবশ্য ছিল যারা রাজনৈতিক আন্দোলন সম্বন্ধে সচেতন। তেমন একজন বোধহয় পরের বছর এসে পৌঁছল, পুব বাংলার কোনও কলেজ থেকে। তার নাম নিখিল মৈত্র। নিখিল খদ্দর পরে, দেশের স্বাধীনতা সম্বন্ধে তার আকুতির অন্ত নেই। তার যাবতীয় বিশ্বাস ধারণা দৃঢ়মূল, সেখান থেকে এক চুল সরারও স্থান নেই। নিখিল এসে আমাদের মধ্যে খানিকটা রাজনৈতিক চেতনা-সঞ্চারিত করেছিল। যা হয়, উৎসাহ উদ্দীপনা বেশি বলে নতুন দলে যেতে হয়—নিখিল ক্রমশ বামঘেঁষা হয়ে পড়ল। নিখিল মৈত্র কমিউনিস্ট পার্টির সদস্যও হয়েছিল। পরে শুনেছি, সে কমিউনিস্ট পার্টি থেকে বহিষ্কৃত হয়।

যদিও পলিটিক্সে কমিউনিস্ট আন্দোলনের খবর তার কাছ থেকেই প্রথম শুনেছি, ক্রমশ তার কথা ভুলে গিয়েছিলাম। আশ্চর্য এই যে, মানুষটার চেহারা মনে আঁকা হয়ে ছিল। তার সঙ্গে দেখা হল সতেরো-আঠারো বছর পরে। বম্বেতে। অফিসে বসে কাজ করছি, বেয়ারা এসে একটা স্লিপ দিয়ে গেল, নাম লেখা নিখিল মৈত্র।

লাঞ্চের সময় সঙ্গে করে বাড়ি নিয়ে গিয়েছিলাম। দুপুরে একসঙ্গে ভোজন হল। নিখিল ভারী যত্ন করে খেল। কথাবার্তার ধরন যেমন ছিল, তেমনই আছে। যা বলে তাই যেন চূড়ান্ত কথা, হড়বড় করে জোর দিয়ে বলে, অন্যের কথায় কান দেয় না। তার কাহিনী শুনে আমার স্ত্রী চমৎকৃত। কোনও কারণে, কারণ হয়তো বলেও ছিল, আমার মনে নেই, তাকে আত্মগোপন করতে হয়। তারপর ছদ্মনামে জাহাজে উঠে আন্দামান। সেখানে এম এ পাশ নিখিল নিজেকে ম্যাট্রিক পাশ বলে অন্য পরিচয়ে প্রাথমিক বিদ্যালয়ে শিক্ষকের কাজ করেছিল। তার আসল পরিচয় জানতে মানুষের কয়েক বছর লাগল। এখন, স্বনামে দেশে ফিরে এসেছে।

অনেক হয়েছে রাজনীতি, এবারে গঠনমূলক কাজ করতে হবে। একটা নিউজ এজেন্সি করার পরিকল্পনা আছে। সাধারণ নিউজ এজেন্সি নয়, যে খবরের সঙ্গে সাধারণ মানুষের জীবনের সম্পর্ক, তেমন একটা আদর্শ নিউজ এজেন্সি করবে। আমি কাগজে কাজ করি, আমি কি তাকে সাহায্য করতে পারব?

বিশেষ কিছু করতে পারব তার জন্য এমন ক্ষমতা আমার নেই। তার যে কী আদর্শ তাও ভাল করে বুঝতে পারিনি। যদিও একতরফা হাঁকডাক করে বোঝাবার ত্রুটি করেনি নিখিল।

কলকাতায় ফিরে নিখিল তার নিউজ এজেন্সি প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করেছিল। সে নিউজ এজেন্সি সফল হয়েছিল বলে জানি না। এই ঘটনার দু'-তিন বছরের মধ্যে খবর পেলাম, নিখিল মারা গিয়েছে।

নিখিল আমার অনুর্বর মাথায় রাজনীতির বীজ ঢোকাবার চেষ্টা করেছিল। আমার ওদিকে মন নেই। সামনে ইন্টারমিডিয়েট পরীক্ষা। দুটো বছর যৎপরোনাস্তি ফাঁকি দিয়েছি। এখন পরীক্ষার সময় উদ্বেগ তো হবেই। তবু সারাদিন পড়াশুনো করা হয় না। অন্য বুদ্ধিমান ছেলেদের অনুকরণে রাত্রি

দশটায় হস্টেলের আলো নিভিয়ে দেবার পর বারান্দার একটা মোমবাতি অথবা কেরোসিনের ল্যাম্প জ্বালিয়ে বসে লেখাপড়ার চেষ্টা করি। আশেপাশে আরও মোমবাতি জ্বলছে। মাঝে মাঝে উঠে গিয়ে তাদের সঙ্গে খানিকক্ষণ কথা বলি। পড়ার কাজ বেশি এগোয় না।

উঁচু ক্লাসের ভাল ছাত্রেরা আমাদের সাহায্য করবার জন্য সদা প্রস্তুত। কেউ পদার্থবিদ্যা পড়িয়ে দেন, কেউ রসায়ন পড়ায় সাহায্য করেন। সম্ভাব্য প্রশ্নগুলোর উত্তর ভাল করে শিখিয়ে দেন।

চতুর্থ বর্ষের যে ছাত্র আমাকে রসায়ন পড়ায় সাহায্য করেছেন তাঁর নাম প্রিয়ব্রত। নিজে ভাল ছাত্র, ইন্টারমিডিয়েটে ভাল ফল করেছেন। সব সময় পরিচ্ছন্ন, ইস্ত্রি করা ধুতি পাঞ্জাবি পরেন। মাঝারি লম্বা, ব্যাকব্রাশ করা চুল, সুদৃশ্য চেহারা। এক রাত্রে আমাকে বললেন, চলো, কাল তোমাকে মেট্রো সিনেমাতে নিয়ে যাব। একটা ভাল ছবি হচ্ছে।

গেলাম একদিন তাঁর সঙ্গে, তিনি ন' আনার ফ্রন্ট স্টলের টিকিট না কেটে, পাঁচ সিকের মিডল স্টলের টিকিট করলেন। ছবির শেষে গড়ের মাঠের এক নির্জন অংশে বসে খানিকক্ষণ গল্প হল। তারপর হস্টেলে ফিরে এলাম। এরপর প্রতি সপ্তাহে তাঁর সঙ্গে মেট্রোতে ছবি দেখা নিয়মিত হয়ে গেল। শো-র পরে মাঠে বসে বিবিধ বিষয়ে গল্পগুজবও।

এমনই এক সন্ধ্যায় দু'জনে মাঠে বসে অলস গল্প করছি, প্রিয়ব্রত হঠাৎ আমাকে জড়িয়ে ধরলেন। আশ্চর্য হয়ে গিয়েছিলাম, তাঁর আলিঙ্গনমুক্ত হতে সময় লাগল। এই ঘটনার তাৎপর্য কী অল্পবুদ্ধি আমার মাথায় আসেনি। সিনেমা দেখা ও মাঠে বসে একান্তে গল্প করা বন্ধ হল না। একটু সাবধানে থাকি।

প্রিয়ব্রত খুব ভাল ফল করেছিলেন রসায়নে। পরীক্ষার পর আমি বাবার কাছে ডেহরি অন শোনে চলে গিয়েছিলাম। প্রিয়ব্রত এম এসসি পড়তে বাঙ্গালোর চলে গেলেন। সেখান থেকে ডক্টরেটও করেছিলেন। প্রথম দিকে দু'-চার মাস চিঠিপত্র আদানপ্রদান হত, ক্রমে তাও বন্ধ হয়ে গেল। আর কখনও প্রিয়ব্রতের সঙ্গে দেখা হয়নি।

নিখিল মৈত্রের সঙ্গে পরিচয়ের সময়ে খবরের কাগজ পড়তে শুরু করেছিলাম। ইতিমধ্যে রাজা পঞ্চম জর্জের রাজত্বের পঁচিশ বছর পূর্ণ হয়েছে।

আমরা স্কুলে থাকতে একটা করে রাজা-রানির রঙিন ছবি উপহার পেয়েছিলাম। অষ্টম এডওয়ার্ড অভিষেকের আগেই মিসেস সিমসনের জন্য সিংহাসন ত্যাগ করলেন, তাঁর পরের ভাই ষষ্ঠ জর্জ রাজা হলেন। এ-সব খবর আমাকে খুব আলোড়িত করেছে মনে পড়ে না।

প্রেমের এমন পরম পরাকাষ্ঠার নিদর্শন বড়দের বিশেষ আলোচনার বিষয় হয়ে দাঁড়িয়ে ছিল। আমাদের, অন্তত আমার মনে ঘটনাটি কিচ্ছুমাত্র চাঞ্চল্য আনেনি। তার প্রধান কারণ প্রিন্স অফ ওয়েলসের প্রেমিকা আমাদের চোখে আদৌ সুন্দরী ছিলেন না এবং তাঁর চেহারায় বয়সের ছাপ ছিল। রাজপুত্রের এ কেমন প্রণয়িণী, আমাদের কোনও রূপকথার সঙ্গে মেলে না?

কলেজে দু'বছর পার হবার মুখে একটি ঘটনা আমাদের খবরের কাগজ পড়ায় আগ্রহী করে তুলল। সুজাতা সরকারের মৃত্যু। কুমারী মেয়ে সুজাতা বেথুন কলেজের ছাত্রী হস্টেলে থাকত। কোথায় যেন গর্ভপাত করাতে গিয়ে তার মৃত্যু হল। প্রকাশ পেল তার পদস্খলন ও ভ্রূণ হত্যার আয়োজনের সঙ্গে কয়েকজন প্রতিষ্ঠিত বাঙালি জড়িত। বড় একটা কলঙ্কের কাহিনী স্বভাবতই খবরের কাগজগুলিকে উত্তেজনার ইন্ধন জুগিয়েছিল।

নানা ছোট পুস্তিকা প্রকাশ হয়েছিল তখন। এক আনা বা দু' আনা দাম। এক পা'য়ে ঘুঙুর বেঁধে নৃত্যের ভঙ্গিতে তাল ঠুকে কলেজ স্ট্রিটের মোড়ে ফিরিওয়ালারা সেই পুস্তিকা বিক্রি করত। সঙ্গে মজাদার গান আর ছড়া—শুন শুন পুরনারী হও সাবধান ইত্যাদি। শহর একটা আলোচনা ও তর্কের বিষয় পেয়ে তেতে উঠল। বেশিদিন চলেনি পুলিশের মামলা। পরের বছরই শেষ হয়ে গিয়েছিল। মনে নেই কী হয়েছিল। কাগজগুলো আবার ঝিমিয়ে পড়ল।

এদিকে বিশ্ব ইতিহাসের পট পরিবর্তনের সূচনা হচ্ছে। ইউরোপে অশান্তির শেষ নেই। হিটলার একরোখা দামাল ছেলের মতো দাপিয়ে বেড়াচ্ছে। শাসন করবার কেউ নেই। ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী নেভিল চেম্বারলেন ছাতা হাতে ইউরোপে দৌড়োদৌড়ি করছেন। শান্তির চেষ্টায় তিনি হিটলারের অনেক দাবি মেনে নিয়েছিলেন।

ভারতীয় রাজনীতিতে সুভাষচন্দ্রের সক্রিয় ও তেজস্বী প্রভাব পড়তে শুরু করেছে। তিনি সবে চল্লিশ পার হয়েছেন। আমাদের ইন্টারমিডিয়েট পরীক্ষা আসন্ন। সে বছরই সুভাষচন্দ্র ভারতীয় কংগ্রেসের সভাপতি নির্বাচিত হলেন।

সাধারণ মানুষের মনে উদ্দীপনার শেষ নেই। আমরা নিয়মিত খবরের কাগজ পড়তে শুরু করেছি।

দেশের রাজনীতিতে আগ্রহ আছে, এমন ছাত্রও ছিল। তখন আমরা বুঝেছি রাজনীতি মানে কংগ্রেস রাজনীতি। স্বাধীনতার জন্য রাজনীতি। সিদ্ধার্থশঙ্কর দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জনের দৌহিত্র। তার সঙ্গে রাজনীতির যোগ স্বাভাবিক। প্রতাপচন্দ্রও যে পরিবারের ছেলে তাঁরা বহুকালের কংগ্রেসি। প্রতাপের বাড়িতে কংগ্রেস নেতাদের নিত্য যাতায়াত ছিল। প্রতাপের বাবা বাংলার পঞ্চ প্রধানের একজন।

এই সময় নিখিল মৈত্রের আবির্ভাব আমাদের রাজনৈতিক চেতনাকে খানিকটা প্রখর করেছিল। নিখিলের বামপন্থী ভাবনা তার কথাবার্তায় প্রকাশ পেত। সুভাষচন্দ্রের বামঘেঁষা চিন্তাধারাও যুবসমাজকে প্রভাবিত করেছিল। যুবসমাজের একমাত্র নেতা তখন সুভাষচন্দ্র।

কিছুদিনের মধ্যে নিখিল কমিউনিস্ট পার্টির সদস্য হয়েছিল। কমিউনিস্টরা তখনও নিজের পায়ে দাঁড়াতে সক্ষম নয়। অনেক কমিউনিস্ট কংগ্রেসেরও সদস্য ছিলেন।

ইট লোহা কংক্রিটের ঘিঞ্জি শহর কলকাতাতেও শীতশেষে বসন্তের আগমনের আশ্চর্য ছোঁওয়া পাওয়া যায়। হঠাৎ দক্ষিণের বাতাস বইতে শুরু করে। লেখাপড়া ভাল লাগে না। বাইরে যাবার ইচ্ছে করে। সামনেই কলেজ স্কোয়ার বা গোলদিঘি। হস্টেল থেকে দু'পা। সেখানে সব সময়ই কিছু মানুষজন থাকে, দু'-চার জন ফিরিওয়ালা। দিঘি চক্কর দিয়ে ক্লান্ত হলে দিঘির পুব দিকে প্যারাডাইস বা প্যারাগনে একপাত্র শরবত। তাঁদের পুরনো দোকান, বহুদিনের অভিজ্ঞতায় তাঁরা ঘোলের শরবতকে সম্পূর্ণ অন্য কোনও স্তরে নিয়ে গিয়েছেন। বাঙালির ব্যবসা। তাঁরা গর্বের সঙ্গে বলতেন তাঁদের এক প্রকার শরবতের প্রকরণ আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়ের উদ্ভাবন। আমাদের অত পরীক্ষা করবার সামর্থ্য নেই। প্রধানত গ্রিন ম্যাঙ্গো বা রোজ শরবতেই তুষ্ট হই। এক গেলাসের দাম এক আনা। এক বোতল ভিমটোর দাম আমাদের হস্টেলে পাঁচ পয়সা। শ্রান্তি এবং তৃষ্ণা নিবারণের পর হ্যারিসন রোড আর কলেজ স্ট্রিটের সংযোগে দ্বারিক সবথেকে ভাল জায়গা ছিল। এক আনায় চারটে লুচি এবং অবারিত ছোলার ডাল। ঈষৎ মিষ্টি, তবু অপূর্ব মনে হত। এখানেও এক আনায়

এক গেলাস রোজসিরাপের শরবত পাওয়া যায়। অত্যধিক মিষ্ট, তবু স্বাদে কম যায় না। রসগোল্লার রস মেশানো বলে যতই তাচ্ছিল্য করি, দ্বারিকের রোজ শরবত বড় পরিতৃপ্তির ছিল।

আশেপাশে খাবার দোকান এবং তাদের নিবেদনে হৃদয়লোভন ভোজ্যের আয়োজন অনেক ছিল। পুঁটিরামের রাধাবল্লভি তখন যাঁরা স্বাদ নিয়েছেন অন্য কোনও রাধাবল্লভি তাঁদের মনে ওঠে না। এর সবটাই বিগতদিনের স্মৃতিমেদুর, না সত্যিই অতি বিশিষ্ট ছিল, হলফ করে বলা কঠিন। চা পানের জন্য নিকটে জ্ঞানবাবুর বিখ্যাত চায়ের দোকান, আর গোলদিঘির দক্ষিণে ট্রাম রাস্তার ওপর বসন্ত কেবিন।

হস্টেলেও জলখাবারের ভাল আয়োজন ছিল। তিনু ঝাঁকায় করে হস্টেলের বাইরে থেকে লুচি, শিঙাড়া, কচুরি, সন্দেশ, রসগোল্লা নিয়ে আসত। বাইরে বেরোবার ইচ্ছে না থাকলে, অথবা আড্ডায় জমে গিয়েছি বলে বহু অপরাহ্ণ তিনুই আমাদের জলখাবার জুগিয়েছে। সকালে প্রাতরাশের বন্দোবস্ত হস্টেলে। তার সঙ্গে অবশ্য হস্টেলের মেস কমিটির কোনও সম্পর্ক নেই।

প্রতি ওয়ার্ডে দু'জন করে পরিচারক। তারা আমাদের অগোছাল, অপরিচ্ছন্ন ঘর সাফ করত, স্নানের পর আমাদের ছাড়া ধুতি কেচে শুকুতে দিত। আর সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত আমাদের ছোটখাটো ফরমাশ শুনত। চার নম্বর ওয়ার্ডে আমাদের অংশে ছিল বংশী। সকালে ছ'টা নাগাদ এসে বারান্দার একপাশে টেবিলের আড়ালে স্টোভ ধরিয়ে চা তৈরি শুরু করত। আমরা যে যখন উঠেছি বংশীকে বললেই প্রচুর দুধ চিনিযুক্ত গাঢ় ধূমায়িত চা এসে পৌঁছয়। বংশীর কাছে কাচের শিশিতে কেক এবং বিস্কুট আছে, যে যেমন চায়।

আর একটু বেলায় আমাদের প্রাতরাশের সময় বংশী আদেশ অনুসারে ডিম ভেজে দেবে, মামলেট অথবা পোচ এবং টোস্ট। বংশী তার ভাঁড়ারে চাবি দিত না। সন্ধ্যার পর প্রয়োজনমতো আমরা তার আয়োজনের সদ্ব্যবহার করতে পারতাম। পরদিন সকালে এসে বংশী জেনে নেবে কার বাবদে কী খরচ হয়েছে। মাসিক হিসাব রক্ষাও তার কাজ। মাসের শেষে ছেলেদের কাছে ফর্দ নিয়ে আসবে। কখনও এমন হয়েছে যে মাসের গোড়ায় তার পাওনা মেটাতে পারিনি। টাকা দিতে কষ্ট হয়েছে, বংশী কখনও তার জন্য ব্যাকুল হবে না। বংশীর উন্মুক্ত ভাঁড়ারের যেমন সুবিধা ছিল, অসুবিধাও কম ছিল না। কলেজের অনেক বন্ধুবান্ধব আড্ডা দিতে

হস্টেলে আসত এবং বংশীর ভাঁড়ারে হাত দিতে সংকোচ করত না। টাকাটা আমাদের মেটাতে হত।

বংশীর কাছে ডাব থাকত, তিন পয়সা। আর থাকত ভিমটো, পাঁচ পয়সা। আজকালকার কোকোকোলার মতো প্রিয় পানীয় ছিল তখন। ভিমটো, রোজ এন্ড থিসল কোম্পানির তৈরি করা, কোলার রং। আমার এমনও মনে হয় ভিমটো কোকাকোলার চেয়ে কোনও অংশে কম ছিল না। বায়রনের আইসক্রিম সোডা আমাদের আর একটি প্রিয় পানীয়। তার দাম তিন পয়সা বা এক আনা। মনে হচ্ছে যেন সেদিনের কথা, অথচ পঞ্চাশ ষাট বছর পার হয়ে গিয়েছে। আমরাও কি এতই বদলে গিয়েছি এই সময়কালে!

ঘটনাটা শরৎচন্দ্রের মৃত্যুর পরে বা তার আগে, মনে করতে পারছি না। শ্রীহর্ষ নামে ছাত্রদের একটি মাসিক পত্রিকা ছিল। বাইরের লেখা ছাড়াও সেখানে ছাত্রদের লেখা এবং ছাত্র ও শিক্ষা জগতের খবর ছাপা হত। এই পত্রিকার সম্পাদক হতেন ছাত্র-ছাত্রীরা। যদিও বলা হত ছাত্রদের পত্রিকা, তখনই জানতাম পত্রিকা আর কেউ চালান। এবং অবশ্যই লাভের জন্য। সেই শ্রীহর্ষে সেবার শরৎচন্দ্রের ওপর প্রবোধকুমার সান্যালের একটি প্রবন্ধ ছাপা হয়েছিল। প্রবোধকুমার যা লিখেছিলেন, তার মূল বক্তব্য ছিল যে শরৎচন্দ্র বাস্তববাদী লেখক নন, তিনি আসলে রোমান্টিক লেখক। শরৎচন্দ্র তখন জনমানসে অপ্রতিদ্বন্দ্বী বাস্তববাদী লেখক। কল্লোল যুগের লেখকেরা তখন সবে পাঠককে চমক দিতে আরম্ভ করেছেন। শরৎচন্দ্র সম্বন্ধে কোনও বিরূপ মন্তব্য ছাত্র সমাজকে আলোড়িত করবে এ তো স্বাভাবিক। প্রতিবাদের ঝড় উঠল, প্রধানত ছাত্র মহল থেকে। প্রতিবাদ থেকে বিতর্ক। আরও অনেকে অবিলম্বে সে বিতর্কে যোগ দিলেন। শ্রীহর্ষের বিক্রি আদৌ বেড়েছিল কি না জানি না। জানবার আগ্রহ ছিল না, উপায়ও ছিল না। শ্রীহর্ষ কাগজটা কারা চালান তখন জানতে পারিনি, আজও জানি না।

সুভাষচন্দ্র কংগ্রেস সভাপতি হলেন। ছাত্রমহলে উদ্দীপনার অন্ত নেই। পরীক্ষার পর বিহারে ডেহরি অন শোনে চলে গেলাম। সেখানে রাজনৈতিক আন্দোলন, ক্রিয়াকলাপের স্পর্শ অল্পই এসে পৌঁছয়। তার ওপর রেললাইনের ওপাশে মাত্র কয়েক বছর হল, প্রকাণ্ড শিল্প গড়ে উঠেছে। মানুষ তাই নিয়েই

ব্যস্ত থাকে। যে প্রাণহীন রেলস্টেশনে আগে শীতের শুরুতে কতিপয় বাঙালি স্বাস্থ্যোদ্ধার করতে আসতেন, এখন সেখানে কলকাতার ট্রেন এলে জায়গাটা গমগম করে, নতুন চাঞ্চল্যে জেগে ওঠে। আমাদের অন্যতম ব্যসন ছিল সকাল-সন্ধ্যা স্টেশনে বেড়াতে যাওয়া।

সেখানে এক সন্ধ্যায় সুভাষের সঙ্গে পরিচয় হয়েছিল। সুভাষ মজুমদার। সে কাশী হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াশোনা করে। সুভাষ কলকাতা যাচ্ছে। ট্রেনে ওঠবার আগে বলে গেল, শীঘ্রই আবার আসবে। দু'-চারদিন আমাদের কাছে থাকবে। সুভাষ কথা রেখেছিল। সে বছর ক্রিসমাসের ছুটিতে কাশী থেকে এল। মা তাকে দেখে মুগ্ধ হয়ে গেলেন, তার প্রতি মা'র মমতার শেষ নেই। সুভাষের বালক বয়সে তার মা মারা গিয়েছেন।

সুভাষ আর আমি ডেহরি-রোহতাস লাইট রেলওয়েতে চড়ে এক রাত্রে শীতে কাঁপতে কাঁপতে ছোট রেলের অন্ধকার কামরায় শুয়ে পঁচিশ মাইল দূরে রোহতাস পৌঁছলাম ভোরবেলায়। পাহাড়ের ওপর রোহতাস দুর্গ। ওপরে উঠতে ঘণ্টাখানেক লাগে। দুপুরের কিছু পরে পাহাড় থেকে নেমে স্টেশনে ট্রেনের জন্য সন্ধ্যা পর্যন্ত অপেক্ষা করেছিলাম।

সুভাষের বাবা পটারি শিল্পে ভারতবর্ষে পথিকৃৎ ছিলেন। গোয়ালিয়রে গোয়ালিয়র পটারিজ তাঁর তৈরি করা।

দিল্লিতে গোয়ালিয়র পটারিজ একটা নতুন কারখানা করেছে। সুভাষ আমাকে দিল্লিতে আসবার জন্য নিমন্ত্রণ করে গেল।

সুভাষের সঙ্গে বন্ধুত্ব আমার বেনারসবাসের প্রথম দিনগুলি অনেক সহজ করে দিয়েছিল। তখনও জানি না, আমিও দু' বছর পরে সেই কাশীতেই পড়তে যাব।

গরমের শেষে আবার হিন্দু হস্টেলে ফিরে এলাম। কলেজে তৃতীয় বর্ষ বিজ্ঞান। বিষয় পদার্থবিদ্যা। অনেক বন্ধু কলেজ ছেড়ে ইঞ্জিনিয়ারিং পড়তে শিবপুর বা ডাক্তারি পড়তে মেডিক্যাল কলেজে চলে গেল। মেডিক্যাল কলেজের ছেলেদের সঙ্গে তবু কখনও দেখা হয়। কিন্তু পুরনো অন্তরঙ্গতার মুহূর্ত আর ফিরে আসে না।

ক্লাসে একঝাঁক নতুন ছাত্র এল। তারা ঢাকা থেকে এসেছে। এদের মধ্যে প্রধান বিভূতি সরকার। সেও আমার সঙ্গে পদার্থবিদ্যায় অনার্সে। বিভূতি

অসাধারণ ভাল ছাত্র ছিল। একবার খুব ভাল থিয়েটার করেছিল হিন্দু হস্টেলে সরস্বতী পূজায়। বিভূতি নায়কের পার্ট করবে, চেহারায় সে নায়ক হবার যোগ্য। কথায় কিঞ্চিৎ পূর্ববঙ্গীয় টান আছে, নাটকে পার্ট বলবার সময় বোঝা যায় না। একটাই অসুবিধা ছিল। বিভূতি গান গাইতে পারে কিন্তু মঞ্চে গান গাইবার উপযুক্ত নয়। অথচ নাটকে দুটি গানের সিকোয়েন্স আছে নায়কের জন্য। গানদুটি বাদ দেওয়াও যায় না। আমাদের মোশনমাস্টার বললেন, গান বাদ দেওয়া চলবে না।

বিভূতিকেও বাদ দেওয়া যায় না। আর সব বিষয়ে সে যোগ্য। তখনও টেপ রেকর্ডারের আবির্ভাব হয়নি। সিনেমাতেও প্লেব্যাক জিনিসটা খুব চালু নয়। কানন দেবী ছবিতে স্বকণ্ঠে গান করেন।

মোশনমাস্টারই বুদ্ধি দিলেন, উইংস-এর ওপাশ থেকে আর কেউ গানটা গাইবেন। বিভূতি মুখ নেড়ে বোঝাবে সেই গান গাইছে। অনুশীলনের সময় দেখা গেল খুব সুবিধা হচ্ছে না ব্যাপারটা। স্থির হল, বিভূতি দর্শকদের দিকে ফিরে গাইবে না, সে একটু বেঁকে দাঁড়াবে। যাতে উইংসের পাশে যে গান গাইবে তাকে দেখতেও পাবে।

শেষ পর্যন্ত ব্যাপারটা বেশ গুলিয়ে গিয়েছিল। বিভূতি নায়িকার দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে এক পাশ ফিরে দাঁড়িয়েছে। যেমন হয়, দরকারের সময় মাইক কাজ করে না। তেমনই হল। বিভূতি দাঁড়িয়ে আছে তো দাঁড়িয়েই আছে, গান আর শুরু হয় না। এদিকে দর্শকও অধীর হয়ে পড়ছে। গানের শেষ চরণে নায়িকা মঞ্চে আসবে, সেও আসতে পারছে না। বিভূতি বুদ্ধি করে দর্শকদের দিকে ফিরে নায়িকাকে উদ্দেশ করে বলল, লুকিয়ে লুকিয়ে গান শুনছ আমার, মনটা স্থির করেছ? কিন্তু কোথায় নায়িকা সে তো মঞ্চে প্রবেশ করেনি।

কী নাটক ছিল নাম মনে পড়ে না। শেষ পর্যন্ত ভাল অভিনয় হয়েছিল। বিভূতি আশানুরূপ ফল করেছিল ফাইনাল পরীক্ষায়—প্রথম।

এত ভাল ছাত্র, সবাই আশা করেছিল, বিভূতি বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠের পর গবেষণা করবে, দেশ-বিদেশে তার নাম হবে অধ্যাপক হিসাবে। বিভূতি এ-সব না করে. একটি কাচের কারখানা খুলল যাদবপুরে, কৃষ্ণা গ্লাস ওয়ার্কস।

লেখাপড়া নয়, অধ্যাপক হিসাবে প্রতিষ্ঠা নয়, বিভূতি যা করেছিল, আমার আগের প্রজন্মের ছাত্রদের সেই কাজে উদ্বুদ্ধ করবার জন্য আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র তখনও চেষ্টা করছেন। কিন্তু ক্লান্ত হয়ে পড়েছেন।

কৃষ্ণা গ্লাস ওয়ার্কস উত্তরোত্তর বড় হতে থাকল। এ দেশের অবধারিত নিয়মে একদা বন্ধও হয়ে গেল। তখন কৃষ্ণা গ্লাসের কর্মীসংখ্যা অনেক।

বিভূতির সঙ্গে আমার যোগাযোগ ছিন্ন হয়ে গিয়েছিল। বন্ধু-বান্ধবদের কাছ থেকে তার ব্যাপক উন্নতির খবর পাই। এক দুর্ধর্ষ ছাত্র লেখাপড়ার লাইনে না গিয়ে ব্যবসাতে এত উন্নতি করছে, যে শোনে সেই তারিফ করে।

একদিন বম্বের বাড়িতে বিভূতির টেলিফোন পেলাম। বম্বেতে তাজমহল হোটেলে আছে। বম্বেতে তার কোম্পানির আর একটি কারখানা খোলবার জন্য এসেছে। দেখা হল, একত্র ভোজনও হল। পুরনো দিনের কথা, তার দুঃসাহসিক সিদ্ধান্তে নতুন শিল্প গড়ে তোলবার কাহিনী শুনলাম। ক্রমে বম্বেতে কাজ শুরু হল। স্থানীয় ম্যানেজার কখনও সখনও যোগাযোগ করেছেন। থানেতে তাদের কারখানায় যাবার আমন্ত্রণ জানিয়েছেন। শহরের বাইরে পঁচিশ মাইল দূরে বিভূতির রাজ্য দেখতে যাওয়া হয়ে ওঠেনি। ঠিক কেন কৃষ্ণা গ্লাস ওয়ার্কস বন্ধ হয়ে গেল বলতে পারব না। শুনেছি একটা বড় স্ট্রাইক হয়েছিল। কী নিয়ে এবং কেন তার মীমাংসা হল না, কেন কারখানা দীর্ঘদিন বন্ধ থাকল, বম্বেতে বসে তার পুরো খবর পেলাম না। স্ট্রাইকের মধ্যেই হার্ট অ্যাটাকে বিভূতি আকস্মিক মারা গেল।

বন্ধুরা বলেছিল, কারখানার অবুঝ স্ট্রাইক বিভূতিকে অত্যন্ত আঘাত দিয়েছিল, তার ফলেই তার হার্ট অ্যাটাক হয়েছিল।

হস্টেল কলেজে দিন গতানুগতিক চলতে থাকল। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সূচনা হল পয়লা সেপ্টেম্বর ১৯৩৯-এ। ভারতবর্ষে তার আঁচ লাগতে সময় লেগেছিল। সুভাষচন্দ্র আবার কংগ্রেসের সভাপতি নির্বাচিত হলেন সে বছরের প্রথমদিকে। অল্পদিনের মধ্যেই পদত্যাগ করলেন, কংগ্রেস থেকে বহিষ্কৃত হলেন এবং নতুন রাজনৈতিক দল ফরওয়ার্ড ব্লক প্রতিষ্ঠা করলেন। তাঁর প্রতি মহাত্মা গান্ধীর অবিচার ব্যথিত করেছিল বাঙালিকে। বিশেষভাবে যুবসমাজ গান্ধীর প্রতি অত্যন্ত বিরূপ হয়ে উঠল। জওহরলালের ওপর বাঙালির ক্ষোভ বাড়ল। তিনি নিজেকে প্রগতিশীল বলে দাবি করেন, অথচ পরীক্ষার সময়ে সুভাষচন্দ্রের পক্ষে না গিয়ে অনায়াসে রক্ষণপন্থী গান্ধীবাদীদের দলের সঙ্গে থাকলেন। আর পাঁচজন বাঙালি ছেলেদের মতো আমারও জওহরলালের অপ্রত্যাশিত ব্যবহারে তাঁর প্রতি বিতৃষ্ণা এসে গেল।

এদিকে ফাইনাল পরীক্ষা আসন্ন। তার প্রস্তুতি চলতে থাকল। যথাকালে পরীক্ষা হয়ে গেল। ভাল হয়নি বুঝতে পেরেছিলাম। ফল আশানুরূপ হল না। বাবার ইচ্ছা ছিল গ্র্যাজুয়েট হবার পর শিবপুরে ইঞ্জিনিয়ারিং পড়ি। ভর্তি হতে না পেরে আবার ডেহরি অন শোনে ফিরব, বাবা বললেন, যাকগে, আপাতত এম এসসি করে ফেল। বয়স তো বেশি হয়নি। লেখাপড়া করা ইঞ্জিনিয়ার হলে, আখেরে ভাল হবে।

কলকাতায় নয়, এবারে পড়তে যাব কাশী। বেনারস হিন্দু ইউনিভার্সিটিতে। ডেহরি থেকে রেলে আড়াই ঘণ্টার রাস্তা। বাড়ির কাছাকাছি থাকলে পড়াশুনাটা বেশি ফাঁকি দিতে পারব না। এটাই বোধ হয় বাবার আশা ছিল। মাঝে একবার বাবার সঙ্গে গিয়ে ভর্তি হয়ে এসেছিলাম। জুলাই মাসে বাক্স বিছানা নিয়ে কাশী রওনা হলাম। দেরি হয়ে গিয়েছিল বলে ভাল হস্টেলে স্থান হয়নি। ঘর পেলাম, একতলা বাড়ি রুইয়া হস্টেলে। প্রথমে গিয়ে হস্টেলে

উঠলাম না। সোজা চলে গিয়েছিলাম সুভাষের কাছে। সুভাষ হস্টেলে থাকে না। সে থাকে একটা লজে। বিশ্ববিদ্যালয়ের দু'পাশে অনেকগুলি ছোট ছোট বাড়িতে বিভিন্ন লজ। কোথাও কয়েকজন ছাত্র মিলে একটা বাড়ি তারা করেছে, আবার কোথাও বাইরের কেউ ছাত্রদের রাখবার জন্য বাড়ি ভাড়া করে রেখেছে। তারই একটাতে সুভাষ থাকে। সুভাষ স্বাধীনচেতা ছেলে, একটু খেয়ালিও। সে হস্টেলে থাকতে চায় না ধরা-বাঁধা নিয়মশৃঙ্খলার মধ্যে।

সুভাষের লজে দিন দুই কাটিয়ে রুইয়া হস্টেলে নিজের আস্তানায় পৌঁছলাম। রুইয়া হস্টেলে খাওয়া-দাওয়া ভাল নয়। তাই আমি আহারাদির আয়োজন করলাম, পাশের বিড়লা হস্টেলে। কাশীর হস্টেলে আহারের ব্যবস্থা অন্য ধরনের।

হস্টেল কোনও রন্ধনশালা পরিচালনা করে না। হস্টেলের পিছনদিকে আলাদা একটা ছোট বাড়িতে সার সার মেসের আয়োজন। একটা বড় ঘরে একটা মেস। তার একপাশে রান্নাবান্না হচ্ছে, অন্য পাশে টেবিল চেয়ার লাগানো ভোজনস্থল। এই মেসগুলি বিভিন্ন পাচকেরা চালায়। তারা বিশ্ববিদ্যালয়ের কাছ থেকে ঘরটা ভাড়া নেয়। দশ-পনেরো জন সভ্য হলেই একটা মেস চলে যায়। কদাচ ত্রিশ জনের বেশি হয়। অত জায়গা নেই। এই পাচকদের বলে মহারাজ। মহারাজ একাধারে পুরনো হালুইকর ও আজকের মিশিরজি। মিশিরজি রান্নাবান্নায় খারাপ নয়। আমি অবশ্য মনে মনে ভেবেছিলাম, আর কত খারাপ হবে রান্না, নিরামিষ আহারের আবার ভালমন্দ কী? বিশ্ববিদ্যালয় চত্বরে আমিষ নির্বাসিত, এখানে শুধুমাত্র নিরামিষ রন্ধন ও পরিবেশন করা হয়।

ওই প্রথম একটা সর্বৈব অনাত্মীয় পরিবেশে উপস্থিত হলাম। কেউ বাংলায় কথা বলে না। আমার মেসে যারা খায়, তারা অধিকাংশ বিহার আর উত্তরপ্রদেশের ছেলে। একজন কাশ্মীরিও ছিল। তারা বিভিন্ন বিষয়ে বিভিন্ন কলেজে বিভিন্ন শ্রেণীতে পড়ে। কারও সঙ্গে লেখাপড়ার বিষয়ে কোনও মিল খুঁজে পাই না। দু'-চারদিন পরেই আবিষ্কার করলাম, আমি ভুল মেসে অন্নগ্রহণ করছি। আমাদের মেসের পাশের মেস চালান দুবেজি। ওঁর ওখানে মাংসও পরিবেশন হয়, ঈষৎ গোপনে, ছদ্মবেশে। সেখানে সপ্তাহে দু'দিন রাত্রে মাংস দেওয়া হয়। মাংসাশীদের কিঞ্চিৎ দেরি করে খাওয়া বিধেয়। নিরামিষাশীরা খেয়ে চলে যাবার পর, মাংসের গুণগ্রাহীরা আসেন।

আমি অবিলম্বে দুবেজির আশ্রমে ভর্তি হয়েছিলাম। কাশী বিশ্ববিদ্যালয়ের

মহারাজেরা হিন্দু হস্টেলের ভব বা অবিনাশের মতো বাহাদুর পাচক নয়।

তার ওপর, কোনও ছাত্র কমিটি নেই যে প্রত্যহ নতুন নতুন মেনু তৈরি হবে। যা পাওয়া যায় তাতেই সন্তুষ্ট থাকতে হবে। মহারাজের ভোজন আদৌ ভাল লাগে না। বাঁধাধরা পদ, রান্নার কোনও কলাকৌশল নেই। তারই মধ্যে করলার সবজি না থাকলেই আমি শান্তি পাই। এই তিক্ত পদটি উত্তরভারতীয়দের মতো সমাদর করে খেতে পারি না। তবু, রুটি গরম গরম পরিবেশন হয়। একটির পর একটি আসে। অড়হরডাল হিং ধনেপাতার সম্বুরা দিয়ে অতিতপ্ত পরিবেশন হয়। একটা শুকনো সবজি, আলু, ঢেঁড়স, বরবটি বা পালং শাকের আর একটা রসাদার, সেও সদ্য গরম করা, তেল-মশলা কম, আলু কপি সব এক স্বাদ।

প্রথমদিকে খেতে বেশ কষ্ট হত। সব সবজিতে কেমন একটা বিচিত্র গন্ধ। কটু নয়, কিন্তু আদরেরও নয়। মাঝে একবার ছুটিতে বাড়ি গিয়েছিলাম, মাকে বললাম, কী তেলে রান্না করে জানি না, একটা একঘেয়ে কটুগন্ধ সব ব্যঞ্জনে। মা বহুকাল বিহার উত্তরপ্রদেশে বাস করেছেন। সহজেই শনাক্ত করে ফেললেন। বললেন, ওটা হল ধনেপাতার গন্ধ। এ অঞ্চলের মানুষেরা ধনেপাতার সম্বুরা এতই পছন্দ করে যে সর্বঘটে তার ব্যবহারে কার্পণ্য করে না।

ক্রমে ধনেপাতাও সয়ে গেল। ততদিনে কিঞ্চিৎ চালাক হয়ে গিয়েছি, মহারাজকে বলাতে আমার ডালেতে ধনেপাতার বদলে রসুনের সম্বুরা দেওয়া হত। ঘি-ও সৌরভ পূর্ণ ছিল বলে রসুন ও ঘৃতের সুগন্ধে গরম অড়হর ডাল লোভনীয় পদার্থ হয়ে উঠত।

লক্ষ করলাম, যে ধরনের মেসই হোক, যেমনই হোক রন্ধনশালা, উত্তর ভারতের মানুষেরা একটি বিষয়ে অতি রক্ষণশীল। খাবার উত্তপ্ত পরিবেশন হবে। ডাল তো হয়ে থাকে কোন সকালে, ছেলেদের কেউ টেবিলে বসলেই তার জন্য এক হাতা ডাল বড় লোহার হাতায় প্রায় ফুটিয়ে পরিবেশন করা হবে। সেই সময়েই বিশিষ্ট সম্বুরা যুক্ত হত—আমার ক্ষেত্রে যা হল রসুন।

মহারাজ যে ঘি দিয়ে ডাল সাঁতলান সে ঘি সব সময় উচ্চশ্রেণীর হয় না, ব্যবহারেও কার্পণ্য স্বাভাবিক। এইজন্য আমাদের আর একটি রীতি ছিল। যে ছেলেরা ডালে ঘি পছন্দ করে তারা সেরখানেক ভাল ঘি কিনে কাচের শিশিতে মহারাজের কাছে রেখে দেবে। সে যখন খেতে আসবে, তখন তার

নিজের শিশি থেকে ঘি নিয়ে ডাল সাঁতলানো হবে। রুটির ওপর মাখানো হবে। মনে আছে এক সেরে একমাস চলে যেত। দেড়টাকা দাম।

মঙ্গলবার আর শুক্রবার নিরামিষাশীরা চলে যাবার পর আমাদের মাংসাশীদের ভোজন হ্ত। দুবেজি মাংস রান্নাতে খুব বাহাদুর ছিলেন না। তবু মাংস তো। বিরল নিধির মতো আমাদের জীবনে সুখ এনে দিত। মহারাজ মাংসে সম্ভবত পিঁয়াজের চেয়ে অথবা বদলে গোলমরিচ ব্যবহার করতেন। তার ঝাল অপেক্ষা ঝাঁঝ বেশি হ্ত। আমার প্রায়ই ইচ্ছা হয় বলি আমাকে দু'-একখণ্ড পিঁয়াজ দিলে এই গরম রুটি মাংসের আরও উত্তরণ হয়, কিন্তু আর কেউ চায় না। আমি সংকোচবশত সে-কথা বলতে পারতাম না। যেদিন পারলাম তার পর থেকে অপটু মহারাজের তৈরি মাংস অন্যমাত্রা পেয়ে গেল।

যার যেমন প্রয়োজন, ততগুলি রুটি ভক্ষণের পর, গরম ভাত আসবে। এদেশে চাল কম খায়, কিন্তু ভাল চাল ছাড়া খায় না। দেরাদুন আতপ চালের সৌরভময় ভাত, তার সঙ্গে আমাদের সংরক্ষিত গব্যঘৃতের এক চামচ, তরকারি যেমনই হোক, এই সুখের বুঝি সীমা ছিল না।

খাওয়ার কথা থাক। কাশীতে গিয়ে আমার প্রথম লাভ হল, ভারতবর্ষকে চিনলাম। ভাবতে ইচ্ছে করে, আমার মতো স্বল্পজ্ঞান বাঙালি ছাত্রসমাজের চরিত্র লক্ষণ নয়। এটা শুধু আমারই অসম্পূর্ণ শিক্ষা। উত্তর ভারত সম্বন্ধে স্পষ্ট না হলেও খানিকটা ধারণা অবশ্যই ছিল। কিন্তু আমি জানতাম বিন্ধ্য পর্বতের দক্ষিণের বিশাল ভূখণ্ডের নাম মাদ্রাজ। সেখানে যারা থাকে তারা সবাই মাদ্রাজি। কাশীতে এসে প্রথম জানলাম, দক্ষিণ ভারতে যদিও মাদ্রাজ প্রেসিডেন্সি অনেকটা ভূখণ্ড জুড়ে রয়েছে, তার মধ্যে বিভিন্ন ভাষাভাষী আরও কয়েকটি জনগোষ্ঠী আছে। তারা সবাই মাদ্রাজি ভাষা বলে না। বস্তুত, মাদ্রাজি নামে কোনও ভাষাই নেই। আজ যে-খবর স্কুলের নিচু ক্লাসের ছাত্রও জানে, আমার সে-খবর জানবার জন্য কাশীতে যেতে হল। যখন জানলাম, তখন আমি যৌবনের দোরগোড়ায়, স্নাতকোত্তর পর্যায়ে পড়াশুনা করি। মাদ্রাজ প্রেসিডেন্সির বাইরে তিনটি করদ রাজ্য, মহীশূর, ত্রিবাঙ্কুর ও কোচিন। মহীশূরের ভাষা কন্নড়, ত্রিবাঙ্কুর ও কোচিনে মালয়ালাম। মাদ্রাজ থেকে পরে যে অংশ বিচ্ছিন্ন হয়ে অন্ধ্রপ্রদেশ হল, সেখানে এখনও তামিল ভাষা চলে না। সেখানকার ভাষা তেলুগু। তামিল চলে মাদ্রাজে বা আজকের তামিলনাড়ুতে।

এর আগে দক্ষিণ ভারতের মানুষজন দেখিনি বললেই হয়। কিছু মুটেমজুর

মেথর, যাদের আমরা বলতাম তেলেঙ্গি, তাদের দু'-দশজনকে দূর থেকে দেখেছি মেদিনীপুরে, খড়্গপুরে। শালবনির ঠাকুমা বলেছিলেন, তেলেঙ্গিরা তেঁতুল ছাড়া খেতে জানে না, আর খুব ঝাল। শালবনির ঠাকুমার সঙ্গে স্টেশনের কর্মচারীদের জানাশোনা ছিল। তাদের মধ্যে দু'জন তেলেঙ্গি।

জ্ঞানভাণ্ডারের ঘাটতিপূরণের পর দেখলাম, তেলুগুভাষীরা আহার অভ্যাসে অন্য দক্ষিণ ভারতীয়দের মতো, তবু তাদের ভোজের বিশিষ্টতা তাদের স্বাতন্ত্র্য চিহ্নিত করে। আমাব ক্লাসে পঞ্চমবর্ষে পদার্থবিদ্যায় যে আঠারো জন পড়ে, তাদের মধ্যে তেলুগুভাষী সংখ্যায় বেশি। মালয়ালামভাষী পাঁচজন ছাত্রছাত্রী ছিল। আর ছিল কন্নড়ভাষী তিনজন। বাঙালি একজনও নয়। উত্তরপ্রদেশের জনাতিনেক ছাত্র, আর কাশ্মীরের একজন। আমি একমাত্র বাঙালি। এমন অকল্পনীয় পরিবেশে পৌঁছব ভাবতেও পারিনি।

অধ্যাপকদের মধ্যে মাত্র দু'জন বাঙালি, আর ছ'জন অধ্যাপক ভারতবর্ষের অন্যান্য প্রদেশ থেকে এসেছেন। পদার্থবিদ্যার প্রধান ড. দশনাচার্য মহীশূরের মানুষ, ছোটখাটো শরীর, মৃদুভাষী, টুকটুকে ফরসা রং। প্রেসিডেন্সি কলেজ ও হিন্দু হস্টেলের বাঙালি অভয়ারণ্য থেকে এবারে যেন সত্যিকারের ভারতবর্ষে পৌঁছলাম। ছাত্রছাত্রীরা মধ্যবিত্ত বা নিম্নমধ্যবিত্ত পরিবার থেকে এসেছে। বেনারস হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়েও লেখাপড়া, থাকা খাওয়ার খরচ কম, তাই হয়তো বাইরে থেকে এত ছেলেমেয়ে আসে।

কথাবার্তা বলতে হয় ইংরেজিতে, দক্ষিণ ভারতের কোনও ছাত্রছাত্রী হিন্দির বিন্দুবিসর্গও জানে না। ছেলেমেয়েরা শান্তপ্রকৃতির, সানতন নিয়ম কানুন, রীতি রেওয়াজ মেনে চলে। যেদিন প্রথম আমরা কলেজে গেলাম, আমার সঙ্গের ছাত্রছাত্রীরা বিভাগীয় প্রধানের ঘরে ঢোকবার আগে সবাই বাইরে জুতো খুলে রেখেছিল। অনভ্যাসে আমি জুতো পায়ে ঘরে ঢুকে লজ্জিত। প্রথম দিকে সবাই প্যান্টশার্ট পরে আসত। তারপর দেখি লুঙ্গি করে পরা ধুতি শার্ট পরেও কেউ কেউ আসছে।.

যদিও একটা উইমেনস কলেজ আছে, আর সব কলেজে, সব ক্লাসে সহশিক্ষা। আমার ক্লাসেও দুটি মেয়ে, একজন কোচিনের, অন্যজন গুন্টুরের, তখনও মাদ্রাজের অন্তর্গত। মালয়ালি মেয়েটির নাম জানকী, তেলুগু মেয়েটি সীতা। দু'জনেই বয়সে আমাদের থেকে বড়, কারণ তারা কয়েক বছর হল চাকরি করছিল, এখন দু'বছরের ছুটি নিয়ে এম এসসি পড়তে এসেছে।

জানকীর শ্যামলা রং। লম্বা চওড়া শরীর। মুখটি মিষ্টি। সীতার রং ফরসা, দীর্ঘ চুল বেণী করে রাখে, মুখশ্রীও ভাল। দু'জনই বয়স এবং অভিজ্ঞতাজনিত গাম্ভীর্যে আমাদের থেকে দূরে থাকে। ঈষৎ ফস্টিনস্টি করবার সাহস হয় না। ল্যাবরেটরিতে পাশাপাশি কাজ করি, ক্লাসে পাশাপাশি বসি, তবু বেশ ভাল করে জানাশোনা হল না এই দু'জনের সঙ্গে। সহপাঠীদের কাছে শুনলাম, সীতার নাকি আগে বিয়ে হয়ে গিয়েছিল, কিন্তু স্বামীর সঙ্গে ভাব নেই।

ছাত্রীদের সঙ্গেই শুধু নয়, ছাত্রদের সঙ্গে ভাল করে জানাশোনা হবার বাধা হয়ে দাঁড়ায় ইংরেজি। আমাদের উত্তর-ভারতীয়দের ইংরেজি উচ্চারণের ধারার সঙ্গে দক্ষিণ দেশীয়দের ইংরেজি উচ্চারণের ধারা মেলে না। ওরা কী বলে বুঝতে অসুবিধা হয়। আমি কী বলি, ওরা সহজে বুঝতে পারে না। তখন কীসের একটা ভোট হচ্ছিল। আমি যেই বললাম, বাইরের ওই কলরব ভোটের জন্য, ওরা হেসে উঠল। তোমরা বুঝি ওটকে ভোট বল? বুঝতে পারলাম V অক্ষরটা উচ্চারণ নিয়ে অসুবিধা হচ্ছে। আমরা ভি-কে বলি ভ, ওরা বলে উও। কোনটা যে ঠিক বুঝতে পারলাম ছুটিতে বাবার কাছে গিয়ে। বুঝলাম দুটো উচ্চারণই ভুল। ভি-র উচ্চারণ আদৌ উও নয়, ভ-ও নয়। বাবা বললেন, শব্দটা লেবিওডেন্টাল, অর্থাৎ দন্ত্যোষ্ঠ— দাঁত আর ঠোঁট দিয়ে V উচ্চারণ করতে হবে। আমাদের ভ উচ্চারণও ভুল। v, f ইত্যাদির উচ্চারণের সমান আমাদের কোনও ব্যঞ্জনবর্ণ নেই।

ইংরেজির আরও একটা অভাব নিয়ে বিব্রত হয়েছি, প্রথমদিকে। রেলের টিকিট এবং ডাকটিকিট কাটা ও কেনা ইংরেজিতে তৎক্ষণাৎ অনুবাদ করতে পারি না. পোস্ট অফিসে টিকিট নয় স্ট্যাম্প কিনতে যাচ্ছি কথাটা সহসা মুখে আসে না বলে অন্য ছাত্রদের হাসির কারণ হই। রেলের টিকিট যে কাটতে হয় না ইংরেজিতে, তার অভ্যাসও তো আমার নেই।

এই সব ত্রুটি কাটাতে খানিকটা সময় লাগল। তারপর থিতিয়ে বসতে পারলাম। দক্ষিণীদের অসুবিধা কিন্তু পদে পদে। আমার বন্ধুরা একজনও চাপাটি কী বস্তু জানে না, রুটি তারা কখনও চোখেও দেখেনি। ভোজনের সময় সম্বার নেই দেখে তারা স্তম্ভিত হয়ে যায়। সে কী রসমও নেই? তা হলে খাব কী দিয়ে? দই-এর সমান চল উত্তর ভারত এবং দক্ষিণ ভারতে। একমাত্র বাঙালিরা মিষ্টি দই না হলে খেতে পারে না। দক্ষিণীরা ওই সাদা দই দিয়ে কোনওক্রমে সম্বার ও রসমের ঘাটতি মেটায়।

ক্রমে দেখা গেল, যে মেসে দক্ষিণ ভারতীয়ের সংখ্যা বেশি, সেখানে মহারাজেরা অড়হর ডালের বদলে সম্বার পরিবেশন করছেন। রসমও তৈরি করতে জানেন, প্রয়োজনে তারও উপস্থিত হয় ভোজ্যপাত্রে। সেই মেসে রুটি বা চাপাটি আদৌ চলে না।

মালয়ালি ব্রাহ্মণরা ছাড়া আর সকলে মাংসাদি পছন্দ করে। কিন্তু হস্টেলে সব মেসে তার আয়োজন নেই। তাই কয়েকজন মালায়ালি হস্টেল ছেড়ে লজে চলে গেল। সেখানে মাছ-মাংসে বাধা নেই। আমিও প্রায় মালয়ালি বন্ধুদের সঙ্গে তাদের লজে ভোজন করেছি।

আমার অসুবিধা হত না, কারণ আমি ইচ্ছা হলেই সুভাষের লজে চলে যেতাম। সেখানে পরিবেশ মনোমতো, ইংরেজি বলতে হয় না। ভোজ্যগুলিও মন খারাপ করে দেয় না। সুভাষের সঙ্গে আমি কয়েকটি অ্যাডভেঞ্চারে গিয়েছি। সব যে আনন্দময় হয়েছিল তা নয়, কিন্তু মনে রাখবার মতো অভিজ্ঞতা হয়েছে।

কাশী আমার দেখা প্রথম আবাসিক বিশ্ববিদ্যালয়। তিন হাজারের অধিক ছাত্র হস্টেলে এবং লজে থাকত। শহর থেকে হাজার খানেক ছাত্র পড়তে আসত। তারা বাড়িতে থেকে লেখাপড়া করে। কলা, বিজ্ঞান, ফলিত (industrial) রসায়ন, ইঞ্জিনিয়ারিং, মেটালার্জির আলাদা আলাদা বাড়ি। সবই কিছুটা দূরে দূরে। অনেকখানি জায়গা নিয়ে বেনারস হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়, প্রতিষ্ঠাতা মদনমোহন মালব্যের স্বপ্নের রূপায়ণ।

পণ্ডিত মদনমোহন মালব্য সদ্য কায়কল্প করিয়ে এসেছেন কোচিন থেকে। তাতে নাকি নবযৌবন পাওয়া যায়। তখন তাঁর বয়স সত্তরের অধিক, হয়তো আশি। তাঁর নবযৌবনের আকাঙ্ক্ষা খানিকটা হাসির খোরাকও জোগাত ছাত্রসমাজে। ছাত্রেরা তখনও রাজনীতির টানাপোড়েনের প্রভাবমুক্ত। কখনও কখনও পূর্ণিমা বা একাদশীতে মালব্যজিকে প্রণাম করতে তাঁর বাংলোয় যায়। সাদা চুল, সাদা গোঁফ, পরিধানে পরিপাটি সাদা পোশাক, মালব্যজি পুতুলটির মতো বসে থাকতেন। বয়স কমেছে বা যৌবন ফিরে পেয়েছেন আদৌ মনে হত না। মৃদু হেসে আমাদের আপ্যায়ন করতেন, আমরা খুশি হয়ে ফিরে আসতাম।

তখন উপাচার্য সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণণ। প্যান্টের ওপর লম্বা আচকান ধরনের

পোশাক, মাথায় উঁচু পাগড়ি এই তাঁর নিত্যকার বাইরে যাবার পোশাক। প্রতি একাদশীতে তাঁর বক্তৃতা হয় কলা বিভাগের বড় হলে। শিক্ষক, ছাত্রদের নিয়মিত ভিড় হয়। রাধাকৃষ্ণণের বক্তৃতার ধরন বিশিষ্ট ছিল। কখনও কোনও শব্দের জন্য ইতস্তত করতে দেখিনি তাঁকে। অনর্গল মার্জিত ইংরেজিতে নিটোল বক্তৃতা দিতেন। মাঝে মাঝে বেদ উপনিষদ থেকে উদ্ধৃতি। তাঁর বক্তৃতা চুম্বকের মতো আকর্ষণ করত মানুষকে। ইংরেজিতে বলতেন, অন্য কোনও ভাষা শুনিনি তাঁর মুখে।

উত্তরপ্রদেশে গ্রীষ্ম অতি দীর্ঘ। আমরা যেহেতু জুলাই মাসে কলেজ শুরু করেছিলাম তাই বেশিদিন গরম সহ্য করতে হয়নি। বর্ষায় সামান্যই বৃষ্টি পড়ত, তাই তাপমাত্রা যথেষ্ট বেড়ে থাকে। সে বছরই অগস্ট মাসের এক সন্ধেবেলা বাঙালি জীবনের ইন্দ্রপতন ঘটল, খবর এল রবীন্দ্রনাথ চলে গেছেন। গরমকালটা আমরা সবাই খোলা ছাদে শুই। অনেক রাত্রি পর্যন্ত আকাশের দিকে তাকিয়ে থেকে চুপচাপ শুয়ে পড়লাম। আমার আশেপাশে আরও দু'-একটি বাঙালি ছেলে বিনিদ্র শুয়ে আছে। ভোরে কখন ঘুম ভেঙেছে। তখনও সূর্যের আলো ফোটেনি। কার উদাত্ত কণ্ঠের গান শুনে ঘুম ভাঙল, আজ শারদ প্রাতে। যে গান ধরেছিল তার নাম অহি মল্লিক। আমার তিন ক্লাস নীচে পড়ে। কাশী শহরে থাকে। রাত্রিতে বাড়ি যেতে পারেনি। অহির কথা অন্য এক সময়ে বলব। এমন বলশালী শরীর, ব্যায়াম করা, কণ্ঠে অপূর্ব গান, ছবি আঁকার অলৌকিক হাত। কখনও নিজেকে ছাড়িয়ে যাবার চেষ্টা করেনি। আপন গণ্ডির মধ্যে নিজেকে তুষ্ট করে রেখেছিল। কার্টুনিস্ট হয়েছিল, চার বছর একসঙ্গে কাজও করেছি, কখনও রাগতে দেখিনি। আমরা হয়তো মারামারির আশায় অহির সাহায্যের জন্য দাঁড়িয়ে আছি, অহি নির্বিকার। এই সব তুচ্ছ তাড়না তাকে স্পর্শ করতে পারত না।

ছুটির দিন দুপুরবেলায় নিয়মিত সুভাষের লজে যাই যেখানে ভাল মন্দ রান্না হয়। নিজের ফরমায়েশও করা চলে। সুভাষ সম্ভ্রান্ত বাড়ির ছেলে। তার চালচলনই আলাদা। খাবারের আগে হয়তো আড্ডা দিচ্ছি একটা ফিরিওয়ালা জাতীয় লোক ঝুড়িতে চিঁড়ে ভাজা, নিমকি, ঝাল বিস্কুট ইত্যাদি নিয়ে এসেছে। তার চালচলনই কেমন আলাদা। সামান্য কথাটাও এমন এদিক ওদিক

তাকিয়ে সন্তর্পণে বলবে যেন মনে হবে কোনও ষড়যন্ত্রের কাহিনী ফাঁস করছে।

কৈশোরের কৌতূহল সবে অতিক্রম করেছি। এখন যৌবনের সঞ্চারে কৌতূহলের বদলে আকাঙ্ক্ষা উগ্র হচ্ছে।

ওই ফিরিওয়ালা যার নাম মতি, যে মারাঠা না ভোজপুরি কেউ বলতে পারে না, সে খবর দিল— আপনারা কী ঘাসপাতা খান এখানে। আমার বাড়িতে খেতে আসুন সত্যিকারের ভাল খাবার খাওয়াব। আর তা ছাড়া, লেডিজ হস্টেলের ওঁরাও আসবেন। বলে চোখ মটকে হাসল।

সুতরাং এক সন্ধ্যায় মতির বাড়িতে গেলাম। প্রায় অন্ধকার একটা ঘর, রান্নাঘর ভোজনকক্ষ শোবার জায়গা সব এক। এমন সময়ে লেডিজ হস্টেলের ওঁরা পৌঁছলেন। মাঝবয়সি পুষ্ট শরীর, আসলে মেট্রন। এমন মোহভঙ্গ হল যে আর মতির বাড়িতে কখনও খেতে যাইনি।

ইতিমধ্যে শীত এসে গেছে। শীত শেষ হতেও চলল। সুভাষ একদিন বলল যে আমরা জোনপুরের এই বিশাল অঞ্চলের মধ্যে থাকি কিন্তু কাউকেই চিনি না। কিছু জনসংযোগ থাকা উচিত। পরের ছুটির দুপুরে ভোজনের পরে বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাকারের পুব দিকের একটি ফাটল দিয়ে দু'জনে বেরিয়ে পড়লাম। শীত-শেষের মাঠ তখনও সোনায় সবুজে জ্বলছে। একটা আখের খেতের মাঝখানে খানিকটা জায়গায় ঝেড়ে মুছে নিকিয়ে দেওয়া হয়েছে। একপাশে বড় কড়াইয়ে আখের রস ফুটছে। হয়তো গ্রামের প্রধান, মাঠের মাঝখানে একটা চারপাইতে হালকা বালাপোশ গায়ে দিয়ে দীর্ঘ নল দিয়ে আরামে তামাক খাচ্ছে। আমাদের দু'জনকে দেখে 'আসুন আসুন' বলে সাদর অভ্যর্থনা করে বসাল। প্রথমে ঠান্ডা জল এল, তারপর কয়েক পাকের আখের রস।

সুভাষের চরিত্রে লোককে মুহূর্তে আপন করে নেবার ক্ষমতা ছিল। জেনে অথবা না জেনে এমন মূর্খ মজাদার প্রশ্ন করে ফেলত যে শ্রোতা সঙ্গে সঙ্গে তার বন্ধু হয়ে যেত। এমন তরল সরল ছেলেটিকে না ভালবেসে উপায় নেই। উঠবার আগে টিকায়েতসাহেব দুই প্রকার আখের দুটো বড় বড় গাঁট আমাদের কাঁধে চড়িয়ে দিল। আবার যেন কাল আসি। আখের রস শেষ হয়ে যাবে কিন্তু অন্য কিছু করা যাবে।

আমরা বোঝা কাঁধে টলতে টলতে হস্টেলের দিকে ফিরতে লাগলাম। পরের পর খেতি পড়ছে। আমরা সন্ধ্যা হবার আগেই বাড়ি ফিরতে চাই। মনে হল একটা খেতে একদল চাষি লাঠি হাতে কেমন সন্দেহজনক ভাবে আমাদের দেখছে। আমরা যতই অকুস্থল থেকে সরে পড়ার চেষ্টা করছি খোলা মাঠে তত সহজে পার হওয়া যাচ্ছে না। দিনের আলো তখনও শেষ হয়নি। মানুষগুলোর

বলিষ্ঠ হাতে লাঠির দৈর্ঘ্য দেখা যাচ্ছে। প্রথমে বুঝতে পারিনি আমাদের দিকে অমন কটমট করে কেন চাইছে। এবারে দূর থেকে লাঠি ঠোকার আওয়াজ পাওয়া গেল। চিৎকার করে কে যেন কী বলল, তার মানে বোঝা না গেলেও গলায় ক্রোধের স্পষ্ট ছাপ। আমরা না থেমে, আখের বোঝা কাঁধে নিয়ে, রস-ভারে সামান্য টলতে টলতে ক্রমশ গতি বাড়াতে লাগলাম। অনুসরণের দলটাও থেমে থাকল না। তাদেরও গতি বাড়ল। আমরা দৌড়তে লাগলাম, তারাও দৌড়তে লাগল। কেন যে বুঝতে এমন সময় লেগেছিল যে তারা সন্দেহ করেছিল আমরা আখের বোঝা চুরি করে পালাচ্ছি। তখন আর সময় ছিল না। তারা প্রায় ধরে ফেলেছে আমাদের। আমরা বিনা বাক্যব্যয়ে আখের বোঝা দুটো মাঠে ফেলে দৌড়তে লাগলাম। সামনে কাটা আখের তাড়াগুলো দেখে তারা দৌড়নো বন্ধ করল। আমরা ততক্ষণে বিশ্ববিদ্যালয়ের অভয়ারণ্যের পাঁচিলের ধারে পৌঁছে গেছি। একবার ভেতরে ঢুকে গেলে জানি যে আমাদের অধিকারের ভেতর ঢুকে পড়েছি।

তবু আমরা দৌড় না থামিয়ে সোজা হাঁফাতে হাঁফাতে সুভাষের লজে চলে এলাম। কী হয়রানিরে বাবা। তিন রকমের সুস্বাদু আখের রস খাওয়ার পর এমন স্বর্গ থেকে পতন কে ভাবতে পেরেছিল।

স্থির হয়ে বসে সুভাষ বলল এদেশে কিচ্ছু হবে না। এরা ভাল লোককে চিনতে পারে না।

জনসংযোগ অনেক হয়েছে। আর দরকার নেই। এবার নিজের কাজ করা যাবে।

কাশীর ওই বিশাল বিদ্যালয়ের চত্বরে ঋতু পরিবর্তন ছিল দেখার মতো। শীত শেষ হতেই চওড়া রাস্তার দু'পাশে মস্ত মস্ত নিম গাছ থেকে পাতা ঝরে পড়ে রাস্তাগুলো ভরে যেতে লাগল। কখনও হঠাৎ দক্ষিণ দিক থেকে বাতাস বয়ে সমস্ত পাতা তাড়িয়ে নিয়ে গিয়ে একধারে মস্ত পাতার পাহাড় তৈরি হল। আবার কখনও উলটো দিক থেকে হাওয়া বইলে নতুন করে পাতার স্তূপ তৈরি হয় অন্য দিকে।

অলস বিকেলে দেখতে ভাল লাগে। সূর্য ডুবে গেলে হাতে যদি একটা বাড়তি টাকা থাকে তা হলে ছয় আনার গহরেবাজ টাঙ্গা চড়ে কাশীর পাড়ায় বেড়ানো যায় বদ্যিনাথের দোকান পর্যন্ত। সেখানে প্রচুর হইচই। ফুটবল খেলা নিয়ে প্রায়

হাতাহাতি আলোচনা এরপর একটা ছোট গুলির ঠান্ডাই চড়িয়ে আবার বাড়ির দিকে ফেরা। মেজাজ ভাল থাকলে, বন্ধুরা অনুকূল হলে গঙ্গাবক্ষে একটু নৌকাও চড়া হবে। পাশ দিয়ে সুসজ্জিত আলোকিত বজরা চলে যাবে। ভেতর থেকে সরু গলায় গান শোনা যাবে। আমাদের নৌকায় নিচু পাটাতন থেকে উঁচু বজরার কিছুই দেখা যায় না। গান শুনেই সন্তুষ্ট থাকতে হয়।

এখন আশ্চর্য মনে হয় বাইরের জগতের প্রতি আমাদের দৃষ্টি কত কম ছিল। নিজেদের নিয়েই সম্পূর্ণ।

ক্রান্তিকাল আসন্ন। কংগ্রেসের সর্বোচ্চ নেতা গান্ধীজি মনস্থির করতে পারছেন না ইংরেজদের চলে যেতে বলবেন নাকি তাদের দুঃসময়ে রক্ষা করবেন। নেহরু এবং তাদের ন্যাশনাল হেরাল্ড তেমনই দোলায় দুলছেন।

সুভাষ চলে যাবার আগে সমরেনরা কাশীতে এসে পৌঁছল। ওদের কাশীতে সিকরোল অঞ্চলে মস্ত পুরনো বাড়ি আছে। সমরেনদের ধারণা হয়েছিল যুদ্ধ আসন্ন। কলকাতায় থাকা চলবে না। নিজেদের পুরনো বাড়ির দখল নিতে সমরেনকে পাঠানো হল।

বেহালার সমরেনদের বাড়ির মানুষদের রাজনৈতিক স্পর্শকাতরতা প্রখর। তাঁরা বুঝতে পেরেছিলেন যে বড় যুদ্ধ আসন্ন। জাপান প্রকাশ্যে যুদ্ধে নেমে গেলে কলকাতায় স্ত্রী পুত্র পরিবার নিয়ে বাস করা সম্ভব হবে না।

কাশীর মস্ত মস্ত গাছে ঘেরা প্রকাণ্ড একচালা বাংলোটা ক্রমশ বাসযোগ্য হয়ে উঠল। আমি তো নতুন করে আনন্দের আশ্রয় পেয়ে গেলাম। সমরেনদের কাশীর বাংলো আমার মৃগদাব।

ইতিমধ্যে রাশিয়া জার্মান জোট ছেড়ে জার্মানির বিপক্ষে যুদ্ধে নেমে পড়ল।

ভারতবর্ষের জনমত বিভ্রান্ত ছিল। এখন নানা দলের আলাদা আলাদা মতবাদ প্রকাশ হয়ে পড়ল। আমরা মনে মনে পুরনো কংগ্রেসি, আমরা ইংরেজ তাড়াতে চাই। যে-কোনও সময়ে, যে-কোনও অবস্থায়। এই সময়টায় কমিউনিস্ট আন্দোলন মাথাচাড়া দিয়ে উঠল। ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজে উঁচু ক্লাসের ছাত্র, করন্থ। এখন সন্ধ্যায় ঘরে ঘরে আলোচনার আসর বসিয়ে গেল। করন্থ বলে আর দ্বিধা করবার সময় নেই। আমাদের

এক্ষুনি মিত্র-শক্তির সপক্ষে যুদ্ধে নেমে পড়া উচিত। কারণ এখন যে লড়াই হচ্ছে সে তো বঞ্চিতের লড়াই, আমাদের লড়াই, জনযুদ্ধ।

করম্বের সব কথার মানে আমি ভাল করে বুঝতে পারি না। কাল যারা শত্রু ছিল আজকের রাত্রি শেষে তারা কী করে পরম সুহৃদ হয়ে গেল?

আমার বারবার মনে হয়েছে এরা সুবিধাবাদী। নীতির কথা বলে বটে কিন্তু সেটা নেহাতই মুখের কথা।

শোনা গেল মানবেন্দ্রনাথ রায়ের ক্ষুদ্র প্রভাবহীন দল, তারাও জনযুদ্ধে রাশিয়ার পক্ষে যোগ দিতে চায়।

কলকাতায় মানবেন্দ্রনাথ রায়ের আস্তানা হল বেহালার রায় বাড়ি। কাজেই এই নিয়ে সমরেনের সঙ্গে অনেক রাত্রি পর্যন্ত আলোচনা হয় রোজ। মীমাংসা হয় না।

একদিকে আমাদের পরীক্ষা আসন্ন, অন্যদিকে এটা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিশেষ উৎসবের বছর। ওয়ার্ধা থেকে গান্ধীজি এসে পৌঁছেছেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের অতিথিশালায় আছেন। তিনি রজত জয়ন্তীর উৎসবের উদ্বোধন করবেন। সর্বত্র. সাজসাজ রব। একই সময়ে কাশীতে বিজ্ঞান কংগ্রেসের বিশেষ অধিবেশনও হবে। অনেক বিদেশি বিজ্ঞানী আসবেন, তাদের নাম জানি, লেখা পড়েছি। এখন তাঁদের দেখবার এবং শোনবার জন্য অধীর অপেক্ষায়।

বিশ্বনাথের গলি আমাকে চিরকাল সম্মোহিত করে রেখেছে। প্রথম যখন দেখি, সত্তর বছর পরে দেখা দুই ছবি একই রকম। মনে হয় কিছুই যেন বদলায়নি। রাস্তায় মন্দিরে পৌঁছবার আগে বিষ্ণু মশলাওয়ালা ছোট, ভারী সাজানো দোকান। সে আমাদের নিয়ে গিয়ে চার-ছয় রকম সরু মোটা বিবিধ রূপের পানমশলা খাওয়াবে। ছুটির সময় বাড়িতে নিয়ে যাবার জন্য নানা সুপুরির প্যাকেট দিয়ে দেবে। দাম ফিরে এসে দিলেই চলবে। বিষ্ণু আমাদের পান এবং জরদা খাওয়া শেখাচ্ছিল। সন্ধেবেলা দোকানে গেলেই জরদা দিয়ে একটা পান আমাদের খেতে হবে।

যেহেতু কাশী থেকে ডেহরি অন শোন দু' ঘণ্টার পথ, ছোট ছুটিছাটায় বাড়ি চলে যাই। ইতিমধ্যে বাবাও কয়েকবার কাশীতে এসেছেন। বাবার জীবনে নিয়মশৃঙ্খলা ছিল। চিঠি লিখে জানিয়ে দেবেন অমুক তারিখে কাশী পৌঁছব।

তুমি আমার সঙ্গে দেখা করবে, চৌকের কাছে। কাশীতে কোনও একটা বাড়িতে বাবার অফিসের অতিথিশালা ছিল। বাবা হয়তো লিখতেন— বিকেল চারটের সময় বাঁশ ফাটকে বিশ্বনাথ পেপার কোম্পানি, সেখানে তিনি উপস্থিত থাকবেন। ঠিক সময়ে গেলে দেখব বিশ্বনাথের উঁচু মস্ত চওড়া দাওয়ায় ইজিচেয়ারে বসে সিগারেট খাচ্ছেন। ফুটফুটে আদ্দির পাঞ্জাবি আর ধবধবে চন্দননগরের কাঁচি ধুতি পরে সব সময়ে শান্তিময় পরিতৃপ্ত ছবি। বিশ্বনাথ পেপার দোকানে পুরনো হিন্দি বই আর সংস্কৃত বই পাওয়া যেত। বাবা ওই রোয়াকে বসে বই পছন্দ করতেন।

সেদিন সন্ধ্যার মুখে বাবার কাছে পৌঁছতে বাবা বললেন, চলো তোমাকে একটা নতুন রেস্টুরেন্টে খেতে নিয়ে যাব। এই ভোজনশালা সবে হয়েছে। বাবা যে কী করে তার খোঁজ পেলেন জানি না। দোতলার ছোট বারান্দার পাশে খাবারের ঘর। সেখান থেকে চৌকের মানুষের চলাচল দেখা যাচ্ছে।

বাবা বললেন, এরা যে তিতির রান্না করে এ অঞ্চলে তার তুলনা পাওয়া যায় না। ভোজনশালার নাম সিন্দ রেস্তোরাঁ।

তিতির পাখি অনেক দেখেছি। আমাদের জঙ্গলমহলে লোকেরা তিতির পুষত। প্রভুর পাশে হাঁটতে হাঁটতে তিতির চলেছে। অথবা প্রভুর কাঁধে উঠে পড়েছে। এরা হল কুটুনি হাতির মতো। আর পাঁচটা তিতিরকে ডেকে এনে পাশের জালে ধরা পড়িয়ে দিত। অনেক সময় জালও পাতা থাকত। সেগুলো গুডুর পাখি ধরার জন্য। হিন্দিতে বটের, ইংরেজিতে কোয়েল। তার মাংস অপূর্ব স্বাদের। কিন্তু আমার সঙ্গে তখনও পরিচয় হয়নি।

তিতির ছোট মাপের পাখি। দুটি তপ্ত রুটি সহযোগে একটি তিতিরের কালিয়া খেয়ে আমি চিরকালের মতন অনুরাগী হয়ে পড়লাম। কয়েক বছর আগেও দিল্লিতে তিতিরের মাংস পাওয়া যেত। পরে সংরক্ষিত প্রাণী হিসেবে তিতির শিকার আইন করে বন্ধ হয়েছে।

বাবা এই যে নতুন একটা ভোজনশালা নতুনতর ভোজ্যের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিলেন তারপর অনেকবার সেখানে গিয়েছি। প্রতিবারই আনন্দের সীমা থাকত না। ফেরার পথে বিশ্বনাথের গলিতে যাই। বিশ্বনাথের গলিতে কত লোক, কত কথা, কত ভাষা, কত ছন্দ। ভারতবর্ষের দিকবিদিক থেকে মানুষ আসে। এরা সবাই উপস্থিত হয়েছে বিশ্বনাথের স্মরণে। যুগযুগান্ত ধরে কে কী পেয়েছে কেউ বলতে পারবে না। মানুষের সারের বিরাম নেই। যেন সারা

ভারতবর্ষ হাঁটতে হাঁটতে চলেছে অনন্ত কাল ধরে। আমার উদ্দেশ্য বিষ্ণুর জরদা সংযোগে পান।

অন্য বিভিন্ন পাখির মাংস থেকে তিতিরের মাংসের স্বাদ ভিন্ন এ-কথা বললেই যথেষ্ট বলা হল না। মুরগির থেকে অনেক বেশি সুস্বাদু। বলা যেতে পারত তিতিরের মাংস ঠিক মুরগির মতন অত রসস্থ নয়। তার মানে এই নয় যে তিতিরের মাংস শুষ্ক। সুগঠিতা সুন্দরী যুবতীর কণ্ঠস্বর ধরা-ধরা— ইংরেজিতে যাকে বলে হাসকি, যেমন পুরুষের প্রাণ উচাটন করে দেয়— এ যেন তেমনই। এত কথা আমার প্রথম দিন মনে হয়নি। কোনও অপরিচিত আনন্দের খনির সন্ধান পেয়ে নিপাট মুগ্ধ হয়ে গিয়েছিলাম। ফেরার পথে ভেবেছি বাবা কোথা থেকে এত খবর পান। কী করে জানতে পারেন কে আনন্দের চূড়ান্ত বিপণি সাজিয়ে বসে আছে। তখনও বটেরের সঙ্গে সাক্ষাৎ পরিচয় হয়নি। দীর্ঘাঙ্গিনী স্ত্রীলোকটিকে ভালবাসলে কি নাতিউচ্চ সুন্দরীকে আলিঙ্গন করা যায় না? বটের হল তেমনই।

বিশ্ববিদ্যালয়ের রজত জয়ন্তী উৎসব উপলক্ষে একটা বিশেষ ক্রিকেট ম্যাচের আয়োজন করা হয়েছে। ভিজিয়ানাগ্রামের রাজকুমার একটা প্রাসাদোপম রাজবাড়ি নিয়ে কাশীর ও প্রান্তে থাকতেন। হয়তো রজত জয়ন্তী অনুষ্ঠানে ক্রিকেট খেলাটা তাঁরই উদ্ভাবন।

ভারতবর্ষের সব সেরা খেলোয়াড় সেখানে জড়ো হয়েছিল। এরমধ্যে নির্মল চাটুজ্যে, কমল ভট্টাচার্য, মুস্তাক আলি, লালা অমরনাথ এঁরা সমরেনদের বাড়িতে আড্ডা জমিয়ে রাখতেন। ভিজির সঙ্গে অমরনাথের সম্পর্ক ভাল নয়। লালাজি সুযোগ পেলেই ভিজির নিন্দা করে নেন। সারাদিন জমজমাট আড্ডা, বিকেলে চৌক, দশশ্বামেধ ঘাট, বিশ্বনাথের গলি গঙ্গাবক্ষে নৌকা-বিহার, ফুর্তির যেন শেষ নেই।

খেলোয়াড়দের দু'ভাগে ভাগ করা হয়েছে! গভর্নর একাদশ এবং ভাইসরয় একাদশ। কোন দল জিতেছিল মনে নেই। শীত শুরুর কাশী আমাদের মাতিয়ে রেখেছিল।

এক-একজন মানুষের সাহচর্যে অন্য অনেক মানুষের জীবন সমৃদ্ধ হয়ে ওঠে। এই সমৃদ্ধ করবার ক্ষমতা সবার থাকে না। কেউ জেনেশুনে চেষ্টা করে বলেও মনে হয় না। কলকাতায় আমার সঙ্গে কলা বিভাগে পড়ত দুর্গা চক্রবর্তী। তার এই অদ্ভুত ক্ষমতা ছিল। সে সবার সঙ্গে যোগাযোগ রাখত। সব বন্ধুদের সঙ্গে। কোনও খবর এলে পরস্পরকে জানিয়ে দিত। কোথাও এক মুহূর্ত বসবার সময় নেই তার। মৌমাছির মতন অক্লান্ত ঘুরে বেড়াতে পারত। কী কারণে জানি না সে হঠাৎ কাশী এসে পৌঁছল। হয়তো তিন অথবা চার দিন ছিল। আবার সবাইকে সবার খবর জানিয়ে সে হঠাৎ কলকাতায় চলে গেল। এই মানুষের স্বভাব এ জীবনে বদলাবে না। পাঁচ বছর আগে তার আকস্মিক প্রস্থানে আমাদের বন্ধুদের যে কত ক্ষতি হল বুঝতে পারিনি।

দুর্গার বিপরীত চরিত্র ছিল মিহির মিত্র। শ্যামপুকুর রাজবাটীর ছেলে। কোনও চালিয়াতি ছিল না। তার চলায় বলায় পোশাকে আভিজাত্য ফুটে উঠত। সব সময় পালিশ করা কালো নিউ-কাট জুতো পরত। ধবধবে সাদা সদ্য পাট ভাঙা ধুতি এবং আদ্দির পাঞ্জাবি সর্বসময়ে ব্যবহার করত। কম কথা বলে এবং সবাইকে ভালবাসতে জানে। সেইজন্য সবার ভালবাসা পায়। মিহিরকে কলেজে আমি কিঞ্চিৎ সমীহ করে চলেছি। মিহির পরে বড় ডাক্তার হয়েছিল। দুর্গা আর মিহির দু'জনেই কলকাতার শেরিফ হয়েছিল।

কলকাতায় যে কলেজে পড়েছি সেখানে দরিদ্র ছাত্র ছিল না বললেই হয়। কাশীতে এসে তার বিপরীত দেখলাম। আমাদের পঞ্চম বর্ষের তামিল আয়েঙ্গার পরিবারের ছেলে রামচন্দ্রন ছাড়া সচ্ছল অবস্থার আর কোনও ছেলেমেয়ে ছিল না।

বাবা-মা কিংবা পরিবার কলেজের মাইনের জোগান দিচ্ছে, আর ছেলেরা নিশ্চিন্তে লেখাপড়া করে— এটাই নিয়ম জানতাম। প্রথমে বুঝতে অসুবিধা

হয়েছিল। পরে স্পষ্ট হল আমার সহপাঠী ছেলেমেয়েরা কত সন্তর্পণে ব্যয় সংকোচন করে লেখাপড়া চালায়। এরমধ্যে অনেকেই আমার চেয়ে বয়সে বড়, ওরা কাজ করে টাকা সঞ্চয় করেছে। ছুটি নিয়ে আরও বিদ্যা আহরণ করে একটি ভাল কাজ পাবার আশায় লেখাপড়া করতে এসেছে। তার আর অন্য কোনও চিন্তা নেই। যেটুকু সঞ্চয় আছে তাই নিয়ে দু' বছর চালাতে হবে। পরীক্ষা দিতে হবে এবং পাশ করতেই হবে।

সহপাঠী আলেকজান্ডারের বয়স আমার থেকে দশ বছর বেশি। মানুষটা অনেক ধাক্কা খেতে খেতে শেষ পর্যন্ত কাশী থেকে এম এসসি ডিগ্রি পাবে এই আশায় এসেছে। কত কষ্ট করে এখানে এসে পৌঁছল সে খবর পেয়েছি অনেক পরে।

আলেকজান্ডারকে দেখতাম রবিবার হলে নিজে সাবান দিয়ে তার প্যান্ট, শার্ট, কোট পরিষ্কার করছে। প্যান্টের তলা ছিঁড়ে গেছে, সুতো বেরিয়ে পড়েছে। তার গায়ে সব সময়ে একটা সাদা কোট থাকত, কখনও খুলতে দেখিনি যত গরমই হোক না কেন। শীতকালে আর কিছু গায়ে দেবার নেই। ওই কোট সম্বল করে জড়োসড়ো হয়ে বসে থাকে। একদিন দুপুরে প্রচণ্ড গরমে আমার বন্ধুরা তাকে বলল, কোটটা খুলে বসো, একটু আরাম পাবে। কথাটা শোনামাত্রই সে ভয় পেয়ে গেল। কোটটাকে বুকের মধ্যে আঁকড়ে ধরে কাঁপতে লাগল। আমরাও জোরজবরদস্তি করলাম— কোটটা খোলো। কিছুতেই খুলল না। প্রায় জোর করে কোট খুলিয়ে যা দেখলাম তাতে আমরা সবাই হতভম্ব। তিরিশ বছরের বিরল কেশ— আলেকজান্ডার ভেউ ভেউ করে কাঁদতে লাগল। তার শার্টের শুধু সামনের অংশ আছে, হাত দুটো একেবারেই নেই। শার্টের পেছনের আধখানা নেই। চব্বিশ ঘণ্টা কোটটা পরে সে তার লজ্জা নিবারণ করে। আমরা সবাই মরমে মরে গিয়েছিলাম।

আমাদের অবস্থা অত খারাপ নয়। তখনই বুঝতে পারলাম আলেকজান্ডার সকালে কেন চা খায় না, কেন ক্যান্টিনে যায় না। দু'বেলা বরাদ্দ খাবারটি হাপুশহুপুশ করে খেয়ে পেট ভরায়।

এরপর ক্রমশ তার জীবনের কাহিনী শুনলাম। ষোলো বছর বয়সে এক ডাক্তারবাবুর চেম্বারের কমপাউন্ডারের ফাইফরমাশ খাটত। তার থেকে যে-ক'টা টাকা হয় তাতেই তার সংসার চলত। সংসারে কেউ নেই। কিন্তু ভালবাসার মানুষ আছে। তার একটি সুপ্রাচীন ছবি আমাদের দেখাল। মনে হল

সে যেন আলেকজান্ডারের থেকে দশ বছরের বড়। দুটো দাঁত নেই। মাথায় চুল কম, কুচকুচে কালো রং। সে হল আলেকজান্ডারের প্রণয়িনী।

কমপাউন্ডারের কাছ থেকে যেটুকু টাকা পাওয়া যাচ্ছে তাই জমা করে আলেকজান্ডার ধীরে ধীরে প্রাইভেটে ম্যাট্রিক পাশ করল। এবার তার একটা মাইনে ঠিক হল। বোধহয় পঁচিশ টাকা। আস্তে আস্তে আলেকজান্ডার ডাক্তারের কমপাউন্ডার হয়ে গেল।

ডাক্তারবাবু একদিন বললেন এমনি করে তোমার কী হবে। তুমি ইন্টারমিডিয়েট পাশ করলে লোয়ার স্কুলে টিচার হতে পারবে। এইভাবে তিন বছর ধরে সাধনা চলল। আলেকজান্ডার ইন্টারমিডিয়েট পাশ করল। প্রাইভেট স্কুলে মাস্টারও হল। তারপর বুঝতে পারল গ্রাজুয়েট না হলে হাইস্কুলে মাস্টার হওয়া যায় না। আবার তিন বছর কেটে গেল। গ্র্যাজুয়েট হল। এবার হেডমাস্টার মশাই বললেন বিটি যদি পাশ করতে পারো তা হলে স্কুলে স্থায়ী চাকরি পাবে। সেটিও পাশ করল। যেদিন পাশ করল সেদিন সকালে চার্চের কলেজে এক মাস্টারমশাই মারা গিয়েছিলেন। আলেকজান্ডার সঙ্গে সঙ্গে সেই পদটা পেয়ে গেল। ডিমনস্ট্রেটর।

ভেবে দেখল কলেজে প্রফেসর না হতে পারলে বিয়ে করার মতো অবস্থা হবে না। আর কতদিন প্রণয়িনীকে বসিয়ে রাখবে। দু' বছর লাগল টাকা জমা করতে। তারপরেই এই কাশী। সবার শেষ আশ্রয় এম এসসি-টা পাশ করতে পারলে সংসার বাঁধতে পারবে। তার জীবনের আর কোনও উদ্দেশ্য নেই। পরে অবশ্য আলেকজান্ডার আরও ভাল করেছিল। এম এসসি পাশ করার পরে ঘানা বা নাইজেরিয়ায় পড়াবার একটা চাকরি পেয়ে গিয়েছিল। সেই কাজ করে তিন বছর পরে দেশে ফিরল। তখন তার বৃদ্ধা স্ত্রী, আস্ত জামা কাপড়, মাথার চুল প্রায় নেই বললেই হয়। তার মুখে দিগ্বিজয়ের হাসি।

আবাসিক বিশ্ববিদ্যালয় বলে আশা করেছিলাম ছাত্র-অধ্যাপক পরিচয়, মিলন, ঘনিষ্ঠতা অত্যন্ত সহজ হবে। কার্যত কিন্তু তেমন হল না। বিভাগীয় প্রধান ড. দশনাচার্য প্রাত্যহিক চায়ের আসরে অধিপতি ছিলেন। তাঁর সঙ্গে সম্পর্কটা ঘনিষ্ঠতর পর্যায়ে নেমেছিল। অন্য অধ্যাপকেরা এই আসরে প্রায়ই আসতেন না। ড. আসুন্দি তাঁর অন্ধকার ডার্করুমে নিশ্চিন্তে বসে থাকতেন। ড. সোগনি সুদূর তসরের পাঞ্জাবি পরা দীর্ঘকায়, মাঝে মাঝে ল্যাবরেটরি থেকে

বেরোতেন। কিন্তু তার সঙ্গে বিশেষ মেলামেশা হত না। আর একজন অন্য বিভাগের অধ্যাপক চা চক্রে প্রায়ই থাকতেন। ড. পুনতামবেকার দর্শনের অধ্যাপক ছিলেন। তিনি কড়া কড়া কথা বলতেন বলে শুনতে ভাল লাগত। তাঁর একটা মুখের বাণী ছিল— In India philosophers thirve and cowards multiply. বিজ্ঞান বিভাগের প্রধান ছিলেন ড. যোশি। খ্যাপাটে বলব না, কিন্তু তাঁকে এক-একদিন এক এক রূপে দেখা যেত। কখনও ভারী উল্লসিত হয়ে বড় বড় কথা বলছেন— সামনে মস্ত ভবিষ্যৎ দেখতে পাচ্ছি— বা কোনওদিন ঝিমিয়ে আছেন। মাঝেমাঝে বলতেন— ভারতের কিচ্ছু হবে না। এদেশটা গোল্লায় যাবেই।

এই উজ্জ্বল নক্ষত্রদের মধ্যে জ্যোতিষ্ক ছিলেন প্রফেসর ভাটনগর। মনে হত যেন অশারীরিক ক্ষমতার উৎসাহে টগবগ করে ফুটছেন। বলেছিলেন— এই যে পৃথিবী দেখছ, কাঠ, সিমেন্ট, লোহালক্কড় এসব থাকবে না। ভবিষ্যতে পৃথিবী হবে প্লাস্টিক ওয়ার্ল্ড।

দেশ স্বাধীন হবার পরে প্রফেসর ভাটনগর সরকারের বিজ্ঞান বিষয়ক পরামর্শদাতা হয়েছিলেন। দেশে ন্যাশনাল কেমিক্যাল ল্যাবরেটরি এবং ন্যাশনাল ফিজিকাল ল্যাবরেটরি ইত্যাদি বহু বিশিষ্ট গবেষণাগার তাঁরই সৃষ্টি।

এই যে আমাদের আবাসিকদের সঙ্গে অধ্যাপকদের আশানুরূপ মেলামেশা হল না তার একটা কারণ, এখানে অধ্যাপকেরা এবং ছাত্ররা বিভিন্ন অঞ্চলের, বিভিন্ন ভাষার, বিভিন্ন সংস্কৃতিতে প্রতিপালিত। তার বেড়া ভেঙে একসঙ্গে মিশে যাওয়া সহজ কাজ ছিল না।

এই কাজটা খুব সহজভাবে করতেন গণিতের অধ্যাপক ড. সুবোধ দাশগুপ্ত। মিষ্টি স্বভাবের মানুষ ছিলেন। ছাত্ররা তাঁর প্রিয়ও ছিল। তাদের জন্য বাড়িতে উন্মুক্ত দ্বার ছিল। তিনি সফল ছিলেন প্রধানত শুধু বাঙালি ছেলেদের নিয়ে মেলামেশার জন্য।

পঞ্চমবর্ষের শেষে অঙ্কের ছাত্রছাত্রীর দল ঠিক করেছিল তারা কলকাতা হয়ে ছুটিতে দেশে যাবে। স্বাভাবিকভাবে আমি তাদের গাইড। একদিন দুপুর বারোটার সময় ছাত্রছাত্রীরা হাওড়া স্টেশনে নামল। ঠিকানাটা তারাই জোগাড় করেছিল। 'কমলা বিলাস'— রাসবিহারী অ্যাভিনিউয়ের ওপরে। সেখানে গিয়ে তারা স্নানাদির পর পরিপাটি ভোজন করল। এই প্রথম ভাল দক্ষিণী

খাবার আমি দেখলাম। কাশীতে এরা যেখানে খেতে যেত, অর্থাভাবের জন্য ছোট-পুরনো নোংরা ভোজনশালা ছাড়া যাওয়া যেত না। অল্প আলোয় ভাত দিয়ে দই দিয়ে মেখে যে খাবারটা খেত তাদের কাছে অমৃত সমান হলেও আমার আদৌ ভাল লাগেনি। আজ এখানে দিনের স্পষ্ট আলোয় ভাল থালাবাটিতে ভাল জায়গায় বসে যে থালিটি খেলাম সেটি সম্পূর্ণ অন্য রকম। সম্বর রসমের তফাত ভাল করে বুঝতে পারলাম। তখনও ভাল দোসা বা ভাল ইডলি খাইনি।

কাশীতে পড়তে না গেলে আমাদের হয়তো জানতে আরও সময় লাগত যে ভারতবর্ষে অধিকাংশ মানুষই নিরামিষাশী। বাংলায় মানুষ হয়েছি, বাংলার বাইরে জ্ঞানের পরিধি অত্যন্ত সংকীর্ণ। আজকের অন্ধ্রপ্রদেশ, তামিলনাড়ু এবং কর্ণাটকে আমিষ ভোজনের চল নেই বলা যায়। কেরলে খ্রিস্টানদের সংখ্যা অধিক বলে এই অঞ্চলে মাছ-মাংসের প্রচলন আছে।

ভোজ্য পদার্থ যেমনই হোক দক্ষিণ ভারতের প্রিয়খাদ্য নিরামিষ। আরও আশ্চর্য এই যে তারা নিরামিষ আহার ভালবেসে গ্রহণ করে থাকে। আমার মনে হয়েছে যে, নিরামিষ খাবার আদৌ ফেলনা নয়। প্রথম যখন দক্ষিণী খাবারের সঙ্গে পরিচয় হয় তার পরের সত্তর বছর দক্ষিণী খাবারের প্রভাব ও বিস্তার দেখে আশ্চর্য হবার কথা। আজকের অল্পাহার বলতে শিঙাড়া, কচুরি, নিমকি— অতটা চলে না যতটা চলে ইডলি, দোসা, উপমা। সঙ্গে পরিবেশিত সম্বার ও চাটনি, মানুষ আদর করেই খায়।

এ-কথা ঠিক দক্ষিণী ভোজনের তালিকা মস্ত বড় কিছু নয়। তা হলেও যাঁরা যত্ন করে দক্ষিণী ভোজন গ্রহণ করেন তাঁরা বিভিন্ন অঞ্চলে ভিন্ন রকম ও সূক্ষ্ম ভিন্ন স্বাদের চাটনি ও সম্বারের পার্থক্য ধরতে পারেন।

যাই হোক সহপাঠীদের নিয়ে সেই দুপুরে পরিপাটি লাঞ্চ খাওয়া হল। সময় কম। তার মধ্যে লেক, ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়াল, মনুমেন্ট, মার্বেল প্যালেস, পরেশনাথ মন্দির দেখা হল। দেরি হয়ে গিয়েছিল। রাত্তিরের খাবার স্টেশনে পুরিভাজি দিয়েই সারতে হল।

এই দলে অন্য ক্লাসের একটি মেয়ে এসেছিল। তার নাম শান্তা। পাঞ্জাবি মেয়ে, কিন্তু বলিষ্ঠ চেহারা নয়। মেয়েটিকে আমার পছন্দ ছিল। আমি তাকে বললাম এর পরের ছুটিতে যখন দিল্লি ফিরে যাবে তার আগে আমাদের বাড়ি ডেহরি অন শোনে এসো। আমার মা তোমাকে দেখলে খুশি হবেন। মেয়েটি

এক মুহূর্ত চিন্তা না করে বলল— যা গরম তোমাদের বিহারে, কে যাবে সেখানে। আমার মুখে উত্তর জোগাল না। বাড়ি দিল্লিতে, বলে কিনা বিহারের গরম। কথাবার্তা আর এগোল না। সন্দেহ হল ডেহরি অন শোনে নয়। আমাকেই অপছন্দ হয়েছিল।

দেখলাম শুধু বাঙালিই নয়, সবারই মনের বাইরের জানালা বন্ধ।

গ্রীষ্মের ছুটির পর যে ক'দিন বিশ্ববিদ্যালয়ে উৎসব অনুষ্ঠানের আবহাওয়া ছিল সে ক'টা দিনই খুব ভাল লেগেছিল। নানা কাজের জন্য কমিটি তৈরি হচ্ছে। আমরাও ছোটখাটো ভার পাচ্ছি।

গান্ধীজির বক্তৃতার দিনে সভায় লোকারণ্য। ভাল জায়গায় বসা অসম্ভব। গান্ধীজির দন্তহীন মুখের হাসি ভারী মধুর লেগেছিল। কথাগুলি আদৌ মধুর নয় তার কারণ ভাল করে বুঝতেই পারলাম না।

এরপর সায়েন্স কংগ্রেস এর অধিবেশন শুরু হল। আমরা পৃথিবী বিখ্যাত বিজ্ঞানীদের কাছাকাছি যাওয়ার চেষ্টা করছি। তাঁর কিছু কাজ করতে পারলে নিজেকে কৃতার্থ মনে করব।

ক্রমশ দ্বিতীয় বর্ষের শেষ চলে এল। এবার একমাত্র চিন্তা পরীক্ষা।

পরীক্ষাও শেষ হল। ভালমন্দ মিশিয়ে পুরনো সাইকেল, পুরনো পাখা দশ অথবা পাঁচ টাকায় বিক্রি করে দিয়ে বাড়ি ফেরার জন্য তৈরি হচ্ছি। বন্ধুবান্ধবদের সঙ্গে অনেক ঠিকানার আদান প্রদান হল পরে যোগাযোগ হবে বলে। আসবার আগের দিন সন্ধেবেলা বিশ্বনাথের গলিতে মতিচন্দর দোকানে গেলাম। মতিচন্দ অতি সমারোহ করে পান সেজে খাওয়াল। সুপারি, কিমাম ইত্যাদির একটা ছোট প্যাকেট দিয়ে দিল। দিয়ে বলল এর দাম দিতে হবে না। আবার যখন কাশী আসবে আমার কথা মনে রেখো।

ভারাক্রান্ত মনে ডেহরি অন শোনে ফিরে এলাম। তার ওপর পরীক্ষার ফলাফলের জন্য কী রকম একটা অস্বস্তি।

মাসখানেকের মধ্যেই জ্বরে পড়ে গেলাম। আর কোনও কাজ নেই। একদিনের বাসি পুরনো খবরের কাগজ সন্ধ্যায় আসবে। আমাদের রেডিয়োতে আবার সব স্টেশন পাওয়া যায় না। বাইরের খবর ভাল করে পাই না। কংগ্রেসের মধ্যে তর্ক বিতর্কের শেষ নেই। কংগ্রেস কী করবে বুঝতে পারছি না।

এক দুপুরে আমাদের বাড়ির বাইরের দিকে একটা ঘরে শুয়ে আছি। দূরে সোজা দেখা যাচ্ছে রেলওয়ের স্টেশন ইয়ার্ড। হঠাৎ স্টেশনের কাছে একটা আগুনের গোলা ফেটে উঠল। মিনিটখানেকের মধ্যে স্টেশন অঞ্চলের লোকের দৌড়াদৌড়ি শুরু হয়ে গেল— কী হচ্ছে বুঝতে পারছি না। মা দৌড়ে বাড়ির সব দরজা জানলা বন্ধ করতে লাগলেন। বুঝতে পারছি একটা বড় কিছু হয়েছে।

ভাসা ভাসা খবর ছিল কংগ্রেস নেতারা যুদ্ধের বিরুদ্ধে প্রস্তাব দিলেই তাদের গ্রেপ্তার করা হবে। হয়তো তার ফল হচ্ছে এই অগ্নিসংযোগ। বাড়িতে পুরুষ মানুষ কেউ নেই। মা তাড়াতাড়ি এসে বাইরের দিকে দরজা জানলা বন্ধ করে দিয়েছিলেন।

বাবা বিদেশ গেছেন। বুঝতে পারছি মা খুব অসহায় বোধ করছেন।

আরও দু'-চারটে বোমা ফাটার শব্দ আসতে লাগল। জানলার ফাঁক ফোকর দিয়ে অগ্নিকাণ্ডের ঝিলিক দিচ্ছে।

বিকেলবেলায় বাবার কয়েকজন সহকর্মী বললেন, এ বাড়িতে থাকাটা নিরাপদ নয়। এ বাড়ি শিল্পাঞ্চলের বাইরে। পাঁচিল ঘেরা শিল্পাঞ্চলের মধ্যে ঢুকে গেলে দারওয়ান পাহারাদার থাকবে। আশপাশে বাড়িঘরও আছে। এ বাড়িটা একদম একটেরে। কোনও খবর পাওয়ার উপায় নেই। আমরা শুধু আন্দাজ করছি কী হচ্ছে। কে কার সম্পত্তিতে আগুন লাগাচ্ছে। কে কোথায় বোমা ফাটাচ্ছে। বোঝবার কোনও উপায় নেই।

যাই হোক, একটু সংরক্ষিত এলাকায় পৌঁছানো গেল। প্রতিবেশী দু'-এক জন এলেন। ভরসা দিতে থাকলেন। রাত্রিটা অশান্তিতে কাটল। এখানে ওখানে বিস্ফোরণ হচ্ছে আর আলোর ছটা দেখছি। কিন্তু কারণটা ধরতে পারছি না। এ-সব কি আমাদের কারখানাটা উড়িয়ে দেবার জন্য?

এদিকে বাবা বোম্বাই গেছেন। তাঁর কাছ থেকে কোনও খবর নেই। তার জন্যও ভাবনা। পরে শুনেছিলাম এই হল ৪২-এর স্বাধীনতা আন্দোলনের সূচনা। এই ঘটনায় মেদিনীপুরের আজকের যে অঞ্চলটা পূর্ব মেদিনীপুর জেলা, তাদের প্রকাণ্ড ভূমিকা ছিল। স্থানীয় নাগরিকরা ব্রিটিশ রাজশাসন পরাস্ত করে নিজস্ব রাজ প্রতিষ্ঠা করেছিল।

পরের দিন থেকে খবর আর গুজব মিলিয়ে অনেক কিছু শোনা যেতে লাগল। তাতে আশ্বাস বাড়ে, ভয়ও বাড়ে।

ভারতবর্ষের আকাশে তখন গভীর সংকট আসন্ন। সবে পুব বাংলায় মন্বন্তর দেখা দিয়েছে। দু'-এক আনা সের চালের দাম পঁয়তাল্লিশ টাকা মণ। মানুষ হা-অন্ন হা-অন্ন করে দ্বার থেকে দ্বারে ঘুরে বেড়াচ্ছিল। কে কাকে অন্ন দেবে। কার অন্নের সঞ্চয় আছে। শোনা গেল এই অন্নাভাব মানুষের তৈরি করা। জাপানিরা বুঝি এসে গেল। তারা ভারতবর্ষে পা রেখে যদি খাবার দাবার কিছু না পায় তার জন্য ছোট নৌকা আর ছোট পোল ভেঙে দেওয়া হয়েছিল। সেই নৌকো দিয়ে সেই পোল পার হয়ে সেই খাবার দেশের মানুষের কাছে পৌঁছত সেটা মনে ছিল না।

সামনে আরও বিপদ ছিল। জাপানিরা শুনছি স্থলপথে আসবে তাও নয়। ভারতবর্ষে কোথাও নামার আগে সেখানে প্রভূত বোমাবাজি করে ধ্বংস করে দেবে। মানুষ বিশ্বাস করেছিল জাপানি আক্রমণ প্রধানত বড় শহরেই হবে। তাই বড় শহর ছেড়ে পালাবার হিড়িক পড়ে গিয়েছিল। ট্রেনের টিকিট পাওয়া যায় না। কলকাতার সামান্য বাইরে যেতে হলে ট্যাক্সি বা মোটর গাড়ি ভাড়া চাই।

এই সময়টা আমার ভাই কলকাতায় এসেছিল ম্যাট্রিক পরীক্ষা দিতে। বাবা বলে পাঠালেন তাকে সঙ্গে নিয়ে যেন অবিলম্বে বিহারে ফিরে আসি। কাজটা বলা যত সহজ, করা তত সহজ নয়। বিহার দূরে থাক। কলকাতার আশপাশের শহরে রেলের টিকিট পাওয়া যায় না। বাবার বন্ধু বিপিনবাবু যে কী উপায়ে দুটো টিকিট সংগ্রহ করে আমাদের দু'ভাইকে মেদিনীপুরের ট্রেনে তুলে দিলেন। আমরা অপেক্ষাকৃত নিরাপদ আশ্রয়ে মেদিনীপুর পৌঁছলাম।

হাওড়া স্টেশনে এসে দেখেছি লোকে লোকারণ্য, মানুষের ভিড়ে ট্রেন প্রায় দেখা যাচ্ছে না। অনেককাল পরে এলাহাবাদে প্রয়াগের সময় এরকম ভিড় দেখেছিলাম। আমার মনে হয়েছে হাওড়া স্টেশনে ভিড় আরও বেশি ছিল। তার সবটাই ছিল অনিশ্চিত। ট্রেন কোথাও যাচ্ছে কি না, আদৌ কোথাও যাবে কি না কেউ বলতে পারে না। বিপিনবাবুর বসার জায়গা নেই আমাদের দু'জনকে বসিয়ে দিয়ে তিনি প্ল্যাটফর্মে দাঁড়ালেন। ঠিক মনে নেই তিন-চার ঘণ্টা বাদে ট্রেনটা বোধহয় ছাড়ল।

প্ল্যাটফর্মের যাত্রী আসার বিরাম নেই। প্ল্যাটফর্ম ছাড়িয়ে পরের স্টেশনে পৌঁছতে অনেকবার থামতে হল। তবু তো যাচ্ছি। খাদ্য নেই, পানীয় নেই। বাড়ি পৌঁছলে খেতে পাব।

ট্রেন প্ল্যাটফর্ম থেকে বেরোবার পরে রাস্তার দু'ধারে দৃশ্য না-দেখা কোনও ছবির মতো। দু'পাশ দিয়ে সার সার মানুষ চলেছে। ছেলে বুড়ো অথর্ব অসুস্থ। সবাই ভয়ের শহর কলকাতা ছেড়ে পালাচ্ছে। প্রধানত ওড়িশা বিহারের মানুষই বেশি, তাদের যাবতীয় সহায় সম্বল নিয়ে দেশে ফিরে যাচ্ছে।

জাপানি বোমা যে ভয়াবহ জিনিস তার সব ভয়ংকর বর্ণনা শোনা যাচ্ছে আশেপাশে। সন্ধের মুখে মেদিনীপুর শহরে পৌঁছে গেলাম। সেখানে জীবনযাত্রা শান্ত স্বাভাবিক। একশো মাইলের মধ্যে একটা বড় শহরে যে ভীষণ আশঙ্কায় মানুষ কাঁপছে এখানে তার আঁচ পাওয়া যায় না। মানুষের কথাবার্তায় ভয়ের অচেনা ছবির আলোচনা।

কলকাতার অল্প ক'দিন ছিলাম। কারও সঙ্গে বিশেষ আলোচনা হয়নি। তবে দেখলাম এখানেও জনযুদ্ধের আন্দোলন শুরু হচ্ছে। আমাদের পাড়ায় পাশের বাড়ির মস্ত চওড়া রোয়াকে সকাল সন্ধে আড্ডা বসে। সেখানে আলোচনার প্রধান বিষয়বস্তু নিষ্প্রদীপ আর জনযুদ্ধ। প্রতি সন্ধ্যায় দু'-একজন বাইরের লোক আসেন। তাঁরা আড্ডায় বসেই বোঝাবার চেষ্টা করেন জনযুদ্ধে যোগ দেওয়া ছাড়া মুক্তি নেই। সেই সময় কলকাতার চেহারা বদলে গিয়েছিল। সব বাড়ির সামনে ছোট-বড় বোর্ড ঝুলছে— টুলেট, ভাল বাড়ি খালি আছে ইত্যাদি।

কেমন করে সে অন্নাভাব মিটে গিয়েছিল, কত মানুষ মারা গিয়েছিল— দশ লক্ষ না পনেরো লক্ষ— সঠিক হিসেবে কোনওদিনই জানা যায়নি।

যুদ্ধের পক্ষে জনযুদ্ধ আন্দোলন খুব সফল হয়েছিল বলে মনে হয় না। রাজনৈতিক দলেরা কিছু টাকা পেয়ে আন্দোলনকে সাহায্য করেছিল। পরে তাই নিয়ে লজ্জাও ছিল। অবশ্য রাশিয়া মিত্র পক্ষে যোগ দেওয়াতে যুদ্ধের চেহারাটা অনেক বদলে গিয়েছিল।

কাশীতে বাটরা করস্থের সঙ্গে অনেক আলোচনা হয়েছিল। পরবর্তী জীবনে করস্থ মালাবার অঞ্চলে কমিউনিস্ট পার্টিতে গুরুত্বপূর্ণ স্থান পেয়েছিল। বাটরার নামডাক আর শোনা গেল না। সে দিল্লির ভিড়ে কোথায় হারিয়ে গেল।

বামপন্থীরা অস্ত্রশস্ত্র হাতিয়ার নিয়ে যুদ্ধ সমর্থন করতে না পারলেও সংগীত, বাদ্য ইত্যাদি দিয়ে জনমনকে আলোড়িত করেছিলেন। তখনই শুরু হয়েছিল গণনাট্য আন্দোলন। সে আন্দোলন অবশ্য ভেঙে যায় নানা খণ্ড হয়ে। তা হলেও নতুন একটা ভাবধারা সুর ও গানের সমন্বয়ে নতুন আবহাওয়া তৈরি করেছিল।

এই সময় নেতাজি ইংরেজ পাহারাদারদের চোখে ধুলো দিয়ে তাঁর পরিকল্পনা মতো ভারতের বাইরে চলে গিয়েছিলেন ১৭ জানুয়ারি ১৯৪১ সালে। তিনি জনমত সাহায্যে অস্ত্রশস্ত্র সংগ্রহের চেষ্টা করছিলেন বিদেশে। অনেকাংশে সফলও হয়েছিলেন। সেটা পরের খবর।

মানুষের সব কষ্ট সহ্য হয় না। সময়ে সময়ে সব দুঃখ ভুলে যায়। ৪৩-এর মন্বন্তর কেমন করে শেষ হল সে কথা ভাল মনে নেই। গলির মোড়ে এখানে ওখানে অভুক্ত মানুষের শবদেহ পড়ে থাকত। সেগুলো আর দেখা গেল না। চালের মণ পঁয়তাল্লিশ টাকা থেকে বারো-চোদ্দো টাকা সের দরে নেমে গেল।

কাশী ছাড়বার আগে বন্ধু-বান্ধবদের মধ্যে মাঝে মাঝে আলোচনা হত যে যুদ্ধ আরম্ভ হয়ে গেছে। সরকার আবহাওয়া অফিসে অনেক লোকজন নিচ্ছে। বন্ধুরা বলেছিল ওখানে চেষ্টা করলে কাজ পাওয়া যাবে। আমিও তাই ভেবেছিলাম। কিন্তু বাবা আমার সিদ্ধান্তে জল ঢেলে দিলেন। বললেন, ওইসব তুচ্ছ কাজ করে কী হবে। নতুন কাজের উৎস তৈরি হয়েছে কলকাতার শেয়ার মার্কেটে। শেয়ার বাজারে অনেক কাজ কম্ম বেড়েছে। এইটাই ওখানে যাবার সময়। অ্যাসিসস্টেন্ট মেম্বারশিপ পাওয়া যাচ্ছে তিন-চার হাজার টাকায়। তাই একটা কেনা হবে আমার জন্য।

রোজগার শুরু করতে গিয়ে এ কী অসুবিধা। গোড়াতেই খানিকটা টাকা লাগাতে হবে। আমাকে রাজি হতেই হল।

কলকাতায় এসে পৌঁছলাম। শুনলাম, স্টক এক্সচেঞ্জ অতি অভিজাত জায়গা। একটা মেম্বারশিপ কার্ডের দাম এখন লক্ষ টাকা। মাত্র কয়েক শতাংশ দামে শেয়ার বাজারে ঢুকে পড়া যাবে, এর চেয়ে বড় সুযোগ আর কী হতে পারে।

দু' বছর পর কলকাতায় ফিরেছি। একটা শহরে দু' বছরে এমন চরিত্র বদলাতে পারে, না দেখলে কেউ বুঝতে পারবে না। কতরূপেই না কলকাতাকে দেখলাম। যুদ্ধের আগে সমৃদ্ধ কলকাতা, যুদ্ধের মধ্যে সমৃদ্ধতর কলকাতা, এখন একেবারে ম্রিয়মাণ। প্রায় মৃত কলকাতা।

প্রথমত, এখানে এখন ব্ল্যাক আউট। সন্ধে হলেই অন্ধকারে থাকতে হবে। কালো কাচের উপর কাগজের পট্টি লাগাতে হবে। যাতে বাইরে বোমার ধাক্কায় কাচ ভেঙে গেলে ছিটকে টুকরো টুকরো হয়ে এসে মানুষের ক্ষতি না করতে

পারে। রাস্তায় আলো নেই। তার ওপর স্থানে স্থানে পাঁচিল তুলে দেওয়া হয়েছে। ব্যাফেল ওয়াল। বোমা পড়লে তার আড়ালে দাঁড়াতে হবে। যাতে বোমার আঘাত সরাসরি গায়ে না লাগে।

ততক্ষণে মন্বন্তর শুরু হয়ে গেছে। সারি সারি বুভুক্ষু মানুষ একটা টিনের পাত্র নিয়ে "দুটি ভাত দাও মা" বলে বেড়াচ্ছে। সেই "ভাত" শব্দ বদলে গিয়ে "ফ্যান দাও মা" হয়ে গেল। কেউ ভাতও দেয় না, ফ্যানও দেয় না। কে দেবে, কার বাড়িতে বাড়তি জিনিস আছে। অভাবী লোকগুলো ঘুরে ঘুরে এক সময় ক্লান্ত হয়ে ফুটপাথের ওপর পড়ে যাচ্ছে। তারপরে মরেও যাচ্ছে। তারপর নানা দুর্গন্ধের সঙ্গে মৃতদেহ পচনের দুর্গন্ধও যুক্ত হচ্ছে। এমন ভয়াবহ অবস্থা কল্পনা করা যায় না।

পথে লোক নেই, দোকানপাট বন্ধ। সর্বত্র অন্ধকার। সেই ভুতুড়ে শহরে সন্ধ্যার পর আর প্রাণ থাকে না। সবাই সূর্যাস্তের পরেই বাড়ি ফিরে যাচ্ছে। অল্প আলো জ্বেলে জানলা বন্ধ রেখে কোনওরকমে রাত্রির কাজ সেরে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব শুয়ে পড়া।

যে শহর সমস্তক্ষণ গাড়িঘোড়া, চাঞ্চল্যে ভরা থাকত সূর্যাস্তে যেন তাকে রুপোর কাঠি ছুঁইয়ে ঘুম পাড়িয়ে দেওয়া হচ্ছে। শহরে সর্বত্র খালি বাড়ি পাওয়া যাচ্ছে ভাড়ার জন্য। কেউ বলে না ভাড়া চাই। যে গৃহস্থের উপায় আছে সে পুত্র পরিবার বাইরে কারও কাছে জমা দিয়েছে।

শনিবারে শহরটা আরও অথর্ব, মৃত দেখায়। যে পেরেছে বাইরের আত্মীয়স্বজনকে দেখতে গেছে। আমার এক বন্ধু চিৎপুর রোডে বড় রাস্তার ওপর বড় ফ্ল্যাট ভাড়া করলেন। তিন কামরার ঘর, দু'টো বড় বাথরুম। সামনে খোলা বারান্দা— সবসুদ্ধ ভাড়া তিরিশ টাকা। বুদ্ধিমান অনেকে এই সব বাড়িতে ভাড়াটেই থেকে গেছেন। যখন অবস্থা ফিরল তখন তারা বাড়ি ছাড়লেন না।

এই ডামাডোলের বাজারে আমি ক্যালকাটা স্টক এক্সচেঞ্জের লায়ন্স রেঞ্জে গিয়ে ভর্তি হলাম। ছোট সুন্দর অফিস, চারজন পার্টনার, তিনজন অ্যাসিস্ট্যান্ট। এদের মধ্যে একজন ছিল ভিক্টর কাপুর। সে স্যুট পরে আসে। পুরনো বলে আরও চালাক চতুর। তার যোগাযোগ অনেক বেশি।

আমাদের সবার সম্পদ হল একটা ছোট স্লিপের খাতা। একটা পেনসিল।

কাজটা করতে গিয়ে খুব হাসি পেয়েছিল। একটা মস্ত হলে দেড়শো-দু'শো আমার মতো ব্রোকার ঘুরে বেড়াচ্ছে। থেকে থেকে সে কী করতে চায় তার হাঁক দিচ্ছে। যদি হাঁক দেয় 'ইন্ডিয়ান আয়রন'— তা হলে বুঝতে হবে ইন্ডিয়ান আয়রনের শেয়ার বেচবার বা কেনবার জন্য আছে। বুদ্ধিমান ব্রোকার আদৌ বুঝতে দেবে না সে কী করতে চায়। তবেই না ন্যায্য দাম পাবে। আমি হয়তো গিয়ে কোনওরকমে ইন্ডিয়ান কপার-এর একশোটি বিক্রি করে এলাম। এখানে একশোটার মানে ইন্ডিয়ান কপারের একশোটা শেয়ার। যাকে বিক্রি করলাম তার নাম টুকে রাখলাম। সেও আমার নাম টুকে রাখল। আর কোনও লেখাপড়া নেই, কোনও দলিল দস্তাবেজ নেই। আমি সন্ধেবেলায় অফিসে এসে আমার কেনাবেচার তালিকাটা এক কেরানিকে দিয়ে যাব। সে পরের দিন দু'পক্ষের কাছে কেনাবেচার তালিকা মতো চিঠি পাঠিয়ে দেবে। ইতিমধ্যে হয়তো যে ইন্ডিয়ান কপার শেয়ার আমি বিক্রি করে দিলাম তার দাম বেড়ে গিয়েছিল দু' টাকা।

অপর পক্ষকে কখনওই বলা যাবে না কোনও সওদা হয়নি। মুখের কথায় হয়তো পঞ্চাশ হাজার ইন্ডিয়ান কপার-এর সওদা হয়ে গেল। এই যে মুখের কথার ওপর এত বড় ব্যবসা চলছে, না দেখলে বিশ্বাস হবে না। অথচ লোকগুলো কেউই ধুরন্ধর সৎ লোক নয়। এরা সুযোগ মতো বহু জালজোচ্চুরি করছে। যেমন অনেক পরে পাওয়া গেল হর্ষদ মেহতা। কিন্তু কথার খেলাপ কখনওই হয় না। শেয়ার মার্কেটে দামের ওঠাপড়া দেখে আমার প্রথম প্রথম একটু ভয় করত। পরে দেখলাম দামের ওঠা পড়ার সঙ্গে আমাদের কথার কোনও সম্পর্ক নেই, কথা অনড়। তার সত্যতা অনস্বীকার্য।

আমার আবহাওয়াবিদ বন্ধুরা যেখানে মাসে ষাট টাকা রোজগার করছে আমি একদিনে অনেক শেয়ার কেনাবেচা করে তার থেকে ঢের বেশি রোজগার করতে পারব। বলা হয়নি আমাকে শেয়ার বেচার কাজটা কে দেবে। আমি তো নিজে ইচ্ছে মতো কিছু শেয়ার বিক্রি করা বা কিনতে পারি না। তার দু'দিন পরে টাকা দিয়ে আমার সেই প্রতিশ্রুতি পূরণ করতে হবে। এই কাজগুলো আসে বড় কোম্পানি, বড় মক্কেল বা বড় শেয়ার বাজারের খেলুড়ের কাছ থেকে। ভিক্টর কাপুরের এরকম মক্কেল বেশি ছিল বলে সে একদিনে একহাজার-দু'হাজার শেয়ারের কেনাবেচা সেরে ফেলে।

সংস্কৃতে একটা বাক্য আছে— 'চক্রবৎ পরিবর্তন্তে জগৎ।' দেখতে পাই

এটাই অমোঘ। কলকাতার চেহারা আবার বদলাতে লাগল। সেই প্রায় মৃত শহরটা আবার জাগতে শুরু করেছে। যুদ্ধের কারণে হঠাৎ ভারতবর্ষ থেকে সরকারকে অনেক কাঁচামাল সংগ্রহ করতে হচ্ছে। তার মধ্যে অনেক উদ্ভট জিনিসও ছিল। বড় যুদ্ধ বেধে গেলে লোহা দুষ্প্রাপ্য এবং দুর্মূল্য হতে পারে। এইজন্য নানা ক্ষেত্রে লোহার বিকল্প খোঁজা হতে লাগল। আলপিন পাওয়া কঠিন, আলপিনের বদলে বাবলা কাঁটা কিনতে এবং জোগাড় করতে একদল লোক বেরিয়ে পড়ল। এমনও শোনা গেল যে সে রাতারাতি অনেক টাকা করে ফেলেছে। এইসব জোগাড় ও সরবরাহের কারণে নানা স্থানে অফিস খোলা হতে লাগল। কয়েকটা নতুন ব্যাঙ্কও খোলা হয়ে গেল। শেষ পর্যন্ত বোধহয় চল্লিশটা নতুন ব্যাঙ্ক খোলা হয়েছিল।

একদিন সকালবেলা দরজা বন্ধ করে হাজার হাজার দেনদার ও অ্যাকাউন্ট হোল্ডারদের পথে বসিয়ে যেমন আচমকা এসেছিল তেমনি আচমকা অন্তর্ধান করল কয়েকটি ব্যাঙ্ক।

মানুষের জামাকাপড়ের চেহারা বদলে গেল। সেইসব নতুন ব্যাঙ্ক অফিস মানেই তো একজন ম্যানেজার, দু'জনে সাধারণ কর্মচারী, একজন পিওন বা বেয়ারা। এইসব লোকেরা আবার রাতারাতি বেকার হয়ে পড়ল। কিন্তু এই ঘটনা অনেক পরের কথা। সদ্য জাগ্রত আর্থিক উন্নতির হাওয়ায় পাল খাটিয়ে ব্যবসার নৌকো মসৃণ চলেছিল। শুধু সাময়িক অলীক আর্থিক উন্নতির কথা ভেবে অনেকে নিশ্চিন্ত হয়েছিল। কিন্তু অন্যদিকে আরও বড় ঘটনার মেঘ জমেছিল আকাশে। সাধারণ মানুষ এইসব দেখতে পাননি।

কংগ্রেস নেতাদের গ্রেপ্তার করবার পর আগা খাঁ প্যালেসের বন্দিশালায় কস্তুরবা গান্ধীর মৃত্যু হল। ইংরেজ সরকার আবার তৎপর হয়ে উঠলেন। এদিকে যুদ্ধ আরও গম্ভীর পর্যায়ে প্রবেশ করল। মুসলিম লিগ ও জিন্নার চাপ সরকারের ওপর অনেক বেড়ে গেল। জিন্না বুঝতে পেরেছিলেন এই হল তাঁর সুযোগ। যত দূর সম্ভব চাপ দিয়ে আদায় করতে হবে। জিন্না ডাইরেক্ট অ্যাকশন ডে ঘোষণা করলেন ১৬ আগস্ট, ১৯৪৬ সাল।

সময়টা অদ্ভুত ছিল। একদিকে তখনও নতুন ব্যবসার নৌকো মসৃণ জলের উপর দ্রুত দৌড়চ্ছে। কংগ্রেস কর্তারা কেউ বাইরে নেই।

১৬ আগস্ট এসে গেল। কলকাতায় অমন রক্তাক্ত দিন আর আসেনি। হিন্দুরা যে ভয় পেয়েছিল সন্দেহ নেই। বেলা যত বাড়তে লাগল তত দাঙ্গার

খবরাখবর দিগ্‌বিদিক ছড়াতে লাগল। হিন্দুরা ধীরে ধীরে হলেও কঠিন প্রতিজ্ঞায় দাঁড়িয়ে উঠল। কলকাতায় সব পাড়ারই আশপাশে বিস্তৃত ধর্মীয় বসতি। তাই খুন জখম বাড়া সহজ— তাই হতে লাগল। কখনও মনে হয় অনেক বাড়ানো খবর শুনছি। কখনও ভয় হয় যে আসল খবরটা আরও অনেক খারাপ। পাড়ায় পাড়ায় স্বেচ্ছাসেবক দল হয়ে গেল। ওরাই পাড়ার মোড় রক্ষা করবে। হিন্দুদের প্রস্তুতি কম, জোগাড় করতে সময় লাগবে। সন্ধেবেলা শহরটা থমথমে নীরব হয়ে গেল। থেকে থেকে সমবেত কণ্ঠে চিৎকার উঠছে, 'আল্লাহো আকবর'। সে আওয়াজ থামতে না থামতে আর এক পাশ থেকে 'বন্দেমাতরম'। অস্ত্রশস্ত্র নয়, আওয়াজের জোরেই ভরসা করতে হত।

চারদিন, বলা যেতে পারে, কলকাতা বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। সমস্ত দোকানপাট বন্ধ। কেউ কোথাও যাচ্ছে না, পথে লোক চলাচল নেই। গাড়ি ঘোড়া চলছে না। সর্বত্র আতঙ্কের চিহ্ন।

বাড়িতে বাড়িতে আলুভাতে বা ডালভাতে ভাত খাওয়ার ধুম পড়ে গেল। চারদিন পরে পুলিশের স্পেশাল ফোর্স এসে দাঙ্গাটা থামিয়ে দিল। এইবারে আমরা পথে বেরোলাম, দেখি মিশ্র বসতির মোড়ে মোড়ে পাঁচ-দশটি মৃতদেহ ফুলে ডবল মাপের হয়ে দুর্গন্ধে জায়গাটাকে ব্যাপ্ত করে দিয়ে পড়ে আছে। কোথাও দাঁড়ানো যায় না।

সেই শহর একদিন পরিষ্কার হল।

ইংরেজ সরকার তখন ভারতবর্ষ ছেড়ে চলে যাওয়া স্থির করে ফেলেছে। শুধু ভারতে অধিবাসী কয়েক লক্ষ ইংরেজ নাগরিকদের কথা, তাদের স্বার্থের কথা মনে রাখতে হবে। তাই তারাও ভারত ত্যাগের পক্ষে নয়। একদিকে জিন্নার জেদ, অন্যদিকে কংগ্রেসের দুর্বলতা, ইংরেজ সরকার কী করবে মনস্থির করতে পারছে না। আলোচনার জন্য বিলেত থেকে স্যার স্ট্যাফোর্ড ক্রিপস-এর নেতৃত্বে একটি ছোট দল পাঠানো হল। সময়টা— ১৯৪৭। ভারতবর্ষের স্বাধীনতা যে এই অবস্থায় এসে পড়বে সেটা অনুমান করা যায়নি। ভাবাও যায়নি যে দেশ ভাগ হচ্ছেই, এবং তার অসম্ভব দাম দিতে হবে দেশবাসীকে।

তাই যখন কংগ্রেসের সঙ্গে আলোচনার পর দেশ বিভাগের স্বীকৃতি নিয়ে ভারতের স্বাধীনতার দিন ঘোষণা করল ইংরেজরা মানুষ এত আশ্চর্য হয়ে গিয়েছিল।

সবে কলকাতা এবং সারা বাংলা রক্তস্নান করে উঠেছে। তারপরেই সামনে অভ্রান্ত সূর্যোদয়।

পাকিস্তানে স্বাধীনতা ঘোষণা হয়ে গেল একদিন আগে— ১৪ আগস্ট। ১৪ই সারাদিন ধরে কলকাতায় মহা ধুমধাম। গান্ধীজি আছেন। তিনি ১৪ই রাত্রে কলকাতায় উপস্থিত থাকলেন। শহরটা যেন হঠাৎ পাগল হয়ে গেল। কী করে এমন হয়. একটা আতঙ্কগ্রস্ত শহর হঠাৎ উল্লাসে জেগে উঠল।

বিদেশি যাঁরা কলকাতায় ছিলেন সেই দিনে তাঁরা চোখে দেখেও কলকাতার চেহারা বিশ্বাস করতে পারলেন না। মধ্যরাত্রে নেহরু'র বিখ্যাত উদাত্ত ঘোষণায় ভারতবর্ষ স্বাধীন হয়ে গেল। দেড়শো বছরের অধিক ইংরেজ শাসন থেকে মুক্তি।

ভারতবর্ষে চূড়ান্ত সুখের সময় আমার নিজের ব্যবসায় ধস নামতে শুরু

করেছে। ডাইরেক্ট অ্যাকশনের প্রস্তুতির সময় থেকে শেয়ার বাজারে মন্দা চলেছে। ক্রমাগত শেয়ারের দাম পড়ে যাচ্ছে। পনেরো দিন আগে সকালবেলায় শেয়ার কিনে বিকেলে বেশি দামে বেচে দিয়ে লাভ করা যেত। এখন তার বিপরীত। সব জিনিসেরই দাম নির্বিবাদে পড়ে যাচ্ছে। কাগজে কলমে আমার লক্ষাধিক টাকা লাভ হয়েছিল। সে-সব কখন মুছে গিয়েছে। এখন কাঁধের ওপর লোকসানের দায়। শেয়ার বাজারে মক্কেলরা কেউ আসে না। কেনাবেচার কাজ হয় না বললেই চলে। বড় মেলার পর খোলা মাঠে সবশেষে যেমন পড়ে থাকে ক্লান্ত নিশ্বাস, তেমনি। যে মক্কেলের কাছে টাকা পাব তাদের খুঁজে পাওয়া কঠিন। টাকা যে তারা দিতে পারবে না, সামর্থ্যের অধিক লাভ লোকসানের কাজ করেছে। সেটা এতই স্পষ্ট, তবু, তা সব জেনেশুনে আমরা প্রশ্রয় দিয়েছি।

বুঝতে পারলাম শেয়ার বাজারের ভবিষ্যৎ শেষ হয়ে গিয়েছে। বড় দশ-বারোটা কোম্পানি তাদের প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবসার জোরে টিকে যেতে পারে। বাকিদের ভবিষ্যৎ অন্ধকার।

সময় যখন ভাল ছিল তখন ব্যবসার নৌকোর পালে হাওয়া দিয়েছিল। তখন একটা ভাল কাজ করেছিলাম। একটা ছোট ছাপাখানা করেছিলাম। যুদ্ধের সময় অনেক কড়াকড়ি আইন হয়েছিল। প্রয়োজনীয় জিনিসের অভাব। সরবরাহের নল সরু এবং বাঁকা। অভাব এবং কল্পিত অভাবের মোকাবিলার জন্য তৈরি আইনকানুন বড় কঠিন ছিল।

ছাপাখানা করতে গেলে সরকারের অনুমতি নিতে হয়। পেপার কন্ট্রোলারের ক্লিয়ারেন্স চাই। তিনি ছাপার কাগজ কেনবার অনুমতি দিলে তবেই ছাপাখানার কাজ শুরু করা যাবে। এইসব নিয়ম, আইন, অনুমতি সবই আমার অভিজ্ঞতা এবং দিনগত কাজের বাইরে।

খবরগুলো পেতেই অনেকদিন সময় লাগল। পেপার কন্ট্রোলারের নাম আর্নট— একজন ইংরেজ। একদিন বিকেলে তার বাড়িটা দেখতে গেলাম। শুনলাম আর্নট ভেট না পেলে কোনও কাজ করবে না। সুতরাং আগে ভেটের বন্দোবস্ত করতে হবে। বিজ্ঞজনেরা পরামর্শ দিলেন যে সাহেব মানুষকে এক বোতল মদ উপহার দিলে যথোপযুক্ত ভেট হবে।

আমি তখন শেয়ার বাজারে সেদিন পর্যন্ত সফল দালাল। একুশ বছর বয়েসে আমার নিজের টাকা লক্ষাধিক। দু'-একটা বড় ভোজনশালায় লাঞ্চ

ডিনারও করেছি। কিন্তু মদের গ্লাস ছোঁয়ার স্পর্ধা হয়নি। আর্নটসাহেব কী মদ খাবেন, কোন মদ ভালবাসেন জানবার উপায় নেই। পাঁচজনের সমবেত বুদ্ধিতে চৌরঙ্গির ইটালিয়ান স্টোরে এক বোতল হুইস্কি কিনে ফেলা গেল। দোকানদার জানতে চেয়েছিল কোন ব্র্যান্ডের হুইস্কি চাই। বলেছিলাম যেটা ভাল হবে। এর বেশি আর কিছু বলতে পারিনি।

সেদিন সন্ধ্যায় আলিপুরে একটা ছোট থলিতে মদের বোতলটি ঝুলিয়ে একটা খামে আমাদের ছাপার কাগজের জন্য কাগজের দরখাস্ত হাতে নিয়ে সাহেবের বাড়ি গেছলাম। আমি আর আমার বন্ধু মতিলাল পাল।

দেশের শেয়ার বাজার সক্রিয় না থাকলে আর্থিক বা অর্থনৈতিক অবস্থার কথা বুঝতে পারা যায় না। তাই বলা হয় সক্রিয় শেয়ার বাজার অর্থনীতির প্রতিষ্ঠা ও প্রতিপালনের সাহায্য করে।

আমি যখন শেয়ার বাজারে যোগ দিয়েছিলাম তখন এ-সব কথা আদৌ মনে হয়নি। আশা করে এসেছিলাম এবং দেশে বিশ্বাস দৃঢ় হয়েছিল যে বুদ্ধিমান মানুষদের পক্ষে শেয়ার বাজার থেকে অর্থলাভ করা খুব কঠিন কাজ নয়। সেই সময় শেয়ার বাজার অত্যন্ত সক্রিয় ছিল। বিভিন্ন শেয়ারের দাম কখনও দ্রুত, কখনও অকস্মাৎ ওঠানামা করেছে। বুদ্ধিমান ব্যক্তি আজ কোনও শেয়ার কিনে দু'-একদিন বা দু'-চার ঘণ্টা পরে দাম সামান্য বাড়লে বেচে দিয়ে লাভটা ঘরে তুলতে পারত। আমরাও তাই করেছিলাম। বাজারের হালচাল, চিৎকার চেঁচামিচি দেখলে ও শুনলে আন্দাজ পাওয়া যায় কোন কোন শেয়ার সেই মুহূর্তে চাহিদার তালিকায় উঁচুতে। কেন তারা উঁচুতে গেছে, কেন তাদের নিয়ে এত সাড়াশব্দ সেটা জানবার উপায় নেই। অন্তত আমার ছিল না। আমার মতো আরও পাঁচ-সাতশো শেয়ারের দালালেরও তেমন বুদ্ধি ছিল না। আমরা সমাজে বা অর্থনীতিতে কী মূল্যবান সাহায্য করি তখন বুঝতেও পারিনি, এখনও বুঝি না।

এ-কথা অবশ্যই ঠিক যে যখন কোনও শেয়ারের চাহিদা বাড়ে তখন নিশ্চয় তার গভীর এবং গোপন কোনও কারণ থাকে। আমরা কারণের দিকে যাই না। লক্ষণ দেখে আমরা লাভের ব্যবসা করি। তার মানে এই নয় যে সবাই আমাদের মতো। আজও এদের মধ্যে এমন মানুষও থাকবে যে হয়তো জানে যে সরকার অ্যালুমিনিয়াম আমদানির ওপর শুল্ক বাড়িয়ে দেবার কথা ভাবছে।

যে ঘটনা ঘটলে দেশের অ্যালুমিনিয়াম কোম্পানিগুলির লাভ বাড়বে এ অনুমান কোনও কঠিন বিচারবুদ্ধির নয়। এ ধরনের আরও পাঁচ রকম কারণের ওপর শেয়ারের দাম ওঠানামা করে। আমরা তার থেকে লাভের কড়ি বাড়িতে তুলি। নইলে আমরা এঁটো পাতার সমান। উলটো হাওয়ায় এদিক ওদিক উড়ে ছড়িয়ে যাই।

আমার কোম্পানিতে আমরা যে ক'জন ছিলাম তার মধ্যে ভিক্টর কাপুর কিছু খোঁজখবর রাখত অথবা তার খবর পাওয়ার সূত্র ছিল। আর একজন ছিল সোওয়াই রাম। অকিঞ্চিৎকর অশিক্ষিত এক মারোয়াড়ি, কিছু খোঁজখবর পেত অন্য সূত্রে। সে সারাদিন বড়লোকদের, ধনীদের বাড়িতে, গদিতে ঘোরাফেরা করত। খবরের যে ছিটেফোঁটা পাওয়া যায় তার উচ্ছিষ্ট সংগ্রহ করে। সে এবং তার দু'-একজন মক্কেল সেই খবর থেকে কিছু লাভ তোলার চেষ্টাও করে।

সোওয়াই রামের অফিসে আসবার কোনও নির্দিষ্ট সময় ছিল না। হঠাৎ অফিসে এসে ঢুকল, দু'-চারটে টেলিফোন করল, ফিসফিসিয়ে কথা বলে দ্রুত নীচে নেমে গেল।

সেদিন ওইরকম সোওয়াই রাম টেবিলে বসে ঝিমুচ্ছিল। ফোন আসতে কী সব উত্তেজিত কথাবার্তা বলল টেলিফোনে কারও সঙ্গে। "দু'-হাজার আভি লিজিয়ে।" বলেই টেলিফোন নামিয়ে রেখে দৌড়ে নীচে নেমে গেল। সে যাবার পর আবার টেলিফোন বাজল। ওপারের ভদ্রলোক বললেন, সোওয়াই রাম গেলেন কোথায়। ও তো আমার কথা বুঝতেই পারেনি। আমি ওকে শেয়ার বেচতে বলেছিলাম।

কথা বলতে বলতে সোওয়াই রাম ঘরে ঢুকল।

তাকে টেলিফোন ধরিয়ে দিতে সে বারতা পেয়ে গেল যে তার শেয়ার বেচবার কথা, কেনবার কথা নয়। সোওয়াই রাম টেলিফোন রেখে দিয়ে কপাল চাপড়াতে চাপড়াতে আবার নীচে নামল। পড়ন্ত বাজারে এতক্ষণে শেয়ারটার দাম আরও কিছুটা হয়তো পড়ে গিয়েছিল। সে এখন শেয়ারগুলো কম দামে বেচে দিয়ে ক্ষতিটা সীমাবদ্ধ করতে লাগল।

সেদিন কত ক্ষতি হয়েছিল সোওয়াই রামের বা আদৌ হয়েছিল কি না এগুলো প্রয়োজনীয় তথ্য নয়, তথ্য হল এই যে সোওয়াই রামও একজন স্বীকৃত অর্থনৈতিক কর্মী যার কাজে কর্মে নাকি সমাজের অর্থনৈতিক ভিত্তি পুষ্ট হচ্ছে।

বেশিদিন এ-সব নিয়ে আমাকে ভাবতে হয়নি। শেয়ার বাজার যেমন বাড়ছিল প্রায় বিনা কারণে আবার হঠাৎ পড়তে শুরু করল। আসলে ভয়টা প্রকৃত। সামনে আসন্ন ডাইরেক্ট অকশন ডে, বাজারে সেই যে ভাঙন ধরল তা শোধরাতে কুড়ি-ত্রিশ বছর লেগেছিল। ততদিনে আমাকে আবার শেয়ার বাজার ছেড়ে অন্য কোথাও যেতে হয়েছিল।

আধুনিক ভারতবর্ষের ইতিহাসে চল্লিশের দশকের মতো এমন ঘটনাবহুল সময় আর আসেনি। এই দশকে ভারতবর্ষের ভবিষ্যৎ নির্ধারিত হতে চলেছে। দীর্ঘকাল টালবাহানার পর ১৯৪২-এর আগস্ট মাসে কংগ্রেস ঘোষণা করল যে ইংরেজ সরকারের ভারতবর্ষে আর স্থান নেই। 'কুইট ইন্ডিয়া'। ইংরেজ চলে যাবার পর কী হবে ভারতবর্ষের সে-কথা ইংরেজদের ভাবতে হবে না। ভারতীয়রা নিজেদের ভবিষ্যৎ স্থির করে নেবে। ইংরেজ সরকারের প্রতিক্রিয়া প্রত্যাশিত ছিল। তারা প্রধান ভারতীয় নেতাদের গ্রেপ্তার করে আগা খাঁ প্যালেসে বন্দি করে রাখল। কংগ্রেস নিষিদ্ধ দল হিসেবে ঘোষিত হল। মনে হয়েছিল সর্বপ্রকার আলোচনার পথ রুদ্ধ হয়ে গিয়েছিল।

ব্রিটিশ সরকারের মীমাংসার জন্য স্যার স্ট্যাফোর্ড ক্রিপস-এর নেতৃত্বে একটি দল পাঠালেন। তাঁরা এসে পৌঁছন ১৯৪২ সালে। ক্রিপস-এর প্রস্তাব কংগ্রেস ও মুসলিম লিগ উভয়েই প্রত্যাখ্যান করে। কংগ্রেস পরে ক্রিপসদের প্রস্তাব অংশত গ্রহণ করতে রাজি হয়েছিল। ব্রিটেন থেকে আরও ক্ষমতাসম্পন্ন "ক্যাবিনেট মিশন" আলোচনার জন্য ভারতবর্ষে এসে পৌঁছল আগস্ট ১৯৪৬ সালে। তারা প্রস্তাব দিল অন্তর্বর্তী সরকার গঠন করে মীমাংসার শুরু করা যাক। কংগ্রেস অতি সহজেই এই প্রস্তাব গ্রহণ করেছিল। মনে হয়েছিল দেশের মন্ত্রী ইত্যাদি হবার জন্যে বৃদ্ধ কংগ্রেস নেতাদের আর তর সইছিল না। মুসলিম লিগ এই সরকারে যোগ দিতে চাইছিল না। বরং ঘোষণা করল যে ১৬ আগস্ট ১৯৪৬ ডাইরেক্ট অ্যাকশন হবে। কোথাও বলে দেওয়া হয়নি ডাইরেক্ট অ্যাকশনে কী করা হবে। কেউ জানল না কী হবে। তিনদিনের দাঙ্গায় কলকাতায় মারণ যজ্ঞে পাঁচ হাজার নিরীহ মানুষের বলিদান হল।

ইতিমধ্যে কারাগারে বন্দি অবস্থায় কস্তুরবার মৃত্যু হয়েছে।

গান্ধীজি হিন্দু-মুসলমান মৈত্রী ফিরিয়ে আনার জন্য পুব বাংলার দুর্গম গ্রামে ভয়হীন পদযাত্রা শুরু করেছিলেন। যে রাত্রে ভারতবর্ষ স্বাধীন হয় সেদিন

গান্ধীজি কলকাতায়। তিনি দিল্লি যেতে রাজি হননি! মধ্যরাত্রের শেষে ঘণ্টার ধ্বনির মধ্যে নেহরু তাঁর বিখ্যাত বক্তৃতা করে ভারতবর্ষের স্বাধীনতার সন্ধিক্ষণে যুগপুরুষ হয়ে দাঁড়ালেন।

সেদিন সকাল থেকে কলকাতার অবস্থা ছিল বর্ণনার অতীত। এত মানুষ একসঙ্গে এমন উদ্দাম আনন্দের শরিক হতে পারে কেউ আগে দেখেনি। পরেও দেখবে না। যে যাকে সামনে দেখছে সে তার বন্ধু, সে তার আত্মীয়, তাকে বুকে জড়িয়ে ধরছে। আর স্বাধীনতার এই পরমক্ষণে দিনটি ভালবাসায় চিহ্নিত হয়ে থাকল। অনেক বিদেশি সাংবাদিক তাঁদের লেখায় এই ঘটনার অল্পবিস্তর বর্ণনা করেছেন। মনে হয় না কেউ সেই মুহূর্তের উদ্দাম উল্লাসকে রচনায় বন্দি করতে পেরেছেন।

রাতটা একটা ঘোরের মধ্যে কাটল। এটা কি স্বপ্ন না মায়া না আর কিছু। পরের দিন সকাল থেকে স্বাধীন সরকারের কাজ শুরু হয়ে গেল।

বুঝতে পারছিলাম শেয়ার বাজারে সুদিন শেষ হয়েছে। রেজিস্টার্ড ব্রোকার হিসেবে লেগে থাকলে দু'-দশজন মক্কেল জোগাড় করতে পারলে সংসার নির্বাহ করার মতন তিন-চারশো টাকার জোগাড় হতে পারে কিন্তু তার বেশি হবে না। রাতারাতি ধন সঞ্চয়ের সুযোগ চিরকালের মতো সমাধিস্থ হয়েছে।

শেয়ার বাজার যখন খুব ভাল চলছে তখন রোজ জমার খাতায় বড় অঙ্কটা গিয়ে পড়ত। সেই সময় আমার একটু পুরনো ইচ্ছাপূরণ করবার চেষ্টা করেছিলাম।

শৈশব থেকে ছাপাখানার ওপর আমার মোহ ছিল। আমার মামার বাড়ির সামনের বাড়ির একটা অন্ধকার ঘরে একটা ছোট ছাপাখানা ছিল। আমি মামাবাড়ি এলে ওই ছাপাখানার দিকে চেয়ে চেয়ে সারা দুপুর কাটিয়ে দিতাম। ছায়াচ্ছন্ন ঘরের ভিতর দু'জন কালো কালো সিসের টাইপ হাতে নিয়ে হয় সাজাচ্ছে, নয়তো খুলে ফেলছে। মন্থর সেই কাজ একটার পর একটা অক্ষর সংযোজন করে শেষ অবধি একটা পাতা তৈরি হত। আমি মন্ত্রমুগ্ধের মতো তাকিয়ে দেখেছি। এখন শেয়ার মার্কেট থেকে কিছু অর্থ সংগ্রহ হবার পর মনে মনে একটা ছাপাখানা বসিয়ে ফেলার পরিকল্পনা করি। কাছেই সিমলা স্ট্রিটের একটা নতুন বাড়ির একতলা ভাড়া করে ছাপাখানা বসানো গেল। কাগজের পারমিট না পেলে ছাপাখানা চালানো যায় না। সেই পারমিট আর্নট সাহেবের কাছ থেকে কী করে পেয়েছিলাম আগেই বলেছি। যে মদের বোতল নিয়ে

গিয়েছিলাম সাহেবের জন্য সেটা সে আদৌ পেল কি না তা জানতে পারিনি।

শুধু পারমিটটা এসে গিয়েছিল। এখানে আমার নিজস্ব ছাপাখানা— নিজস্ব বলা ঠিক নয়। আমার দু'জন পার্টনার ছিল। এক পার্টনার অল্পকালের মধ্যেই অংশ ছেড়ে দিয়ে হিসেবপত্র মিটিয়ে চলে গিয়েছিল। অন্যজন মতিলাল। সুখে-দুঃখে আমার সঙ্গে বহু সময় কাটিয়েছে। এমন উদার বন্ধুবৎসল সদয় মানুষ আমি আর দেখিনি।

যে ব্যবসার থেকে তার এই বমরমা অর্থাৎ লোহার কারবার সেটা আদৌ তার পছন্দ নয়। তার ওপর সেখানে তার শ্বশুরের, যিনি লোহার বাজারে একজন অন্যতম প্রধান কারবারি ছিলেন, তাঁর কথামতো চলতে হয় এটা মতির ঘোর অপছন্দ ছিল।

যাই হোক, কাঠের টাইপ কেস, গ্যালি, গ্যালি স্ট্যান্ড ইত্যাদি নানা সরঞ্জাম ক্রমশ জড়ো হয়ে প্রেসটা চেহারা পেতে লাগল। ছাপবার যন্ত্র কিনতে গিয়ে দেখা গেল পুরনো যন্ত্রেরও অনেক দাম। ইতিমধ্যে শেয়ার বাজারকে মন্দা গ্রাস করেছে। তাই শেষ পর্যন্ত তিনটে ছোট "হাফ ক্রাউন" ছাপার মেশিন কেনা হল।

সিমলা স্ট্রিটের ছাপাখানায় একটা নতুন বসবার জায়গা হল। সারাদিন শেয়ার মার্কেটে মাছি তাড়াতে ভাল লাগে না। কোথাও এমন কোনও উত্তেজক ঘটনা ঘটছে না। কোনও শেয়ারের দাম এখন উঠছে বা নামছে না যেখানে দাঁত ফুটিয়ে কুড়ি-পঞ্চাশ টাকা লাভ লোকসান করা যায়। দু' মাস আগে যে পাড়াটা মানুষের আনাগোনায় গমগম করত সেখানে সবাই ব্যস্ত হয়ে দৌড়চ্ছে বা হাঁক দিচ্ছে, এখন সেই জায়গাটা হঠাৎ ভাঙা গির্জার কমপাউন্ডের মতন ঠান্ডা হয়ে গেছে।

কাজেই দুপুরের পরের সময় ছাপাখানায় বসে কাটাই। এতদিন শেয়ার বাজারের চাঞ্চল্যের উত্তেজনায় সম্পূর্ণ মগ্ন হয়ে গিয়েছিলাম। যার ফলে পুরনো বন্ধুবান্ধব কারুর সঙ্গে যোগাযোগ করার উৎসাহ বা সুযোগ হয়নি। এখন তাদের কথা মনে পড়তে লাগল।

ছোট ছাপাখানায় মক্কেল নেই বললেই চলে। তখনও কেউ আমাদের নাম জানে না। কাজ আসে অতি সামান্য। জনা দশেক কমপোজিটার আর দুটো বা তিনটে ছাপার যন্ত্র চালু থাকলেই আমরা খুশি।

দুপুর গড়িয়ে গিয়ে বিকেল আসে। কলকাতায় বিকেলের একটা বিশিষ্ট রূপ আছে। মানুষ যেন এতক্ষণ রুপোর কাঠির ইন্দ্রজালে ঘুমোচ্ছিল। চারদিকে সবাই জেগে উঠল। চায়ের দোকানগুলো খুলে গেল— কোথাও তেলেভাজা বা চপ-কাটলেট ভাজা শুরু হল। ইতিমধ্যে দু'-একজন বন্ধুবান্ধব আসতে শুরু করেছে। কিছু জলপানের সঙ্গে মনোরম আড্ডাও চলতে লাগল।

যা হয়। অলস মস্তিষ্কে বহু ভাবনার বীজ জেগে ওঠে। মনে হল একটা বাংলা মাসিক পত্রিকা বের করতে পারলে ভাল হয়, কিংবা বাংলা বইও ছাপা শুরু করা যেতে পারে। এই ভাবেই একদিন 'কালান্তর' মাসিক পত্রিকা শুরু হল। পরিণত ফল নয়, অল্পবয়সি অনভিজ্ঞের কাঁচা হাতের কাজের অধিক আর কিছু হল না।

মাসিক পত্রিকা ছাপালেই তো হয় না। কী করে কাগজ বিক্রি করতে হয় কিছুই আমাদের জানা নেই। কোথায় এজেন্ট, কাকে পাঠাব, এ-সব কার কাছ থেকে জানব। বিনা প্রস্তুতি ছাড়া শুধু বালসুলভ উৎসাহের ফল 'কালান্তর' প্রকাশ হল। বড় কাগজের অপিসে প্রথম সংখ্যার কপি পাঠানো হল আলোচনার অনুরোধ সহ। আশ্চর্য এই যে তাতেও অনেক ফল হল। সকলেই সাধারণভাবে নতুন কাগজটাকে অভ্যর্থনা করল। এমনই আশ্চর্য, ইংরেজি স্টেটসম্যানও।

জেলা শহর থেকে এজেন্ট হওয়ার আবেদন— এ তো স্বাভাবিক ছিল। কালান্তর পাঁচ বছর চলেছিল। চলেছিল মানে চালানো হয়েছিল। তিন-চারজন নিয়মিত বিজ্ঞাপনদাতাও ছিলেন, তার যদিও সব টাকা আদায় হত না তা হলেও বিক্রি হাজারে পৌঁছেছিল। কালান্তরের প্রকাশ শুরু হবার ফলে আমাদের সন্ধ্যাগুলো আবার জেগে উঠল। লেখা নিয়ে উচ্চাকাঙ্ক্ষী মানুষ আসে। কিছু লেখা বেরিয়েছে এমন লেখকও কেউ কেউ আসে। আমরা যোগাযোগ করি বড় লেখকের সঙ্গে। লেখা এনে ছাপার বন্দোবস্ত করি। শিবরাম চক্রবর্তী আমাদের কাছাকাছি ঠনঠনে কালীতলায় থাকতেন। তিনি মাঝে মাঝে বিকেলে আসতেন। সন্ধ্যাগুলো রঙিন হয়ে উঠত। রসিক মানুষ— তাঁর উপস্থিতিই যে-কোনও আড্ডাকে প্রাণবন্ত করে তুলত।

ঠিক খেয়াল করতে পারি না নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তীর সঙ্গে কোথায় প্রথম পরিচয় হল। কালান্তরে তাঁর কবিতা ছেপেছিলাম বলে, নাকি পরে দৈনিক কাগজ 'ভারত'-এর ভার নেবার পর তাঁর সঙ্গে পরিচয় হল। যখনই হোক

ঘটনাটা একই সময়ের। গৌরকিশোর ঘোষের সঙ্গেও পরিচয় ওই সময়েই।

আমার বন্ধু সমরেন রায় 'অরণি' কাগজটা সত্যেন্দ্রনাথ মজুমদারের কাছ থেকে কিনে নিয়েছিলেন। সমরেনের ছাপাখানায় গৌর থাকত। প্রুফ দেখত, আরও পাঁচটা অন্যান্য কাজ করত। তারমধ্যে একটা কাজ ছিল সমরেনের প্রশ্রয়ে এবং উৎসাহে 'গজমূর্খের ডায়েরি' নামে একটি রসালো কলমের।

নীরেন এবং গৌরের সঙ্গে সেই বন্ধুত্বের সূচনা। গৌর জীবিত থাকলে ভালবাসা আজও অক্ষত থাকত।

একই সময় আর একটি ছেলে কালান্তরের অফিসে এসে পৌঁছল। তার পরিবার দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় বর্মা থেকে পালিয়ে এসেছে। কলকাতায় আন্তর্জাতিক সম্পর্ক পড়বার জন্য স্নাতকোত্তর ক্লাসে ভর্তি হয়েছে। কখনও বাংলায় লেখাপড়া করেনি। তার নাম বারীন্দ্রনাথ দাস।

যুদ্ধের সময় নতুন কোনও পত্র-পত্রিকা প্রকাশের ওপর বিধিনিষেধ ছিল। এখন সে কড়াকড়ি কমে যাবার পর দু'-একটা নতুন কাগজ বেরোতে আরম্ভ করেছে। আজকের অভিজ্ঞতায় বলতে অসুবিধা নেই যে, সে-সবই অধিকাংশ অপটু উচ্চাকাঙ্ক্ষা ছিল। বিষয় সম্বন্ধে জ্ঞানগম্মি নেই, একটা কাগজ চালাবার মতন আর্থিক বলও নেই। এমনকী এটাও জানা নেই যে একটা কাগজ কতদিন কীভাবে লোকসান বহন করে প্রকাশিত হতে পারবে। ছোট বড় দু'-একটা কাগজ বেরোল, একটি দুটি ছাড়া তাদের বছর পার হল না।

এই সময় কলকাতা থেকে একটি বাংলা ও একটি ইংরেজি দৈনিক প্রকাশিত হচ্ছিল— "ভারত" এবং "ইস্টার্ন এক্সপ্রেস"। ভারত কাগজের নামের ওপর সম্পূর্ণ স্বত্ব মাখনলাল সেনের। তিনি আনন্দবাজার পত্রিকার একদা জেনারেল ম্যানেজার ছিলেন। মতবিরোধের জন্য চাকরি ছাড়তে হয়েছে। বাজারে তাঁর এমনই দাপট যে সাধারণ মানুষ বিশ্বাস করে যে আনন্দবাজার পত্রিকা তিনিই গড়েছেন।

মাখনলাল সেনের কাগজ চালাবার বুদ্ধি ও অভিজ্ঞতা ছিল কিন্তু অর্থ নেই। এই সময় তাঁর সঙ্গে যোগাযোগ হল রামনাথ গোয়েঙ্কার। ভারতের সংবাদপত্র জগতে এই কালাপাহাড় প্রকাশক দক্ষিণে খবরের কাগজ চালান। সম্প্রতি বোম্বাইতেও এসেছেন। এবারে পূর্বাঞ্চলে তিনি মাখনলাল সেনের সঙ্গে যোগ দিলেন।

রাজযোটক না হোক জুটিটা কিন্তু যুক্তিগ্রাহ্য ও কার্যকর ছিল। ধোপে টিকল না যদিও। তার কারণ রামনাথ গোয়েঙ্কা ও মাখনলাল সেন উভয়েই অনম্র ব্যক্তিত্ব। যখন দু'জনে আর বনছে না, লোকসানের অঙ্ক বেড়ে যাচ্ছে, তখন রামনাথ টাকা পাঠান না। কাগজগুলো অক্সিজেনের অভাবে রুগির মতো মৃত্যু পথে এগোয়। এই সময়ে এই দৃশ্যে আর একজন মারোয়াড়ি এলেন। তিনি রামকৃষ্ণ ডালমিয়া। সংবাদপত্র জগতে তাঁর আবির্ভাবই বলি বা অনুপ্রবেশ বলি— তিনি অতি গুরুত্বপূর্ণ ব্যবসায়ী।

বোম্বের বিখ্যাত টাইমস অফ ইন্ডিয়া গ্রুপ সম্পূর্ণ সাহেবদের মালিকানায় ছিল বিগত একশো বছর ধরে। ভারতবর্ষের সব থেকে সফল সংবাদপত্র, সবার চেয়ে বড়। ইংরেজ মালিকরা যখন বুঝতে পারলেন যে ভারতবর্ষে আর থাকা যাবে না তখন তাঁরা কোম্পানিটি বিক্রি করে দিয়ে চলে যাবার আয়োজন করলেন। রামকৃষ্ণ ডালমিয়ার কাছে তখন অনেক নগদ টাকা। তিনি টাইমস অফ ইন্ডিয়ার নিরঙ্কুশ মালিক হলেন। হবার পরেই সাম্রাজ্য বিস্তার শুরু করেছিলেন। দিল্লিতে টাইমসের অফিস হল। প্রথমে অন্য একটা নামে কাগজ বের করেছিলেন। পরে টাইমস অফ ইন্ডিয়া নাম হল। সামান্য বিক্রি। কারণ দিল্লির প্রধান কাগজ ছিল 'হিন্দুস্তান টাইমস।'

ডালমিয়াজিকে তখন সাম্রাজ্য বিস্তারের প্রবল ইচ্ছা পেয়ে বসেছে। কলকাতায় রামনাথ গোয়েঙ্কা সে সুযোগ এনে দিলেন।

পৃথিবীতে যোগাযোগ জিনিসটা বড় আশ্চর্য। কেমন করে যথার্থ সময়ে কার সঙ্গে কার যোগাযোগ হয়, সে ব্রাহ্ম মুহূর্ত কখন— আগে জানবার উপায় নেই। ঠিক এই সময়েই শেয়ার বাজার চলছে না। আমি কার্যত বেকার। একটা বালখিল্য ছাপাখানা নিয়ে অল্প জলে সাঁতার কাটছি।

এই প্রথম টাকাওয়ালা প্রতিষ্ঠান খবরের কাগজে এলেন। আমার ক্ষেত্রে এই যোগাযোগ মস্ত বড় প্রমাণিত হয়েছে। সেই মুহূর্তে আমার একটা চাকরির দরকার। আমি স্পষ্ট এই প্রয়োজনটা অনুভব করিনি। বাবা হয়তো কিছুদিন ধরেই ভাবছেন। তিনি একদিন আমাকে দিল্লিতে রামকৃষ্ণ ডালমিয়ার কাছে নিয়ে গেলেন। আমার চাকরি তৎক্ষণাৎ স্থির হয়ে গেল। শেঠজির কলকাতার কাগজে আমি জেনারেল ম্যানেজার হয়ে গেলাম। খুব আশ্চর্য হয়ে গেলাম, এত সহজে এত ভাল কাজ পাওয়া যায়। বাবা ডালমিয়াদের সঙ্গে দীর্ঘদিন কাজ করেছেন। তিনি তাদের আইনগত পরামর্শদাতা ছিলেন। কর্তাদের সঙ্গে

তাঁর সম্পর্ক ছিল খুব সহজ ও স্বাভাবিক। আমি যদিও মারোয়াড়িদের বিশ্বাসপ্রবণতা দেখে যুগপৎ বিস্মিত ও আনন্দিত হয়েছিলাম। বাবা যখন বলেছেন ডালমিয়াজি ধরেই নিলেন আমি এই কাজে যোগ্য হব।

বাবার সঙ্গে দিল্লিতে শেঠজির অতিথিশালায় ছিলাম। দুপুরে একটা আটপৌরে নিরামিষ লাঞ্চ হল। অতি ফুর্তির পর এমন সাধারণ ভোজ দমিয়ে দিয়েছিল। বিকালে বাবা বললেন, আজ সন্ধ্যায় আমরা বাইরে খাব। তোমাকে একটা নতুন রেস্তোরাঁয় নিয়ে যাব। যেখানকার খাবার একেবারে নতুন জাতের।

সন্ধ্যার একটু পরে বাবার সঙ্গে সেই ভোজনশালায় চললাম। নাম 'মতিমহল'। বাবা বললেন এরা সীমান্ত প্রদেশের লোক। দেশ ভাগ হবার পর এরা চলে এসেছে এদেশে। এসেই এখানে খাবারের দোকানটা খুলেছে। দেখে অবাক হলাম কত দেশি-বিদেশি লোক খেতে এসেছে। একটা একতলা সাধারণ বাড়ির সামনে কত দেশি-বিদেশি গাড়ি জড়ো হয়েছে।

দেখে অবাক হলাম সামনের দিকে খোলা রোয়াক। সেখানে শক্তিশালী আলো জ্বালিয়ে রাখা হয়েছে। বিভিন্ন পোশাকে বিভিন্ন দেশের মানুষরা আসছেন, যাচ্ছেন। একটু পরে একটা অতি বিশ্বস্ত কর্মচারী আমাদের একটা টেবিলে বসিয়ে দিল। কোথাও কোনও শোভা বা আতিশয্য নেই। চুনকাম করা দেওয়াল, অতি সাধারণ টেবিল চেয়ার। আমরা বসার সঙ্গে সঙ্গে টেবিলের ওপর আচার ও স্যালাডের পাত্র পৌঁছে গেল। কোনও খাদ্য তালিকা নেই। বাবা বললেন তন্দুরি মুরগা আর কড়া করে ভাজা দুটো করে রুটি দাও। সম্ভবত এক পাত্র ডালও বলা হয়েছিল। একটি আস্ত মুরগা, তখনও তার গা দিয়ে ধোঁয়া বেরোচ্ছে, টেবিলে এসে পৌঁছে গেল পাঁচ-সাত মিনিটের মধ্যে। এত গরম যে হাত দেওয়া যাচ্ছে না। পরিচারক টেনে আস্ত মুরগাটাকে পাঁচ টুকরো করে দিল। ততক্ষণে একটু ঠান্ডাও হয়ে গিয়েছে। আমি সন্তর্পণে কামড় দিলাম। সঙ্গে সঙ্গে বুঝতে পারলাম অনাস্বাদিত কী অপূর্ব ভোজ্য আমার সামনে উপস্থিত হয়েছে। তন্দুরি মুরগার স্বাদই আলাদা। বিভিন্ন প্রকরণে রান্না করা যে কুক্কুটের ব্যঞ্জন এতকাল খেয়েছি আদর করে, এই পদটা তাদের সবাইকে অতিক্রম করে অন্য দিগন্তে পৌঁছে দিয়েছে। এ ঝোল নয়, ভাজা নয়, আদৌ পাক করা নয় অথচ কী অপূর্ব স্বাদ এই তন্দুরি মুরগার পদ।

এই পদটার চল ছিল সীমান্ত প্রদেশ অঞ্চলে। সেখানে মানুষের অর্থ সামর্থ্য কম। তারা মাংস ঝলসিয়ে নিয়ে খায়। তার আগে অবশ্য সেই মাংসটাকে একটু

জরিয়ে নেওয়া হয় নানা প্রকার বিভিন্ন মশলা দিয়ে। তার ফলে পরিচিত উপকরণ এমন অন্য জগতে পৌঁছে দিতে পারে সেদিন সন্ধ্যায় মতিমহলে ভোজনের আগে আমার কল্পনার অতীত ছিল। এটা স্বাভাবিক। এই পদ যারা পূর্বে গ্রহণ করেনি তারা গ্রহণ করবার পর মোহিত হয়ে যায়। আমার খালি মনে হত এই পদটির থেকে এতদিন বঞ্চিত ছিলাম কেন? অতি তৃপ্ত হৃদয়ে বাবার সঙ্গে ফিরে এলাম। এরপর যদি তিনদিন মশলাহীন পূর্ণত নিরামিষ খাবার খেতে হয় তাও সহ্য হবে।

সহ্য করতে হল না। বড় ব্যবসায়ীদের সময় কম। ধৈর্য কম। সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়ে গেছে। তাঁরা ফলাফল দেখতে চান। বলা ঠিক হয়নি— পরিকল্পিত ফল পেতে চান তাঁরা। অপেক্ষা করবে কেন? আমাকে বলা হল আমি যেন অবিলম্বে কার্যভার গ্রহণ করি।

এরপর পঞ্চাশ বছর ধরে অনেক যাতায়াত করেছি মতিমহলে। প্রবল প্রতাপের সঙ্গে চলেছিল ভোজন সাম্রাজ্য। মালিকদের একজন সবসময় প্রবেশদ্বারে দাঁড়িয়ে থাকতেন। অতিথিদের এমন অন্তরঙ্গতা ও আদরের সাথে আপ্যায়ন করতেন মনে হবে তিনি যেন সবাইকে ব্যক্তিগতভাবে চেনেন। নব্বইয়ের দশকে কেন জানি না মতিমহলের রমরমা পড়ে যায়। তার দুঃসময় শুরু হয়ে যায়। আজকের মতিমহল আর পাঁচটা ভোজনশালার মতো। অপরিচ্ছন্ন, অমনোযোগী। তা ছাড়া এখন সবাই তন্দুরি মুরগি রান্না করে। তার আবার দু'-তিন রকমফের করে। মতিমহল সেটা শুরু করে দিয়েছিল আগেই।

মহা উল্লসিত হয়ে কলকাতায় ফিরে এলাম। কাজের অজুহাতে একটা ছোট ছাপাখানায় সারাদিন বসে থাকি। সন্ধ্যায় পাঁচ-দশ জনের সঙ্গে বসে, তাদের অধিকাংশই কালান্তরে কিছু ছাপতে এসেছেন, নির্ভেজাল আড্ডা হয়। এখন থেকে দুপুরটা ভাল, বড় অফিসে বসে কেটে যাবে। তখন অবশ্য জানি না যে কাজটা কার্যত কত কঠিন হবে। ছাপার বিষয়ে আমার অভিজ্ঞতা সামান্য, খবরের কাগজের বিষয়ে শূন্য। তবুও একদিন কপালে দইয়ের ফোঁটা লাগিয়ে সারকুলার রোডের ওপর সুরি লেনে ভারতের অফিসে গিয়ে পৌঁছালাম। শুনলাম অন্যতম অংশীদার মাখন সেন বেলা করে আসেন। তিনি পৌঁছতেই তাঁর কাছে গিয়ে পরিচয় দিলাম। নিয়োগপত্র দেখানোমাত্র তিনি প্রায় নির্বিকার চিত্তে ঘটনাটা গ্রহণ করলেন। আপনাদের তো ম্যানেজারের অফিস রয়েছেই দোতালায়। আপনি ওখানে গিয়ে বসুন। আর কোনও আলোচনা নয়, আর কোনও কথাবার্তা নয়। তিনি অন্য কাজে মন দিলেন।

আমি নিজের অফিসে বসে দু'-একজন অফিসারদের ডেকে পাঠাতে লাগলাম। একজন মারোয়াড়ি অ্যাকাউন্টেন্ট ছিল। সে ডাকা মাত্র এসে গেল। বুঝতে পারতাম অন্যরা অনিচ্ছায় আসছে।

ক্রমে ভারতের পরিচালন বিষয়ে কিছু কিছু বোঝা গেল। কিন্তু আমার ভূমিকা কী হবে— তা নির্ণয় করতে পারলাম না। বুঝতে পারলাম যথেষ্ট লোকসান হচ্ছে। সম পরিমাণ টাকা উপস্থিত করা অন্যতম কাজ। সম্পাদকীয় বিভাগের দু'-একজনকে ডেকে পাঠালাম। কেউই আসতে চায় না। একজন এলেন এবং বললেন— তিনি আমাকে বলতে এসেছেন নীচের থেকে যদি কাউকে ডেকে পাঠাই সেটা অনধিকার চর্চা হবে। ভারত মাখনলাল সেনের। তিনি ভারত চালাচ্ছেন, চালাবেনও। আমার হস্তক্ষেপ বাঞ্ছনীয় নয়।

এদিকে মারোয়াড়ি অফিসে কাজ করতে গিয়ে এদের কাজের ধারা

দেখলাম। চিঠিপত্র লেখালিখি, খাতাপত্র ঠিকঠাক রাখা যেন আদৌ প্রয়োজনীয় নয়। বেশির ভাগ নির্দেশ মালিক নিজেই দেন। তার কোনও নোটও থাকে না। লেখাজোকাও থাকে না।

ডালমিয়াজি প্রত্যহ সকালে তাঁর রাজ্যের বিভিন্ন সুবেদারদের খোঁজখবর নেন। তাঁকেই বলতে হল যে মাখন সেন চান না আমি তাঁর কোনও কাজের ক্ষেত্রে পা ফেলি। ডালমিয়াজি নির্দেশ দিয়েছিলেন আগে ওঁর সঙ্গে কথা বলো, বোঝাও, না বুঝলে চিঠি দিয়ে নোটিশ দাও।

মাখনবাবু একেবারেই অনড়। তিনি আমাকে গ্রাহ্যের মধ্যেই আনলেন না। মানুষটার ব্যক্তিত্ব ছিল এবং একদল স্তাবক তাঁকে সবসময় ঘিরে রাখত। ডালমিয়াজি শেষ পর্যন্ত স্থির করলেন যে মাখনবাবুর সঙ্গে একযোগে ব্যবসা করা যাবে না। তিনি টাকা জুগিয়ে যাবেন আর মাখনবাবু অন্যদিকে লোকসান বাড়িয়ে যাবেন এটা আর সহ্য হল না। ফলে একদিন সকালবেলায় নোটিশ দিয়ে কাগজ বন্ধ করে দেওয়া হল। কর্মীরা সবাই এমন সম্ভাবনার জন্য প্রস্তুত ছিলেন না। গেট বন্ধ হবার পর তাঁরা অফিস যাতায়াত বন্ধ করে দিলেন। মাখনবাবু আর এলেন না।

কাগজের নামের ওপরে নিজের সত্ত্বাধিকার প্রমাণ করবার জন্য মাখনবাবু অন্য কোনও ছাপাখানায় পর পর দু'-চারদিন ভারত নামে ফুলস্কেপ সাইজের একটা বাংলা কাগজ বের করলেন। বুঝতে অসুবিধা হল না রেকর্ড রাখবার জন্যই এমন করা হচ্ছে।

আমি হতাশ হয়েছিলাম বইকী। গুরুত্বপূর্ণ পদ এবং মনোমতো চাকরি এমন সহসা যে আসবে আর এমন সহসা যে চলে যাবে ভাবতে পারিনি। কাগজই বন্ধ হয়ে গেল এখন আর আমার কী প্রয়োজন। এমন সময় শেঠজি আমাকে জানালেন যে কলকাতায় বাংলা, হিন্দি এবং ইংরেজি কাগজ বের করতে হবে। সুরি লেনের ওই ক্ষুদ্র অফিসে চলবে না। অফিসের ভাড়াটে আসলে কে তাও আমাদের অগোচর। সুতরাং নতুন অফিস খুঁজতে হবে।

খোঁজাখুঁজি শুরু করলাম। যে-বিষয় জানি না সে-বিষয়ে খোঁজখবর করা অতি কঠিন কাজ। এমন সময় শেঠজির ফরমান এল। কনভেন্ট রোডে যে প্রকাণ্ড কাঠের কারখানা আছে ল্যাজারাস কোম্পানির এবং যে খালি জমি আছে সেখানেই আমাদের অফিস হবে। কাঠের কারখানার সঙ্গে খবরের কাগজ কীভাবে চলবে সেটা সম্বন্ধে শেঠজি বললেন, লেজারাস কোম্পানি

তুলে দেব। শেঠজি সম্প্রতি পোদ্দারের কাছ থেকে ল্যাজারাস কোম্পানি কিনে নিয়েছেন।

আমার ওপর আদেশ হল অবিলম্বে ওখানে গিয়ে অফিস করে বসার। অফিস একটা ছোট তৈরি করা গেল। করাত চলার ঘরঘর শব্দ, হাতুড়ির ঠুকঠাক— অশিক্ষিত পটুত্বর সঙ্গে আমি অফিসের পরিকল্পনা শুরু করলাম।

কাগজ ছাপাবার জন্য একটা ছোট রোটারি মেশিন ছিল। ফ্রান্স থেকে বহু কষ্টে ভারতে আমদানি করা নানা হাত ঘুরে 'ভারত' এবং ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেস ছাপার জন্য কেনা হয়েছিল। সেই যন্ত্রটা সুরি লেন থেকে খুলে কনভেন্ট রোডের ল্যাজারাস কোম্পানিতে খাড়া করলাম। বোম্বাই থেকে একজন ইঞ্জিনিয়ার এসেছিল। সে আমাদের সঙ্গে কোনও পরামর্শ করল না। রেলের একজন অবসরপ্রাপ্ত ইঞ্জিনিয়ারকে ডেকে এই ভারটা তাঁকে দিয়ে দিল। আমরা তো হতবাক। আমরা জানি এই রোটারি মেশিন কলকাতায় একজন লোকই দেখাশোনা করতে পারে। তিনি বিমল চ্যাটার্জি। এর বিষয় আর কেউ কিছুই জানে না। এর যে বৈদ্যুতিক যন্ত্রাংশ, সে কালীবাবু ছাড়া আর কেউ হাতই দিতে পারবে না।

অনভিজ্ঞ মানুষদের এরকমই ধারণা থাকে। আমি শুধু অনভিজ্ঞই নয়, আমি সম্পূর্ণ অজ্ঞ। তাই কোনও বিশ্বাসই আমাকে আচ্ছন্ন করতে পারেনি। মাস দুয়েকের মধ্যে মেশিনটা চালুও হয়ে যায়। বিমলবাবুকে ডাকা হল না, কালীবাবুকেও নয়।

এই প্রথম ছাপার জন্য রোটারি মেশিনের সঙ্গে পরিচয় হল। ওই সময় এবং তার আগেও দৈনিক বসুমতী বলে যে খবরের কাগজটি ছিল তার ইমপ্রিন্ট লাইনে লেখা থাকত বৈদ্যুতিক রোটারি মেশিনে মুদ্রিত। তখনও এই যন্ত্রটা এতটাই অভিনব ও অপরিচিত ছিল।

কোন কাজে কর্মী কত লাগে, কোথায় কী করতে হয় কিছুই আমার জানা নেই। ইতিমধ্যে বোম্বাই থেকে পুরাতন পাঁচখানা লাইনো টাইপ মেশিন এসে গেল। তাতে কমপোজ করতে হয় না। কী বোর্ডের চাবি টিপে লাইন লাইন কমপোজ করার মেশিন। সিসা গরম হচ্ছে। প্রত্যেকবারই নতুন টাইপের সৃষ্টি হচ্ছে।

একজন অপারেটর কতখানি কমপোজ করতে পারে তাও আমাকে অন্যের কাছ থেকে জানতে হত। এমনি করে কর্মীর সংখ্যা নির্ধারিত হত। সম্পাদকীয়

বিভাগে আমরা প্রথম নির্বাচিত করেছিলাম সত্যেন্দ্রনাথ মজুমদারকে। সম্পাদনা করবার জন্য তিনি খালি ছিলেন। সহজেই রাজি হয়ে গেলেন। তাঁরই পরামর্শে বার্তা সম্পাদক হলেন সুকুমার মিত্র। কিছুদিন আগেও কমিউনিস্টদের কাগজ 'স্বাধীনতা'র উচ্চপদে ছিলেন। নিজে প্রতিষ্ঠিত কমিউনিস্ট। তাঁর বুদ্ধিতে অন্য যে-সব সহকারী সম্পাদক, সহ সম্পাদক নিয়োগ করা গেল তাঁরা অধিকাংশ নাম লেখানো বামপন্থী। ব্যক্তিগত পছন্দ অপছন্দ, সুপারিশ, অনভিজ্ঞ হলে যা হয়, অনেক বেশি লোক হয়ে গেল। সম্পাদকীয় লেখবার জন্য তিনজন— তার মধ্যে অতুল দত্ত নানা কাজের ভার বহন করেছেন, বাকি দু'জন নতুন।

অফিস চালাবার জন্য কিছু কর্মী ভারত থেকে আমাদের সঙ্গেই এসেছিল। বিজ্ঞাপনের জন্য বাইরে থেকে অভিজ্ঞ কর্মী সংগ্রহ করা হল। আনন্দবাজারের বিতরণ বিভাগের এক পুরাতন কর্মীও যোগ দিলেন। এই উদ্ভট সম্মেলনের মাঝখানে কী করে যে গৌরকিশোর ঘোষ আর নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী এসে গেলেন ঠিক মনে পড়ে না। হয়তো ওঁদের আমি আগে চিনতাম বলে। নীরেনের অবশ্য একটা বাড়তি গুণ ছিল। সে অন্য বাংলা খবরের কাগজে এই কাজই করেছে। আরও যে ক'জন সাহিত্যিক আমাদের সঙ্গে যোগ দিয়েছিলেন তাঁদের মধ্যে ছিলেন নরেন্দ্রনাথ মিত্র, বিমল কর, শান্তিরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়। সব মিলিয়ে আবহাওয়াটা বন্ধুত্বপূর্ণ ছিল। যতটা কাজের হওয়া উচিত ছিল সেটা হয়নি। সে-কথা বুঝতে দু' বছর লেগে গেল।

কাগজের নাম নিয়ে অসুবিধা দেখা গেল। আমরা যে নাম পছন্দ করি বাইরের একজন লোক এসে বলে এই নামে তার একটা কাগজ আছে। তাকে কিছু টাকা দিলে আমাদের পছন্দের নাম ব্যবহার করতে হবে। এ-সব দাবি সবসময় সত্য নয়। কিন্তু তা নিয়ে মাথা ঘামাবার সময় নেই। ডালমিয়াজি নামকরণ করলেন "ধর্মযুগ"। আমি তারস্বরে প্রতিবাদ করায় "তপযুগে" রাজি হলেন। শেষ পর্যন্ত হল "সত্যযুগ"। আমার তখন আর প্রতিবাদ করবার ক্ষমতা নেই।

মাখনবাবুর সঙ্গে যে সময় ভারতের স্বত্ব নিয়ে দড়ি টানাটানি হচ্ছিল তখন একদিন শেঠ ডালমিয়া বললেন, রামনাথ গোয়েঙ্কার সঙ্গে এদের সম্পর্ক ঠিক কোন স্তরে তা জানা উচিত। রামনাথজি মাঝে মাঝেই কলকাতায় আসেন। আমি যেন তাঁর সঙ্গে কথা বলে মীমাংসার চেষ্টা করি। রামনাথজি একবার

কলকাতায় আসতেই আমি তাঁর সঙ্গে দেখা করতে গেলাম। খবরের কাগজ ডালমিয়াজির অনুরাগের নানা বিষয়ের একটি। অন্যপক্ষে রামনাথজি শুধুমাত্র খবরের কাগজ নিয়েই আছেন। আগে কিছুদিন হয়তো অন্য কিছুর সঙ্গে জড়িত থেকে মূলধন সংগ্রহ করেছিলেন।

রামনাথজি কথা বলতে ভালবাসতেন। আমার সঙ্গে অনেক কথা বললেন। মাখন সেন আমাদের জ্বালাচ্ছে শুনে হেসেই লুটোপুটি। আমি যখন তাঁকে বললাম মাখনবাবুর সঙ্গে তাঁর কী ধরনের চুক্তি ছিল, রামনাথজি হাসেন আর বলেন, তুমি বাঙালি তোমার এ-সব গোচরে থাকার কথা নয়। কিন্তু রামকৃষ্ণজির তো জানা উচিত ব্যবসার একটা প্রাথমিক নিয়ম আছে। সওদা হওয়ার আগে পর্যন্ত যত খুশি প্রশ্ন করো। কিন্তু সওদা হয়ে গেলে তখন আর কিছু বলার থাকে না।

তিনি যা বলেছিলেন আমি আর শেঠজিকে সে-সব বলিনি। পরে আরও নানা বিষয়ে রামনাথজির সঙ্গে যোগাযোগ হয়েছে। এই মানুষটার জ্ঞান আর বুদ্ধি দুইই আমাকে আশ্চর্য করেছে। তিনি একবার সংসদে সদস্যও হয়েছিলেন। ফলে রাজনীতির প্রধানদের তিনি আগাপাশতলা চেনেন। বেশিরভাগই ছিল তাঁর নাম ধরে ডাকা বন্ধু। নেহরুর সঙ্গে একটু তিক্ততা ছিল, তার প্রধান কারণ সম্ভবত রামনাথজির দায়িত্বজ্ঞানহীন উত্থান। নেহরু বিশেষ করে খবরের কাগজে সমালোচনা অপছন্দ করতেন। নেহরুর প্রিয় পাত্র টি টি কৃষ্ণমাচারি রামনাথের নিকট ছিলেন।

যদিও আমাদের ছাপার কৌশল পুরনো, যত্ন করে ছাপা হয় বলে সত্যযুগ দেখতে ঝকঝকে। তার ওপর কমপোজ করা হয়েছে লাইনোটাইপে। তার জন্য অক্ষরগুলো পরিচ্ছন্ন এবং গোড়ায় পড়ায় সাহায্য করে। বলা বাহুল্য আমরা নিজেদের কাজ দেখে খুশি হয়েছিলাম। আমাদের সব থেকে গর্বের বিষয় হল, সত্যযুগের রবিবারের পরিশিষ্ট। কাগজের অঙ্গশয্যা, টাইপের মাপ এবং শিরোনামগুলি সুষ্ঠু উপস্থাপনা আজকের দিনে নতুন কিছু নয়। সব খবরের কাগজকেই এদিকে মনোযোগ দিতে হয়। সত্যযুগ তখনই এই বিভাগগুলিতে যথেষ্ট মনোযোগী এবং উদ্ভাবনশীল হওয়ার জন্য কাগজটা একটা স্বতন্ত্র রূপ পেয়েছিল। রবিবারের পরিশিষ্টের ভার ছিল নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তীর ওপর। তিনি এ কাজ আগে করেননি। হয়তো করেননি বলেই প্রচলিত ধারার নিগড়ে বন্দি নন। কাগজের আরও দুটি পাতার বৈশিষ্ট্য ছিল।

প্রথম ছোটদের পাতা, দ্বিতীয় সিনেমা থিয়েটারের পাতা। এই দুটি পাতার ভার পেয়েছিলেন গৌরকিশোর ঘোষ। তাঁর ব্যতিক্রমী মন, রসবোধ এই দুটি পাতায় বৈশিষ্ট্যের মর্যাদা দিয়েছিল।

এলাহাবাদে সম্ভ্রান্ত বসু মল্লিক পরিবারের সন্তান অহি। অনেকদিন পর্যন্ত অহি মনস্থ করতে পারেনি তার নাম লিখবে অহিভূষণ বসু মল্লিক না অহি মল্লিক। কাশীতে যখন পড়ত অহি মালিক নামটাই তার বেশি পছন্দ। যদিও অহি হস্টেলে থাকত না, আমার থেকে নীচে পড়ত তবুও অহির সঙ্গে আমার সম্পর্ক ছিল নৈকট্যের। কাশী থেকে চলে আসবার পরে তার সঙ্গে আর যোগাযোগ ছিল না। কালান্তর প্রকাশ করবার সময় আবার জানতে পারি অহি ভাগ্যান্বেষণে কলকাতায় এসেছে। কালান্তরের জন্য স্বেচ্ছাপ্রবৃত্ত কিছু ছবি আঁকার কাজ করে দিত। অহিও আমাদের সঙ্গে যোগ দিয়েছিল সত্যযুগে।

সত্যেন্দ্রনাথ মজুমদার দ্বিপ্রহরে আহারাদির পর কিছুক্ষণ বিশ্রাম করে তারপরে চারটের সময় অফিসে আসতেন। রাত ন'টা অবদি তাঁকে অফিসে পাওয়া যেত। তিনি তখন দিগ্বিজয়ী সম্পাদকীয় লেখক। তাঁর অলংকারবহুল ধ্বনি-মাধুর্যমণ্ডিত লেখা সহজেই পাঠকদের আকৃষ্ট করত।

তখনও দেখেছি, পরে আরও নানা স্থানে দেখেছি বড় সম্পাদকেরা নিজেদের লেখা নিয়েই ব্যস্ত থাকতেন। কাগজে আর কী হচ্ছে, সব মিলিয়ে কাগজের কেমন রূপ হল তা নিয়ে খুব মাথা ঘামাতেন না।

সত্যেন্দ্রনাথেরও কাগজের খোঁজখবর নেবার বা নতুন কোনও নির্দেশ দেবার সময় থাকত না বললেই চলে। কাগজগুলো আসলে সম্পাদক-কেন্দ্রিক ছিল। সমগ্র কাগজের ভার গিয়ে পড়ত বার্তা সম্পাদকের ওপর।

সুকুমার মিত্র অভিজ্ঞ মানুষ। পরিপাটি, যথাসম্ভব নির্ভুল, পাঠযোগ্য কাগজ বার করবার ক্ষমতা রাখতেন। তাঁর সহকর্মীদেরও তাঁর সঙ্গে পরামর্শ করে নিয়োগ করা হয়েছিল। সুকুমারবাবু চলে যাবার পরে গঙ্গাপ্রসাদ বসু বার্তা সম্পাদক হলেন। তিনি মনে অনেক উদার, বাইরের ধারণা গ্রহণ করতে সক্ষম, কাগজের পরিধি আরও বিস্তৃত করতে পেরেছিলেন।

কী করে সম্ভব হয়েছিল জানি না। এখন ভাবতে আশ্চর্য লাগে খেলাধুলো সম্বন্ধে অন্তত মোহনবাগান, ইস্টবেঙ্গল, মহামেডান স্পোর্টিং বা স্পোর্টিং ইউনিয়নের খেলা নিয়ে আমাদের আগ্রহ কিছুমাত্র কম না হলেও খেলাধুলোর রিপোর্টিং-এ তেমন মনোযোগ দেওয়া হত না। সব কাগজই বেশি জোর দিত

রাজনীতির ওপর— এমন খবরের ওপর, যা সহজেই পাওয়া যায়। খুব একটা অনুসন্ধান করতে হয় না।

সত্যযুগের এক বছর পার হবার পরই ডালমিয়াজির ফরমান এল, আমাকে দিল্লি অফিসের ভার নিতে হবে। আমি যেন অবিলম্বে দিল্লি চলে যাই। কলকাতা অফিসে ভাল লোক নেবার জন্য এক ব্যক্তির নিযুক্তি হয়ে গিয়েছে।

আকস্মিক দুঃসংবাদের মতো খবরটা আমাকে যথার্থই বিচলিত করেছিল। এমন সুন্দর সুখকর পরিবেশ ছেড়ে. কোথায় কোন অনাত্মীয়, অপরিচিত অফিসে গিয়ে পৌঁছব, কিন্তু প্রতিবাদ কে শুনবে?

সুতরাং, নীরবে একদিন দিল্লি রওনা হয়ে গেলাম। আমার নিজের হাতে তৈরি অফিস ছাড়তে আমার কষ্টের দাম কে দেবে?

দিল্লিতে বছর দুই পার হবার আগেই, আবার শেঠজির নির্দেশ এল: তোমাকে কলকাতায় যেতে হবে। সেখানে টাইমস অফ ইন্ডিয়া প্রকাশ করতে চাই। তুমি অবিলম্বে কলকাতায় গিয়ে সব কাজের ভার নাও।

প্রধানত সত্যযুগের প্রাথমিক সাফল্যে উৎসাহিত হয়ে শেঠ ডালমিয়া ঠিক করলেন কলকাতা থেকে টাইমস অফ ইন্ডিয়ার সংস্করণ বের করা হবে। মালিকানা পরিবর্তনের পর টাইমস অফ ইন্ডিয়ার বম্বে আপিসে নতুন মেশিন কেনা হচ্ছে। পুরনো মেশিনগুলো বাড়তি। তারই একটা ছাপার যন্ত্র আমাদের কাছে এসে পৌঁছল। ল্যাজারেসের প্রকাণ্ড বাড়ি, ততদিনে তার গুদামে জমা আসবাবপত্র বিক্রি হয়ে গেছে। খুব ঘটার সঙ্গে টাইমস অফ ইন্ডিয়া প্রকাশের তোড়জোড় শুরু হল। বম্বে থেকে প্রায়ই বড় অফিসাররা তদারকি করতে আসে। তারা চলনে বলনে সপ্রতিভ। হয়তো অভিজ্ঞতায় ও জ্ঞানে আমাদের থেকে বেশি। আমরা নিঃসংকোচে তাদের কথা মান্য করি।

বম্বের সঙ্গে সহজ এবং সর্বদা যোগাযোগের জন্য টেলিপ্রিন্টার মেশিন বসানো হল। আমরা তার নতুনত্বে বিস্ময়াবিষ্ট। কাগজ বেরোবার দিন পনেরো আগে থেকে পরীক্ষা শুরু হয়ে গেল। প্রথমে এক পাতা দু'পাতা তারপরে পুরো কাগজটা ছাপা হতে লাগল। এবারে একদিন একটা বড় চা চক্রের আয়োজন করে টাইমস অফ ইন্ডিয়ার আবির্ভাবের ঘোষণা করা হয়েছিল। কাগজের সম্পাদক হলেন মুলগাঁওকার। কয়েকটি বড় কাগজে কাজ করেছেন। এখন টাইমস অফ ইন্ডিয়ার বম্বে এডিশনের সহকারী সম্পাদক, আশ্চর্য ভাল

ইংরেজি লেখেন। উদার, দিলখোলা, অন্যের কথা শুনতে প্রস্তুত— এই মানুষটাকে প্রথম থেকে বেশ ভাল লেগেছিল।

কলকাতায় তাঁর জন্য একটা বড় ফ্ল্যাট ভাড়া করা হয়েছিল। সেখানে প্রায় সন্ধ্যায় পার্টি হয়। মুলগাঁওকার সেখানে লাঞ্চ খেতে গিয়ে হয়তো বিকেল চারটে পর্যন্ত ফেরেন না। বড় কাগজের সম্পাদকের এমন আচরণ সত্যযুগের কর্মীদের বিভ্রান্ত করে। মুলগাঁওকারকে সম্পাদকীয় প্রায়ই লিখতে হত না। কারণ কাগজে ছাপাবার সমস্ত লেখা বম্বে থেকে আসত। স্থানীয় সংবাদ কলকাতায় তৈরি হয়। বাকি খবরের বিষয়েও বম্বে থেকে যথেষ্ট নির্দেশ থাকে।

সত্যযুগ বার করে আমরা যেমন খুশি হয়েছিলাম টাইমস অফ ইন্ডিয়া আমাদের তেমনি হতাশ করল। যৎসামান্য বিক্রি হল। কেন হয় না আমাদের বোঝবার ক্ষমতা নেই। আমাদের বণ্টন এবং বিপণনের কোনও সাক্ষাৎ জ্ঞান নেই।

মালিক শেঠ ডালমিয়া কিন্তু হতাশ হলেন না। তিনি বিশ্বাস করতেন আমরা ক্রমশ উন্নতি করব। তিনি চেয়েছিলেন কলকাতার অফিসটা আরও কার্যকর হোক। তাই একটা হিন্দি কাগজ বার করতে চাইলেন। তখন তিনি দিল্লির টাইমস অফ ইন্ডিয়ার অফিস থেকে হিন্দি "নবভারত" পত্রিকা বের করা শুরু করেছেন। তাঁর ইচ্ছানুসারে কলকাতা থেকেও "নবভারত" প্রকাশ করতে গিয়ে প্রথম ধাক্কা এল এক ব্যক্তির কাছ থেকে। তিনি বললেন, তাঁর নবভারত নামে একটা কাগজ আছে। তাঁর চিঠির সঙ্গে নবভারত নামে ছাপা কিছু পুরনো খবর হ্যান্ডবিলের আকারে ছাপিয়ে পাঠালেন।

তার সঙ্গে লড়াই করার সময় নেই। যে নামই স্থির হয় সেই নামে অবিলম্বে একটা প্রতিবাদপত্র চলে আসে। বুঝতে পেরেছিলাম একদল ধূর্ত ব্যবসায়ী এই কাজ করে বেড়াচ্ছে। তখন শেঠজি বলে পাঠালেন কাগজের নাম রাখা হোক "ধর্মযুগ"। আমরা শিউরে উঠলাম। তাঁকে বোঝাতে লাগলাম ও নামে কাগজ হয় না। তখন তিনি বললেন নাম রাখো তপোযুগ অথবা নবভারত তপোযুগ। নামের উদ্ভাবনে দিশেহারা আমরা মনস্থির করতে পারিনি। সেইজন্য ঠিক করা হল নাম রাখা হবে নবভারত টাইমস। নামটাও উদ্ভট। এমন নাম যে হয় আমরা ভাবিনি। কিন্তু টাইমস অফ ইন্ডিয়া গ্রুপের হিন্দি দৈনিক "নবভারত টাইমস" আজও বিভিন্ন শহর থেকে প্রকাশিত হয় এবং বিক্রির সংখ্যাও যথেষ্ট উঁচু।

তখন আমরা বিশ্বাস করিনি যে পাঠক এই নামে কাগজ স্বীকার করবে। তবু

আমরা এই নাম রাখতে বাধ্য হলাম। নবভারত টাইমস ছাপাবার জন্য একটা ছোট রোটারি এল। এটা অন্য জাতের রোটারি। কাগজের রিল থেকে ছাপা হয়। কিন্তু স্টিরিয়ো করতে হয় না। বলা হত ফ্ল্যাট বেড রোটারি। এই প্রেসের ছাপাবার ক্ষমতা ঘণ্টায় পাঁচ-সাত হাজারের বেশি বিক্রি হবে কিনা সন্দেহ আছে।

অফিস জমে উঠল। এক ছাদের তলা থেকে তিন ভাষায় তিনটে কাগজ বার হচ্ছে। প্রায় ন'শো কর্মী। এখন বুঝতে পারি এর অর্ধেক কর্মী দিয়েও ওই তিনখানা কাগজ তখন প্রকাশ করা সম্ভব ছিল। আমরা, অনভিজ্ঞ পরিচালকরা এটা বুঝতে পারিনি।

সত্যযুগ কলকাতায় মুসলমান সমাজে প্রিয় হয়ে উঠেছিল। অন্যান্য কাগজে মুসলমান সমাজের কথা সামান্যই ছাপ হত। দেশভাগ হয়ে গিয়েছে। মুসলমান সমাজের দুঃখ বেদনার প্রতিফলন অন্য কাগজে তেমন দেখতে পাওয়া যায় না। ফলে শুধু এখানকার মুসলমানরা নয় পূর্ব পাকিস্তানের মুসলমানরাও সত্যযুগ পছন্দ করেন। আমরা পূর্ব পাকিস্তানে সত্যযুগ পাঠানো শুরু করার পর দেখলাম যে পূর্ব পাকিস্তানে সংবাদপত্রের দুর্ভিক্ষ। নিজস্ব কাগজগুলি তখনও শৈশব ছাড়াতে পারেনি। একটি পরিণত সম্পূর্ণ কাগজে সত্যযুগ এ দেশের পাঠককেও আকর্ষণ করেছিল।

কলকাতার অন্য কাগজেরা পূর্ব পাকিস্তানে কাগজ পাঠাতে ইতস্তত করত। তার কারণ ও দেশ থেকে টাকা আদায় করা কঠিন কাজ ছিল। ওখানে টাকা আটকে রাখার সামর্থ্য সবার নেই। আমরা হয়তো এতটা ভবিষ্যৎ ভাবিনি। আমরা ভেবেছি টাইমস অফ ইন্ডিয়া, করাচিতে যাদের প্রকাণ্ড অফিস, তারা সহজেই পূর্ব পাকিস্তান থেকে আমাদের টাকা আদায় করে দেবে। সেই উদ্দেশ্যে একদিন জহরুল হক, টাইমস অফ ইন্ডিয়ার লাহোর অফিসের কর্মচারী, তাকে সঙ্গে নিয়ে আমি ঢাকা চট্টগ্রাম রওনা হলাম।

আমাদের কলকাতায় আত্মপ্রকাশ অনেকে জানে, কিন্তু জানে না এমন মানুষও অনেক। পূর্ব পাকিস্তানে দেখি সবাই সত্যযুগের নাম জানে। কাগজটাকে সম্মান করে, ভালবাসে। তবু দেখা গেল টাকা আদায় করে খবরের কাগজে পাঠানো সহজ কাজ নয়। টাকা পূর্ব পাকিস্তানে জমা রাখা যেতে পারে। তারপর সুবিধা ও সুযোগমতো সে টাকা ভারতবর্ষে আনা যাবে। তখনও দু'দেশের অর্থনৈতিক সম্পর্ক স্পষ্ট নয়, রাজনৈতিক সম্পর্ক আদৌ

ভাল নয়। তার ওপর পূর্ব পাকিস্তানে ছোট বড় দাঙ্গা হাঙ্গামা লেগেই আছে। বহু শরণার্থী দলবেঁধে এপারে চলে আসছে। এখান থেকেও কিছু লোক ওদেশে চলে যাচ্ছে।

এক ছাদের নীচে তিনটি ভাষায় তিনটি দৈনিক পত্র। তাদের সম্পাদকীয় বিভাগগুলি সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। অন্যান্য কাজ, যেমন বিজ্ঞাপন সংগ্রহ করা ও কাগজের বণ্টন ও বিক্রি একটি কেন্দ্রীয় বিভাগই করত। সম্পাদকীয় বিভাগের শ্রেণীচেতনা তখনই আমাকে বিস্মিত করেছিল। টাইমস অফ ইন্ডিয়ার সম্পাদকীয় বিভাগে অনেক কর্মী বোম্বাই থেকে এসেছিলেন। কিন্তু সাব-এডিটর ও রিপোর্টার কলকাতা থেকে নিযুক্ত করা হয়েছিল। সত্যযুগ ও নবভারত টাইমসের ক্ষেত্রে বলাবাহুল্য প্রত্যেকেই স্থানীয় মানুষ। তাদের নির্বাচন এখান থেকেই করা হয়েছে।

টাইমস অফ ইন্ডিয়ায় যারা বোম্বাই থেকে এসেছে, অস্বাভাবিক নয় যে তারা একটু উন্নাসিক ছিল। বড় কাগজের বড় অফিস থেকে এসেছে আমাদের সামান্য প্রচেষ্টা তদারক করবে। তাদের নিয়ম শৃঙ্খলার মধ্যে কাজ করা অভ্যেস। তারা অন্য সবাইকে কিছুটা অনুকম্পা ও প্রশ্রয়ের সঙ্গে দেখে। হয়তো প্রচ্ছন্ন বিরক্তিও থাকে।

সত্যযুগের সম্পাদকীয় কর্মীরা এই ব্যাপারটাকে গ্রাহ্যের মধ্যে আনত না। তাদের মধ্যে অনেকেরই কাজের অভিজ্ঞতা ছিল। তা ছাড়া যাঁরা আগে এসেছেন তাঁদের ঈষৎ গর্ব থাকাও আশ্চর্য নয়। সব শেষে যারা এসেছিল তারা নবভারত টাইমসের সম্পাদকীয় কর্মী। আমাদের কাগজ খুব সামান্যই চলে। তারা এর আগে কোনও বড কাগজে কাজ করেনি। স্বভাবতই সংকুচিত হয়ে থাকে।

নবভারত টাইমসে যাঁকে এডিটর করে আনা হল সত্যেন্দ্রনাথ মজুমদারের সুপারিশে তিনি নাম লেখানো একজন কমিউনিস্ট, অগ্নিহোত্রী। তাঁকে অল্পদিনের মধ্যেই সরতে হয়েছিল। কিন্তু সে অন্য কাহিনী।

কোথাও কোনও সমাবেশে যখন আমাদের তিনটি কাগজের প্রতিনিধিদের উপস্থিত থাকতে দেখা যেত, তাদের পরস্পরের মধ্যে কথাবার্তা হয় না। টাইমস অফ ইন্ডিয়ার প্রতিনিধিরা উন্নাসিক, নিজেদের অভিজাত মনে করতেন। অন্য দুই কাগজের প্রতিনিধিরা স্বতন্ত্র থেকে নিজেদের মর্যাদা রক্ষায় ব্যস্ত থাকতেন।

এমনি করেই চলছিল। নতুন কাগজে বিজ্ঞাপন আশানুরূপ হবে না এটা জানা কথা হলেও সবাইকে সমস্তক্ষণ পীড়া দিত। সব জেনেশুনে, উচ্চমানের বুদ্ধিবিবেচনার অধিকারী টাইমস অফ ইন্ডিয়ার বোম্বাই অফিস বিরক্ত হতেন এবং প্রকাশ্যে বলতে দ্বিধা করতেন না। অন্যপক্ষে আমরা তো নাচার। একটা কাগজই আমাদের কাছে গন্ধমাদন। তিনটে কাগজের বোঝা বইবার সাহস ও সামর্থ্য নেই। আমরা সে-বিষয়ে অবহিত। তার জন্য ঈষৎ নতশির।

বোম্বাই অফিস আমাদেব ঘাটতি পুরণের টাকা পাঠাতেন দেরি করে। যে বিজ্ঞাপন বোম্বাই থেকে আসবার তা আসে না। তখন জানতাম না কলকাতায় বিজ্ঞাপন পাঠাবার কোনও চেষ্টা বোম্বাই অফিস করেই না। এই প্রকল্প তাঁদের পছন্দ নয়। এটা অভিনব বলে তাঁদের কাছে গ্রহণযোগ্যও নয়। মালিক জোর করে চাপিয়ে দিয়েছেন। অথচ কাজটা আসলে সহজ ছিল। কলকাতায় নতুন সংস্করণ বেরোচ্ছে, টাইমস অফ ইন্ডিয়া তার বিক্রির একটা আনুমানিক সংখ্যা ঘোষণা করতে পারত। বিক্রি বেড়েছে বলে টাইমস অফ ইন্ডিয়ার বিজ্ঞাপনের হার সামান্য বাড়িয়ে দিলেই কিছু বাড়তি রাজস্ব আসত।

আজকে দেখা যায় বহু কাগজের একাধিক সংস্করণ। কারও কারও দশ-বারোটারও অধিক। তার কারণ, একটা গ্রুপ যত সহজে একটা নতুন সংস্করণ বের করতে পারে নতুন কারওর কাছে সে কাজ অত্যন্ত কঠিন, ব্যয় সাপেক্ষ। নতুন সংস্করণ প্রকাশ করে বিজ্ঞাপনের দর কিছুটা বাড়ালে আয় খানিকটা বাড়ানো সম্ভব।

ভাবিনি এটা সম্ভব। কিন্তু একদিন সকালবেলায় শেঠজি বললেন কলকাতার কাগজ তিনটে বন্ধ করে দাও। এদের লোকসান বহন করা যাচ্ছে না। তিন-চার দিনের মধ্যে উপযুক্ত নোটিশ দিয়ে কলকাতার অফিস বন্ধ করে দাও।

এমন নির্দেশ যে আসতে পারে, এইভাবে কোনও আলোচনা ছাড়া, ভাবতে পারিনি। হয়তো আমার উচিত ছিল কাজে ইস্তফা দিয়ে চলে যাওয়া তৎক্ষণাৎ। কী বা হত যদি আমি ইস্তফা দিতাম। যিনি টাকা দেবেন তাঁর সিদ্ধান্ত বদল হত না। তা ছাড়া সত্যি এমনও হতে পারে যে এই ব্যয় বহন করা তাঁর পক্ষে সাধ্যাতীত।

এই যে নির্দেশ এল এ-কথা কাকে বলব? আগে থেকে সবাইকে বলে এই কাজ নিষ্পন্ন করা সম্ভব নয়। অথচ কাজটা একা একা করাও অসম্ভব। যাকে বললাম তিনি আমার বন্ধু, আমার সঙ্গে কাজ করতেন সত্যযুগে। তাঁর নাম হীরেন পাল। রাত্রে অফিস যাওয়ার আগে বাবা মা এবং স্ত্রীকে বলে গেলাম আমি একটা কঠিন, অপ্রিয়, অন্যায় কাজ করতে যাচ্ছি। ঠিকঠাক হয়ে গেলে ভোর বেলায় ফিরে আসব।

হীরেন আর আমি অফিসে পৌঁছলাম। কেউ বিশেষ আশ্চর্য হল না। আমি মাঝে মাঝে সিনেমার শেষ শো-র পরে অফিসে এসেছি। সবাই নির্লিপ্তভাবে আমাকে দেখল। আমি অফিস ঘরে গিয়ে তিনটে নোটিশ তৈরি করলাম। ইংরেজি, বাংলা এবং হিন্দিতে। বক্তব্য সামান্য। কাল থেকে এই তিনটে কাগজ আর প্রকাশিত হবে না। কর্মচারীরা যেন এটাকে ছাঁটাইয়ের নোটিশ বলে গণ্য করেন।

হীরেনের হাতে হিন্দি নোটিশটা দিয়ে বাকি দুটি নোটিশ, একটি বাংলা অপরটি ইংরেজিতে, নিয়ে কমপোজিং বিভাগে গেলাম। দু'জন লাইনো অপারেটর সেটা কমপোজ করে দিল। তারা কমপোজ করতে এত ব্যস্ত ছিল

যে নোটিশের মর্মার্থ বুঝতে পারেনি। কমপোজ করা ক'টা লাইন নিয়ে এবার পাতা তৈরির টেবিলের কাছে দাঁড়িয়ে রইলাম। ইংরেজি এবং বাংলা কাগজে এই কমপোজ করা লাইনগুলি বসিয়ে দেওয়া হল। কর্মীরা বুঝতে পেরেছে এমন মনে হল না। হীরেনেরও একই অভিজ্ঞতা।

আধঘণ্টা পরে তিনটে কাগজ ছাপা শুরু হল। কাগজে নোটিশ ছাপা হয়েছে দেখে আমি আর হীরেন বাড়ির পথে রওনা দিলাম। তখনও সূর্যোদয় হয়নি। ডিউটি সেরে অফিস সংলগ্ন মাঠে ইতস্তত কিছু কর্মী জটলা করছে। সত্যযুগ ছাপা কাগজের কপি তাদের হাতে। তারা সম্ভবত বড় খবরগুলির ওপর চোখ রেখেছে, কোনও ভুলচুক আছে কিনা অথবা লেআউট নিয়ে ভাবছে। প্রথম পাতার এককোণে সেই ভয়ংকর খবরটির ওপর তখনও তাদের চোখ পড়েনি। আমি বাড়িতে ফেরার জন্য গাড়িতে উঠে পড়লাম। ঘুমের আর সময় ছিল না।

বাড়ি ফিরে সদ্যসমাপ্ত কর্তব্যের পূর্ণ তাৎপর্য অনুভব করার চেষ্টা করছি। একবাক্যের একটি নোটিশে একসঙ্গে প্রায় নয়শো কর্মী চাকরিচ্যুত হলেন। কী করবে তারা অতঃপর। এই শহরে চাকরি পাওয়া কোনওদিনই সহজ ছিল না। এরা বাড়ি ফিরে গিয়ে বাড়িতে কী বলবে। কী বলে স্বজনদের সান্ত্বনা দেবে যে একটা কাজ গেছে যাক, অন্য কাজ করা যাবে।

পরের দিন কী একটা উৎসবও ছিল— হয়তো জন্মাষ্টমী। আমার মনে অপরাধবোধ বাসা বেঁধে থাকল। জানি আমার কিছু করার ছিল না। মাসে লক্ষ টাকার লোকসান— তিনটে কাগজ চালাতে শেঠজি যদি না রাজি হন তাঁকে দোষই বা দিই কী করে। আমার সমস্ত আক্রোশ গিয়ে পড়ল বোম্বাইয়ের হেড অফিসের ওপর। তাঁরা চেষ্টা করলে হয়তো এ অবস্থাটা সামলানো যেত। নির্বিকার চিত্তে প্রায় নয়শো কর্মীর জীবনযাত্রা খণ্ডিত করে দিলেন। সঙ্গে সঙ্গে মনে হল আমি তো নিজেই তাদের দলেরই একজন।

আমি কী করব অতঃপর? আমাকে এখন ধরে নিতে হবে যে আর সকলের সঙ্গে আমিও ছাঁটাই হয়ে গিয়েছি।

সেদিন একটু বেলাতে শেঠজির টেলিফোন এল। নির্বিঘ্নে ঘটনাটি নিষ্পত্তি হয়েছে শুনে সন্তোষ প্রকাশ করলেন। মনে হয়েছে জিজ্ঞাসা করি অতঃপর আমি কী করব। তার আগেই শেঠজি বললেন তুমি দুই-একদিনের মধ্যেই বোম্বাই চলে এসো। আমি সেখানে থাকব। তোমাকে পশ্চিম জার্মানিতে যেতে

হবে। আমরা সেখানে অতি মূল্যবান ফটোগ্রাভিওর প্রেসের অর্ডার দিয়েছি। প্রস্তুতকারীরা মেশিনটা চালিয়ে দেখাবে। তুমি দেখে এসো।

শেঠজি অল্পকথার মানুষ। তা ছাড়া সফল ধনী ব্যক্তিরা কথা শুধু বলেই থাকেন। কারওর কথা শোনেন না। আমি কিছু বলার আগেই শেঠজি বললেন অবিলম্বে জার্মানি যাওয়ার দরকার। তুমি কবে বোম্বাই আসছ, আমাকে জানিয়ো।

আমি আশ্চর্য হয়ে গেলাম। নিজের সম্বন্ধে কিছুটা নিশ্চিন্ত হলাম। আমার চাকরিটা তা হলে আছে। আমার সঙ্গে যারা কাজ করত ওই নয়শো কর্মীর মধ্যে অনেকে আমার বন্ধু এবং বন্ধু স্থানীয়। তাদের কী হবে। তাদের এই দুর্দশার দিনে ফেলে দিয়ে আমি অনির্দিষ্টভাবে জার্মানি চলে যাব।

অ্যাডভেঞ্চার তো বটেই। ফটোগ্রাভিওর কী জিনিস আমি তার বিন্দু-বিসর্গ জানি না। মেশিন-এর আমি কী দেখব, কী বুঝব? ধনী ব্যক্তিরা কোনও কাজে দেরি করতে চায় না। সেটা এক হিসেবে মঙ্গল। কারণ একটু দেরি হলে তাদের সিদ্ধান্ত বদলে যাওয়াটা অস্বাভাবিক নয়। তিন-চার দিনের মধ্যেই বোম্বাই চলে গেলাম। সেই প্রথম আমার বিদেশযাত্রা হবে। ভাগ্যক্রমে পাশপোর্ট করানো ছিল।

বোম্বাই গিয়ে জানতে পারলাম মাসখানেক পরে জার্মানি থেকে ফিরে এসে আমি বোম্বাই অফিসে কাজ করব। আমার পদ হবে বিজনেস ম্যানেজার। জেনারেল ম্যানেজারের পরেই ওই পদ। সমস্ত ছাপাখানায় যেখানে প্রায় দুই হাজার কর্মী কাজ করে তাদের জন্য কয়েকজন ইংরেজ ম্যানেজার আছে। সেই ছাপাখানা আমার দেখাশুনায় লালিত হবে। দু' হাজারের মধ্যে হাজারখানেক কর্মী টাইমসের জব ডিপার্টমেন্টে কাজ করে। খবরের কাগজের সঙ্গে যুক্ত নয়। বাইরে থেকে যেমন যেমন বরাত আসে তারা সেই কাজ নিষ্পন্ন করে।

সেই রাত্রে বোরি বন্দরে টাইমসের অফিসে এলাম। অফিসের নীচের তলায় কারখানা। ইলাস্ট্রেটেড উইকলি ছাপা হচ্ছিল। ফটোগ্রাভিওর মেশিনে। পুরনো যন্ত্র, সেজন্যই নতুন মেশিন আনা হচ্ছে জার্মানি থেকে।

আমি এবারে অনেক নিরিবিলি পেয়ে কাজটা বোঝবার চেষ্টা করলাম খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে। এখানেও টেক্সট লাইনোটাইপে কমপোজ করা হয়। তারপর পাতা সাজানো হয়। সেই পাতায় কালো-সাদা ও রঙিন ছবি যুক্ত করা হয়। এর

পদ্ধতি জটিল এবং অত্যন্ত স্পর্শকাতর। একদিনে এত জ্ঞান আহরণ করে আমি ক্লান্ত হয়ে গিয়েছিলাম। তবু খুশি হয়ে ভাবলাম জার্মানি যাচ্ছি যে মেশিন দেখতে তার সম্বন্ধে একেবারে অজ্ঞ থাকলাম না, মোটামুটি চিত্রটা পেয়ে গিয়েছি।

আমার সঙ্গে দু'জন ইংরেজ কর্মচারী যাবে। চিফ ইঞ্জিনিয়ার প্র্যাট এবং ফটোগ্রাভিওর বিভাগের সুপারিনটেন্ডেন্ট নকলস।

শেঠজি বম্বের জুহুতে একটি বিশাল বাংলো ভাড়া করে থাকতেন। সেখানে একটি ঘরে আমার থাকার ব্যবস্থা হয়েছিল। সকালে শেঠজির সঙ্গে একবার দেখা করতে যাই আর বিকেলে অফিস থেকে ফিরে দেখা হয়ে যায় বারান্দায়, তখন তিনি সেখানে বসে জুহুর সমুদ্রের হাওয়া সেবন করেন।

তখনকার দিনে বিলেত যাতায়াত এবং বিদেশি মুদ্রা নেওয়া সম্বন্ধে কোনও বিধিনিষেধ ছিল না। ভিসা লেগেছিল কি লাগেনি মনে নেই। জার্মানি ছাড়া আরও দু'-একটা দেশে যাওয়ার ইচ্ছা ছিল। গিয়েওছিলাম।

দ্বিতীয় সন্ধ্যায় শেঠজির সঙ্গে দেখা হল। খোঁজখবর নিলেন আমি কী করছি। দু'দিন ধরে বোম্বাই অফিসে গিয়ে আমার কী ধারণা হল। টাইমস অফ ইন্ডিয়া দুই বছরের অধিককাল শেঠজির সম্পত্তির অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। তখনও তিনি টাইমস অফ ইন্ডিয়ার অফিস স্বচক্ষে দেখেননি। ভিক্টোরিয়া টারমিনাসের পশ্চিম দিকে বিশেষ স্থাপত্যে চারতলার বাড়িটির কোথায় কী আছে সে-সম্বন্ধে আমার কাছ থেকে খোঁজ নিলেন। জিজ্ঞাসাও করলেন ওই অফিস সম্বন্ধে আমার কী ধারণা হল। ওই বাড়িতে দুই হাজার লোক কাজ করে। বিশাল সমুদ্র। এমন কথাও উনি জিজ্ঞাসা করলেন আমরা ফটোগ্রাভিওর মেশিন কিনছি কেন?

এই যন্ত্র ভারতে আর কারও কাছে নেই। সেটা অবশ্যই একটা কারণ হতে পারে। এ ছাড়া আর কী ভাবব। কে অত টাকা দিয়ে ওই যন্ত্র কিনবে?

এই যন্ত্র কেনার সিদ্ধান্ত আমার নয়। আমার জানবার কথাও নয় কী কারণে ওই যন্ত্র কেনা হচ্ছে। কিন্তু গত দু'দিনে আমি ফটোগ্রাভিওর মেশিন সম্বন্ধে কিছুটা জেনেও গিয়েছিলাম। বললাম ফটোগ্রাভিওরে রং ছাপা সম্ভব হবে। যে কাজটা আমাদের লেটারপ্রেস রোটারি মেশিনে করা যায় না। আসলে যায় না তা নয়, কিন্তু ফলটা কারও হাতে দেবার মতো হয় না। ফটোগ্রাভিওরে অন্য সুবিধা হল এর মুদ্রণ সৌকর্য কাগজের মানের ওপর পূর্ণ নির্ভরশীল নয়। ফলে

আর্ট পেপারের ওপর ছাপালে যে রকম ফল পাওয়া যায় প্রায় তেমনই ফল পাওয়া যায় নিকৃষ্ট মানের নিউজ প্রিন্টের ওপর ছাপালেও। মোট সুবিধা হল অনেক কম খরচে এই পদ্ধতির দাক্ষিণ্যে অনেক সুন্দর ছাপানো পত্রিকা দেওয়া যায়। এটাই ছিল টাইমস অফ ইন্ডিয়া গ্রুপের বড় মূলধন। যে কারণে বাজারে ইলাসট্রেটেড উইকলির একচ্ছত্র অধিকার।

ফটোগ্রাভির পদ্ধতি জটিল। এঁরা তিরিশের দশকের প্রথম দিকে একটি পুরনো মেশিন সস্তায় কিনে এনে তার যাবতীয় অনুষঙ্গের আয়োজন করে ইলাসট্রেটেড উইকলি ছাপাতে আরম্ভ করেন। তাই ইলাসট্রেটেড উইকলির আর কোনও সমকক্ষ ছিল না সে সময়ে। এলাহাবাদের এক বাঙালি শ্রীযুক্ত ঘোষ তার অল্প পরেই ওই পদ্ধতি এবং একটি ছাপার মেশিন বিলেত থেকে আনিয়েছিলেন। সম্ভবত এক হাত ফেরত। তিনি কলকাতা থেকে কাগজ ছাপার আয়োজন করেছিলেন। ওরিয়েন্ট বা অন্য কোনও নামে। দামে ইলাসট্রেটেড উইকলির সমান অথবা কম। কিন্তু নানা কারণে তাঁর কাগজ চলল না। যন্ত্রপাতিগুলি ধর্মতলা স্ট্রিটের একটি বাড়িতে পড়ে ছিল।

শেঠজির এত কথা শোনবার সময় নেই, আগ্রহও নেই। আমার কাছ থেকে বিষয়টির নির্যাস জেনে নিয়েই খুশি। আমাকে বললেন, শুনেছি রামনাথ গোয়েঙ্কার ন্যাশনাল স্ট্যান্ডার্ড এই যন্ত্র কেনার আয়োজন করছে। একটু খোঁজ খবর করো তো। দরকার হলে ওদের অফিসেও যেতে পারো।

দৈনিক ন্যাশনাল স্ট্যান্ডার্ড এবং রবিবারের সানডে স্ট্যান্ডার্ড এই কাগজ দুটি সম্প্রতি রামনাথ গোয়েঙ্কা অধিগ্রহণ করেছেন। হ্যামিলটন নামে একজন সাহসী ইংরেজ কাগজ দুটি শুরু করেছিলেন। কিন্তু সাফল্য না পাওয়ায় রামনাথজিকে কিছুকাল আগে বিক্রি করে দিয়েছেন।

যে কাগজের কাউকে চিনি না, কোন অঞ্চল থেকে প্রকাশিত হয় তাও আমার জানা নেই সেই কাগজের ভিতরের সিদ্ধান্ত আমি কী করে জানব। সে কথা শেঠজিকে বলে লাভ নেই। বড় ব্যবসায়ীরা অভিলাষ ব্যক্ত করেই খালাস। সেই অভিলাষকে রূপ দেওয়া অধীনস্থ কর্মচারীদের কাজ। সুতরাং পরের দিন দুরূহ একটি কাজ হাতে নিয়ে টাইমস অফ ইন্ডিয়ার অফিসে এলাম। জানতে সময় লাগল না যে কোলাবা অঞ্চলে সাসুন বন্দরে একটি পুরনো গুদাম ঘরে ন্যাশনাল স্ট্যান্ডার্ড-এর অফিস। কী করব কোনও ছক না কষেই লাঞ্চের পর সেখানে রওনা হয়ে গেলাম। ভাগ্য প্রসন্ন থাকলে পঙ্গুও

পর্বত ডিঙোতে পারে, অক্ষমও অসাধ্য সাধন করে। আমি গেট দিয়ে ঢুকে খোঁজ নেব কোথায় কার কাছ থেকে অনুমতি নিয়ে ম্যানেজারের সঙ্গে দেখা করব। অবিশ্বাস্য সৌভাগ্যে অভিভূত হয়ে গিয়েছিলাম! ঢোকার মুখেই রামনাথজির সঙ্গে দেখা। ভিতরে গিয়ে, যে ভাবনা টগবগ করে ফুটছিল সেটা স্বতঃস্ফূর্ত ভাবে বেরিয়ে এল। আমি জিজ্ঞাসা করলাম, 'শুনলাম আপনারা ফটোগ্রাভিওর মেশিন কিনছেন। তাই ভাবলাম খোঁজ নিয়ে আসি।' রামনাথজি বললেন, তাঁদের ফটোগ্রাভিওর মেশিন কেনবার সত্যি কোনও বাসনা নেই। দেখলাম তিনি আমাদের ব্যাপারে অনেক খোঁজখবর রাখেন। আমি যে কলকাতা থেকে চলে এসেছি, এখন থেকে বোম্বাই অফিসে যুক্ত হব কিছুই তাঁর অগোচর নয়। যখন শুনলেন আমি দু'-একদিনের মধ্যে জার্মানি যাচ্ছি আমাদের জন্য নবনির্মিত ফটোগ্রাভিওর মেশিনের ট্রায়াল রান দেখতে, একটু অবাক হয়েছিলেন। পরে বললেন, 'ও তোমাকে পাঠানো হচ্ছে, জয়চাঁদকে বাদ দিয়ে।'

জয়চাঁদ আমাদের জেনারেল ম্যানেজার। আমি তাঁর কথার তাৎপর্য বুঝতে না পারায় বিশদ করে বললেন, 'মেশিন তো জয়চাঁদ অর্ডার দিয়েছে। এখন তাকে না পাঠিয়ে তোমাকে পাঠাবার অর্থ হল তুমি বুঝে আসবে জয়চাঁদ কতটা দালালি পেয়েছে।'

আমি কিছুই বুঝতে পারছি না। নির্বোধ চোখে তাকিয়ে আছি। তখন বললেন, 'মারোয়াড়ি ব্যবসাদারদের অভ্যাস কী জান? কোটি টাকা খরচ করে কারখানা খুলবে, কয়েক হাজার টাকা দিয়ে ম্যনেজার রাখবে, চারদিকে নিটোল পাহারা বাখার ব্যবস্থা হবে। তবু কারখানা থেকে বেরিয়ে পাশের ছোট্ট পানের দোকানে গিয়ে বলবে, ভাই তোর ভরসায় কারখানা খুললাম, একটু দেখিস, রাতবিরেতে মাল পত্তরের চালাচালি হচ্ছে কি না।'

বলা বাহুল্য আমি একেবারে স্তম্ভিত। কথাটা মুখে এসে গিয়েছিল কিন্তু বলা হল না, আপনিও তো একজন মারোয়াড়ি। পরে শুনেছি, রামনাথজি টাকাকড়ির ব্যাপারে স্বয়ং দেখাশোনা করতেন।

রামনাথজির সৌজন্যে তাঁর কারখানা এবং অফিস একটু ঘুরে দেখলাম। তারপর নিজের অফিস ফিরে এলাম।

যেদিন বিদেশে যাব, বোধহয় বেলা এগারোটা নাগাদ প্লেন ছাড়ার সময় ছিল। বাড়ি থেকে আটটা নাগাদ বেরোচ্ছি। ডালমিয়াজির সঙ্গে দেখা হল।

বললেন, তিনিও শীঘ্রই লন্ডন যাচ্ছেন। আর বললেন, একটু খবর নিয়ো তো যে মেশিনটা আমরা কিনছি তার আসল কী দাম।

আমি জিজ্ঞাসা করতেই পারতাম যে আসল দাম মানে কী? কী জানতে চাইছেন শেঠজি। কিন্তু রওনা হবার সময়, অজানা এক দেশে সামান্য পরিচিত দুই ইংরেজ সাহেবকে নিয়ে বিদেশ যাত্রার দুর্ভাবনা আমাকে আচ্ছন্ন করেছিল। আমি যথা আজ্ঞা বলে রওনা হয়ে গেলাম। মনে হল রামনাথজি তা হলে ঠিকই বলেছিলেন। ডালমিয়াজি ঘুরিয়ে জানতে চাইছিলেন রামনাথজি যে-কথা বলেছিলেন তাই। অর্থাৎ কেউ কোনও কমিশন পেয়েছে কিনা। সে খবর আমি কোথা থেকে পাব, কেনই বা কেউ আমাকে বলবে? তখন এ-সব ভাবার মানসিক অবস্থা ছিল না। বিদেশযাত্রার একটা ভয়-মিশ্রিত দুর্ভাবনা অন্য কিছু ভাবতে দিচ্ছিল না।

ভারতবর্ষের তিনটি সংবাদপত্র গোষ্ঠী মারোয়াড়িদের দখলে। দক্ষিণ ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেস গোষ্ঠী, উত্তরভারতে দিল্লির হিন্দুস্থান টাইমস গোষ্ঠী আর বোম্বাইয়ের টাইমস অফ ইন্ডিয়া গোষ্ঠী। এদের মধ্যে দু'জন—রামনাথ গোয়েঙ্কা এবং রামকৃষ্ণ ডালমিয়া সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠায় ব্যাকুল। ডালমিয়াজি তবু আরও বিবিধ ব্যবসায়ে সংযুক্ত। তাঁর সময়ের সামান্যই ব্যয় হয় দেশের তিন অঞ্চলে ছড়িয়ে থাকা খবরের কাগজগুলোর জন্য। অন্য পক্ষে রামনাথজির অন্য কোনও ব্যবসা নেই। তাঁর জীবিকা এবং জীবনই খবরের কাগজ।

রামনাথজির আর একটা গুণ ছিল। তিনি রাজনীতিতেও পা রেখেছিলেন। বস্তুত অন্দরমহলে প্রবেশও করেছিলেন। তিনি সংসদে সদস্য হয়েছিলেন। দেশের সব রাজনীতিকের সঙ্গে তাঁর জানাশুনা। দক্ষিণী যত রাজকর্মচারী ছিল তাদের অনেকেই তাঁর হাত-ধরা। তিনি সবাইকে চিনতেন। সকলের সঙ্গে সোজাসুজি কথাবার্তা বলতেন। সেই মুহূর্তে নেহেরু তাঁর চোখের বালি, অপছন্দের মানুষ। ও বিষয় সম্বন্ধে তাঁর অভিমত সুস্পষ্ট প্রকাশ করতে কখনও দ্বিধা করেননি।

কলকাতায় ফিরে আসবার আগে আমি এক বছরের অধিক দিল্লিতে ছিলাম। দিল্লি থেকে তখন ইংরেজি টাইমস অফ ইন্ডিয়া, হিন্দি নবভারত টাইমস এবং সাপ্তাহিক নবযুগ কাগজ বের হত। নবভারত টাইমস ডালমিয়াজির মানস-সন্তান। কোনও কাগজেরই বিক্রি বিশেষ ভাল নয়। টাইমস অফ ইন্ডিয়ার বিক্রি মাত্র দশ হাজার কপি। কিন্তু অফিস বাড়িটা প্রশস্ত।

মাঝখানে প্রকাণ্ড উঠোন। তারপরে ছাপাইয়ের হলঘর। সেখানে একটা রোটারি মেশিন ছিল। আমি যাবার পর আরও একটা রোটারি মেশিন বসানো হল।

এখানে হিন্দি এবং ইংরেজি কাগজের কর্মচারীদের পরস্পরের মধ্যে তেমন নির্লিপ্ততা নেই যেমন দেখেছিলাম কলকাতায়।

তখন দিল্লিতে টাইমস অফ ইন্ডিয়ার দু' বছর পূর্ণ হয়েছে। বোম্বাইয়ের দাপট একটু কমেছে। তার ওপর ডালমিয়াজির প্রিয় পাত্র যে ডিরেক্টার আমাদের কাজকর্ম দেখতেন তিনি সব বিষয়ে বোম্বাইয়ের হস্তক্ষেপ পছন্দ করতেন না। সাহেবদের নোঙর তোলবার সময় এসেই গিয়েছে। পরিচালন বিভাগের ওপরতলায় যে তিন-চারজন সাহেব কাজ করেন তাদের মেয়াদ অল্পই বাকি আছে। তাদের মধ্যে হ্যারিস যার নাম, তার জায়গায় আমি এসে গিয়েছি। অ্যাকাউন্টেন্ট হলের জায়গায় বসানো হয়েছে একজন মারোয়াড়িকে। বিজ্ঞাপনের জায়গায় বিনসের জায়গায় একজন দক্ষিণী বসে গিয়েছে। যিনি দিল্লির ওপর তখনও কিছু ছড়ি ঘোরাচ্ছেন বেশ দাপটের সঙ্গে তাঁর নাম স্নো। তিনি ছিলেন চিফ ইঞ্জিনিয়ার।

দিল্লিতে একটা অসুবিধায় পড়েছিলাম। কর্মচারীদের যত দরখাস্ত আসত তার বড় একটা অংশ উর্দুতে লেখা। পড়তে পারতাম না, বুঝতে পারতাম না কী চায়। কাউকে দিয়ে সেই দরখাস্ত পড়িয়ে নিতে হত অথবা দরখাস্তকারীকে ডেকে এনে তার মুখ থেকে বক্তব্য শুনতে হত।

আমি বাড়ি পেয়েছিলাম দরিয়াগঞ্জে। অফিস এবং মতিমহল থেকে সামান্য দূরে। দুটোই হেঁটে যাওয়া যায়। প্রথম দিকে লোকজন ঠিক হবার পূর্বে অনেক সন্ধ্যায় মতিমহলে ভোজন করেছি। দেখলাম এদের খাদ্য তালিকা সামান্যই। একটা সত্য তখন বুঝিনি। এখন খুব পরিষ্কার হয়ে গিয়েছে। এই খাদ্য তালিকা যত বড় হয় ভোজ্যের স্বাদে ততই গাফিলতি হতে থাকে। বিভিন্ন ব্যঞ্জনের মধ্যে অনেকগুলির ভ্যারিয়েশন করা যায়। কিন্তু তার একটা সীমা আছে। স্বাদে অত বেশি ভ্যারিয়েশন করা যায় না। মুরগি এবং মাংস মিলিয়ে মতিমহলে দশটির অধিক পদ ছিল না। লিখিত ভোজ্য-তালিকা না থাকায় আমার একটা ক্ষতি হয়ে গিয়েছিল। আমি জানতাম না এখানে তিতির পাওয়া যায়। সেই কবে শেষবার তিতিরের ব্যঞ্জন খেয়েছি কাশীতে। তার স্বাদ ও স্মৃতি এখনও ধরে রেখেছি। কিন্তু কোথায় পাওয়া যাবে না জানায় ইচ্ছা মেটাতে পারিনি।

বলা বাহুল্য অফিসে সবাই হিন্দিভাষী। আমি হিন্দি বলতে পারি, হিন্দিতে লেখা চিঠিপত্র পড়তে পারি। আমার মনে হয় এই কারণে আমি সহজেই কর্মীদের কাছে স্বীকৃত হলাম।

সেই সময় টাইমস অফ ইন্ডিয়ার সম্পাদকের পদ নিয়ে প্রায় ছোটদের মতন খেলা শুরু হয়ে গিয়েছিল। টাইমসের পরম্পরা, তার ঐতিহ্য, তার প্রাচীন অনুরক্ত পাঠকবৃন্দ—এ-সব ব্যাপারে ডালমিয়াজির কোনও দুর্ভাবনা ছিল না। অন্তত প্রকাশ্যে এ-সব নিয়ে কিছু বলেননি কখনও। ইংরেজ সম্পাদক চলে যাবার পর ডালমিয়াজি ভারতীয় সম্পাদক নিয়োগ করলেন। নেহরু তাঁর চোখের বালি। এমন সম্পাদক হওয়া চাই যিনি মনে প্রাণে নেহরু-বিরোধী এবং যাঁর কলম তীব্রতায় কারও চেয়ে কম নয়। প্রথমে সম্পাদক হয়ে এলেন ফিরোজ চন্দ্র। তিনি চিরকাল স্বদেশি করেছেন, বোধহয় সার্ভেন্টস অফ ইন্ডিয়ার অন্যতম সেবক ছিলেন। ইংরেজি ভাল লেখেন। ছোট দু'-একটা খবরের কাগজের সম্পাদকের কাজও করেছেন। কিন্তু টাইমসের মতো বিশাল সংবাদপত্র যেখানে রিপোর্টারের সংখ্যাই দু' ডজনের বেশি, নানাবিধ বিশেষজ্ঞের বিভাগ, সেখানে তিনি যে একেবারেই মিশ খাবেন না ফিরোজ চন্দ্রের বেশিদিন লাগল না সেটা বুঝতে। তিনি যাবার পর আবার সম্পাদক খোঁজা হল। এবার ডালমিয়াজি যাঁকে এনে উপস্থিত করলেন তিনিও ফিরোজ চন্দ্রের মতন নিষ্প্রভ, জং বাহাদুর রাণা। কিন্তু ভেতরে ভেতরে টগবগ করে ফুটছেন। জোর দিয়ে ছাড়া কথা বলেন না। তিনিও বড় খবরের কাগজ সম্বন্ধে সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞ। প্রবল বেগে নেহরুর সমালোচনা চলতে থাকল। খবর পাওয়া যায় নেহরু অত্যন্ত বিরক্ত হচ্ছেন। কিন্তু কিছু করবার উপায় নেই। তিনিও সংবাদপত্রের স্বাধীনতার পক্ষে আগে বক্তৃতা করেছেন।

ডালমিয়াজির যারা শত্রু তারা কিছু গোপন খবর পৌঁছে দেয়। সেইসব খবর সরকারের কাছে জমা হচ্ছে। একদিন তাদের আকস্মিক বিস্ফোরণ হল। ডালমিয়াজি অনুমান করতে পেরেছিলেন কিনা জানি না। আমি আমার নিজের কাজ করে যাই। প্রায় প্রতি প্রত্যুষেই ডালমিয়াজির কাছে জবাবদিহি করতে হত।

মাঝে একবার গোপালস্বামী নামে টাইমস অফ ইন্ডিয়ার ডেপুটি এডিটরকে সম্পাদক করা হয়েছিল। তিনি দেখা গেল ডালমিয়াজির উচ্চাকাঙ্ক্ষা পূরণে সক্ষম নয়। এখনও মালিকরা সহজে একটা কাগজকে দিয়ে তাদের স্বার্থসিদ্ধির

কাজ করিয়ে নেয়। কিন্তু তার মধ্যে একটু সূক্ষ্মতা থাকে। কিছু আড়াল থাকে। সহসা গূঢ় অভিলাষটা ধরা পড়ে না। ডালমিয়াজির ক্ষেত্রে এইসব সূক্ষ্ম জিনিস অবাস্তব অবান্তর ছিল। মনে আছে তিনি নেহরুকে উদ্দেশ করে পর পর কয়েকটা চিঠি লিখেছিলেন। তিনি নেহরুকে সম্বোধন করতেন "জাঁহাপনা" এবং "মহামহিম সম্রাট" বলে। সে-সব চিঠি কাগজে ছাপা হত। নেহরু এবং তাঁর অনুগতরা কিছু করতে পারতেন না।

শেষ পর্যন্ত অবশ্য টাইমসের সম্পাদকীয় বিভাগের একদা অন্যতম প্রধান ফ্রাঙ্ক মোরেসকে সম্পাদকের ভার দেওয়া হল। মোরেস কিছুদিন আগে সিংহলের একটি প্রধান দৈনিক সংবাদপত্রের সম্পাদক নিযুক্ত হয়ে চলে গিয়েছিলেন।

দিল্লি অফিসের ভার নিতে আমার কোনও অসুবিধা হল না। তার কারণ এতদিনে খবরের কাগজের বিষয়ে আমার খানিকটা অভিজ্ঞতা হয়েছে। দিল্লিতে কাজ করে আনন্দও ছিল। কারণ পরিবেশ টেনশনমুক্ত। এখানকার কাগজ দুটিও বোম্বাইয়ের উচ্চপদাধিকারীদের মনঃপূত পরিকল্পনা না হোক এখন তারা পরিস্থিতিটা স্বীকার করে নিয়েছে। তার ওপর শেঠজি স্বয়ং দিল্লিতে থাকেন এবং যে ডিরেক্টর আমাদের কাজকর্ম দেখাশোনা করছেন তিনি শেঠজির খুব নিকটের মানুষ। এখানেও কাগজ দুটি সাফল্য থেকে অনেক দূরে। লোকসানের বহর আরও বেশি। কিন্তু টাকা পেতে কোনও অসুবিধা হয় না। নিশ্চিন্ত মনে কাজ করা যায়। সুতরাং বন্ধুহীন পরিবেশে সকাল দশটা থেকে পাঁচটা পর্যন্ত শান্তিতে কাজ কবতে পারতাম। দুপুরে খাবার জন্য বাড়িতে আসতাম। তারপর দশ-পনেরো মিনিট বিশ্রাম করে আবার অফিস। অফিসে অধঃস্তন ম্যানেজারদের সঙ্গে সদ্‌ভাব ছিল। কাজের কোনও অসুবিধা হত না।

টাইমস অফ ইন্ডিয়ার মতো তখনও নবভারত টাইমসেও সম্পাদক নিয়ে পরীক্ষা চলছে। মাতাদিন ডগেরিয়া নামে যাকে ডালমিয়াজি সম্পাদক করে এনেছিলেন, তিনি জ্বালাময়ী বক্তৃতা করতে পারতেন। কখনও সম্পাদকীয় প্রবন্ধ লিখেছেন বলে আমার মনে হয় না। স্টেনোগ্রাফার তাঁর বক্তৃতা লিখে নিত। তিনি দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে অবিরত শ্রোতামণ্ডলীকে বলবার ভঙ্গিতে ডাইনে বামে তাকিয়ে তাঁর প্রবন্ধ বলে যেতেন। কাগজের জন্য কোনও ব্যাপারে তাঁর আগ্রহ ছিল না। তারপরে যিনি এসেছিলেন তার নাম রামগোপাল বিদ্যালঙ্কার।

তিনি অন্য প্রতিষ্ঠিত দৈনিকে সম্পাদকের কাজ করেছেন। তিনিও নিজের লেখা নিয়ে ব্যস্ত থাকতেন।

কাগজের বার্তা সম্পাদক ছিলেন অক্ষয়কুমার জৈন। তিনি পরে সম্পাদক হন এবং দীর্ঘকাল ওই কাজ নির্বাহ করেন।

টাইমস অফ ইন্ডিয়ার যিনি স্থানীয় সম্পাদক, তাঁর লেখার কোনও কাজই ছিল না। বস্তুত তিনি বার্তা সম্পাদকের কাজই করতেন। প্রতি সপ্তাহে একটা কলাম লিখতেন দিল্লির রাজনৈতিক আবহাওয়া বিশ্লেষণ করে। আমার তখন মনে হয়েছিল তাঁর সব থেকে বড় কাজ ছিল জনসংযোগ, যে কাজটা তাঁকে প্রায় করতে হতই না—অন্যেরা তাঁর সঙ্গে যোগাযোগ রাখত। হাজার হোক টাইমস অফ ইন্ডিয়ার স্থানীয় সম্পাদক। ভারতের এক নম্বর এবং দিল্লির দুই নম্বর কাগজ।

অফিসে বেশ ব্যস্ত থাকতে হত। আমি নিজে যে বিভাগে বেশি মনোযোগ দিতাম সেটা কাগজের বিতরণ ও বিক্রি। নতুন কাগজকে শহরের বাইরের কোনও এজেন্ট কোনও ডিপোজিট দিতে চায় না। এই প্রতিক্রিয়া তো স্বাভাবিক। কত কপি বিক্রি হবে জানা নেই, আদৌ হবে কিনা, কত দিনে কত কপি বিক্রি হতে পারে কে বলতে পারে। তখন অল্প অথবা বিনা ডিপোজিটে মফস্‌সলে নতুন এজেন্টকে কাগজ দিতে শুরু করলাম। শর্ত এই ছিল—তারা তিন-চার দিন অন্তর আমাদের জানাবে কাগজ কেমন বিক্রি হচ্ছে এবং প্রয়োজন মতো তাদের সরবরাহের সংখ্যা কমিয়ে-বাড়িয়ে দেবে। ফলে কোনও এজেন্ট বলতে পারত না যে তার কাছে কাগজ অবিক্রিত সংখ্যা অনেক বেশি। দ্বিতীয় শর্ত ছিল এজেন্টরা আমাদের মাসের শেষ নয়, প্রতি পনেরো দিনের শেষে টাকা পাঠাবে। অফিসকেও সতর্ক থাকতে হত। কোনও এজেন্ট টাকা এক মাসের মধ্যে না পাঠালে তার কাগজ পাঠানো বন্ধ করতে হত। এর নিট ফল হল অগ্রিম টাকা দিতে হচ্ছে না—এই বাড়তি সুবিধাটুকু এজেন্টরা কৃতজ্ঞতার সঙ্গে গ্রহণ করত এবং অফিসের লোকের মনে শান্তি ছিল যে কেউ টাকা না দিলে বড়জোর এক মাসের প্রাপ্য বাকি থেকে যাবে। টাইমস অফ ইন্ডিয়া এবং নবভারত টাইমস-এর বিক্রি ঊর্ধ্বমুখী।

অফিসে যতই কাজ থাক, বিক্রির বৃদ্ধি অন্যান্য সাফল্য অথবা ব্যর্থতা যতই ব্যাকুল করুক, আমি সন্ধ্যায় নিশ্চিন্ত ভাবনাহীন মনে আমার বাড়িতে ফিরতাম। অফিসের কথা মন থেকে সম্পূর্ণ বিসর্জন দিতাম। কিন্তু তার পরের সময়টা কী

করব? সপ্তাহের চারদিন সন্ধ্যায় মৌলবি সাহেব আসতেন। তাঁর কাছে আমি উর্দুর পাঠ নিচ্ছি। আমি বুঝতে পেরেছিলাম উর্দু না পড়তে পারলে ভাল করে কাজ করা যাবে না। উর্দু লিপির চল ছিল সমগ্র পাঞ্জাবে এবং সমগ্র উত্তর ভারতে। অনেক হিন্দুর কাছে বরং দেবনাগরী অপরিচিত লিপি। শুনেছি গীতাও নাকি উর্দু লিপিতে পড়া হত পাঞ্জাবে।

আমার উর্দু-শিক্ষা খুব বেশি দিন চলেনি। কারণ কিছুদুর এগিয়ে বুঝতে পারলাম উর্দ ভাষা শেখা সহজ, উর্দু লিপি আয়ত্ত করা সহজ নয়। কিন্তু যে কারণে আমার উর্দু শেখার আগ্রহ, যাতে আমি হাতে লেখা চিঠি পড়ে ফেলতে পারি, সেই কাজ আয়ত্তে আসতে বহুদিনের অনুশীলন লাগবে। কারণ উর্দু হাতের লেখায় প্রায়ই অক্ষরের নুকতাগুলি লেখা হয় না। শর্টহ্যান্ডের মতো লেখা থেকে পুরো শব্দ অনুমান করে নিতে হয়। অতএব দুরাকাঙ্ক্ষের বৃথা চেষ্টা একদিন বন্ধ করে দিলাম।

সারা সন্ধ্যা করার কিছু ছিল না। মাঝে মাঝে দু'-একটা বই কিনতাম, কয়েক দিনের মধ্যে শেষ হয়ে যেত। সময় কাটানো দুর্বিষহ হয়ে উঠেছিল। এমন সময় সৈয়দ মুজতবা আলী দিল্লি এসে গেলেন। বাসস্থান নিলেন কার্জন রোডের, এখন বিলুপ্ত, কনস্টিটিউশন ক্লাবে। দিল্লির সংবিধান রচনার সময় সৈন্যবাহিনীর পরিত্যক্ত এই বাড়িটায় সদস্যদের থাকবার জন্য ভাড়া দেওয়া হত। আলীসাহেব সরকারি কাজ নিয়ে দিল্লি এসেছিলেন। সম্পূর্ণ সরকারি কাজ নয়। তিনি সেক্রেটারি হয়ে এসেছিলেন ইন্ডিয়ান কাউন্সেল অফ কালচারাল রিলেশনের। এই প্রতিষ্ঠান শিক্ষা মন্ত্রালয়ের অধীনে। মৌলানা আজাদ তখন ভারতের শিক্ষামন্ত্রী। হুমায়ুন কবির ছিলেন সেই বিভাগের সেক্রেটারি। তখনও লোকসভার সদস্য হননি। দিল্লির রাজনীতিতে অতি সন্তর্পণে পা ফেলছেন।

এই ঘটনার কাছাকাছি সময় আমার অলস সময়গুলিকে উজ্জীবিত করবার জন্য আরও একটা ঘটনা ঘটল। অনন্দবাজার পত্রিকা দিল্লি থেকে হিন্দুস্থান স্ট্যান্ডার্ড প্রকাশ করা শুরু করল। নতুন দিল্লি রেল স্টেশন রামনগরের কাছে অনেকখানি জায়গা নিয়ে অফিস প্রতিষ্ঠা করা হয়েছিল। সেই বাড়ির নীচের তলায় প্রকাণ্ড রোটারি মেশিন বসল। হিন্দুস্থান স্ট্যান্ডার্ডের, পাঁচিল ঘেরা, একই হাতার মধ্যে কর্মচারীদের ফ্ল্যাট বাড়ি তৈরি হয়ে গেল।

হিন্দুস্থান স্ট্যান্ডার্ডের উদ্বোধনের দিনে আমার নিমন্ত্রণ হয়েছিল। এখানে

অধিকাংশ কর্মী বাঙালি। কয়েকজন আমার পরিচিত। তার মধ্যে একজনকে দেখে উল্লসিত হয়েছিলাম। তাঁর নাম সন্তোষকুমার ঘোষ।

সৈয়দ মুজতবা আলীকে আমি কলকাতা থেকে চিনতাম। সত্যযুগ প্রকাশনের আগে। তখন আনন্দবাজার পত্রিকাতে একটি কলম প্রকাশিত হত। লেখকের নাম ছিল "সত্যপীর"। লেখাটি প্রথম আবির্ভাবে আমাকে মুগ্ধ করেছিল। সম্পূর্ণ নতুন স্টাইলে লেখা। ভাষার মধ্যে স্বল্প পরিচিত হিন্দি উর্দু শব্দ।

আনন্দবাজার থেকে খবর নিয়ে আলীসাহেবের ঠিকানা জোগাড় করে একদিন আমি আর নীরেন চক্রবর্তী তাঁর বাড়িতে দেখা করতে গেলাম। মানুষটিকে দেখে ভাল লেগেছিল। মাথায় চুল খুব কম, উজ্জ্বল গৌরবর্ণ। সদ্য পাট-ভাঙা ধুতি আর আদ্দির পাঞ্জাবি-পরা মানুষটাকে দেখলেই পছন্দ হয়। চোখ দুটি প্রাণবন্ত বালকের মতন চঞ্চল। কথা বলেন দ্রুত। বলার ভঙ্গি বিশিষ্ট। কিছুক্ষণ কথা বলার পর বুঝলাম এই মানুষটির অভিজ্ঞতা অসাধারণ, স্মৃতি অতি গভীর। উর্দু, পার্শিয়ান, জার্মান বা ফরাসি ভাষা থেকে অজস্র উদ্ধৃতি দিতে পারেন। যা বলেন তা যথোপযুক্ত জোর দেবার জন্য সঙ্গে ছোট গল্পও যোগ করেন। যেন এই ঘটনাটির ব্যাখ্যা দেবার জন্যই ওই গল্পটা তৈরি হয়েছে। আর তাঁর গল্পের উৎস হল সংস্কৃত, ফরাসি, জার্মান, আরব সাহিত্য।

আলীসাহেব বললেন, লেখার নিন্দা, প্রশংসা মেয়েদের শাড়ি জামার মতো। যেটা স্থায়ী সেটা হল অলংকার। তেমনি এ ক্ষেত্রে যথোপযুক্ত পারিশ্রমিক পেলে তবেই তিনি মনে করেন তাঁর লেখার তারিফ হয়েছে।

তখনও সত্যযুগ ছাপা শুরু হয়নি। সেখানে তাঁর লেখার সুযোগ কম। পূজা সংখ্যা ছাড়া কালান্তরে দু'-তিনটি ছোট গল্প ছাপা হয়েছিল। তাঁর বিদ্যা ও বচনের দ্যুতিতে এমনই সম্মোহিত ছিলাম যে একটা অন্য কাগজে পূর্ব প্রকাশিত তাঁর গল্পও আমি কালান্তরে ছেপে ছিলাম। সান্ত্বনা এই ছিল যে প্রদেয় পারশ্রমিক কিঞ্চিৎ কম।

তারপর তাঁর ওখানে মাঝে মাঝে যাতায়াত করেছি। তিনিও আমাদের বাড়িতে এসেছেন, বাবা, মা এবং আমার স্ত্রীর সঙ্গে পরিচয় হয়েছে, গল্প করেছেন। দেখেছি মানুষটার মুখ একটু আলগা হলেও তিনি সমাজের সব স্তরের মানুষের সঙ্গে অনায়াসে মিশতে পারেন। সেই মানুষ দিল্লিতে এসে উপস্থিত হয়েছেন দেখে আমার আনন্দের পরিসীমা ছিল না।

হিন্দুস্থান স্ট্যান্ডার্ডের উদ্বোধনে গিয়ে যাঁর সঙ্গে দেখা হয়েছিল সেই সন্তোষকুমার ঘোষও আমার অতি পরিচিত মানুষ। তার কারণ তিনি আমার অনুরোধে একটি উপন্যাস লিখতে শুরু করেছিলেন কালান্তরে। "নানা রঙের দিন"। উপন্যাস শেষ হবার আগেই কালান্তর বন্ধ হয়ে যায়। তখন তিনি কলকাতায় স্ট্যার অফ ইন্ডিয়া বা স্টেটসম্যানের কাজ করতেন। এখন দিল্লিতে হিন্দুস্থান স্ট্যান্ডার্ডের বার্তা সম্পাদক হয়ে এসেছেন। যদিও বাঙালি মহল্লায় থাকেন, কাজেও অনেক সময় দিতে হয় কিন্তু তিনি বন্ধু খুঁজছিলেন যার সঙ্গে আনন্দে অবসর কাটানো যায়। আমি তাঁকে পেয়ে অপার আনন্দ পেয়েছিলাম। সন্তোষের স্মৃতিশক্তি খুব ভাল ছিল। সংস্কৃত, ইংরেজি ও বাংলা সাহিত্য থেকে অনায়াসে উদ্ধৃতি দিতে পারতেন। ইংরেজি লিখতেন খুব ভাল। আমার তখন বিশ্বাস হয়েছিল যে বাংলা সাহিত্যে বিভূতিভূষণ, মানিক, তারাশঙ্করের পরে চূড়ায় আসন গ্রহণ করবেন পরের তিনজন সাহিত্যিক—নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়, নরেন্দ্রনাথ মিত্র এবং সন্তোষকুমার ঘোষ। আমার বিশ্বাস অবশ্য সত্যে পরিণত হয়নি। কিন্তু সে অন্য কথা। যে সময়ের কথা লিখছি তখন আমি সন্তোষের ভাষা, স্টাইল এবং গল্প বলার টেকনিক-এ মুগ্ধ হয়ে আছি।

সৈয়দ মুজতবা আলী এবং সন্তোষ ঘোষ দিল্লি এসে পড়ায় আমার অবসর যাপনে কোনও অসুবিধা রইল না।

সন্তোষের কাজের চাপ থাকত রাত্রে। সন্ধ্যায় প্রথম দিকে তাঁকে প্রায়ই পাওয়া যেত। তখন আলীসাহেবের বাসস্থানে দু'জনে আড্ডা মারতে যেতাম। আলীসাহেব অফিস থেকে ফিরে স্নানাদি সেরে, চা পান সমাপ্ত করে সবে জিনের গেলাস হাতে নিয়ে বসেছেন, তখন আমরা পৌঁছতাম। ওঁর একজন রান্নাবান্না করার লোক ছিল। সে আমাদের জন্য পকোড়া জাতীয় কিছু তৈরি করত। কিন্তু আমাদের প্রাথমিক উদ্দেশ্য ছিল আড্ডা জমানো। আমরা গেলে আলীসাহেব বরাবরই তাঁর পানীয় আমাদের দিতে চাইতেন। আমরা তখনও ও পথে একেবারেই গোবিন্দ দাস। হুইস্কি আর জিনের তফাত বুঝি না। মাহাত্ম্যও নয়। তুমুল আড্ডা জমত। বহু সন্ধ্যাতে সন্তোষের অফিসে যেতে দেবি হয়ে যেত। রাজনীতি, দিল্লিব হালচাল, সরকারি চক্র, সাহিত্যের গতিপ্রকৃতি ইত্যাদি নিয়ে মনোরম সেই দুই-আড়াই ঘণ্টার আড্ডা। আরও দু'-একজন যোগ দিতেন। লজ্জার কথা, আমি নাম ভুলে গিয়েছি। কিন্তু প্রায়ই অতিথি ছিলেন দুটি বাঙালি যুবক। তারা উচ্চাকাঙ্ক্ষী হবু সাহিত্যিক। দু'জনেই একটা বা দুটো বই লিখেছে।

অনেক পরের একটা ঘটনা এখানে বলে নিই। আমাদের সভায় কয়েকদিন হল একজন নতুন আগন্তুককে দেখতে পাচ্ছি। তিনি এসে আমাদের পিছনে বসে থাকেন, এক-দু' ঘণ্টা থেকে আবার চলে যান। তিনি কার আমন্ত্রণে এখানে উপস্থিত হন আমরা কেউ জানি না। চা হলে আলীসাহেবের পরিচারক তাঁকেও চা দেয়। তিনি কোনও কথা বলেন না। কোনও বিষয় জানতে চান না, আবিষ্ট হয়ে তিনি আমাদের কথাবার্তা শোনেন।

একদিন সকালে খবরের কাগজে একটা খবর দেখে আতঙ্কিত হয়েছিলাম। কনস্টিটিউশন ক্লাবের একটা অংশ ভেঙে পড়েছে। কেউ হতাহত হননি। কাগজে আরও লিখেছে যে বহুদিন ধরে এই বাড়িটি ভেঙে ফেলবার তালিকায় আছে। পশ্চিমি সৈন্যরা সাময়িক বাসের জন্য অতি দ্রুত তৈরি করা এই বাড়িতে ছিল। তারা কবেই চলে গিয়েছে, সেই ৪৫/৪৬ সালে। এই বাড়ির আয়ু কয়েক বছর আগেই শেষ হয়ে গিয়েছে বলে ঘোষণাও নাকি হয়ে গিয়েছিল। অন্তত সরকারি নথিপত্রে।

আলীসাহেবকে টেলিফোন করেছিলাম সঙ্গে সঙ্গে। তিনি বললেন তাঁর ঘরের কয়েকটা ঘরের পরের অংশ কাল রাত্রে ধসে পড়ে। সেই ঘরে কেউ বাস করে না। তিনি বহাল তবিয়তে আছেন। খোদা তাঁকে এখনও ডাকেননি।

সন্ধেবেলায় সন্তোষ এবং আমি আলীসাহেবের বাড়িতে গেলাম। সেই পরিচিত চেহারা, হাতে জিনের গ্লাস নিয়ে একটা হেলানো চেয়ারে আলীসাহেব বসে আছেন। আমাদের সেই দুই বন্ধু, যারা ভাবী সাহিত্যিক তারাও উপস্থিত। এমন সময়ে তৃতীয় সেই অনাহুত অতিথিও এসে ঢুকলেন। আমরা তখন কনস্টিটিউশন ক্লাবের ধসে পড়ার কথা বলছি। হঠাৎ সেই ভদ্রলোক আমাদের কথায় যোগ দিলেন। বললেন, "কী জানেন, খবরটা আমি আগেই জানতাম। এই ক্লাব বাড়িটা কনডেমড ঘোষিত হয়েছে ক'দিন আগে। আপনাকে এই খবরটা দেব আর এই বাড়িটা ছেড়ে দিতে অনুরোধ করব বলেই আসি। কিন্তু আপনাদের গল্পে আমি এমনই মন্ত্রমুগ্ধ হয়ে যাই যে কথাটা আজও বলা হয়ে ওঠেনি।

তার কথা শুনে খুব বিরক্ত এবং বিমুগ্ধও হয়েছিলাম মনে পড়ে।

আলীসাহেব যে কাজটা করতেন সেটা তাঁর খুব মনঃপূত ছিল না। আসলে আমার সন্দেহ হত কোনও কাজই তাঁর মনোমতো নয়। কারণ তিনি লেখাপড়া জগতের মানুষ। তার বাইরে অন্য কিছু তাঁকে আকর্ষণ করত না।

রবিবার দুপুরে প্রায়ই সন্তোষের বাড়িতে যেতাম। তখনও আমাদের মদ্যপানের হাতেখড়ি হয়নি। নানা আলোচনার নেশায় সময়টা সহজেই কেটে যেত। অন্য কোনও নেশার জিনিসের প্রয়োজন অনুভব করিনি। দুপুরে সন্তোষের বাড়িতে ভোজন হত। সন্তোষের বাবা অনেকদিন আগেই চলে গিয়েছেন। মা তাঁর সঙ্গে থাকতেন। দুটি শিশু কন্যাও ও স্ত্রী—এই নিয়ে সন্তোষের সংসার। রান্নার কাজটা তাঁর মা-ই করতেন। আমার বিশ্বাস, তিনি করতে ভালবাসতেন। এমন সব স্বাদের চমকপ্রদ নিরামিষ রান্না আমি আগে কখনও খাইনি। সন্তোষের মায়ের নিরামিষ রান্নার অফুরন্ত ভাণ্ডার ছিল। হয়তো মাছ রান্নাতেও তাঁর সমান দক্ষতা ছিল। আমি মাছ খাই না বলে সেই বিভাগে তাঁর দক্ষতা আমার কাছে প্রকাশ পাবার সুযোগও হল না। মাংস রন্ধন করতেই হত—কারুর পাতে বুঝি নিরামিষ রান্না দিতে নেই। ভোজনের পরে যেমন সন্তোষের বাড়িতে হত তেমনই অনেক দিন ভোজনের পর আমার বাড়িতেও সেরকমই হত। বালিশ মাথায় দিয়ে অথবা তাকিয়া নিয়ে খাটের ওপর বসে উদ্দাম আড্ডা হত।

মনে আছে এই সময়টা সাহিত্য নিয়েই আলোচনা হত। সন্তোষ রবীন্দ্রনাথের কবিতার ভক্ত ছিল। তাঁর কবিতা, গান সহজেই উদ্ধৃত করতে পারতেন, আমি প্রধানত শ্রোতা। বিকেল আসতে দেরি হত না। বিকেল গড়িয়ে সন্ধ্যা। হয়তো সন্তোষের ডিউটি থাকত। আমাদের সেদিনকার আড্ডা ভঙ্গ করতে হত। পরিচয়ের বৃত্ত ছোট ছিল বলেই এই সামান্য আয়োজনেই জীবনটাকে পরিপূর্ণ মনে হত।

বাঙালির আড্ডার প্রতি একটা মোহ আছে। আলীসাহেবের মতো সুকথক, সন্তোষের মতো স্পষ্টভাষী আমাদের আড্ডাকে সবসময়ই প্রাণবন্ত করে রাখত। শেষের দিকে পরপর দ্বিপ্রহরে আমরা যে আলোচনায় কাটিয়েছি সেই বিষয়বস্তুর নায়ক ছিলেন কমলকুমার মজুমদার। তাঁর একটি গল্প পরিচয়ে বেরিয়েছিল অথবা চতুরঙ্গে। আমি পড়ে বাক্‌রহিত হয়ে গিয়েছিলাম। তার খানিকটা সন্তোষকে পড়ে শোনালাম। কমলকুমার তখন ভাষার বিন্যাস নিয়ে ব্যস্ত। বাক্যের যে পরিচিত গঠন, তাকে অপ্রত্যাশিতভাবে দুমড়ে মুচড়ে দেওয়া এমন লেখা আগে পড়িনি। সেই গল্পটি আজ আর আমার মনে নেই। তেমন কিছু উঁচু দরের ছিল না। কিন্তু লেখকের বলার বিচিত্র ঢঙে পাঠক আকৃষ্ট না হোক চমকিত না হয়ে পারে না। আমাদের অনেক দুপুরে কমলকুমার

মজুমদার আমাদের আড্ডাকে লঘু এবং হাস্যময় করে তুলতেন। তখনও তাঁর বেশি লেখা বেরোয়নি। সন্তোষ তাঁর কিছু অন্য লেখা পড়েছিল। এই মানুষটার শক্তি ও নতুনত্বে তাঁর স্পষ্ট ধারণা ছিল। প্রথমত তাঁরই প্ররোচনায় আমার সঙ্গে কমলকুমার মজুমদারের পরিচয়। দিল্লির আড্ডার অনেক পরে আমরা দু'জনেই যখন কলকাতায় তখন কখনও সন্তোষ কোনও ভাল লেখা পড়লে আমাকে বলতেন। কমলকুমারের পরের লেখাগুলি আমি সেই কারণে পড়েছি।

কমলকুমার নিঃসন্দেহে শক্তিশালী লেখক ছিলেন। কিন্তু তাঁর বাংলার বাগ্‌রীতি, খামখেয়ালিপনা, বিনা প্ররোচনায় ব্যাকরণকে সম্পূর্ণ অগ্রাহ্য করা হয়তো পাঠককে আকর্ষণ না করে বিকর্ষণ করত। কিন্তু আমার স্বীকার করতে দ্বিধা নেই যে আমার অনেক দুপুর আমোদে কেটেছে তাঁর লেখা পড়ে। এই আপাত অসংলগ্ন বাক্য গঠনের কোনও গূঢ় তাৎপর্য আছে তখন বুঝতে পারিনি। একজন শক্তিধর লেখক কেন, কী মহৎ উদ্দেশ্যে এমন আচরণ করেন তখন বুঝতে পারিনি। এখন তার অনুগামীদের সমর্থনসূচক বহু লেখা পড়ে আজও তৃপ্ত হই না।

আজকের হিসেবে আমাদের দিল্লির দিনগুলি বন্ধ্যা। কিন্তু তারা আমাকে সন্তুষ্ট করে ছিল।

দিল্লির হিন্দুস্থান স্ট্যান্ডার্ড দু'-এক বছরের মধ্যে বন্ধ হয়ে যায়। সন্তোষ কলকাতায় ফিরে আসেন। আমার কলকাতা বাসের তৃতীয় পর্বে সন্তোষ আনন্দবাজারের অন্যতম প্রধান। তাঁর নিজের অফুরন্ত প্রাণশক্তি অতি সহজেই কাগজটার মধ্যে সঞ্চারিত করেছিলেন। গত শতাব্দীর প্রথম অর্ধের খবরের কাগজ দ্বিতীয় অর্ধে বিষয়বস্তু, গঠন, লেখার ধারা ইত্যাদির যে পরিবর্তন দেখেছে তাতে সন্তোষের অবদান অসামান্য।

এয়ার ইন্ডিয়ার প্লেনে চড়ে জেনিভা হয়ে মিউনিখ যাব। নতুন কাজ নতুন দেশ দেখার আনন্দ—এ-সব ছাপিয়ে মনে দুর্ভাবনা। সঙ্গের দু'জন অধস্তন সাহেবকে কি আমার যোগ্যতা বোঝাতে পারব। এরা যদি বুঝে যায় যে আমি বড় কাগজ, বড় ছাপাখানা, দ্রুতগতির ফটোগ্রাফিওর মুদ্রণ এ-সব সম্বন্ধে অনভিজ্ঞ তা হলে ফিরে এসে এদের চালনা করা সহজ হবে না। অথচ এখানে এয়ার ইন্ডিয়ার প্লেনে বসে জেনিভা যাবার পথে আমি এদের ওপর নির্ভর।

এরা আগে কয়েকবার দীর্ঘ বিমানে সফর করেছে। আর আমার এই প্রথম। সব ব্যাপারে আমাকে এদের অনুসরণ্ করতে হচ্ছে।

সাহেবদের রকম সকমই আলাদা। আমি একটা প্রকাণ্ড কেবিন ট্রাঙ্ক নিয়েছিলাম। ফিরতে ফিরতে শীত শুরু হয়ে যাবে। এক মাসের অধিক থাকব ইউরোপে। যথেষ্ট জামা কাপড় নিতে হয়েছিল। আর আমার সঙ্গের চিফ ইঞ্জিনিয়ার প্র্যাট সঙ্গে একটা বারো ইঞ্চি অ্যাটাচি কেস নিয়েছেন। সেটা তাঁর হাতেই আছে, প্লেনে ওঠবার সময় সেটা জমা দিতে হয়নি। কী ধরতে পারে ওইটুকু অ্যাটাচি কেসে। স্যুট তো অবশ্যই নেই, একটা প্যান্ট.থাকলেও থাকতে পারে, আর হয়তো দু'-একটা শার্ট। আমি ভেবে কূল পাই না। প্র্যাট অবশ্য মাত্র সাতদিন থাকবেন।

প্রায় কুড়ি ঘণ্টা বিমান যাত্রার পর সকালের দিকে ঘোষণা শুনলাম যে আমরা জেনিভার কাছে এসে পৌঁছেছি। কিন্তু আবহাওয়া এত খারাপ যে আমরা লন্ডন চলে যাচ্ছি। আমি তো স্তম্ভিত। কী হবে তা হলে? জেনিভা থেকে মিউনিখ যাবার পাকা টিকিট আমার হাতে, তারই বা কী হবে। লন্ডন নেমেই বা কী করব। সেখান থেকে মিউনিখ যাবার কী উপায় হবে? এমন দুর্ভাবনায় আমি ভারী অস্বস্তিতে পড়লাম। আবার সেই সাহেবদের জিজ্ঞাসা করতে হল। সারাক্ষণ ইংরেজি বলে বলে ক্লান্ত হয়ে গেছি। সাহেবরা লন্ডন যাচ্ছি শুনে ভারী খুশি। বলল একদিন সেখানে রেখে দিলেও হয়।

পরে দেখলাম দুর্ভাবনার কোনও কারণ ছিল না । লন্ডন এয়ারপোর্টে নামা মাত্র এয়ার ইন্ডিয়ার লোকেরা আমাদের প্যানঅ্যামের মিউনিখগামী একটি প্লেনে উঠিয়ে দিল। আমার এমনই দুর্দৈব যে এই প্লেনটা সেদিন মিউনিখ যেতে পারল না। যাবার পথে যাত্রী ওঠা নামার জন্য ফ্রাংকফুর্টে থেমেছিল। সে রাত্রে আমাদের ফ্রাংকফুর্ট থেকে যেতে হয়েছিল—সে আর এক যন্ত্রণা। প্রথম যাত্রায় এত বিঘ্ন শুভলক্ষণ বলে ভাবতে পারলাম না। যাই হোক মিউনিখ পৌঁছে মেশিন প্রস্তুতকারকদের গাড়িতে উঠে অটোবান ধরে গন্তব্যস্থল অগ্‌সবার্গ পৌঁছলাম। এইখানে মেশিন তৈরির কারখানা।

কলকাতা ছাড়বার আগে বাবা বলে দিয়েছিল ও দেশে মাথায় টুপি পরতে হয়। কলকাতায় টুপি কেনা হল না। বোম্বাইতে দেখি হোয়াইটওয়ে লেডল উঠে যাবার আগে সব মাল বেচে দিচ্ছে। আমি একটা টুপি দেখলাম। টুপিটার দাম বেশি বলে কেনা হল না। ঠিক করলাম বিদেশে গিয়ে কিনব। অগ্‌সবার্গ

গিয়ে দেখলাম জার্মান কর্তারা সবাই টুপি পরে আছে। কোনও অফিস বা বাড়িতে গেলে টুপিটা খুলছে। মেশিন পরিদর্শন করছে সেখানেও টুপি, গাড়িতে চড়ে এখানে ওখানে যাচ্ছে সেখানেও টুপি মাথায়। আমার সঙ্গীদেরও মাথায় টুপি। কেবল আমারই নেই। সন্দেহ হচ্ছে আমার জন্য তাদের অস্বস্তি হচ্ছে । লাঞ্চের পর আমাদের হোস্টেলের পাশে একটা টুপির দোকানে গিয়ে দেখি দরজা বন্ধ। বিফল মনোরথ হয়ে ফিরে আসছি। কাচের দরজার ওপাশ থেকে আমাকে একজন ডাকছে। তখন বুঝতে পারলাম এখানে দরজা ভেজানো থাকে, ছোট-বড় সব দোকানে দরজা ঠেলে ঢুকতে হয়।

শোকেস থেকে একটা ছাই রঙের টুপি পছন্দ হল। দোকানদারকে ইঙ্গিতে বোঝালাম ওইরকম একটা টুপি আমার চাই। অতি কষ্টে ইংরেজিতে বোঝালাম। তার আগে আমাকে জিজ্ঞাসা করল আমার টুপির সাইজ কত? প্রশ্ন শুনে আমি নিরুত্তর। টুপির আবার সাইজ কী? মাথার চওড়া দিকের না লম্বা দিকের? শার্টের কলারের মাপ হয় জানি। গলার পরিধি মেপে, যেমন আমার সাড়ে পনেরো ইঞ্চি, টুপির মাপও কি মাথার পরিধির ওপর হয়। প্রস্তাব করলাম মাপ যখন জানি না একটা টুপি পরে দেখলেই তো হয়। দোকানদার আনন্দের সঙ্গে নয়, দ্বিধার সঙ্গে, একটা টুপি আমার হাতে দিল। আমি টুপিটা প্রায় মাথায় দিয়েই ফেলেছি, দোকানদার রোককে রোককে বলে আর্তনাদ করে উঠল। বুঝতে দেরি হয় না আমার ভারতীয় চুলে আগের দিনের ভারতীয় তেল পালিশ করা মুক্তোর মতো চকচক করছে। মাথার তেল লাগলে টুপিটা নষ্ট হয়ে যাবে। মাথার থেকে এক ইঞ্চি উপরে ধরে আন্দাজে একটা টুপি কেনা হল। আদৌ সস্তা হল না। হোয়াইটওয়ে লেডলের দামের থেকে বেশিই লেগেছিল। তারপর থেকে আমার আত্মবিশ্বাস একটু বাড়ল। আর পাঁচজনের মতো টুপি মাথায় রাখলাম। কয়েক বছর পরে পূর্ব জার্মানিতে বার্লিন থেকে লাইপজিগের পথে ভোজনের জন্য গাড়ি থেকে নেমেছি। প্রবল হাওয়া দিচ্ছিল। এক সাইজ বড় টুপি হাওয়াতে উড়ে গেল। সামনে বরফ ঢাকা প্রান্তর। টুপি তার ওপর দিয়ে অতি সহজেই চলে যেতে লাগল। আমি কিছু দূর গিয়ে ক্ষান্ত দিলাম। কারণ টুপির সঙ্গে রেসে পারছি না। এবং বরফের ওপর দিয়ে যেতে ভরসাও হচ্ছে না। আমার ভাগ্য প্রসন্ন। ততদিনে টুপির দাপট সমগ্র ইউরোপে কমে এসেছে।

বড়, ছোট, বেশি দামি, কম দামি কোনও জিনিস কেনার আমার অভিজ্ঞতা ছিল না। তাদের ভালমন্দ বোঝবার ক্ষমতা আমার নেই। শেঠজি যেটা জানতে চেয়েছিলেন অর্থাৎ এই মেশিনের আসল দাম কী সে কথা কাকে জিজ্ঞাসা করব বুঝতে পারি না। ছাপার যন্ত্রটির কর্মক্ষমতা দেখে আমি অবাক। ছিয়ানব্বই পাতার একটি ইলাসট্রেটেড উইকলির মতো পত্রিকা একসঙ্গে ছাপা হয়ে, যার মধ্যে ষোলো বা বত্রিশ পাতা পত্রিকার আকারে ভাঁজ হয়ে মাঝখানে স্টিচ করে ঘণ্টায় পনেরো হাজার কপি বেরিয়ে আসছে। আমি তাতেই চমৎকৃত। তখনও জানি না ভবিষ্যতে স্টিচিং বাদ দিলে ঘণ্টায় আশি হাজার কপি ছাপার মেশিন তৈরি হবে।

সমগ্র যন্ত্রটির গুণাবলী এবং যন্ত্রাংশগুলির নির্ভরযোগতা নিরূপণ করা—দুইই আমার ক্ষমতার বাইরে। সঙ্গী সাহেব দু'জন সন্তুষ্ট হয়ে বলল সব ঠিক আছে। তাদের একজন মেশিন চালাবে আর একজন রক্ষণাবেক্ষণ করবে। কাজেই তাদের মতামত নিঃসন্দেহে নির্ভরযোগ্য।

এখানে সব কিছু ভাল—এ-কথা বলবার অন্য একটা কারণ ছিল যদিও। আমাদের যে পরিমাণ খিদমত হল তা আমার কল্পনার অতীত। তদুপরি মাঝে মাঝে দিনের অর্ধেক সময় এবং শনি ও রবিবারে আমাদের নানা মনোরম স্থানে বেড়াতে নিয়ে যাওয়া হত। ভোজ্য অথবা পানীয়ের কার্পণ্য ছিল না। কখনও সঙ্গে সেলস ডিরেক্টর থাকেন অথবা তার সহকারী। কাজটা ছিল চার-পাঁচদিনের। কিন্তু অত আতিথেয়তা ছাড়তে কারুরই মন চায় না। আমরা পুরো দু' সপ্তাহ অগ্‌সবার্গে কাটিয়ে লন্ডনে ফিরলাম।

লন্ডন অফিসে খোঁজ নিয়ে জানলাম যে ডালমিয়াজি লন্ডনে এসে গিয়ছেন। অভিজাত পল্লী গ্রোভনার স্কোয়ারে অ্যাপার্টমেন্ট নিয়েছেন। তিনি নাকি আমার খোঁজও করেছেন। সুতরাং একদিন তাঁর সঙ্গে দেখা করতে গেলাম। ভাগ্যক্রমে তিনি আর মেশিনের আসল দামটা জানতে চাইলেন না। মেশিন দেখে সন্তুষ্ট হয়েছি—এ-কথা জানানোর পর তিনি আমাকে জিজ্ঞাসা করলেন, মেশিন যে ঠিক ছিল তুমি কী করে বুঝলে? আমার উত্তর তাঁর মনঃপূত হয়েছিল। বলেছিলাম আমাদের বরাত দেবার আগে মেশিনের যে যে গুণাবলী বিবৃত করেছিল প্রস্তুতকারীরা, তারা সবগুলি সুষ্ঠুভাবে প্রকট ছিল। সেইজন্য আমার মনে হয়েছে এই যন্ত্র আমাদের মনোমতো।

শেঠজি বললেন, তুমি তো জার্মানি ঘুরে এলে, এক বাক্যে সে দেশের

বিশেষত্ব কী আমাকে বলে দাও। প্রশ্ন শুনে ঘাবড়ে গেলাম। দু'-চার বাক্যেও জার্মানির কী প্রশস্তি অথবা নিন্দা করব স্থির করতে পারিনি। অনেক ভেবে বললাম যে ও দেশে চাপরাশি, বেয়ারা বা সেপাই নেই। যে যার কাজ নিজের মতো করে চলেছে। কিছু আনতে হলে বা কাউকে কিছু দিয়ে আসতে হলে কর্মীকে সেটা নিজেই করতে হয়। সাধারণ কর্মী হোক অথবা প্রধান পরিচালক সবার জন্যই এই ব্যবস্থা। দু'-চার হাজার কর্মী কাজ করে MAN কোম্পানিতে। কিন্তু সেখানে যাকে আমরা বলি আনস্কিলড—এমন লোকের স্থান নেই।

কথাটা ডালমিয়াজির মনে ধরেছিল। এখানেই থামলে হত। কিন্তু অল্পবুদ্ধি আমার মাত্রাজ্ঞান সামান্য বলে আমি আরও অনেক খবর দিলাম। এটাও জানালাম যে MAN-এর সেলস ডিরেক্টর একদিন আমাদের তিনজনকে তাঁর বাড়িতে নিমন্ত্রণ করে ডিনার খাইয়েছেন। সন্ধের পরেই আমরা যখন তাঁর বাড়িতে পৌঁছলাম ততক্ষণেই তাঁর স্ত্রী রান্নাবান্না সেরে আমাদের অভ্যর্থনার জন্য তৈরি। তাঁর কাজে সাহায্যের জন্য কোনও লোক নেই। শুনলাম একটি মেয়ে সপ্তাহে একদিন আসে তাঁদের বাড়ি পরিষ্কার করার জন্য। আহারাদির পর সেলস ডিরেক্টর স্বয়ং বাসনপত্র সাফ করতে আমাদের অনুমতি নিয়ে স্ত্রীর সঙ্গে যোগ দিলেন। শেঠজি এই বিবরণ শুনে তৎক্ষণাৎ তাঁর স্ত্রীকে ডেকে পাঠালেন।

—তুমি লোক চাই, বেয়ারা চাই, পাচক চাই বলে হাঙ্গামা কর। এর কাছে শোনো, পৃথিবী বিখ্যাত MAN কোম্পানির ডিরেক্টরের বাড়িতে কোনও কাজের লোক নেই। তাঁর স্ত্রী রান্না করেন, পরিবেশন করেন এবং স্বয়ং তিনি বাসন ধোয়ায় সাহায্যও করেন। বাক্য শুনে শেঠজির স্ত্রী এমন মলিন মুখে, কাতর চোখে তাকিয়ে থাকলেন যে আমি মরমে মরে গেলাম।

লন্ডন ফেরার পথে আমি মিউনিখ এবং ফ্রাংকফুর্টে দু'-একদিন ছিলাম। বম্বে অফিস থেকে ব্যবস্থা করে নিয়েছিলাম যাতে আমি কয়েকটি খবরের কাগজের অফিস দেখতে পারি। মিউনিখের যে কাগজের অফিসে গেলাম সেটা একটা পুরনো খবরের কাগজ। মিত্রশক্তির বোমায় অনেকাংশ ধ্বংস হয়ে গিয়েছিল। এখন নতুন করে উঠে দাঁড়াবার চেষ্টা করছে। সম্পাদকের সঙ্গে দেখা হল। তাঁদের বিষয়ে জানবার জন্য আমার প্রশ্নের শেষ নেই। তিনি স্থিরভাবে উত্তর দিলেন। বললেন দেশের মানুষ এই তো স্বাধীন হয়েছে পাঁচ বছর হল। হিটলারের শাসনে কোনও মানুষেরই স্বাধীনতা ছিল না। খবরের কাগজের তো নয়ই।

আমরা ভারতীয়রা প্রায় একই সময় স্বাধীন হয়েছি। আমাদের সম্বন্ধে জানবার কোনও কৌতূহল সম্পাদকের মধ্যে দেখলাম না। শুধু জানতে চেয়েছিলেন আমরা কোন ভাষায় সংবাদপত্র প্রকাশ করে থাকি। আমাদের দেশে আঠারো-কুড়িটি ভাষায় সংবাদপত্র বের হয় শুনে তিনি খুব বিস্মিত হয়ে বললেন, তার মানে তোমরা সবাই পনেরো-কুড়িটি ভাষা পড়তে পার বা লিখতে পার।

ফ্রাংকফুর্টের যে সংবাদপত্র অফিসটাতে গিয়েছিলাম সেটা ঠিক ফ্রাংকফুর্টে নয়। নদীর অপর পারে অবস্থিত কাগজটির নাম "ওফেনবাখ আবডেন পোস্ট" অর্থাৎ ওফেনবাখ শহরের সান্ধ্য পত্রিকা প্রতিষ্ঠা হয়েছে যুদ্ধের পর। অর্থাৎ মাত্র পাঁচ বছর আগে। কিন্তু তখনই কাগজটার বিক্রি লক্ষাধিক। অতি সফল সংবাদপত্র। অফিসের বাড়ি, নতুন আসবাবপত্র, নতুন যন্ত্রপাতি সবই আধুনিক। সম্পাদক আমাকে সাদর অভ্যর্থনা করলেন। একটা পায়ে কোনও চোট আছে, হাঁটতে কষ্ট পান, হয়তো যুদ্ধের আঘাতের চিহ্ন। মানুষটির বেশ মনখোলা ও কৌতূহলী। প্রসঙ্গত বলি জার্মানির যে-সব অঞ্চলে গিয়েছি

সেখানেই তখনও যুদ্ধের ক্ষত বর্তমান। ইট, কাঠ, লোহা, পাথরের জঞ্জাল সরিয়ে নেওয়া হয়েছে। কিন্তু তখনও শহরের বিভিন্ন অঞ্চলে বড় বড় ক্রেটার বা গহ্বর দেখা যায়। এখানে একদা কোনও বিখ্যাত সৌধ ছিল! আজ তার চিহ্ন মাত্র নেই। আরও একটা জিনিস জার্মানিতে লক্ষ করলাম। পঁচিশ বা তিরিশ বছরের অধিক বয়সের অধিবাসী, তাদের সকলেরই শরীরে যুদ্ধের কোনও না কোনও চিহ্ন আছে। হাত অথবা পা নেই। কিংবা কোনও প্রতিবন্ধ। এমন যৌবনোত্তর মানুষ প্রায় দেখাই যায় না যার শরীরে কিছু বিকল নয়। শ্রবণশক্তি অভাব বহু মানুষের। যুদ্ধ তার পৈশাচিক চিহ্ন শুধু শহরের গায়েই নয় মানুষের শরীরেও বীভৎস ভাবে রেখে গিয়েছে।

ফ্রাংকফুর্ট বা ওফেনবাখের সম্পাদকেরাও সে-কথা বললেন। বললেন এই যুদ্ধে অনেক জার্মান নিহত হয়েছে। আজ আপনি দেখবেন যে মাঝখানেই একটা বিশেষ বয়সের মানুষদের দেখা যায় না। অর্থাৎ যুদ্ধের সময় যারা যুবক ছিল তাদের মধ্যে অনেকেই যুদ্ধের খোরাক হয়েছেন।

ভদ্রলোক ভারতবর্ষের সম্বন্ধেও অনেক প্রশ্ন করলেন। কথাবার্তায় ব্যস্ত মানুষটার হঠাৎ মনে পড়ে গেল যে আমার যথোপযুক্ত অভ্যর্থনা করা হয়নি। তৎক্ষণাৎ সেক্রেটারিকে ডেকে পাঠান। আমাকে বললেন, আপনাকে কী পানীয় দেওয়া যায়। আমাদের জাতীয় পানীয় হল বিয়ার। আর বলা যায় কোনিয়াক। কোনিয়াক সব সময় পান করা যায়। ততক্ষণে সেক্রেটারি এসে গিয়েছেন। আমি তাড়াতাড়ি বললাম, "না, না। আমার কোনও উষ্ণ পানীয় চলবে না।" ভদ্রলোক একটু চমকে উঠলেন। সেক্রেটারির দিকে তাকিয়ে বললেন, দেখলে তো। আমি তোমাকে যা বলেছিলাম তাই ঠিক। ভারতীয়রা সবাই মুসলমান। তারা কেউ মদ খায় না।

আমি তার ভুল ভাঙাবার চেষ্টা করিনি। বুঝতে পারলাম আমাদের পরাধীন জাতির মতো সারা পৃথিবীর জ্ঞানের ভার এদের বহন করতে হয় না। করবার দরকারও হয় না। আমরা শুধু শুধু অন্যের সমস্যা নিয়ে অকারণে চঞ্চল হই।

লন্ডনে যে ক'দিন ছিলাম শেঠজির ওখানে দৈনিক হাজিরা দেওয়া ছাড়া আমি প্রায় প্রতিদিনই খবরের কাগজের অফিসে যেতাম। আগেই বলেছি বম্বে অফিস এ-সব ব্যবস্থা করে দিয়েছিল। সেই সময়—ইংল্যান্ডে মুদ্রণ সংখ্যার

দিক থেকে "নিউজ অফ দ্য ওয়ার্ল্ড" সর্ববৃহৎ ছিল। কাগজটি সাপ্তাহিক, যদিও দৈনিক সংবাদপত্রের আকারে, বিক্রি প্রায় নয় লক্ষ। আর বড় কাগজ ছিল সান্ধ্য দৈনিক 'ডেইলি মিরর'। প্রায় পাঁচ লক্ষ বিক্রি। ছাপাখানায় 'নিউজ অফ দ্য ওয়ার্ল্ড' দশটি রোটারি মেশিনে একযোগে ছাপা হয়। ডেইলি মিরর সম্ভবত পাঁচ-ছয়টি মেশিনে ছাপা হত।

সম্পাদকীয় বিভাগে দেখলাম আমাদের মতো অত খারাপ না হলেও বেশ অগোছালো অবস্থা। যাঁরা লেখালিখির কাজ করেন এবং যাঁরা বিভাগীয় সম্পাদক তাঁরা সকলেই সকাল দশটায় অফিসে ঢোকেন এবং পাঁচটায় চলে যান। সম্পাদকীয় স্তম্ভ লেখবার দলের একজনকে পালা করে রোজ রাত দশটা অবধি থাকতে হয়। তার কাজ হল কোনও জরুরি খবর এলে সেটা কাগজের অন্তর্গত করা। নইলে, বেলা পাঁচটাতে কাগজের চেহারা তৈরি হয়ে যায়। আমাদের দেশের মতো নয়, যেখানে দৈনিক পত্রিকার কাজ বেলা পাঁচটার আগে শুরু করাই যায় না।

টাইমসের সম্পাদকের সঙ্গে দেখা হল না। একজন সহকারী সম্পাদক আমার সঙ্গে চা পানে যোগ দিলেন। এবং মোটামুটি তাঁদের কাজের ধারা আমাকে বললেন। তিনি দেখলাম বেশ চঞ্চল হয়ে উঠেছেন। বুঝতে অসুবিধা হল না যে পাঁচটার আগে এই চা চক্র শেষ হয়ে গেলে খুশি হবেন তিনি। তিনি আমাকে যা বললেন তার মূল কথা হল যে টাইমস কাগজটা ঠিক সাধারণের জন্য নয়। জনমত তৈরি করা তাদের কর্তব্যের মধ্যে পড়ে না। তাদের উদ্দিষ্ট পাঠক হল শাসকদল। সেই মুহূর্তে যাঁরা দেশ শাসনের ভার বহন করছেন, মন্ত্রী, আমলা, বড় ব্যবসায়ী, শিল্পপতি—এঁরা এই কাগজ পড়ে প্রভাবিত হন। সরকারের কার্যের ধারাও অনেকাংশে টাইমসের সম্পাদকীয় পড়ে নির্ণীত হয়। বিভিন্ন প্রসঙ্গ আলোচনা করতে করতে আমরা এসে পড়লাম ইংল্যান্ড আমেরিকার সম্পর্কের বিষয়ে। সহকারী সম্পাদক অনায়াসে বললেন তিনি ও বিষয়ে কিছু বলতে পারবেন না। কারণ আমেরিকা তাঁর বিষয় নয়। তাঁদের ছয়জন সহকারী সম্পাদককে এই পৃথিবী ভাগ করে দেওয়া হয়েছে। তাঁর ভার হল প্রধানত ইউরোপ, রাশিয়া ছাড়া। ভারতবর্ষের বিষয়ে তাঁর কোনও আগ্রহ নেই। কারণ, এটা তাঁর বিষয় নয়। সুতরাং জানবার প্রয়োজনবোধও করেন না।

লন্ডনে যার সঙ্গেই কথা বলেছি একটি বিষয়ে মিল দেখেছি। ইনিও তার

ব্যতিক্রম নন। "ইংরেজ চলে যাবার পর ভারতবর্ষ কেমন চলছে, আদৌ চলছে কিনা।" তিনি প্রসঙ্গক্রমে জিজ্ঞাসা করলেন ভারতবর্ষে সবাই তা হলে ইংরেজি জানেন। শুনে আশ্চর্য হলেন যে আরও অন্যান্য ভাষার কাগজও বের হয়। ক্ষুণ্ণ হলেন শুনে যে অন্যান্য ভাষার সংবাদপত্রগুলির দ্রুত উন্নতি হচ্ছে এবং ইংরেজ চলে আসায় ভারতের কোনও ক্ষতি হয়নি। এই খবরটা তাঁর মনমতো হল না। তিনি খুব বিচলিত হলেন।

আমার বন্ধু কে ডি কোহলি একদা আমাকে একটা উর্দু শের শুনিয়েছিলেন: চাকচিক্য দেখে ভুলো না, সিংহাসনের ভেতরটা খড়ে তৈরি। টাইমসের সহকারী সম্পাদকের সঙ্গে সাক্ষাতের পর আমার ওই শেরটা অনিবার্যভাবে মনে পড়ল।

কে ডি কোহলির সঙ্গে ব্যবসার সূত্রে পরিচয়। বয়সের ব্যবধান অনেক। দু'জন আমরা বিভিন্ন সমাজের মানুষ তবু অল্প সময়ের মধ্যে বন্ধুত্ব হয়ে গেল। তিনি তখন ইউরোপ আমেরিকার কয়েকটি ছাপার মেশিন নির্মাণকারী প্রতিষ্ঠানের, ভারতীয় প্রতিনিধি। আমি দিল্লি ছাড়বার পর কে ডি কোহলি এজেন্সির কাজ কমিয়ে দিয়ে ক্রমশ মেশিন তৈরির দিকে ঝুঁকেছেন। খবরের কাগজে ছাপাবার জন্য রোটারি অফসেট যন্ত্র তিনি তৈরি করেন এবং সেখানেও তার বাজার ছেয়ে ফেলেন।

এই মানুষটার অধ্যবসায়ের সীমা ছিল না। একাগ্রচিত্তে আরাধ্য বস্তুর আহরণের চেষ্টা করতেন। সফলও হতেন। যে সময়ে কথা লিখছি তখনও বিদেশি মেশিন ভারতবর্ষে বিক্রি করা তাঁর উপজীবিকা। আমার সঙ্গে প্রথম পরিচয় হবার সময় ভাবিনি যে পরের চল্লিশ বছর এই সৌহার্দ্য অনড় থাকবে। ক্ষমতা থাকলে আরও অনেক কিছু শিখতে পারতাম তাঁর কাছ থেকে।

ভারী শরীর, উচ্চতায় পাঁচ ফুট দুই ইঞ্চির বেশি হবে না। সব সময় স্যুট পরে থাকেন। অনর্গল কথা বলেন, বহু বিষয়ে জানেন, দিল্লির প্রধান চরিত্রদের সবাইকে চেনেন। একসময় তাঁদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতাও ছিল। মানুষটিকে বুঝতেও আমার সময় লাগল।

কথায় কথায় ডালমিয়াজি বলেছিলেন যে, কে ডি কোহলি মস্ত চতুর লোক। ওর সঙ্গে ব্যবসার কাজ সাবধানে করো। সামান্য পরিচয়ে বুঝতে পারলাম যে মানুষটা অসাধারণ বুদ্ধিমান। এখন বিদেশি মুদ্রণ সংক্রান্ত কয়েকটি যন্ত্রের ভারতীয় এজেন্ট। কারণ দু'-তিন বছর মাত্র এই ব্যবসা শুরু করেছেন

এবং তাঁর দেওয়া যন্ত্র নেই এমন খবরের কাগজ উত্তর ভারতে নেই বলা চলে। ডুপ্লে নামে রোটারি প্রেস টাইমস অফ ইন্ডিয়াকে দিয়েছিলেন এবং অক্ষর সংযোজনের মেশিন (কম্পোজিং মেশিন) তাঁর দেওয়া ইন্টারটাইপ কোম্পানির। ভারতবর্ষের তখনও লাইনোটাইপ কোম্পানির একচ্ছত্র অধিকার। কে ডি কোহলি ইন্টারটাইপের এজেন্সি নেবার পর সংবাদপত্র অফিসে ইন্টারটাইপের প্রবেশ ঘটেছিল। শেঠজি হয়তো সেই জন্য আমাকে সতর্ক থাকবার উপদেশ দিয়েছিলেন।

কে ডি কোহলি অফিসে প্রায়ই আসেন। আমাকে বাড়িতে ডিনারের নেমন্তন্ন করলেন। ডালমিয়াজির উপদেশ মাথায় রেখে এড়িয়ে যাবার চেষ্টা করলাম। একদিন রাজি হতেই হল। তাঁর বাড়িতে গিয়ে আমাকে অবাক হতেই হল। প্রকাণ্ড বাড়ি। জমির চৌহদ্দি দেড় দুই একর। ব্যবসাটা প্রায় তিনি একাই পরিচালনা করেন। কে ডি কোহলি খবরের কাগজের সঙ্গে দীর্ঘকাল জড়িত। হিন্দুস্থান টাইমসের প্রতিষ্ঠার সময় তিনি ওই কাগজের জেনারেল ম্যানেজার ছিলেন। তাঁর শ্যালক সাহানি কাগজের সম্পাদক হয়েছিলেন। প্রধানত লালা লাজপত রায়ের উদ্যোগে দিল্লিতে হিন্দুস্থান টাইমসের প্রতিষ্ঠা হয়। কে ডি কোহলি রাজনৈতিক কর্মী। লালা লাজপত রায় তাঁর অত্যন্ত নিকটের মানুষ। রাজনীতির যে নেতারা কাগজটা চালাতেন তাঁদের অর্থবল নেই। ধার দেনা করে এবং অনুদান সংগ্রহ করে কাগজটা চলত। শেষে যখন হাত বদল হল তখন ওখানে কে ডি কোহলি এবং সাহানি উভয়েরই স্থান থাকল না।

কে ডি কোহলি তখন একটা কোম্পানি খুললেন। নাম দিলেন প্রিন্টার্স হাউস। বিদেশি সবরকম মুদ্রণ সম্পর্কিত যন্ত্রপাতি প্রস্তুতকারকদের এজেন্ট। সেই সময় তাঁর সঙ্গে আমার পরিচয়। প্রথম দিনে তাঁর বাড়িতে খেতে গিয়ে দেখলাম তিনি খাওয়া দাওয়ার ব্যাপারে শৌখিন। পরিপাটি ভোজন হল। বাড়িসুদ্ধ সবাই—তাঁর স্ত্রী, দুই কন্যা এবং একটি বালক পুত্র আমাকে আপন করে নিল। প্রথম পুত্র তখন জুরিখে একটি ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজে পড়ছে। ক্রমে কে ডি কোহলির সঙ্গে আমার বন্ধুত্বের সম্পর্ক গড়ে উঠল। যদিও দু'জনের বয়সের তফাত কুড়ি বছরের বেশি। কে ডি কোহলির একশো বছর পূর্ণ হল না। তার মাত্র কয়েক মাস আগে তাঁর মৃত্যু হয়। এই ধরনের কাজের মানুষ আমি বেশি দেখিনি। ব্যবসায়ে তিনি সৎ, চতুর কিংবা সরল ছিলেন কি না খোঁজ করিনি। আমার সঙ্গে সোজাসুজি ব্যবসা হয়েছে। দিল্লি ছেড়ে আসবার

পরও তাঁর সঙ্গে আমার যোগ ছিল। পরে একবার আমি ইউরোপে মুদ্রণযন্ত্র কেনবার জন্য গিয়েছিলাম। সেখানেও কোহলি এসে পৌঁছলেন। তিনি যে কোম্পানিগুলির এজেন্ট তাদের প্রধানদের সঙ্গে সাক্ষাৎ পরিচয় হল। বন্ধুত্বের সম্পর্ক থাকা সত্ত্বেও তাঁর প্রস্তাবিত মেশিন আমি কিনিনি বলে ক্ষুণ্ণ হয়েছিলেন ঠিকই, কিন্তু আমাদের সম্পর্কে কখনও চিড় ধরল না। তাঁর শেষ দিন পর্যন্ত আমাদের বন্ধুত্ব অক্ষুণ্ণ ছিল।

যে কয়েকদিন জার্মানিতে ছিলাম দ্বিপ্রহরের আহার এবং নৈশাহার দুটোতেই আমরা MAN-এর অতিথি। মদ্যপান যে কত তরিবৎ করে করতে হয় তাও জানলাম MAN-এর আতিথেয়তার কল্যাণে। সপ্তাহে পাঁচদিন ভোজন হত MAN-এর কারখানায়। তাদের কতগুলো ভোজনকক্ষ ছিল আমি জানি না। কিন্তু আমরা অন্তত পাঁচটি ভোজনকক্ষতে খেয়েছি। তাদের ক্রেতা পৃষ্ঠপোষকদের এইভাবে আপ্যায়ন করা হত।

প্রত্যেকটি ভোজনকক্ষে নিজস্ব বার। সেখানে বিভিন্ন প্রকার মদ এবং মদিরার বোতল সাজানো রয়েছে। কেতাদুরস্ত পরিচারক এসে জিজ্ঞাসা করবে কীভাবে সে আমার সেবা করতে পারে। আমার তো নামগুলোই জানা নেই। ভুল করে কিছু বলে ফেলবার ভয়ে আমি সাহেবদের জন্য অপেক্ষা করি। এখন যে পানীয় আসবে সেটা হল মুখবন্ধ, এরা বলে আপাতরেতিভ। খাবার আসবার আগে পর্যন্ত এটা পান করা হবে। প্রথমদিকে আমি কিছু না জেনে মদের এই আয়োজন প্রত্যাখ্যান করেছি। আমি পরম সুস্বাদু আপেল জুসেতেই সন্তুষ্ট ছিলাম। এই পানীয়টি অসাধারণ। আমার সঙ্গী দু'জন সাহেব, একজন শেরি নিয়েছে আর একজন বিয়ার অথবা মার্টিনি।

খাবারেও নতুনত্ব থাকত। প্রথম পদ স্যুপ। রোজ বিভিন্ন স্যুপ হত। দেশে আমি সর্বত্র স্যুপ পরিহার করি। এখানে খেয়ে দেখলাম বিভিন্ন স্যুপে বিভিন্ন স্বাদ এবং অতি মনোরম। আমার টার্টল স্যুপ ভীষণ পছন্দ হয়েছিল। আর একদিন আর একটা স্যুপ আমার পছন্দ হয়েছিল। তার নাম গনয়ডেল। স্যুপের বাটির লঘু তারল্যে চারটি পিংপং বলের আকারে গোলাকার বস্তু। খেতে গিয়ে বুঝতে পারলাম, সতর্ক না হলে বলটা লাফিয়ে প্লেটের বাইরে চলে আসতে পারত। স্যুপটা আমার খুব ভাল লেগেছিল। তাই দ্বিধা হলেও জিজ্ঞাসা করলাম এটা কীসের স্যুপ। আলুকে নানা প্রক্রিয়ার মধ্যে দিয়ে পাক করে এই

গোলাকার বস্তুটি উৎপন্ন হয়। কিছুটা রবারের ভাব থাকে, কিন্তু একেবারে নতুন স্বাদ। এবারে দ্বিতীয় পদ আসবে। বরাহের একটি পদও ভাল না লেগে উপায় ছিল না। এই পদটি জার্মানদের বিশিষ্ট—শ্নিটসেল। বরাহ খণ্ডটি একটু থুড়ে নিয়ে কোনও প্রক্রিয়ায় ভাজা। আমার সঙ্গীরা বললেন উপকরণ গোবৎস হলে আরও সুস্বাদু হত। আমি তো বিকল্প খাচ্ছি।

ভোজনের সঙ্গে যে সুরা পান করা বিধি তা আবার অন্য জাতের। ওয়াইনও হতে পারে আবার বিয়ারও হতে পারে। বিভিন্ন খাবারের সঙ্গে বিভিন্ন মদিরা বিধেয়। একটা সাধারণ নিয়ম আছে, মাছ অথবা পক্ষী জাতীয় মাংস হলে সাদা বা হোয়াইট ওয়াইন আর অন্য ভারী মাংসের সঙ্গে রেড ওয়াইন। রেড ওয়াইন বহু রকমের। MAN-এর ভোজনকক্ষে হয়তো পাঁচ রকম রেড এবং পাঁচ রকম হোয়াইট ওয়াইন ছিল। পরে দেখেছি দোকানে কিনতে গেলে একেবারে দিশেহারা হয়ে যেতে হয়। কত বিভিন্ন রকমের ওয়াইন বিভিন্ন দেশ থেকে আসত। জার্মানির বিভিন্ন প্রান্ত থেকেও নানা রকম ওয়াইন আসত। গুণিজনরা বলতে পারেন কোন সময়ে কোন অঞ্চলের মদিরা ভাল।

আমাদের মূল খাবারের পরেই মিষ্টান্ন আসবে। বিলিতি মিষ্টান্ন যে কত রকমের হতে পারে আমি জানতাম না। তাদের স্বাদ গন্ধ স্থাপত্য সবই আকৃষ্ট করে। আমাদের ভোজনপর্ব এখনও শেষ হয়নি। পানীয়ের শেষ পদ এখনও বাকি আছে। এই পানীয়ের নাম লিকিওর। এই পানীয় অল্প পান করা বিধেয়। তার কারণ এতে কোহলের পরিমাণ বেশি। আমরা শেষ পানীয় হাতে নিয়ে সোফায় গিয়ে বসতে পারি। সেখানে ধূমপানের আয়োজন আছে। বিভিন্ন সাইজের ছোট-বড় সিগার এবং বিভিন্ন নামের সিগারেট আছে।

রাত্রে আমাদের নিয়ে যাওয়া হত বিভিন্ন ভোজনশালায়। সেখানেও মদ্যপানের সঙ্গে ভোজন সারতেও অনেক সময় লেগে যেত। আমি দেখলাম জার্মানিতে আলুর প্রাধান্য। একটা আলুর স্যালাড প্রায় অনিবার্য। এ ছাড়া সেদ্ধ আলু, ভাজা আলু প্রচুর পরিমাণে বিভিন্ন পদের অনুষঙ্গ হিসাবে থাকে।

জার্মানির একটি ভোজ্যের সঙ্গে আমার আজীবনের ভালবাসা হয়ে গেল। সসেজ। কলকাতায় কদাচ সসেজ ভোজনের সুযোগ হয়। যখন গ্রেট ইস্টার্ন হোটেলে দ্বিপ্রহরের ভোজনের দাম ছিল দু' টাকা পঁচাত্তর পয়সা। মনে হয় না, দশ-বারো বারের বেশি সেখানে গিয়েছি। সেখানে ব্রেকফাস্টে সসেজ বা বেকন পাওয়া যেত। জার্মানিতে এসে দেখলাম বহু প্রকারের সসেজ পাওয়া যায়। কী

চাই নির্দিষ্টভাবে বলে দিলে সেই সসেজ পাওয়া যাবে। সসেজের সঙ্গে আর একটা বস্তু আমার অত্যন্ত প্রিয়—গেরকিন। আমাদের শসার মতো একটি সবজি ভিনিগারে ভেজানো। কাগজে পড়েছি অন্তত পঞ্চাশ প্রকার সসেজ আছে যা মানুষের মনে আনন্দ জুগিয়ে চলেছে। একবার বার্লিনে সসেজ খেয়ে ভুলতে পারিনি তার স্বাদ।

বার্লিনে আমার জার্মান সঙ্গীকে বললাম যে খাবারের বিশাল তালিকা থেকে ভোজ্য নির্বাচন করা বড় কঠিন কাজ। বরং যদি বলে দাও এই অঞ্চলে কোন খাদ্যটি সর্বাধিক জনপ্রিয় তা হলে আমি সেই পদটি আদেশ করতে পারি। সঙ্গী বললেন এই অঞ্চলের নাম ওয়েস্টফেলিয়া। এখানে খাবারের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ হল সসেজ। শুধুমাত্র সসেজ দিয়ে একটা পুরো খানা হবে? কিঞ্চিৎ অস্বস্তি হল। তবু বললাম তাই আদেশ করা যাক। সঙ্গে একটু কড়া মাস্টার্ড দিয়ো। ওই ফিনফিনে ফরাসি মাস্টার্ড আমার পছন্দ হয় না। সসেজ এসে পৌঁছল। দেখি আমার থালায় ছয়টি সসেজ আছে। তার মধ্যে একটির নাম ব্লাড সসেজ, ব্ল্যাক সসেজ। প্রস্তুত পর্বে শূকরের রক্তও যুক্ত হয়। সেটা খুব ভাল লেগেছিল বলতে পারি না। কিন্তু বাকি সসেজগুলি বিভিন্ন প্রকৃতির। স্বাদে গন্ধে অতুলনীয়।

জার্মানিতে ডোরের সঙ্গে বেশ আলাপ হয়ে গিয়েছিল। ডোরে আমাদের ক্রীত মেশিনটা চালাবার পদ্ধতি দেখাত। কীভাবে দোষত্রুটি সংশোধন করতে হয় বুঝিয়ে দিত। ডোরে এক শনিবার আমাকে তার বাড়িতে খেতে বলল। সন্ধেবেলা নিজে এসে আমাকে হোটেল থেকে নিয়ে গেল তার বাড়িতে। তার স্ত্রী রান্নাবান্না সেরে যেন আমারই অপেক্ষায় বসেছিলেন। তাদের দুই ছেলে। বড় হয়ে আলাদা হয়ে গেছে। কাছেই কোথায় থাকে। ডোরের স্ত্রী-র রান্না সাধারণ মানের। পোর্ক চপ করেছেন। আলুর স্যালাড, আলু সেদ্ধ, লাল বাঁধাকপি এবং শেষে মিষ্টান্ন করেছেন—অ্যাপেল স্ট্রুডেল। আপেল আমার প্রিয় ফল নয়। কিন্তু আপেল স্ট্রুডেল জার্মানদের কাছে প্রাণাধিক মিষ্টান্ন। ভাল বলতেই হল। আর বললাম মিসেস ডোরের রন্ধন তো ভাল হবেই। কারণ তিনি কত যত্ন করে রান্না করেছেন। তারপর যোগ করলাম জার্মানির রান্নাবান্না অতি ভাল। আমি শুনে এসেছিলাম পশ্চিমদেশে স্বাদহীন, গন্ধহীন খাবার মানুষ আদর করে খায়। জার্মানিতে এসে আমার ভুল ভাঙল। এখান থেকে

ইংল্যান্ড যাব। সেখানে না জানি কী হবে। সেখানে তারা রোস্ট আর গ্রিলড ছাড়া আর কিছুই করতে জানে না অথবা মাছ ভাজা।

মিসেস ডোরে বললেন, ইংরেজদের বদনাম দেবেন না। ওরা সবাই রান্না করতে পারে। আপনি দেখবেন আপনার জন্য রান্না করবার ব্যবস্থা আছে। যে-কোনও খাবার টেবিলে নুন এবং গোলমরিচ থাকবেই। ইংরেজরা আমাদের মতো নয়। তারা শুধু দুটি মশলাই জানে। আপনার ইচ্ছামতো বানিয়ে নেবেন। তারপর খেতে যদি ভাল না হয় তা হলে দোষ পাচকের নয়, এক্ষেত্রে আপনার।

প্রথমটায় বুঝতে পারিনি। তারপর মাথায় ঢুকল যে ডোরে ইংরেজদের খাবারের চূড়ান্ত নিন্দা করলেন। মিসেস ডোরে ভাল ইংরেজি বলতে পারেন না বলে তিনি কম কথা বলছিলেন। এবারে দ্বিধাগ্রস্ত কণ্ঠে আমাকে বললেন, আপনাকে একটা কথা জিজ্ঞাসা করব ভাবছি। দয়া করে অন্য মানে করবেন না। আমি একটু ভাবিত বলেই আপনাকে জিজ্ঞাসা করতে বাধ্য হচ্ছি। নানা কাগজে পড়েছি ভারতবর্ষ শ্বাপদসংকুল স্থান। রাস্তায় বাঘ সিংহ ঘুরে বেড়ায়। এই পর্যন্ত বলে একটু থমকে গেলেন। তারপর যোগ করলেন আশা করি এটা সত্যি নয়। এই কথা বলে আমার দিকে করুণ জিজ্ঞাসু চোখে চেয়ে থাকলেন যেন সাগ্রহে প্রার্থনা করছেন, আমি বলব তাঁর শোনা কথা সর্বৈব মিথ্যা। বলা বাহুল্য, আমি তাই বললাম। শুনে কত স্বস্তি পেলেন। তাঁর মুখ দেখেই বুঝতে পারলাম।

আমরা যে মেশিন কিনছি তা খণ্ড খণ্ড করে দশ-বারো ফুট বাক্সে প্যাকিং করে ভারতে পাঠানো হবে। তারপর ডোরে বোম্বাইতে আসবেন এবং ওই খণ্ডগুলিকে যুক্ত করে সম্পূর্ণ মেশিনটি চালু করবেন। হয়তো এক মাসের বেশি থাকতে হবে। মিসেস ডোরেব ভয় তাই অস্বাভাবিক কিছু ছিল না।

মিসেস ডোরেকে অবশ্যই অভয় দিলাম। তাঁর মুখটি আবার উৎফুল্ল হয়ে উঠল।

বিপদ যে মানুষের কোন দিক দিয়ে আসে অনুমান করা যায় না। যথাসময়ে মেশিন বম্বে পৌঁছেছিল। ডোরে প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই এল এবং মেশিনের অংশগুলি জোড়ার কাজ শুরু হল। ডোরের কাজ শেষ হবার আগেই বোম্বাইতে বৃষ্টি নেমে গেল। এক রাত্রে ডোরেকে তার হোটেলে নামিয়ে দিয়ে বাড়ি চলে যাব। ঘণ্টা দুয়েক প্রবল বর্ষণ হয়েছে। অফিসের কাছে জল জমে না। কিন্তু কোলাবার কাছে জল জমে। সেইজন্য আমি ঠিক করলাম কাফ প্যারেড দিয়ে যাব।

বোম্বাইয়ের বৃষ্টি যে দেখেনি তাকে বোঝানো মুশকিল। ফোঁটা ফোঁটা জল পড়া নয়, মনে হবে যেন আকাশের ট্যাংকের তলাটা খুলে গেছে। সমস্ত জল একসঙ্গে শহরের ওপরে এসে পড়েছে। একটু এগোতেই দেখি চারপাশে অথৈ জল। কাফ প্যারেডের পশ্চিমে মনে হল সমুদ্রের জল সেই রাস্তায় উঠে এসেছে। কোথায় রাস্তা শেষ হয়েছে কোথায় সমুদ্র শুরু হয়েছে কিছুই বোঝা যাচ্ছে না। যথাসম্ভব রাস্তার ধারের বাড়ি ঘেঁষে গাড়ি চালাচ্ছি। কিন্তু প্রবল বর্ষণে কিছু দেখা যাচ্ছে না। মাত্র আট মাস হল আমি এখানে এসেছি। এরমধ্যে এত বৃষ্টি কখনও দেখিনি। বেশ ভয় করছে। বুঝতে পারছি ডোরেকে আরও বেশি ভয় গ্রাস করেছে। সে রাস্তার সমুদ্রের অবস্থান জানেও না। মনে করতেই পারে আমরা সমুদ্রে নেমে পড়েছি।

ভাগ্য ভাল বলতে হবে। সমুদ্রে নেমে পড়ার আগেই গাড়ি বন্ধ হয়ে গেল। রাস্তার বাঁদিকে সারি সারি গাড়ি দাঁড়িয়ে আছে। প্রায় এক হাঁটু জলে নেমে পড়তে হল। ডোরেকে তার হোটেলে পৌঁছে দিয়ে আমি হাঁটতে হাঁটতে বাড়ি গেলাম। গাড়ি ওখানেই পড়ে থাকল। ডোরে নিশ্চয়ই ভাবেনি যে শহরের মধ্যেই ডুবে যাওয়ার আশঙ্কা আছে। সে সম্ভাবনা থাকলে ডোরের স্ত্রী তাকে আসতে দিতেন না।

অগ্‌সবার্গ ছাড়বার পর যে কয়দিন আমি জার্মানিতে ছিলাম, মিউনিখ, ফ্রাংকফুর্ট সম্বন্ধে বহু অভিজ্ঞতা আমার হল। তারমধ্যে বিভিন্ন রেস্টুরেন্টে সুখদায়ক ভোজন অন্যতম। আমাদের ধারণা যে ভারতীয়দের মধ্যে, বিশেষ করে বাঙালির মতো রন্ধন ভোজনে এমন পারদর্শিতা আর কোনও জনগোষ্ঠীর নেই। বাঙালির ভোজনের লিপিবদ্ধ ইতিহাস খুব বেশি দিনের নয়। প্রাচীন ভোজ্যের তালিকা একশোটির বেশি পদের উল্লেখ করে না। বাঙালির পাক-প্রকরণের যে বই এখন পাওয়া যায় তাদের প্রকাশ হয়েছিল একশো দশ বছর আগে। আমরা যাদের আহারে পশ্চাদগামী মনে কবি সেরকম ইউরোপিয়ানদের মধ্যে ভোজনের ঐতিহ্য আরও বেশি দিনের। প্রথম জার্মান পাকশাস্ত্র যা পাওয়া গিয়েছিল সেটি প্রকাশিত হয়েছিল ১৪৮৫ সালে। তারপরের যে বইটি খুব নাম করেছিল তাতে দু'হাজার পদের রন্ধন বিবরণ ছিল। সেটি প্রকাশিত হয়েছিল ১৫৮০ সালের আশেপাশে। কাজেই জার্মান রন্ধনধারা হেলাফেলা করবার নয়।

আমার সঙ্গে জার্মান ভোজ্যের গভীর পরিচয় নেই। এদের একটি পদ আমাদের প্রিয়। তার নাম নাম শ্নিটসেল (Snizel)। বরাহ মাংসের উদ্ভূত এই পদ আমাকে চিরকাল আমোদিত করেছে।

মিসেস ডোরের বাড়িতে অনুষঙ্গ হিসাবে যে দুটি ভোজ্য প্রথম দেখেছিলাম তারাও জার্মান ভোজনকে আচ্ছন্ন করে আছে। প্রায় সর্বত্র, না চাইলেও তাদের উপস্থিতি দেখা যায়। প্রথম গেরকিন (Gherkin)। গেরকিন উদ্ভূত হয় শসা থেকে। অন্য অনুষঙ্গটি হল সাওয়ার ক্রাউট। এর প্রধান উপকরণ বাঁধাকপি। বাঁধাকপি বিশেষ পদ্ধতিতে দুই মাসকাল নুনে জরিয়ে সাওয়ার ক্রাউট তৈরি হয়। এই বস্তুটি জার্মান বিশেষত্ব। সব ভোজ্যের সঙ্গে অনায়াসে সঙ্গত করতে পারে। আমার যেটা প্রিয় হয়েছিল তার নাম রুট ক্রাউট। লাল বাঁধাকপির ব্যঞ্জন। কীভাবে প্রস্তুত করে আমার জানা নেই।

মিসেস ডোরে বলেছিলেন রোস্ট হচ্ছে জার্মানির জাতীয় খাবার। রোস্ট পোর্ক জার্মানদের সর্বাধিক প্রিয় খাদ্য। আমাদের মাছের ঝোলের মতন।

অল্পদিনের জন্য হলেও আমার ইউরোপ যাত্রা বেশ সুখদায়ক হয়েছিল। নতুন দেশ, নতুন দৃশ্যপট, নতুন সব মানুষ, নতুন অভিজ্ঞতা ভাল না লেগে উপায় ছিল না। তবু মনের কোথায় যেন মাছের কাঁটা বেঁধার মতো বিরক্তি ও কষ্ট মাঝে মাঝে যন্ত্রণা দিচ্ছিল। আমিও সবার সঙ্গে গলা মিলিয়ে সদ্য ক্রীত

ফটোগ্রাভিওর মেশিনটির গুণপনা স্বীকার করে নিয়েছি। কিন্তু বোম্বাইতে যদি এই মেশিন ভালভাবে না চলে? সাত-দশ দিনে মাঝে মাঝে চালিয়ে দেখানো মেশিন আর ভারী কাজের জোয়াল কাঁধে নিয়ে প্রতিদিন এবং ঘণ্টার পর ঘণ্টা মেশিনের চলা অন্য জিনিস। তখন যদি কেউ আমাকে বলে যে তুমিই তো মেশিনটা দেখে অনুমোদন করেছ, তবেই তো মেশিনটা কেনা হল। আমি তখন কী উত্তর দেব?

সুখস্মৃতি ও দুর্ভাবনা মাথায় নিয়ে ইউরোপের ক্ষুদ্র সফর সেরে দেশে ফেরবার আয়োজন করছি। মাত্র ছয়-সাত বছর আগের মহাযুদ্ধ শেষ হয়েছে। জার্মানির যে-সব শহরে গিয়েছিলাম সর্বত্র মহাযুদ্ধের নির্মম মুষলাঘাতের চিহ্ন কুৎসিত ক্ষতের মতো প্রকট। যুদ্ধে জার্মানির প্রতিটি শহরের ক্ষতি হয়েছে। সর্বাধিক আশ্চর্য হয়ে দেখলাম জার্মানি কত শীঘ্র স্বাভাবিক জীবনযাত্রায় ফিরে এসেছে। MAN-এর কারখানা তার একটা নিদর্শন। পুরোদস্তুর কাজ হচ্ছে। দেখে বোঝা যায় না এই কারখানা যুদ্ধাস্ত্র তৈরির জন্য ব্যবহার করেছিলেন হিটলার।

এই পুনরুত্থানের সূচনা হয়েছে শুধু জার্মান শ্রমিকের একনিষ্ঠতা এবং পরিশ্রমের জন্য, তা নয়। জার্মানির পুনর্গঠনে বড় সাহায্য এসেছিল আমেরিকা থেকে, যে আমেরিকার সঙ্গে লড়াইতে জার্মানি সর্বস্বান্ত হয়েছিল। তৎকালীন আমেরিকান সেক্রেটারি অফ স্টেট—মার্শালসাহেব যুদ্ধ বিধ্বস্ত দেশগুলির পুনর্গঠনের জন্য অর্থ অনুদান করবার যে পরিকল্পনা করেছিলেন তা বহুলাংশে জার্মানিকে সাহায্য করেছে। জার্মানির বাহাদুরি এই যে দেশের নাগরিকরা সেই অনুদানের সদ্ব্যয় করেছে। তার সঙ্গে শ্রমিকদের পরিশ্রম দেশটাকে উন্নতির পথে এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছে।

বোম্বাই যেন অন্য জগৎ। পৌঁছেই দেখলাম অফিসে শ্রমিক অশান্তি প্রবল আকার নিয়েছে। কাগজ অনেক দেরি করে বেরোয়, সঙ্গে অনেক ত্রুটি থেকে যায়। কোম্পানির আর্থিক ক্ষতি হচ্ছে এবং শ্রমিকরাও দলবদ্ধভাবে 'ধীরে চল' নীতি গ্রহণ করেছে। তাতেও যখন ম্যানেজমেন্ট অর্থাৎ আমরা নতি স্বীকার করি না তখন একটা বিরক্তিকর কুৎসিত নীতি চালু হয়েছিল।

লাইনোটাইপের কমপোজ করা লাইনগুলি গ্যালিতে সাজিয়ে রাখা হয়। পাতা তৈরি করবার সময় গ্যালিগুলি এনে প্রার্থিত অংশগুলি পাতায় বসাবার কথা। কিন্তু হঠাৎ দেখা যায় কমপোজ করা সেই অংশ পাওয়া যাচ্ছে না। অর্থাৎ

কোনও কর্মী তত্ত্বাবধায়কের চোখের আড়ালে কিছু কমপোজ করা অংশ ফেলে দিয়েছে। মস্তবড় ছাপাখানা। তত্ত্বাবধায়ক দিয়ে সবটা পাহারা দেওয়া যায় না। ছাপার সময় কাগজের রিলগুলি আনতে 'ধীরে চল' নীতি মর্মন্তিক চেহারা নেয়। সব তৈরি। কিন্তু কাগজের রিলটা মেশিনে চড়ানো যাচ্ছে না। দেরি হচ্ছে। আমরা কিছুই করতে পারি না।

আমি নিজে তিন-চারদিন রাত্রে অফিসে থাকলাম। আন্দোলনের গতি প্রকৃতি বোঝবার চেষ্টা করলাম। বুঝতে পারলাম যে কর্মীদের সকলের মনোবৃত্তি ধ্বংসাত্মক নয়। অল্প কয়েকজন ক্রুদ্ধ কর্মী অনায়াসে প্রভূত ক্ষতি করতে পারে সকলের চোখের আড়ালে। আমাদের জেনারেল ম্যানেজার স্থির করলেন পাহারা অর্থাৎ তত্ত্বাবধান আরও ভাল হওয়া দরকার। দিল্লি থেকে ছ'জন শিখ দারোয়ান আনা হল। তাদের দেখবার জন্য প্রেসের মধ্যে প্রবল কৌতূহল। তাদের ফাঁকি দিয়ে কোনও ক্ষতির কাজ করে ফেলা একটা খেলার মতো হয়ে দাঁড়াল। শিখেরা অনোন্যপায়। তারা কাউকে চেনে না। কী হচ্ছে বুঝতে পারে না। কী উপায়ে অসন্তুষ্ট শ্রমিকদের দৌরাত্ম্য বন্ধ করবে বুঝতে পারছে না।

এই যন্ত্রণা ও অনিশ্চয়তার মধ্যে একটা মজার ঘটনার উল্লেখ না করে থাকতে পারছি না। আন্দোলনের মধ্যে একদিন মধ্যাহ্নভোজন করছি জেনারেল ম্যানেজারের বাড়িতে। হঠাৎ অফিস থেকে ফোন এল চারতলায় যে ঘরে শিখ দারোয়ানরা থাকে, সেই ঘর শ্রমিকরা আক্রমণ করেছে। ছ'জন শিখ ওই ঘরে রয়েছে। জেনারেল ম্যানেজার বললেন পুলিশে খবর দাও। তারপর অফিসে গিয়ে দেখতে হবে। থানায় ফোন করলাম।

যে ফোন ধরেছিল তাকে ঘটনার পূর্ণ বিবরণ দেবার জন্য বললাম, আমাদের আনা ছ'জন শিখ, ইংরেজিতে বলতে হল সিক্স শিখস। ওপার থেকে ফোনে উত্তর এল: হু ইজ সিক? কার অসুখ করেছে?

বললাম, না না কেউ সিক না। সিক্স শিখস।

ওপার থেকে বলল, ইয়েস সিক্সটি সিক্স।

না, না না সিক্সটি সিক্স না।

তবে ছয়ে ছয়ে বারো৷

না, না, না বারোও নয়।

তবে কি সকলেরই অসুখ করেছে?

অফিসে খুনখারাবি হচ্ছে ভেবে প্রবল টেনশন। আর এদিকে? ফোন কেটে দিলাম। মনে হয়েছিল লক আউট করে দিতে পারলে ভাল হয়। কিন্তু শ্রমিকদের একটা বড় অংশ কারখানার মধ্যে সব সময় থাকে। তাদের বাইরে না পাঠাতে পারলে লকআউট করা সম্ভব নয়।

সাত-আটদিনের মধ্যেই শ্রমিকদের আন্দোলন মিটে গিয়েছিল। অফিসের কাজ আবার নিয়মশৃঙ্খলার মধ্যে মসৃণভাবে চলতে লাগল। আমিও স্থির হয়ে অফিসে বসলাম।

অফিস বাড়ির পাশে বম্বের মিউনিসিপ্যালিটি। সামনে ভিক্টোরিয়া টার্মিনাস রেল স্টেশন। তিনটি সৌধই বিশিষ্ট স্থাপত্যে নির্মিত। এই অঞ্চলটা তাই দেখবার মতো। হয়তো এতদিনে তিনটি সৌধই হেরেডিটি বিল্ডিং ঘোষিত হয়েছে। আমাদের বাড়ির সামনের অংশটি পুরনো চারতলা। পিছনে আরও একটি বাড়ি, নবনির্মিত, তাই সাদাসাপটা। টাইমস গোষ্ঠীর সব কর্মী এই দুটি বাড়িতে কাজ করে। একতলায় দৈনিক কাগজ ছাপার জন্য দ্রুতগতি রোটারি মেশিন। পাশের অন্য অংশে নতুন ফটোগ্রাভিওর যন্ত্রের জন্য জায়গা করা হচ্ছে। বাকি অংশ কমার্শিয়াল প্রিন্টিং বিভাগ, আমরা যাকে বলি জব ডিপার্টমেন্ট, বাইরের ছাপার কাজ করে দেওয়া হয়।

আমাদের অংশের অফিস শুরু হয় সাড়ে ন'টায়। দেখলাম সময় মেনে চলা এ অঞ্চলের মানুষদের মজ্জাগত। আমিও সকাল সাড়ে ন'টায় হাজির হই। সাহেবরা যেমন রেখে গিয়েছিল, এখনও তেমন ব্যবস্থা চলছে। প্রধান ম্যানেজার ক'জন এবং টাইমস অফ ইন্ডিয়ার সমগ্র সম্পাদকীয় বিভাগ তেতলার একটা বড় হলের মধ্যে। বাড়ির এই অংশটি এয়ারকন্ডিশন করা। অতি সহজেই আমাদের জাত্যাভিমান প্রতিষ্ঠা হওয়া ছাড়া, পরম আরামদায়ক ব্যবস্থা ছিল। ঘষা কাচ ঘেরা ছোট বড় কেবিনে আমাদের অফিস।

আমার পাশের ঘরে জেনারেল ম্যানেজার বসেন। জয়চন্দ জৈন। কলকাতায় কাজ করবার সময় তাঁর সঙ্গে পরিচয় হয়েছিল। তিনি আমার এখানে আসা আদৌ পছন্দ করছেন না, প্রথম সাক্ষাতেই জানিয়ে দিলেন। পছন্দ না করাই স্বাভাবিক। জার্মানিতে ফটোগ্রাভিওর মেশিনের অর্ডার তিনি দিয়েছিলেন। মেশিন কেমন চলছে দেখতে যাবার কথা তাঁরই। অথচ, তাঁর বদলে আমাকে সে-কাজে পাঠানো হল। জয়চন্দের কেন ভাল লাগবে? অথচ,

এই ব্যাপারে যে আমার কোনও হাত নেই এ-কথা তাঁকে অযাচিত বোঝাই কী করে? তিনি প্রথম থেকেই আমাকে সন্দেহের চোখে দেখলেন। তার আর একটা কারণ হল আমি মালিক ডালমিয়াজির পরিচিত। এবং হয়তো এও মনে করেছিলেন যে আমার সঙ্গে ডালমিয়াজির যোগাযোগ থাকবে। যদি মনে করে থাকেন, ভুল করেননি। কারণ, ডালমিয়াজি প্রায়ই সকালবেলা আমার বাড়িতে ফোন করে কাগজের খোঁজখবর নিতেন। ঘোড়া ডিঙিয়ে ঘাস খাওয়া কারও ভাল লাগবার কথা নয়।

জয়চন্দের পাশের ঘরে বসেন সম্পাদক ফ্র্যাঙ্ক মোরেস। ঠিক সাড়ে ন'টায় পরিপাটি স্যুট পরে গম্ভীর মুখে অফিসে ঢুকতেন। বেলা একটা নাগাদ যাবার জন্য রওনা হবেন তেমনই গম্ভীর মুখে। লাঞ্চের পরে না ফেরাই সাধারণ নিয়ম ছিল। ফ্রাঙ্কের সঙ্গে আলাপ হল। অতি ভদ্র সজ্জন মানুষ। ছোটবেলা থেকে বিলেতে পড়াশুনা করেছেন, অক্সফোর্ড অথবা কেমব্রিজে শেষ করেছেন। সম্পূর্ণ অভিজাত সাহেবি উচ্চারণে ইংরেজি বলেন। লেখেন অতি চমৎকার। অন্যদিন কোন সম্পাদকীয় নিবন্ধটি তাঁর রচনা বুঝতে পারতাম না। রবিবারে তাঁর নাম লেখা একটি কলম বেরুত টাইমস অফ ইন্ডিয়াতে। পড়ে আনন্দ পেতাম।

মোরেস প্রধানত সেই ধরনের মানুষ যাঁরা মনে করতেন দৈনিক কাগজে প্রধান হল সম্পাদকীয় প্রবন্ধ। মোরেসেরও তার বাইরে অন্য কোনও বিশেষ আগ্রহ ছিল বলে মনে হয় না। সম্পাদকীয় প্রবন্ধের প্রুফ দেখা অফিসে অন্যতম গুরুতর কাজ। সামান্য কোনও ভুল ত্রুটিও সম্পাদকেরা বরদাস্ত করতে পারেন না। যদিও সাধারণ মানুষরাই এই কাগজ পড়তেন তবু কাগজটা তাঁদের জন্য তৈরি করা হত না। কাগজের মূল উদ্দেশ্য ছিল প্রশাসকদের কাছে পৌঁছে দেওয়া। স্বাধীনতার পরবর্তী অধ্যায়ে বি জি খের মুখ্যমন্ত্রী হয়েছিলেন (তখন বলা হত প্রধানমন্ত্রী) তারপর মোরারজি রাজ্যভার গ্রহণ করেছিলেন। মোরারজির সঙ্গে কখনওসখনও মোরেস বা সহকর্মীদের দেখা সাক্ষাৎ হত। অন্যরা নেহাতই সামান্য মন্ত্রী। তাদের সঙ্গে সবার পরিচয় ছিল না। যোগ ছিল আমলাদের সঙ্গে। আমলারা তখনও শাসন কার্যে আধিপত্য করতেন। অবশিষ্ট কয়েকজন আই সি এস আছেন। তাঁদের পরের দল আই এ এসরা সবে দাপট দেখাতে শুরু করেছেন।

খবরের কাগজের ইতিহাসে এই সময় খুব উল্লেখযোগ্য ছিল না। সংবিধান

গৃহীত হয়ে গেছে। নেহরুর নেতৃত্বে ভারতবর্ষের গণতান্ত্রিক রূপ স্পষ্ট। সোস্যালিস্ট সংজ্ঞা গ্রহণ করা হয়েছে। ফলাফল এখনও জানা যায়নি। দেশের মানুষ অপেক্ষায় আছে। ইতিমধ্যে নেহরুর জোট নিরপেক্ষতার নীতি গ্রহণ করা হয়েছে। সাধারণ মানুষ তার তাৎপর্য নিয়ে বিশেষ মাথা ঘামাচ্ছে না। শিল্পপতি এবং ব্যবসায়ীরা এই নীতির মধ্যে বিপদের গন্ধ পাচ্ছে। জোট নিরপেক্ষ হতে গিয়ে আমরা সোভিয়েত রাশিয়ার নিকটে চলে যাচ্ছি এবং আমেরিকার থেকে দূরে। এটা ধনবানদের ভাল লাগবার কথা নয়।

বোম্বাইয়ের ইংরেজি কাগজগুলি তিনটি গোষ্ঠী প্রকাশ করে। প্রথম রামকৃষ্ণ ডালমিয়ার টাইমস অফ ইন্ডিয়া গ্রুপ। দ্বিতীয় রামনাথ গোয়েঙ্কার এক্সপ্রেস গ্রুপ এবং তিন নম্বরে সদানন্দের ফ্রি প্রেস গোষ্ঠী। আমার সময়ে যাঁর অধিকারে ছিল ফ্রি প্রেস গ্রুপ প্রচ্ছন্নভাবে এবং পরে যাঁর অধিকার প্রকাশ পেল তিনি একজন মালয়ালি ভদ্রলোক এ বি নায়ার। বোম্বাইতে বাস করেন। এখানে একসময় নিউজপ্রিন্টের ব্যবসা করতেন। সদানন্দের উচ্চাশা যেমন ছিল কার্যকরী সামর্থ্য তেমন ছিল না।

আরও একটা ইংরেজি দৈনিক ছিল। বোম্বাই ক্রনিকল। তার প্রচণ্ড সুনাম, সুদীর্ঘ পরম্পরা, টাইমসের মতো প্রাচীন না হলেও মূল্যবান। একদা সেই কাগজের সম্পাদক ছিলেন বি জে হর্নিম্যান। তিনি আইরিশ। আয়ারল্যান্ডের দেশাত্মবোধের, দাসত্বমুক্তির সংকল্প তিনি বম্বে ক্রনিকলে সঞ্চারিত করেছিলেন। শেষ সম্পাদক সৈয়দ আবদুল্লা ব্রেলভির মৃত্যুর পর মালিকেরা বোম্বাই ক্রনিকল বন্ধ করে দেন। কিছু অন্যায় কাজ করেননি। তাঁদের বোম্বাই ক্রনিকল-এর ওপর কোনও দায় ছিল না। এটাও সত্য যে কাগজটা চলছিল না এবং ভবিষ্যতে চলবার সম্ভাবনাও ছিল না। বোম্বাই ক্রনিকলের মালিকেরা, যাঁরা পারশি ব্যবসাদার, তাঁরা আরও একটি কাগজ পেয়েছিলেন— ভারতবর্ষের প্রাচীনতম সংবাদপত্র। গুজরাতি ভাষায়, 'মুম্বই সমাচার'। ১৮২২ সালে জনৈক ফিরদুনজি মরজবান এই কাগজের পত্তন করেছিলেন। নানা হাত ঘুরে কাগজ দুটি বর্তমানে পারশি ব্যবসায়ীদের হাতে পৌঁছেছিল। মালিকেরা ধনশালী ব্যক্তি। পরিবারের প্রশ্নাতীত প্রতিষ্ঠা, ভাল ব্যবসা করেন। তাঁরা একটি মুমূর্ষু ইংরেজি কাগজ নিয়ে কী বা করতেন। মুম্বই সমাচারের দিকেও যে তাঁদের নজর ছিল তা নয়। জনপ্রিয়তার ক্ষেত্রে গুজরাতি পাঠকেরা মুম্বই সমাচারকে প্রথম স্থান দিতেন।

তা হলে দেখা যাচ্ছে বোম্বাইয়ের দুই বড় সংবাদপত্র গোষ্ঠী মারোয়াড়ি পরিচালিত। তৃতীয়টি মালয়ালি ব্যবসাদার এবং চতুর্থ গোষ্ঠী সেই মুহূর্তে প্রায়-অনিচ্ছুক, ধনী, গুজরাতিভাষী, পারশি ব্যবসাদারের কর্তৃত্বে। মারাঠিরা যাঁরা সংখ্যায় সর্বাধিক, বোম্বাইতে তাঁদের নিজস্ব বলতে কোনও বড় কাগজ ছিল না। যে মারাঠি বড় কাগজটি বোম্বাই এবং আশপাশের মানুষেরা পছন্দ করত তার নাম লোকসত্তা। এটিও এক্সপ্রেস গোষ্ঠীর।

মারাঠিদের উল্লেখযোগ্য নিজস্ব কাগজ অনেক পরে প্রকাশিত হয়েছিল, 'নওয়াকাল'। মারাঠি কাগজগুলির ভাল বিক্রি হত না। এমন সময় সংযুক্ত মহারাষ্ট্রের ঢেউ এসে আছড়ে পড়ল বোম্বাইতে। সেই সময় স্বতন্ত্র মহারাষ্ট্র প্রদেশের অন্যতম প্রবক্তা আচার্য আত্রে 'দৈনিক মারাঠা' নামে যে কাগজ বের করেছিলেন সেটি সংবাদপত্রের বিক্রিতে প্রায় বিপ্লব ঘটিয়ে দিয়েছিল। শোনা গিয়েছিল বিক্রি পৌঁছেছে লাখের কাছে। বাইরের প্রেসে ছাপিয়ে আচার্য আত্রে আর কুলিয়ে উঠতে পারছেন না। নিজস্ব রোটারি মেশিন কেনা জরুরি। সে বেশ কয়েক লাখ টাকার ব্যাপার। আচার্য আত্রে স্বেচ্ছা-প্রদত্ত চাঁদার থেকে পঞ্চাশ ষাট লাখ টাকা তুলে ফেললেন। দুষ্টজনেরা বলেছিল ওটা সাধারণের টাকা নয়। স্বতন্ত্র মারাঠা আন্দোলনের সমর্থক কিছু যুযুধান ব্যবসাদার কালো টাকা দিয়েছেন আত্রেকে।

দৈনিক মারাঠা নিজস্ব বাড়ি কিনে ফেলল। সগৌরবে তার জয়যাত্রা চলতে থাকল। স্বতন্ত্র মহারাষ্ট্র গঠন হবার পরে বিক্রি কমে গিয়েছিল। এমন সময়ে আত্রের মৃত্যু হয়। তাঁর মেয়ে প্রখ্যাত কবি শিরীষ পৈ সম্পাদকের ভার নিলেন। কিন্তু কাগজটা চলল না। অত্যল্পকালে তার অন্ত্যেষ্টি হল।

টাইমস অফ ইন্ডিয়ার মারাঠি কাগজ অনেক পরে বেরোয়। এখন বোম্বাই শহরে প্রধান দুটি মারাঠি কাগজ হল এক্সপ্রেস গোষ্ঠীর জনসত্তা এবং টাইমস গোষ্ঠীর মহারাষ্ট্র টাইমস।

বোম্বাইয়ের বাইরে মহারাষ্ট্র রাজ্যের অন্যান্য অংশে যে সংবাদপত্র দাপটে রাজত্ব করে তার নাম 'সকাল'। সেটি শুরু করেছিলেন ধনহীন মারাঠি ব্রাহ্মণ নানাসাহেব পারুলেকার। ক্ষুদ্র অবস্থা থেকে বিশাল মহীরুহে পরিণত করেছিলেন।

ফ্রাঙ্ক মোরেস সম্বন্ধে একটা গল্প প্রচলিত ছিল। কোনও এক পার্টিতে

একজন সাংবাদিকের সঙ্গে ফ্রাঙ্কের পরিচয় হয়েছে। ফ্রাঙ্ক সেই সাংবাদিকের সঙ্গে কথা বলে খুব তুষ্ট হলেন। ছেলেটা বলে ভাল, জানে অনেক। একে তাঁর অফিসে নিতে পারলে ভালই হত। তাকে বললেন এই সপ্তাহে আমার অফিসে একদিন এসো। তুমি আমাদের সঙ্গে কাজ করলে আমি খুশি হব। ছেলেটি হতবুদ্ধি হয়ে গিয়ে বলল 'সে কী স্যার? আমি তো আপনার অফিসেরই রিপোর্টার।'

ফ্রাঙ্ক নির্বিবাদী মানুষ ছিলেন। আমার সঙ্গে তাঁর কমই দেখা হত—মাসে একবার কি দু'বার।

মধ্যাহ্নভোজে বাড়ি ফেরা আমার বহুকালের অভ্যাস।

বোম্বাইতে বাড়ি ফিরতে একটু অসুবিধা হত। একে অনেকটা দূর, তার ওপর একটা ভিড় রাস্তা পার হতে হয়। সময় অনেকটা লাগে। অফিস থেকে একটায় বেরিয়ে আবার আড়াইটায় ফিরে যেতে চাই। সেটা সম্ভব হত না।

মনে পড়ল দশ বছর আগে যখন প্রথম বোম্বাইতে এসেছিলাম তখন মনে রাখবার মতন একটা ভোজনশালা আবিষ্কার করেছিলাম। ভোজনশালাটি আসলে রেলওয়ে রেস্টুর্যান্ট। ভিক্টোরিয়া টার্মিনার্সের তেতালায়। একে বলা হত করিমস রেস্টুর্যান্ট। তখন যুদ্ধের সময়। সব জিনিসের সাশ্রয় করা নিয়মে দাঁড়িয়েছিল। পালন করা কঠিন। কেউ পালনও করত না। না করলেও ক্ষতি বৃদ্ধি হয় না। করিমের ওখানেও দেখলাম সেই নিয়ম। এক পাত্র প্রধান ভোজ্য এবং চারটির অধিক রুটি আদেশ করতে পারবে না কেউ। খাদ্য সংরক্ষণের নিয়মে এর বেশি করা দণ্ডনীয়। খেতে গিয়ে দেখেছিলাম একপাত্র মুরগি বা মাটন যথেষ্ট নয়। আরও মাংসের দরকার। তা ছাড়া আরও খান দুই রুটি নিতে পারলে ভাল হত। ভোজনশালায় গিয়ে প্রথম দিনে এই নিয়মটা জানতাম না। একপাত্র চিকেন কারি এবং চারটে রুটি নেওয়ার পর যখন দেখলাম আরও চিকেন কারি অবশিষ্ট আছে তখন দুটি রুটি চাইলাম। পরিচারক বললেন এই প্লেটগুলো সরিয়ে নিই তারপর আর একবার অর্ডার দিতে পারেন। আমি তাই করেছিলাম। আইন-মাফিক আইন-বহির্ভূত ভোজ্য পাওয়া গেল। কিন্তু সত্যিকারের উল্লেখযোগ্য বিষয় করিমের চিকেনকারি এত সুস্বাদু ছিল যে আর কোথাও এরকম মুরগির পদ খেয়েছি বলে মনে পড়ে না।

করিমের দোকানের প্রতি এমন আকৃষ্ট হয়ে পড়েছিলাম যে কয়েকবার দাদার থেকে করিমে খেতে এসেছি।

করিমের কথা মনে হওয়া মাত্রই সেদিন দুপুরে করিমে খেতে যাবার ইচ্ছা হল। কিন্তু একেবারেই অফিসের সামনে করিমের দোকান—তার কোনও আভিজাত্য নেই—সেখানে খাওয়াটা সমীচীন হবে কি না বুঝতে পারলাম না। অফিসের কেউ যদি দেখে ফেলে আমার মান মর্যাদা কোথায় থাকবে? এই অফিসে উঁচু দিকের অফিসাররা সবাই স্যুট পরে। আমিও পরি। সেটা করিমে যাওয়ার অন্তরায় হয়ে দাঁড়াল।

করিমের মুরগি কারি যে কত বিশিষ্ট সেটা ক্রমশ প্রকাশ পেল। বোম্বাইয়ের অন্যান্য মধ্যমশ্রেণীর ভোজনশালায় যে মুরগির ব্যঞ্জন পাওয়া যেত তাতে অপরিচিত মশলার আতিশয্য আমাকে বিরক্ত করত। করিমের মতো এমন নির্মল তারল্যে কুক্কুট মাংস আর কোথাও পাইনি। করিমের আর কোনও পদ অনুরূপ সুস্বাদু ছিল কিনা সে খবরও নেওয়া হয়নি, করিমের চিকেনকারিতে এত মোহিত হয়ে পড়েছিলাম। বোম্বাইয়ের স্থানীয় ভোজ্যের একটা বিশেষ গন্ধ থাকত যেটা আমার কলকাতার অভ্যাস ঠিক বরদাস্ত করতে পারত না।

বোম্বাইয়ের স্থানীয় ভোজ্য বলতে চারটি বিশিষ্ট ধারাকে বোঝায়—ইরানি, গুজরাতি, মারাঠি এবং পারশি।

ইরানি ভোজনশালাগুলি আমেরিকান লুপ্তপ্রায় ড্রাগ স্টোরের ধরনের ছিল। বিবিধ মনোহারি দোকান বলতে যা বোঝায় অনেকটা সেই ধরনের বা তারও বেশি অর্থাৎ দৈনন্দিন প্রয়োজনের প্রায় সব জিনিসই ইরানির স্টোরে পাওয়া যায়। দোকানের একাংশে রেস্টুর‍্যান্ট। সেখানে কয়েকটি ছোট টেবিল এবং চেয়ার থাকবে। দোকানের অবস্থান এবং বিক্রির পরিমাণের ওপর নির্ভর করত রেস্তোরাঁর খাদ্য তালিকা। কোথাও শুধু চা বিস্কুট টোস্ট। আবার কোথাও সবজি ও মাংসের নানাবিধ পদ। লন্ডন শহরে যাঁরা তিরিশ-চল্লিশ বছর আগে গিয়েছেন লায়নস কর্নার হাউস দেখে থাকবেন। সেই দোকানগুলির মতো বোম্বাইয়ের ইরানি স্টোর এবং রেস্টুর‍্যান্টগুলি অর্থনৈতিক চাপে বিলুপ্ত হয়েছে।

একটা ইরানি দোকান আমার প্রিয় ছিল। বোম্বাই শহরের কেন্দ্রস্থলে ফোয়ারা বা ফাউন্টেনের পুব দিকে পার্কস রেস্টুর‍্যান্ট। নামটা ঠিক লেখা হল কি না বলতে পারছি না। রোমান অক্ষরে বানান ছিল Pyrkes। কেউ উচ্চারণ করত পিরকস। কেউ বলে পিরকিস। এদের মধ্যে কে ঠিক গবেষণা করা হয়নি। পার্কসে যাবার অন্যতম কারণ সেখানকার লেসি কাটলেট।

আমি উত্তর কলকাতার ঐতিহ্যের মানুষ। বৈকালিক ভোজনে চপ-কাটলেট গ্রহণ করবার স্বাভাবিক প্রবণতা আছে। বোম্বাইতে গিয়ে কোথাও ঠিক আমাদের ধরনের চপ বা কাটলেট খেতে পাই না। শেষে এক বন্ধু খবর দিলেন যে পার্কসে গেলে লেসি কাটলেট বলে যে পদার্থ পাব সেটি আমাদের দ্বিতীয় শ্রেণীর মটন কবিরাজি কাটলেটের সমান। অফিস থেকে ফেরবার পথে কখনও সখনও লেসি কাটলেট কিনে বাড়ি ফিবতাম। চায়ের সঙ্গে ডুয়েট ভালই জমত।

যে অঞ্চলে আমার অফিস এবং যে অঞ্চলে আমার বাস সেখানে পছন্দ করবার মতো মারাঠি খাদ্য জানা ছিল না। মারাঠি খাদ্যের উপযুক্ত প্রতিনিধি গ্রহণ করতে হলে যেতে হবে পাঁচ মাইল দূরে দাদারে। মারাঠি খাবারের সঙ্গে আমার পরে ঘনিষ্ঠ পরিচয় হয়েছিল।

আমার অফিস এলাকায় গুজরাতি ভোজ্যের কয়েকটি রেস্টুর্যান্ট ছিল। অন্যতমের নাম পুরোহিত। চার্চ গেট স্ট্রিটের ওপরে। মেরিন ড্রাইভের সন্নিকট এই অঞ্চলে বোম্বাইয়ের যাবতীয় মূল্যবান ভোজনশালা এবং অন্যান্য বিপণি। পুরোহিতে প্রথম গিয়েছিলাম বছর দশেক আগে। আয়োজন দেখে বাক্‌রহিত হবার কথা। রুপোর থালা বাটিতে পরিবেশন, শ্বেত পাথরের টেবিল, অতি পরিচ্ছন্ন। ডাল এবং সবজি দিয়ে অন্তত পাঁচটি বাটি ছিল থালার ওপরে। তারপরে একটি পায়েসের বাটিও ছিল। আয়োজনের এত শোভা কিন্তু ভোজ্যের স্বাদ তার সঙ্গে সঙ্গত করতে পারত না। বিস্বাদ ঘোল এল গেলাসের পর গেলাস। গুজরাতিরা বলেন ছাস। এখন বলা হয় গুজরাতি বিয়ার। ঘোল থেকে মাখন নির্বংশ করে যেটুকু পড়ে থাকে তা থেকে ছাস তৈরি হয়। ব্যঞ্জনগুলি ফিকে। আলু, শিম, কপি এবং কুমড়োর। হিংযুক্ত ডাল ভাল লেগেছিল। মিষ্টান্ন দু'-তিন প্রকার। গুজরাতিরা ভোজনের প্রথম পর্বে মিষ্টান্ন গ্রহণ করে। রুপোর থালায় আর ছিল ক্ষুদ্র একটি ধোকলা। ডাল এবং আলু দিয়ে পাকোড়া জাতীয় দুটি ভোজ্য। আর একটি নতুন ভোজ্য ছিল পাত্রে। পাতরেল কচুপাতার ওপরে ডালবাটা দিয়ে তাকে রোল করে পুরু চাকা চাকা করে ভাজা এই বস্তুটি আমার প্রথম সম্পর্কেই অসহ্য লেগেছিল। যাই হোক সব মিলিয়ে পুরোহিতের ভোজন আভিজাত্যের এবং নতুনত্বের সুখ দিয়েছিল।

পুরোহিত তখন ছিল, এখনও আছে। এখন রুপোর বাসন আর নেই কিন্তু বিবিধ ব্যঞ্জনের ঘটা কিছুমাত্র কমেনি।

দ্বিতীয় মনোজ্ঞ ভোজ্যের আসর ছিল চেতনা। আমার বাবার এক বন্ধু সুধাকর দীক্ষিত মনে প্রাণে বুদ্ধিজীবী। বোম্বাইতে ব্যবসা করতে এসেছিলেন। চেতনা নাম দিয়ে একটা বইয়ের দোকান প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। সাধারণ দোকানে পাওয়া যায় না এমন সব বই পাওয়া যেত সেখানে। কিন্তু দেখা গেল বই বেচে পেট ভরে না। আমি যখন এলাম বইয়ের দোকান অর্ধেক করে দিয়ে অবশিষ্ট অংশ খাদ্যশালা করে দেন। সেখানে ঘৃত-প্লাবিত ব্যঞ্জন অপেক্ষা

আধুনিক ইউরোপিয়ান ধরনে প্রস্তুত করা গুজরাতি ভোজ্য পাওয়া যেত।

বলা বাহুল্য গুজরাতিরা নিরামিষ খান। তাদের সব খাদ্যশালাগুলি আমিষের স্পর্শ-বর্জিত। গুজরাতিদের একটি পদ আছে, যে-কোনও ভোজন পাত্রে তার উপস্থিতি অমোঘ। তার নাম কড়ি। দই থেকে উদ্ভূত এই কড়ি মিশিয়ে শেষ গ্রাস না গ্রহণ করলে গুজরাতিদের ভোজন হয়েছে বলে মনেই হয় না। গুজরাতি মিষ্টিযুক্ত কড়ি আমাকে কোনওদিন আনন্দ দিতে পারেনি।

এই প্রসঙ্গে তিনটি গুজরাতি ভোজ্যের কথা না বললে গুজরাতি খাদ্যাভ্যাসের বিবরণ অসম্পূর্ণ থেকে যায়। একটির নাম আমরস, অপর দুটি বাসুন্দি ও শ্রীখণ্ড। গুজরাতি এবং মারাঠিরা এই মিষ্টান্নগুলিকে তাঁদের নিজস্ব বলে দাবি করেন।

আমরস এবং পুরী কখনও সম্পূর্ণ ভোজনের উপকরণ, কখনও ভোজনের শেষপদ। দুধ এবং পাকা আম দিয়ে তৈরি এই মিষ্টান্নটি আমার প্রিয় ছিল। বাসুন্দি আমাদের পাত ক্ষীর বা চন্দন ক্ষীরের মতো। তরল মসৃণ সুগন্ধযুক্ত এই পদটি সর্বদা আমাকে আকর্ষণ করে।

শ্রীখণ্ড দই থেকে উদ্ভূত। মারাঠি এবং গুজরাতিরা বলেন এর প্রকরণ অতি সরল। প্রস্তুত করা আরও সহজ। দই থেকে জলের অংশ বহিষ্কার করা প্রকরণের অন্যতম কর্তব্য।

গুজরাতি একটি পদের উল্লেখ করা হয়নি। সেটা হল খাণ্ডভি। অনেকে এটাকে বলেন ভেজিটেবল অমলেট। দই ও বেসন সহযোগে এই অপরূপ ভোজ্য গভীর অভিনিবেশ সহকারে তৈরি করা হয়। সেটা সকলের হাতে খোলে না।

ক্রমশ পরিচয় পরিধি বাড়তে লাগল। আলস্য যাপনের কর্মহীন সময় কমে এল। সভা সমিতিতে যাই। ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের নেমন্তন্নের ভোজসভায় যোগ দিই। নতুন নতুন মুখ চিনি। নতুন খাদ্যের সঙ্গে পরিচিত হই। বোম্বাইতে মুসলমানি খাদ্যে একটি স্বতন্ত্র এবং মনোহর ধারা আছে। এই ধারার প্রবর্তক বোহরা মুসলমানরা। এই খাদ্য ধারার সঙ্গে পরিচয় হল অনেক পরে।

আমার পরিচয় বৃত্তে কিছু লঘু মাপের মন্ত্রী, আমলা, শিল্পপতি এবং ব্যবসাদার। ব্যবসা, শিল্পে গুজরাতিরা প্রধান, রাজনীতিতে মারাঠি এবং গুজরাতিরা প্রায় সমান সমান। এটা মুখ্যমন্ত্রী মোরারজি দেশাইয়ের আমল।

তিনি কঠোর রক্ষণশীল। কিছুমাত্র ব্যত্যয় সহ্য করেন না। বিশ্বাস করেন তাঁর অভিমতই চূড়ান্ত। তাঁর জীবনযাত্রা সকলের আদর্শের উপযুক্ত। বোম্বাইতে তখন মদ্যপান নিষিদ্ধ ঘোষিত হয়েছে। গুণীজনেরা বলেন, তাতে মদ্যপান কমেনি। বরং বেড়েছে বলা যায়। ছোট ছেলেরা যেমন কোনও বারণ করা কাজ করে আনন্দ পায় তেমনি যারা মদ্যাসক্ত নয় তাদের মধ্যেও অনেকে আইনকে বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ দেখাবার জন্য অল্পবিস্তর সুরা গ্রহণ করতেন। এ-বিষয়ে তথ্যভিত্তিক প্রমাণ নেই। তবে এটা ঠিক যে বোম্বাই রাজ্যে মদ চোলাইয়ের কাজ অনেক বেড়ে গিয়েছিল। পুলিশ দোষীকে নিগ্রহ না করে নির্দোষকে উত্ত্যক্ত করে আরেকটা নতুন কাজ পেয়ে গিয়েছিল।

পারমিট না থাকলে মদ্যপান সম্ভব নয়। যে কয়টি অনুমতি পাওয়া পানশালা ছিল সেখানে সব সময় একজন দারোগা বসে থাকত, তার কাজ পারমিট-রহিত কেউ মদ্যপান করছে কি না দেখা। পুলিশ বিভাগে চাকরি বেড়ে গিয়েছিল। পানশালাগুলি তাদের ছোটখাটো অন্যায় কাজের অনুমোদনের জন্য উপস্থিত পুলিশ অফিসারকে উৎকোচ দিত।

আমাদের সম্পাদক ফ্র্যাঙ্ক মোরেস গোয়ার উন্মুক্ত পরিবেশে জন্মেছেন। গোয়া অবশ্য পর্তুগিজদের অধীন। মোরেস পড়াশুনা করেছেন বিলেতে। স্বভাবে এবং অভ্যাসে আধুনিক। তিনি মোরারজির মদ্যপান নিরোধ নীতি আদৌ পছন্দ করেন না। টাইমস অফ ইন্ডিয়ার সম্পাদকীয় প্রবন্ধে কয়েকবার এই নীতির এবং তার কুফলের ওপর লেখা হয়েছিল। স্বাভাবিকভাবে মোরারজি আমাদের প্রতি বিরূপ ছিলেন। মোরেসকে একবার ডেকে নিয়ে গিয়ে তিরস্কারও করেছিলেন। জেনারেল্ল ম্যানেজার জয়চাঁদের বিরুদ্ধে একটা ক্রিমিনাল কেস বহুদিন ধরে ছিল। তিনি নাকি অন্যায়ভাবে ভৃত্যের রেশনকার্ড ব্যবহার করেছিলেন। জয়চাঁদ অবশ্য বলতেন এটা মোরারজির প্রতিশোধ স্পৃহা। যেন তেন প্রকারে টাইমসের কর্তাদের পীড়ন করা।

জনসংখ্যার দিক দিয়ে বোম্বাই রাজ্যে মারাঠির সংখ্যা বেশি, কিন্তু মারাঠিরা অনেকটা বাঙালিদের মতন। নিজ ভূমে পরবাসী। ব্যবসা বাণিজ্যের প্রধান হল পারশি এবং গুজরাতি। মারাঠি শিল্পপতি হাতে গোনা যায়। কির্লোসকার ব্যতীত অন্য কোনও মারাঠি শিল্পপতির নাম তখনও শোনা যায়নি। মানুষগুলি প্রধানত চাকুরিজীবী। সেখানেও বহিরাগতদের কাছে পিছিয়ে পড়েছে।

অফিসে মধ্যবর্তী কাজ প্রায় একচেটিয়া কেরলার মালায়ালিদের। বস্তুত তখন বোম্বাই মালায়ালিদের রোজগারের প্রধান জায়গা ছিল। টাইপিস্ট, স্টেনোগ্রাফারের পদগুলি একচেটিয়া দক্ষিণ ভারতের লোকদের দখলে। ব্যবসায়ীদের অফিসে মধ্যবর্তী ও উঁচুপদে মারাঠিরা সংখ্যাল্প। মারাঠিদের মনে আমাদের বাঙালিদের মতন ক্ষোভ জন্মাতে শুরু করল। আরও একটা ব্যাপারে মারাঠিদের সঙ্গে বাঙালিদের মিল খুঁজে পাই। মারাঠিরা নিজেদের সাহিত্যের পৃষ্ঠপোষক। মারাঠি সাহিত্য সম্মেলন মারাঠিদের কাছে শুধু সামাজিক নয়, রাজনৈতিক গুরুত্বের প্রতিষ্ঠান। মারাঠিরা আমাদের মতন উত্তেজনা প্রবণ। অকস্মাৎ আবেগে চঞ্চল হয়। আবার প্রশমিত হতে দেরি লাগে না। দু'জন মারাঠি দেখা হলে তৎকালীন রাজনৈতিক আলোচনা অতি স্বাভাবিক ঘটনা।

ভেতরে ভেতরে ক্ষোভ যে পুঞ্জীভূত হচ্ছিল ষাট দশকের শেষ দিকে সেটা স্বতন্ত্র মহারাষ্ট্রের দাবিতে বিস্ফোরিত হল। ১৯০০ সালের মে মাসে মহারাষ্ট্র এবং গুজরাত রাষ্ট্র ঘোষিত হল। মারাঠিদের মনে ভয় ছিল যে বোম্বাই শহর হয়তো মহারাষ্ট্রের অন্তর্গত হবে না। অনেকে এমনও বলেছিলেন যে বোম্বাইকে একটি স্বাধীন রাজ্য করে দেওয়া হোক। অন্যপক্ষে গুজরাতিদের আশঙ্কা ছিল বোম্বাই শহর মহারাষ্ট্রের অন্তর্গত হলে গুজরাত খোঁড়া হয়ে পড়বে। ভারতবর্ষের বৃহৎ পোতাশ্রয় এবং বন্দরের ওপর দখল না থাকলে গুজরাতের প্রভূত ক্ষতি হবে।

রাজ্য ভাগ হয়ে যাবার পর সে আশঙ্কা অমূলক প্রমাণিত হয়েছে। বোম্বাই বন্দর এখনও ভারতবর্ষের সবচেয়ে বড় বন্দর। রাজ্য ভাগ হয়ে যাবার পর গুজরাতের কান্দালা বন্দরের দ্রুত উন্নয়ন হয়েছে। তবুও বোম্বাই নিজের স্থান দখল করে আছে।

আজও বোম্বাইয়ের সর্বভারতীয় রূপটি বজায় আছে। বোম্বাই শহরে নানা দেশের অধিবাসীদের সহাবস্থান। মারাঠি ভাষা প্রাধান্য পায় সন্দেহ নেই কিন্তু মারাঠিরা ব্যবসা-বাণিজ্যে যে উঁচু আশা করেছিলেন তা সম্ভব হয়নি। শিল্পজগতে বোম্বাইয়ের প্রাধান্য এখনও বর্তমান। সেখানে টাটাদের অসামান্য অবদান।

টাটারা ধর্মে পারশি। সম্পূর্ণ বিশিষ্ট, স্বতন্ত্র, পরম্পরা আজও পারশিদের মধ্যে বর্তমান। এদের মোট জনসংখ্যা সারা ভারতবর্ষে এক লক্ষেরও কম। ভারতবর্ষের উন্নয়নে পারশিদের ভূমিকা লক্ষণীয়। যেমন ব্যবসায়, তেমনি

পেশায় আইন, চিকিৎসা, চারুশিল্প, বিজ্ঞান সর্বত্রই পারশিদের সমকক্ষ আর কোনও জনগোষ্ঠী খুঁজে পাওয়া কঠিন।

বোম্বাই পৌঁছে দেখি তখনও স্বতন্ত্র মহারাষ্ট্রের আন্দোলন শুরু হয়নি। স্পষ্টত মানুষেরা এখানে শান্তি ও শৃঙ্খলার মধ্যে বাস করেন।

পারশিরা অগ্নির উপাসক। ইরানে ইসলামের প্রভাব বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে পারশিদের ইরানে থাকা কঠিন হয়ে পড়েছিল। ইরানে যারা পারশি বলে পরিচিত হলেন তাঁরা তেরশো বছর আগে জাহাজে করে ভারতের পশ্চিম উপকূলে অবতীর্ণ হলেন। তাঁরা তাঁদের সামাজিক ক্রিয়াকার্য অক্ষুণ্ণ রেখেও বহু বছর হল ভারতীয় হয়ে পড়েছেন। পারশিদের মাতৃভাষা গুজরাতি। তবে ঘন-নিবদ্ধ গুজরাতি ভাষা থেকে দূরে চলে এসেছে। কিছু শব্দের ব্যবহার ও উচ্চারণ সাধারণ গুজরাতিদের মতন নয়। বোম্বাইতেই বলা হয় পারশি গুজরাতি।

পারশিদের পোশাক-পরিচ্ছদেও বিশেষত্ব ছিল। প্যান্টের ওপর আজানুলম্বিত আচকানের ধরনের একটা জামা, মাথায় বিচিত্র টুপি। পারশিদের উপাসনার স্থান হল অগ্নি মন্দির। সেখানে অন্য ধর্ম সম্প্রদায়ের প্রবেশ নিষেধ। পারশিরা মৃতদেহ সৎকারেও অন্য রীতি মানে। মৃতদেহকে উঁচু একটি গম্বুজের ওপর রেখে আসা হয়। শকুনেরা মৃতদেহটা ছিন্নভিন্ন করে খায়।

পারশিরা কোনও সময় হিন্দু-মুসলমান বা ভাষা ভিত্তিক গুজরাতি মারাঠিদের সঙ্গে মিলতে পারেনি। তাদের পোশাক-পরিচ্ছদ এখন বদলে গেছে। আর চেহারা দেখলে পারশি বলে মনে নাও হতে পারে। কিন্তু আচারে আচরণে রক্ষণশীলদের সংখ্যাধিক্য। পারশিদের ভোজন এখনও পরম্পরা মেনে চলে। কোনও পারশির বাড়িতে ভোজন করলে সে পরম্পরার সবটা নজরে নাও পড়তে পারে। কেন না যার বাড়িতে আপনি অতিথি তিনি আধুনিক সমাজের মানুষ। তাঁর আহারে ব্যবহারে পশ্চিমি প্রভাব অবশ্যম্ভাবী। জন্ম, উপনয়ন বা বিবাহের উৎসবে কিন্তু এখনও পারশিরা স্বতন্ত্র—নিশ্চিতরূপে বলা যায়।

আমাদের অতবড় অফিসে দশজন পারশি ছিল কি না সন্দেহ। গুজরাতির সংখ্যাও নগণ্য। দশ না হয়ে হয়তো পঞ্চাশ হবে। উচ্চপদে আসীন প্রধানদের মধ্যে দু'-একজন গোয়ার এবং দক্ষিণী, প্রধানত মালাবার অঞ্চলের মানুষরাই নিযুক্ত ছিলেন। বোম্বাইয়ের এই অবস্থা নতুন কিছু নয়। তখনকার বোম্বাইয়ের

সমাজ ব্যবস্থার প্রতিরূপ মাত্র। উত্তর ভারতীয়রা ইংরেজ চলে যাবার পর বোম্বাইতে আসতে আরম্ভ করেছে।

একজন পাঞ্জাবি পরে টাইমসের সম্পাদকও হয়েছিলেন। গুজরাতি একজনই ছিলেন সহকারী সম্পাদক পদে।

বাঙালি অবশ্য আরও কম। আমরা দু'জন মাত্র ছিলাম। অন্যজন ব্লক তৈরি বিভাগের প্রধান। তিনি রঙিন ছবির ব্লক তৈরি করায় কুশলী ছিলেন। আমার আগেই টাইমসে প্রবেশ করেছিলেন। বোধহয় বিদ্যালাভও করেছিলেন বিদেশের কোথাও। শুধু ব্লক তৈরি করায় নয়, রঙিন ছবি ছাপানো সমগ্র মুদ্রণ শিল্পেই বিপ্লবের সূত্রপাত হয়েছিল ষাটের দশকে। আশির দশকে রঙিন ছবি ছাপার কৌশল আমূল বদলে গেছে। প্রযুক্তি এমন নতুন নতুন যন্ত্র বের করেছে যে মানুষের ব্যক্তিগত পটুত্ব তার গুরুত্ব হারিয়েছে।

নতুন ফোটোগ্রাভিওর মেশিন চালু হলে ইলাসট্রেটেড উইকলির কপিগুলিকে ছাপার পরে আলাদা করে স্টিচ করার দরকার হবে না। মেশিনই ছাপার সঙ্গে সঙ্গে পত্রিকার কপিগুলি স্টিচ করে দেবে। সুতরাং যাদের ওপর স্টিচ করার ভার ছিল তারা বাহুল্য হয়ে পড়বে। এমন কর্মীর সংখ্যা ছিল পঁয়ত্রিশ জন। আমাদের মনে হয়েছিল এই পঁয়ত্রিশ জনের পাওনাগণ্ডা মিটিয়ে দিয়ে ছুটি দিয়ে দেব। কিন্তু টাইমস অফ ইন্ডিয়ার ইউনিয়ন এত শক্তিশালী যে তাদের সমর্থন ছাড়া এ কাজ করা সম্ভব নয়। সুতরাং ইউনিয়নের কর্তাব্যক্তিদের সঙ্গে এ-বিষয়ে আলোচনা চলতে লাগল। এদের মধ্যে দু'জন, কোলহাটকার; সাধারণ সম্পাদক এবং তার সহকারী মদন ফাদনিস। এদের সঙ্গে পরিচয় হল। মানুষগুলো জেদি কিন্তু খারাপ নয়। তাদের দাবিদাওয়া পূরণ করলে তবেই তারা আমাদের দাবি স্বীকার করে নেবে। ইলাসট্রেটেড উইকলি স্টিচ করবার বাড়তি কর্মীদের ইউনিয়নের সমর্থন নিয়েই ছাঁটাই করতে হবে। সুখের কথা ইউনিয়ন এ-ব্যাপারে আমাদের সঙ্গে সহযোগিতা করল এবং বাড়তি কর্মীদের ছাঁটাই করেছিলাম। তাদের পাওনাগণ্ডা ব্যাপারটা যদিও দরকষাকষিতে সহজ ছিল না।

একটা ঘটনা লক্ষ করলাম যে কোনও কর্মীর বিরুদ্ধে নালিশ করলেই ইউনিয়ন সেটা তাদের হাতে নেয়। আমাদের সঙ্গে আলোচনায় বসে। যদি তাদের বোঝাতে পারা যায় যে তাদের দাবি ন্যায্য নয় সেই দাবি ছাড়তেও রাজি হয়। বোনাসের সময় চিরকাল একটা দড়ি টানাটানি লড়াই হয়েছে। একদিন দু'দিন যে ধর্মঘট হয়নি তা নয়। আমার সঙ্গে ইউনিয়নের সম্পর্ক এত সহজ হয়ে গিয়েছিল যে তাদের কোনও কাজের গূঢ় উদ্দেশ্য বলতেও দ্বিধা করেনি।

আমাদের অফিসে প্রয়োজনের বেশি লোক কাজ করে সেটা অল্পদিনেই

বুঝতে পারলাম। লোক ছাঁটাই করা যায় না। মাইনে বাড়তে থাকে। অন্যান্য নানা উপায়ে আয় বৃদ্ধি করে সমতা রক্ষা করতে হয়।

বাড়তি লোকেদের ছাড়াতে হল না। তার কারণ শেঠজির সাম্রাজ্য বিস্তারের আকাঙ্ক্ষা। ইংরেজিতে ফিল্ম ফেয়ার আগেই শুরু হয়েছিল, অনুরূপ সাম্রাজ্য বিস্তারের আকাঙ্ক্ষা টাইমস অফ ইন্ডিয়ার নতুন মালিক শান্তিপ্রসাদ জৈনেরও ছিল। টাইমসের মালিকানা পরিবর্তনের আঁচ পাননি বাইরের লোক। আমাদের পাঠক ও পৃষ্ঠপোষকেরাও কোনও পরিবর্তন দেখতে পাননি। কর্মীদের ওপরও এই মালিকানা কোনও প্রভাব ফেলেনি। আমরা যারা ওপরের দিকে কাজ করি মালিকানা পরিবর্তনের আকস্মিকতায় চমকে গিয়েছিলাম।

ডালমিয়াজি একটি বিমা কোম্পানির কর্তৃত্ব অর্জন করেছিলেন। সে-কোম্পানির অর্থ সংক্রান্ত কিছু অনৈতিক কাজের জন্য টাইমসের মালিকানা ছাড়তে বাধ্য হলেন। সে কারণে তাঁর বুঝি তড়িঘড়ি দু'কোটি টাকার প্রয়োজন হল। সেই টাকাটা পেয়েছিলেন শান্তিপ্রসাদ জৈনের কাছ থেকে। বিনিময়ের মূল্য ছিল টাইমস অফ ইন্ডিয়ার মালিকানা। টাইমস অফ ইন্ডিয়া অর্জন করে শান্তিপ্রসাদজি আমাদের চেয়ারম্যান হলেন। তাঁর স্ত্রী এবং তাঁর নিজের হিন্দি সংবাদপত্র বিস্তারে বিশেষ আকাঙ্ক্ষা। তাঁদেরই আগ্রহে ইংরেজি ফেমিনা পত্রিকা শুরু করা হল। হিন্দিতে সাপ্তাহিক ধর্মযুগ সদ্য যুক্ত হয়েছে। পরাগ ও সারিকা নামে দুটি মাসিকপত্র শুরু হল। কাজেই বাড়তি লোকেদের অন্য কাজের সুযোগ দিতে পেরেছিলাম।

ইউনিয়নের সঙ্গে আমার সুসম্পর্ক অনেকের বিরক্তির কারণ হয়েছিল। ইউনিয়ন সর্বদা কোম্পানির জন্য কণ্টকসজ্জা তৈরি করে রাখে, সেটা অনেকের ইচ্ছা। তারপর, তাঁদের সুবিধা মতো কখনও ইউনিয়নকে আবার কখনও ম্যানেজমেন্টকে জয়ী করে দেন। আমার সন্দেহ ছিল জয়চাঁদ জৈনও ইউনিয়নের সঙ্গে সমস্যারহিত সম্পর্ক পছন্দ করতেন না। তাঁর পছন্দ ছিল ইউনিয়নকে দাপটের সঙ্গে দমিয়ে রাখা।

১৯০০ সালে বেতন বোর্ডের সুপারিশ কার্যকর করা নিয়ে সারা ভারতবর্ষে সংবাদপত্র ইউনিয়নগুলির সঙ্গে প্রধান কাগজগুলির ঘোর মতান্তর হয়। ফলে একটা সর্বভারতীয় ধর্মঘট হয়েছিল প্রধানত বড় কাগজগুলির বিরুদ্ধে। দক্ষিণ ভারতের কাগজগুলি নির্বিরোধ প্রতিষ্ঠান। তারা লাভ ভাল করে। অল্পে তুষ্ট এবং কলহবিবাদ তাদের সহ্য হয় না। ফলে সেখানে ধর্মঘট হয়নি। উত্তর

ভারতে প্রধান কাগজগুলি বহু দিন বন্ধ ছিল। মীমাংসার ক্ষেত্রে মিল ছিল না। যখন অবস্থা প্রায় আয়ত্তে এসে গিয়েছে অর্থাৎ দু'পক্ষ একটা মীমাংসার পথে এসে গিয়েছে তখন কলকাতার স্টেটসম্যান পত্রিকা হঠাৎ ইউনিয়নের সঙ্গে মিটমাট করে নিল। অকস্মাৎ আমাদের একতায় আঘাত লাগায় আমরা বিব্রত হয়ে পড়েছিলাম। তখন স্টেটসম্যান-এর পরিচালনার ভার ছিল সাংবাদিক গোষ্ঠী থেকে উন্নত এক ভদ্রলোকের ওপর। তাকে আমরা ভাল করে জানি না, মনের মিল তো পরের কথা।

এই ধর্মঘটও মিটে গেল। দু'পক্ষকেই কিছু কিছু ছাড়তে হল।

ফ্র্যাঙ্ক মোরেস নির্বিরোধ কাজ করে যাচ্ছিলেন। তাঁর ছেলে ইংরেজি ভাষার উদীয়মান কবি। কী একটা পুরস্কারও পেয়েছিল। তাঁকে বুঝতে না দিয়ে তাঁর সঙ্গে চাকরির চুক্তি শেষ হবার পর আর নতুন করে চুক্তি করা হল না। আমাদের আচরণে ফ্র্যাঙ্ক যৎপরনাস্তি বিস্মিত হয়েছিলেন। তাঁর জায়গায় সম্পাদক করা হল প্রথম কয়েকদিন মুলগাঁওকরকে। তিনি কলকাতার টাইমস অফ ইন্ডিয়ার রিজিওনাল সম্পাদক ছিলেন। তারপরে তাঁর ওপর থেকে দায়িত্ব প্রত্যাহার করে নিয়ে নানপোরিয়াকে সম্পাদক নিযুক্ত করা হল।

নানপোরিয়ার বাবা ভারতীয়, মা জাপানি।

প্রতিষ্ঠানের প্রতি কোনও টান ছিল না নানপোরিয়ার। সবার সঙ্গে মিশতেও পারতেন না। দু'-একজন সহকারী সম্পাদকের সঙ্গে তাঁর সদ্ভাব ছিল। ইংরেজি অসাধারণ ভাল লিখতেন। দেশ-বিদেশের সম্পর্কে সম্পূর্ণ ওয়াকিবহাল। কিন্তু ভারতীয় এবং তার পরের ধাপে প্রাদেশিক ঘটনা প্রবাহের সঙ্গে আদৌ পরিচিত ছিলেন না। ইনিও পরম নির্বিবাদী ছিলেন। সম্পাদক হলে দলনেতাও হতে হয়। অন্তত সহ-সম্পাদকদের উপদলের নেতৃত্ব না করলে কাজ করা যায় না। নানপোরিয়া বললেন, তাঁকে যদি জাপানে সংবাদদাতা হিসাবে পাঠানো যায় তা হলে তিনি সম্পাদকীয় দায়িত্ব ছেড়ে দিতে প্রস্তুত। অবরোহণ ডিমোশনের স্বেচ্ছাবৃত এমন সিদ্ধান্ত আমাদের অবাক করে দিয়েছিল। আমরা সম্মত হয়ে তাঁকে জাপান পাঠিয়ে দিলাম। তারপরের সিনিয়র সহ-সম্পাদক শ্যামলাল এবার সম্পাদক নিযুক্ত হলেন। শ্যামলাল সেদিন পর্যন্ত টাইমস অফ ইন্ডিয়ার প্রধান সম্পাদক ছিলেন। প্রশংসা ও সম্মান পেয়েছিলেন। যদিও তাঁর আগ্রহ সম্পাদকীয় লেখার বাইরে যেতে চাইত না।

অনেক পরের ঘটনা তবু এখানে বলে রাখা ভাল। টাইমস অফ ইন্ডিয়া সাত

বছর আদালত-নিযুক্ত ডিরেক্টর বোর্ডের অধীনে ছিল। তারপর টাইমসের পরিচালনভার শান্তিপ্রসাদ জৈন ফিরে পেলেন। তাঁর ছেলে অশোক জৈন শান্তিপ্রসাদের মৃত্যুর পর কোম্পানির চেয়ারম্যান হয়েছিলেন। অশোক জৈনের আকস্মিক মৃত্যুর পর তাঁর ছেলে সমীর জৈন কার্যভার গ্রহণ করেন। সমীর জৈনের অভিজ্ঞতা সমকালীন। তিনি সেই দলের যারা বুদ্ধি বিবেচনায় সমকালীন। আধুনিক জগতের নতুন রীতিনীতি, ব্যবসা পরিচালনার নতুন ভঙ্গি সবই তাঁর আয়ত্তে।

বিদেশে দেখেছি খবরের কাগজে কঠোর নিরাপত্তার আয়োজন। আমাদের অফিসে তেমনটা ছিল না। তা হলেও যে-অংশে আমরা বসতাম সে-অংশে আগে স্লিপ না পাঠালে ভেতরে আসতে পারে না কেউ। নিশ্চিন্ত মনে কাজ করা যায়। আজেবাজে কোনও লোক হঠাৎ ঢুকে পড়ে বিরক্ত করতে পারে না।

একদিন সকালে হঠাৎ এক ভদ্রলোক সোজা আমার অফিসঘরে চলে এলেন। আমি আশ্চর্য হলাম। এয়ার কন্ডিশনড অঞ্চলে ঢোকবার মুখে একজন পাহারাদার থাকে। আমার অফিস কামরায় ঢুকতে হয় আমার সেক্রেটারির কামরার মধ্যে দিয়ে। তাদের কেউ এই আগন্তুককে আটকাল না।

ভদ্রলোকের কোনও দ্বিধা নেই। আমার টেবিলের সামনে এসে বললেন, 'গুড মর্নিং। আমি ডি জি তেন্ডুলকর। আমি আট খণ্ডে গান্ধীজির জীবনী লিখেছি। সেটা ছাপা হচ্ছে আপনাদের এখানে। প্রকাশ করবে ভারত সরকার। শুনেছেন নিশ্চয়ই।'

আমি কিছু বুঝতে না পেরে তাঁকে বসতে বললাম। তিনি আমাকে বললেন তাঁর রচনার দ্বিতীয় খণ্ড ছাপা হচ্ছে। আরও ছয়খণ্ড ছাপা হবে। তাই তাঁকে রোজ অফিসে আসতে হয়। আমি টাইমসে যোগদান করেছি শুনে তিনি আমার সঙ্গে পরিচয় করতে এসেছেন।

আমি তাঁকে আসতে বলিনি বা ডাকিওনি। তাঁর সঙ্গে আমার কোনও কাজ নেই। তিনি যে আচমকা আমার ঘরে ঢুকেছেন তার জন্য তিনি বিন্দুমাত্র অপ্রস্তুত নন।

বসতে বলেছি যখন, কিছু কথাও বলতে হয়। দেখলাম ভদ্রলোক সবাইকে চেনেন। সর্বত্র তাঁর যাতায়াত। এই অফিসে তাঁর অবাধ গতি। তেন্ডুলকর প্রায় প্রত্যহ আমার ঘরে আসতেন। কুশল সংবাদ বিনিময় হত। আবার চলে

যেতেন। ক্রমশ এই মানুষটার সঙ্গে ওই দৈনন্দিন কথোপকথনের মধ্যে দিয়ে পরিচয় গভীর হল। সরল মানুষ। নিজের কাজ নিয়ে ব্যস্ত। তার বাইরে কিছু নজরে পড়তে চায় না।

আমি ইতিমধ্যে 'জব ডিপার্টমেন্ট' থেকে তাঁর বইয়ের খণ্ড আনিয়ে নিয়েছিলাম। দেখলাম দামি কাগজ, পরিপাটি ছাপা, বিশিষ্ট মলাট।

তাঁর পোশাক ছিল হাফ প্যান্ট, হাঁটুর নীচ থেকে পা বেরিয়ে একটা কোলাপুরি চপ্পলে আশ্রয় নিয়েছে। বহুকালের সেবার চিহ্ন ওই চপ্পলের সর্বাঙ্গে, ধুলিমলিন। ঊর্ধ্বাঙ্গে একটা হাত-কাটা খদ্দরের শার্ট। বুঝলাম এ-সব তুচ্ছ জিনিসে মনোযোগ দেন না। তাঁর কাছে এ-সব মনোযোগের বিষয় নয়।

বছর দুই পরে আমি যখন বাড়ি পালটে মালাবার পাহাড়ের ওয়ালকেশর রোডে এলাম তেন্ডুলকর বললেন, আমার বাড়িটা তাঁর অফিস যাবার পথে পড়ে। তাঁর বাড়ি আমার বাড়ি থেকে বেশি দূরেও নয়। তিনি কি প্রতিদিন আমার বাড়ি পর্যন্ত এসে গাড়ি করে আমার অফিসে চলে আসতে পারেন। আমার আপত্তি করার কোনও কারণই ছিল না।

তিনি যখনই আসতেন দেখতাম তাঁর ঝুলিতে কিংবা তাঁর হাতে নতুন বই থাকত পড়বার জন্য। আমাদের অফিস থেকে পেয়েছেন কিংবা সমালোচনা করবার জন্য তাঁকে দেওয়া হয়েছে। বই সম্বন্ধে আমার আগ্রহ আছে দেখে তিনি আমাকে ভারতের বইয়ের বাজার এবং ইউরোপের বইয়ের বাজার সম্বন্ধে অনেক খবর দিতেন। তেন্ডুলকরের সৌজন্যে আমার অনেক ভাল বই পড়বার সুযোগ হয়েছিল। ক্রমশ প্রকাশ পেল তিনি কেমব্রিজে অঙ্কে ট্রাইপস করতে গিয়েছিলেন। অত্যন্ত ভাল ছাত্র ছিলেন, কিন্তু কিছুটা বুঝি চপলমতি। তার কারণ সর্ব বিষয়ে তাঁর আগ্রহ, কৌতূহল। সেই সময় জার্মানিতে হিটলারের অভ্যুত্থান হয়েছে, স্বৈরতন্ত্রের চূড়ান্ত অবস্থা। তেন্ডুলকর জার্মানিতে চলে গেলেন। স্বৈরতন্ত্রের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করে তিনি 'হাইল হিটলার' বলতে সম্মত নন। অসহিষ্ণু জার্মান পুলিশ তাঁকে গ্রেফতার করল। তাঁর সঙ্গে দার্শনিক রোমা রোঁলার পরিচয় ছিল। রোঁলার চেষ্টাতেই তিনি ছাড়া পেয়ে প্যারিস চলে এসেছিলেন। দর্শনচর্চা বেশি দিন সহ্য হল না। তেন্ডুলকর মস্কো চলে গেলেন। চলচ্চিত্র সম্বন্ধেও তাঁর সমান আগ্রহ। বিখ্যাত পরিচালক আইসেনস্টাইনের সঙ্গে কিছুদিন কাজ করেছিলেন। চলচ্চিত্র তাঁকে বেশিদিন আটকে রাখতে পারল না। ছবি তৈরি করার গুরু আইসেনস্টাইনের কাছে সর্ব বিভাগের কাজ

দেখেছিলেন। সে সময় ওই বিষয়ে তাঁর মতো জ্ঞানী আর কেউ ছিল না। ঘুরতে ঘুরতে একদা ভারতবর্ষে ফিরে এলেন। বিজ্ঞানী আইনস্টাইনের সঙ্গে তাঁর প্রীতির সম্পর্ক গড়ে উঠেছিল। তাঁর বাড়িতে এঁদের চিঠিপত্র দেখেছি।

তেন্ডুলকরের বাড়িতে তাঁকে লেখা পল রবসনের চিঠিপত্রও দেখেছি। রবসনের কয়েকটি রেকর্ড বাজারে বেরুবার আগেই রবসন তাঁকে উপহার দিয়েছিলেন। পাশ্চাত্য সঙ্গীত সম্বন্ধেও তাঁর গভীর জ্ঞান ছিল। রবসনের গান শুনতে ভালবাসতেন। সেই সব স্মারক নিদর্শন দিল্লিতে নেহরু মিউজিয়ামে রক্ষিত আছে। ভারতবর্ষে গান্ধীজির আন্দোলন তেন্ডুলকরকে আকর্ষণ করে। তিনি দেশে ফিরে সেবাগ্রামে গান্ধীজির কাছে চলে গিয়েছিলেন সেখানে কিছুকাল ছিলেন। তাঁর পক্ষে গান্ধীজির সঙ্গে কাজ করা সম্ভব নয় বুঝে তিনি সেবাগ্রাম থেকে চলে এসেছিলেন।

ইউরোপে পঠনপাঠন সম্পূর্ণ করেননি। চাকরি করবার মানসিকতাও ছিল না। লেখাপড়া ছাড়া অন্য কোনও কাজও জানেন না। কয়েক বছর পরিশ্রম করে এবং অনেক গবেষণার পর তিনি গান্ধীজির জীবনী লিখতে শুরু করেন। নেহরুর সঙ্গে তাঁর পরিচয় হয়েছিল সেবাগ্রামে। মানুষটার জ্ঞানবিদ্যা দেখে নেহরু প্রভাবিত হয়েছিলেন। তিনিই সরকারের পাবলিকেশন ডিভিশনকে বইটি ছাপাতে বলেন।

কংগ্রেসের অনেকেই তাঁকে জানতেন, মান্য করতেন। পৃথিবীর বহু প্রখ্যাত মানুষের সঙ্গে তাঁর পরিচয় ছিল। এইসব প্রখ্যাত মানুষেরা প্রত্যেকেই তেন্ডুলকরের ওপর প্রসন্ন ছিলেন। তাঁদের পাঠানো ছোটখাটো উপহারও তেন্ডুলকরের বাড়িতে দেখেছি। নেহরুর দেওয়া কয়েকটি ছড়ি ছিল। বাইরে কোথাও গেলে তাঁর জন্য নেহরু উপহার আনতেন।

নেহরু তেন্ডুলকরকে এতই সম্মান করতেন যে, তিনি যখন বোম্বাইতে আসতেন তেন্ডুলকরের বাড়িতে গাড়ি পাঠিয়ে রাজভবনে আনার পরিবর্তে তিনি নিজে শত ব্যস্ততার মধ্যেও তাঁর বাড়িতে গিয়ে দেখা করেছেন।

যে বাড়িতে তেন্ডুলকর থাকতেন রকি হিলস অঞ্চলে সে-বাড়িটাও নেহরুর আগ্রহে মহারাষ্ট্র সরকার তেন্ডুলকরের জন্য তৈরি করে দিয়েছিল। দক্ষ কোনও আর্কিটেক্টের পরিকল্পনায় তৈরি করা। মস্ত হাতার মধ্যে নির্মিত ছোট কিন্তু সর্বসুবিধাসমন্বিত একতলা বাড়িটি দেখবার মতো ছিল। তাঁর বন্ধুবান্ধব তাঁর জন্য নানা দুষ্প্রাপ্য গাছের চারা এনে দিয়েছিলেন। সকালটা তেন্ডুলকর

বাগানে কাটাতেন, গাছে জল দিতেন। তারপর থেকে অধিক রাত্রি পর্যন্ত বইটির রচনা, সংশোধন, গবেষণার কাজ চলত।

আহমেদাবাদে তাঁর সঙ্গে পরিচয় হয়েছিল অনু বন্দ্যোপাধ্যায়ের। তিনি কলকাতার খ্যাতনামা অধ্যাপক জয়গোপাল বন্দ্যোপাধ্যায়ের মেয়ে। ইংরেজিতে এম এ পাশ করে গান্ধীজির আদর্শে উদ্বুদ্ধ হয়ে সব ছেড়ে দিয়ে একদা তিনিও আহমেদাবাদে মৃদুলা সরাভাই-এর নারী কল্যাণ প্রতিষ্ঠানে উপস্থিত হন। তিনি একদিন উপস্থিত হলেন তেন্ডুলকরের বাড়িতে। নিজেও লেখাপড়া করেন, তেন্ডুলকরকেও পড়াশোনায় সাহায্য করতেন এবং সংসারও পরিচালনা করতেন। তেন্ডুলকরের মিষ্টান্নের প্রলোভন ছিল। বাড়িতে গেলে সবসময় অনুদির তৈরি করা মিষ্টান্ন অবশ্যই পাওয়া যাবে। সংসারে বাহুল্য ছিল না। তেন্ডুলকারের সামান্য আয় থেকে স্বচ্ছন্দে সংসার চলে যেত।

তিনি যখন আমাদের বাড়িতে পৌঁছতেন, তখন আমরা প্রাতরাশ টেবিলে।

আমাদের প্রাতরাশে যোগ দেবেন। তারপর দু'জনে একসঙ্গে অফিসে চলে যাব। শীত, গ্রীষ্ম, বর্ষা সব ঋতুতেই তেন্ডুলকারের এক বেশ। কোনও বদল নেই। সেই মলিন ক্ষয়িষ্ণু কোলাপুরি চপ্পল, খদ্দরের হাফ শার্ট আর খদ্দরের হাফ প্যান্ট। ক্রমে আমাদের বাড়ির সকলের সঙ্গে সদ্ভাব হল। আমি তাঁকে ডি জি বলে ডাকতে আরম্ভ করলাম। তিনিও আমাকে ডাকতেন পি কে বলেন।

গাড়িতে যেতে যেতে নানা বিষয়ে গল্প হত। বোম্বাই এবং বোম্বাইয়ের বাইরে তাঁর পরিচিত বন্ধুর সংখ্যা অনেক। ডি জি সৎ, সরল, সংসারবুদ্ধিহীন, কারও অনিষ্ট করবার কথা ভাবতে পারেন না। পরে অবাক হয়েছিলাম সম্পূর্ণ ভিন্ন চরিত্রের মানুষও তাঁকে শ্রদ্ধা করতেন, ভালবাসতেন। বিপরীত চরিত্রের মানুষ ড. নানাসাহেব পারুলেকার এবং বাবুরাও প্যাটেল উভয়েই তাঁর বন্ধু ও শুভাকাঙ্ক্ষী ছিলেন। সুতরাং তাঁর দুঃসময়ে বাবুরাও এবং নানাসাহেব ডি জিকে সর্বপ্রকার সাহায্য করেছিলেন। মিষ্ট স্বভাবের মানুষ, কারুর নিন্দা করেন না।

যথাকালে আট খণ্ডে গান্ধীজির জীবনী প্রকাশিত হল। তিনি কিছু অগ্রিম রয়ালটি পেয়েছিলেন। এবারে বিক্রির সঙ্গে সঙ্গে নিয়মিত রয়ালটিও আসতে লাগল। কিন্তু সময়টা খালি হয়ে গেল। একমাত্র কাজ ছিল মুদ্রিত আট খণ্ডে কোথায় কোনও তথ্যের এবং ছাপার কোনও ভুল ছিল কি না তাই দেখা। সে ভুল সংশোধিত হতে লাগল দ্বিতীয় সংস্করণে। কাজেই কোনও তাড়া ছিল না।

হঠাৎ এতখানি সময় হাতে পাওয়ায় তিনি অস্থির হয়ে পড়লেন। ঠিক করলেন সীমান্ত গান্ধী খান আব্দুল গফফুর খানের জীবনী লিখবেন।

ডি জি তথ্য সংগ্রহে নেমে পড়লেন। বই কেনা হল কয়েকটি। সীমান্ত গান্ধীর সঙ্গে সাক্ষাৎকার প্রয়োজন। ভারত সরকার সমস্ত আয়োজন করে দিয়েছিল। ডি জি কী বেশে কাবুলে উপস্থিত হয়েছিলেন আমার জানা নেই। একরাশ কাগজ নিয়ে ভারাক্রান্ত মনে ফিরে এলেন। সীমান্ত গান্ধীর হতাশ্বাস ডি জি-কে আচ্ছন্ন করেছিল।

ইতিমধ্যে চিন ভারত আক্রমণ করেছে। আমাদের যুদ্ধ শুরু হয়ে গিয়েছে। নেহরুর দুঃসময়ে তাঁকে দেখবার জন্য ডি জি ব্যাকুল হয়ে উঠেছিলেন। কিন্তু দিল্লিতে যেতে পারেননি। সরল মনের মানুষ। পৃথিবীর জটিল অস্থির মানদণ্ড যে কোনও কিছুই বিচার করতে পারে না সে-কথা বুঝতে পারলেন না।

রকি হিলসের পাথুরে জমিতে নানারকম গাছপালা লাগিয়েছিলেন। তার মধ্যে কয়েকটি ফলের গাছ ছিল। শ্যামদেশের পেঁপে গাছের ফল, বেশি বড় হয় না। একদিন সকালে আমাদের বাড়িতে এলেন হাতে একটা ফল নিয়ে। বললেন, তুমি এই ফলটা নিয়ে যাও। নেহরুকে দিয়ো। তাঁর হাতে দিতে পারলে ভাল হয়। পেঁপে নিয়ে আমি দিল্লি গেলাম। ডি জি-কে বোঝাবার চেষ্টা করিনি যে আমার পক্ষে নেহরুর বাড়ির ভেতরে পৌঁছনো সহজ নয়। অনুমতি সাপেক্ষ। কে যে আমার হাত থেকে নেবে, কার হাতে গিয়ে পড়বে, নেহরু এটা আদৌ দেখবেন কিনা এ নিয়ে আমার ভাবনার অন্ত ছিল না। বোম্বাই ফেরা মাত্র ডি জি ব্যাকুল হয়ে বললেন, তুমি কি নেহরুর হাতেই দিয়ে এসেছ পেঁপেটা? বলতেই হল, আমি নেহরুর সেক্রেটারি পর্যন্ত পৌঁছতে পেরেছি। তাঁর হাতে দিয়ে এসেছি। দু'-একদিনের মধ্যেই নেহরুর চিঠি এসে গেল। আমার পরম ভাগ্য নেহরু পেঁপেটা পেয়েছেন।

আমাকে তখন প্রায়ই দিল্লি যেতে হত নানা কাজে। তেন্ডুলকার এক খণ্ড পাটালি এনে দিলেন একদিন। কলকাতা থেকে কে যেন এনে দিয়েছেন। আমি যেন নেহরুকে দিয়ে আসি। আর একবার ছেঁড়া খবরের কাগজে মোড়া খানিকটা আমসত্ত্ব নেহরুর কাছে পৌঁছে দেবার জন্য আমাকে দিলেন। এই যাতায়াতে আমার সঙ্গে ভাব হয়ে গিয়েছিল নেহরুর সেক্রেটারির। তাঁর নাম যশপাল কাপুর। যশপাল পরে অনেক উঁচুতে উঠেছিলেন। অনেক ক্ষমতার অধিকারী হয়েছিলেন।

অনুদি নিয়মিত বাড়িতে নানা মিষ্টান্ন তৈরি করতেন। ডি জি-র কাছে গেলে সেই মিষ্টান্নর ভাগ পেয়েছি। বেঙ্গলি সুইটসের দু'-চারটি দোকান হয়েছে তখন বম্বেতে। কিন্তু তাদের অবদান নামেই বেঙ্গলি। অনুদি খাঁটি বাংলা মিষ্টান্ন প্রস্তুত করতেন। মালপোয়া, সন্দেশ, রসগোল্লা, কালোজাম, রাঙাআলুর পিঠে। গান্ধীজির জন্ম, মৃত্যু দিন, পনেরোই আগস্ট, ছাব্বিশে জানুয়ারি, গান্ধীজি সংক্রান্ত নানা ঘটনা, কাহিনী নিয়ে তাঁর লেখা বম্বের কাগজে ছাপা হত। তাঁর লেখা দুটি বই, 'বহুরূপী গান্ধী' ও 'মুসাফিরের ডায়েরি' জনপ্রিয় হয়েছিল। প্রথমোক্ত বইটি এতকাল পরে ন্যাশনাল বুক ট্রাস্ট বিভিন্ন ভারতীয় ভাষায় প্রকাশ করছে। অনুদিত লেখার বিষয় অনেক। গান্ধীজির সঙ্গে নোয়াখালিতে গিয়েছিলেন। তেন্ডুলকরের আগেই কাবুলে গিয়ে সীমান্ত গান্ধীর সঙ্গে দেখা করেছিলেন।

এঁদের সঙ্গে সাক্ষাৎ বেশি হত না। কিন্তু অল্পদিনের মধ্যে বন্ধুত্ব হয়েছিল। ডি জি-র বাড়িতে রবিবার বা ছুটির দিন গেলে দেখব, তিনি খুরপি, কোদাল নিয়ে, খালি গায়ে তাঁর গাছের পরিচর্যা করছেন। পাথুরে জমি, গাছপালা হতে চায় না, কিন্তু ডি জি-র চেষ্টার অন্ত নেই। আমাদের অপরিচিত অনেক গাছ লাগিয়েছিলেন। সপেটা, পেঁপে, পেয়ারা গাছগুলি কিছু ফল দিত।

আমি অশোক গাছ কখনও দেখিনি। কোথায় পড়েছিলাম, নমো অশোকায় শোকরহিতায়। বাক্যবন্ধটি আমার বড় ভাল লেগেছিল। একদা কথায় কথায় ডি জি-কে সেই কথা বলেছিলাম। শোকরহিতায়, শোক হয় না, হবে না বলে অশোক। যে বাড়ির অঙ্গনে অশোক গাছ আছে, সে বাড়িকে শোক স্পর্শ করে না। ডি জি বললেন, অশোক গাছ তিনি চেনেন, কিন্তু কার বাগানে আছে মনে করতে পারছেন না।

তারপর কয়েক মাস কেটে গিয়েছে। এক বিকালে ডি জি এলেন। কোলাবার শেষ প্রান্তে এক পুরনো বাংলোয় অশোক গাছের খবর পেয়ে, অনেক খোঁজাখুঁজি করে আমার জন্য অশোক গাছের চারা এনেছেন। বললেন, শোকরহিতায় সারা দুপুর অনুসন্ধানে কেটেছে।

বম্বে ছেড়ে আমি যখন পুনায় চলে গেলাম, তখন দেখা-সাক্ষাৎ কমে গিয়েছিল। আমি প্রায়ই বম্বে আসতাম। আমার পরিবার তখনও বম্বেতে থাকে, তাই মাঝে মাঝে তাঁর সঙ্গে দেখা হত।

পুনেয় একদিন খবর পেলাম, ডি জি সাংঘাতিক অসুস্থ। তাঁকে জে জে

হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। আমি সেদিনই পুনে থেকে রওনা হলাম। সন্ধ্যার পর জে জে হাসপাতালে একটি নিরাভরণ কেবিনে ডি জি অজ্ঞান হয়ে শায়িত। গায়ে হাত দিলাম। একা বিছানায় পড়ে আছেন। সাড়া নেই।

ভারাক্রান্ত মনে পুনে ফিরে এলাম। পরের দিনই খবর এল ডি জি সবাইকে ছেড়ে চলে গিয়েছেন। শেষ অপরাহ্ণে বম্বে ফিরে সোজা রকি হিলসে চলে গেলাম। তখন ডি জি-র সৎকার শুরু হয়ে গিয়েছে। ডি জি-র বাড়ির অদূরে আরব সমুদ্রের ধারে পরিত্যক্ত এক শ্মশানে তখন চিতার আগুন জ্বলছে। ডি জি বুঝি এটাই চেয়েছিলেন। তাঁর কয়েকজন নিকট বন্ধু তাঁর বাড়ির কাছে দাঁড়িয়ে আছেন। সামনে আরব সমুদ্রে আগুন জ্বালিয়ে সূর্য অস্ত যাচ্ছে। আকাশ গভীর রক্তবর্ণ।

কলকাতার বাইরে যে শহরে কিছু বাঙালি আছেন তাঁরা দুর্গাপুজোর বড় অনুষ্ঠান করেন। এখনও কলকাতার মতন প্যান্ডেল তৈরির দিকে তাঁদের অত নজর নেই। কিন্তু খাওয়া দাওয়ার আয়োজন বড় হয় আর সব থেকে বড় কথা প্রবাসী বাঙালিরা সবাই এই ক'দিন সম্মিলিত হন। বহু জায়গায় কলকাতার থেকে প্রতিমা ও পুরোহিত আনা হয়। বোম্বাইতে দুর্গাপুজো অনুষ্ঠানের জন্য কলকাতা থেকে কারিগর আনাতে হত। কয়েকটি সংগঠন নিয়মিত দুর্গাপুজোর আয়োজন করতেন। শহর এবং তার উপকণ্ঠ নিয়ে প্রায় ত্রিশ মাইল দীর্ঘ বোম্বাই শহর। একটা গলির মতন। তাই অব্যর্থ ছিল যে একাধিক সার্বজনীন দুর্গাপুজোর আয়োজন হবে। আমি যে সময় বোম্বাইতে এলাম তখন অধিকাংশ বাঙালি বসবাস করতেন দাদার এবং প্যারেলে। তাঁরা বাঙালিদের প্রিয় কাজ, নিয়মিত কমিটি আর সাব কমিটি গঠন করে পুজোর বন্দোবস্ত করতেন। আমি যখন বোম্বাই পৌঁছলাম এই সংগঠনের সভাপতি ছিলেন অপরেশ বন্দ্যোপাধ্যায়। মানুষটি মিষ্ট স্বভাবের, ভদ্র, ভারী কাজ থেকে অবসর নিয়েছেন। সময় অনেক। তাঁর এবং তাঁর সহযোগীর উদ্যোগে এই পুজোটাই বোম্বাইয়ের প্রধান পুজো হয়ে দাঁড়িয়েছিল। আগে দাদার ও মাতুঙ্গার নানা পার্কে প্যান্ডেল করে পুজো হত। আমার সময়ে পুজো হয় এক বছর দাদারের শিবাজি পার্কে, পরের বছর প্যারেলে নারে পার্কে।

সেবারে শিবাজি পার্কে পুজো। আমি সপ্তমীর দিন পৌঁছে দেখি পার্কের এক অংশে ত্রিপল লাগিয়ে প্রকাণ্ড প্যান্ডেল। একদিকে কলকাতার শিল্পীর সদ্য তৈরি করা প্রতিমা, অন্যদিকে মঞ্চ বাঁধা হয়েছে চারদিন ধরে নানা অনুষ্ঠানের জন্য। দু'দিন স্থানীয় নারী পুরুষেরা অভিনয় করবেন। তাঁদের একটি দলের সঙ্গে বিপিন গুপ্তের যোগ আছে। বিপিন গুপ্ত তখন হিন্দি সিনেমাতে বয়ঃজ্যেষ্ঠের ভূমিকায় অভিনয় করে নাম করেছেন। তিনি এই অঞ্চলে থাকেন।

অর্থাৎ মনোরঞ্জনের অনুষ্ঠান আরম্ভ হতে অনেক দেরি। দেখলাম কয়েকটি খাবারের স্টলও হয়েছে। যেমন বাঙালিদের হয়—শিঙাড়া, কচুরি, লেডিকিনি, মিহিদানা। অনেকে চেয়ার পেতে সেখানে বসে গল্পগুজব করছে। বাঙালি বৈকালিক ভোজ্যের স্বাদগ্রহণও চলছে। চপ, কাটলেট, পরটা ভাজার একাধিক দোকান। সেখানেও যথেষ্ট ভিড়। এ ছাড়া তাঁতের শাড়ি ধুতি, বিষ্ণুপুর বা মুর্শিদাবাদের সিল্কের শাড়ি। আরও টুকিটাকি নানা জিনিস। বিক্রি কতটুকু হচ্ছে জানি না। কিন্তু দোকানের সামনে প্রচুর ভিড়।

আমি থাকি বোম্বাইয়ের দক্ষিণ প্রান্তে কোলাবায়। সেখান থেকে দাদার অনেক দূর। বাঙালিদের সঙ্গে আমার পরিচয় হয়নি তখনও। ইতস্তত দলছাড়া হয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছি যদি পরিচিত এলাকার বা কলকাতার কাউকে দেখা যায়। ক্রমে ভিড় বাড়তে লাগল। অনেক মারাঠি এবং গুজরাতিও বাঙালিদের পুজো দেখতে এসেছেন। ধূপধুনোর সৌরভে আচ্ছন্ন পুজোর স্থানে তুমুল জনসমাগম। তার ওপর পরিচিত ঢাক আর ঢোলের শব্দ। তারই মাঝে লাউড স্পিকারে বাঙালির উচ্চারণে সংস্কৃত মন্ত্র শোনা যাচ্ছে। বাঙালি মেয়েরা অধিকাংশই শৌখিন, মূল্যবান শাড়ি পরিহিতা এবং অলংকারে শোভিতা। কয়েকজন কমবয়সি মেয়ে সালোয়ার কুর্তা পরেছে। পুরুষেরা বেশিরভাগই প্যান্ট শার্ট পরিধানে। ধুতি পাঞ্জাবির সংখ্যাও সামান্য নয়।

পুজো মণ্ডপের পাশেই বেঙ্গল ক্লাব। দোতলা বাড়িটার একতলায় একটা বড় হল। অনেকদিন আগেই প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল কিন্তু কেমন যেন টিমটিম করছে। পুজোর সময় নয়, পরেও দেখেছি এই ক্লাবটি জনপ্রিয় হতে পারেনি। মুষ্টিমেয় বাঙালি তাস পাশা খেলছেন অথচ বিশাল শিবাজি পার্কের একধারে মূল্যবান জমির ওপর এই ক্লাবের কতই না সম্ভাবনা ছিল।

অঞ্জলির পরই পুজোর প্রসাদ পেলাম। এক কর্তাব্যক্তি আমাকে বললেন, 'আপনাকে নতুন দেখছি। কোথায় থাকেন। রোজ দুপুরবেলায় আসবেন। এখানে ভোগ হয় প্রতিদিন। সন্ধ্যায় ভাল ভাল প্রোগ্রাম। আপনারা চলে যাবেন না।'

পুজোর চার-পাঁচদিন সবক'টা সার্বজনীন প্যান্ডেলে চার অথবা পাঁচ রাত্রি যাত্রা, শখের থিয়েটার, পেশাদের থিয়েটার অথবা গান বাজনার আসর বসে। কলকাতা থেকে আগত শিল্পী ও নাট্য দলকে ঘিরে উদ্দীপনার অন্ত নেই।

কয়েকটি পরিবারের সঙ্গে পরিচয় হল। কেউ বহু বছর ধরে এখানে আছেন অথবা কেউ সদ্য এসেছেন।

এমন আনন্দময় বাঙালি সম্মেলন বোম্বাইতে দেখতে পাব আশা করিনি। আমরা নতুন বলে সাদর অভ্যর্থনা হল। বারোটার আগেই ভোগ এসে গেল। খিচুড়ি, বাঁধাকপির চচ্চড়ি, চাটনি এবং পায়েস। বড় শালপাতার ঠোঙায় পরিবেশন হচ্ছে। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে তার সদুপযোগ করা সহজ পর্ব নয়। প্যান্ডেলের ভিতর সম্ভবত হাজার খানেক চেয়ার। রাত্রে চেয়ারগুলি লাইনে সাজিয়ে অতিথিরা অনুষ্ঠান দেখবেন। ভোগ নিয়ে কেউ কেউ চলে যাচ্ছেন। আবার অনেকে দুটি চেয়ার সংগ্রহ করে, একটা টেবিলের মতো করেছেন ভোজ্য রাখবার জন্য। আর একটি বসবার জন্য। আমরাও তাই করলাম। শুনলাম ভোগ বিতরণ বেলা চারটে পর্যন্ত চলবে। সন্ধ্যায় তাড়াতাড়ি না এলে আরতিও দেখা যাবে না। সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানও ভালভাবে দেখা যাবে না। মধ্যবয়সি এক ভদ্রলোক সবার সঙ্গে হাসিমুখে কথা বলছেন। আমার চেয়ে বয়স সামান্য বেশি হবে। হাসি মুখ, কথায় পূর্ববঙ্গের টান আছে। তিনি সঞ্জীবন বন্দ্যোপাধ্যায়। সন্ধ্যায় যখন আমরা অনুষ্ঠান দেখতে গেলাম সঞ্জীবনবাবুর সঙ্গে পরিচয় হল। মহা খুশি হয়ে বললেন, 'বাঃ আপনি এসেছেন। এবারে আমাদের বিষয়ে বড় করে লেখা বেরোনো চাই টাইমস অফ ইন্ডিয়াতে।'

সন্ধ্যার পরই পৌঁছেছিলাম বলে মোটামুটি ভাল আসন পেয়েছিলাম। আশপাশে অতিথিরা দল বেঁধে বসেছেন। বিভিন্ন ছোট ছোট দলে ভাগ হওয়া মানুষের চরিত্রের লক্ষণ। এমন আয়োজন বোম্বাই শহরে দেখতে পাওয়া যাবে কে ভেবেছিল।

ক্রমশ আমার সঙ্গে দক্ষিণ বোম্বাইয়ের অনেক বাঙালির পরিচয় হল। মালাবার হিলস্, কাম্বালা হিলস্ অঞ্চলে অনেক উচ্চপদস্থ বাঙালি আছেন। ক্রমে আমাদের একটা দল হয়ে গেল। কোনও পুজোয় গেলে আমরা দল বেঁধে একসঙ্গে বসে থাকি। প্যান্ডেলের নীচে গরমে পীড়িত হলেও ভোগের জন্য অপেক্ষা করেছি। তারপর জোড়ায় জোড়ায় চেয়ার টেনে নিয়ে একসঙ্গে বসে খাওয়া। আয়োজন সামান্যই ছিল। কিন্তু একসঙ্গে প্রিয় পরিজনের সঙ্গে হইচই করে খাওয়ার আনন্দ, তার তুলনা ছিল না। কলকাতার মতো এমন দর্শনার্থীর ভিড় নামত না বোম্বাইয়ের পুজোয়। বিশেষ করে তারা পরস্পরের অচেনা। কালে আমাদের পরিচয় পরিধি বড় হল। অতিথিদের অনেককেই চিনি, বছরে হয়তো একবার দেখা হত। তবু অন্তরঙ্গতা অনুভব করি।

সাংস্কৃতিক কার্যক্রম আনন্দের ছিল। স্থানীয় নাটুকে দল যে-সব নাটক

পরিবেশন করত অনেক কুশীলবের উচ্চারণে জড়তা থাকত। তাতে কোনও ক্ষতি হয়নি। পেশাদারি মঞ্চের অনেকের থেকে এদের আমার বেশি ভাল লেগেছে। কেউ মুখ চেনা। কেউ বা বন্ধু বা তার অধিক। আমি যখন কয়েক বছরের মধ্যে এইসব আনন্দ অনুষ্ঠানের সঙ্গে জড়িয়ে পড়লাম তখন কলকাতা থেকে আগত দলের বায়নাক্কা দেখে লজ্জা বোধ করেছি। সব দল হয়তো এক ছিল না। কিন্তু অনেকে আশা করতেন তাঁদের পাওনার অধিক দিয়ে তাঁদের সম্বর্ধনা করা হবে। এটা যে শখের পুজো। দু'-একজন ছাড়া সমস্ত সময় দেবার উপায় নেই কারও এ-কথা তাঁরা বুঝতেন না।

বোম্বাইয়ের আদি দুর্গাপুজো ছিল অন্যত্র, মারাঠি গুজরাতি পাড়ার ভিতরে, কলবাদেবীতে। এই অঞ্চলে বোম্বাইয়ের আদি বাঙালিদের বাস। তাঁরা স্বর্ণকার বা মণিকার। তাঁদের এই কাজের দক্ষতার জন্য তাঁরা ষাট-সত্তর বছর ধরে কলবাদেবীতে বাস করছেন। এঁরা কাজ করছেন গুজরাতি মালিকের কাছে। তাঁদের ছেলেমেয়েরা এই অঞ্চলে মানুষ হয়েছে, কিন্তু বাঙালি বৈশিষ্ট্য বজায় রেখেছেন। কলবাদেবী ব্যবসার জায়গা। সারাদিন অবিশ্বাস্য লোক চলাচল করে, দাঁড়াবার উপায় নেই।

বোম্বাইয়ের পুরনো বাঙালি আমার সদ্য পরিচিত সঞ্জীবন বন্দ্যোপাধ্যায় মনে করেছিলেন কলবাদেবীর পুজোতে আরও সমারোহ করলে মধ্য ও দক্ষিণ বোম্বাইয়ের মানুষরা সহজে পুজোয় যোগদান করতে পারবে। ঠিক মনে পড়ছে না হয়তো সেই সময় সঞ্জীবনবাবুর উদ্যোগে বোম্বাইয়ে দুর্গাবাড়ির প্রতিষ্ঠা হয়েছিল। তাঁর ধারণা ছিল উত্তর ভারতে কয়েক জায়গায় যেমন কালীবাড়ি আছে তেমনি বোম্বাইয়ে একটা দুর্গাবাড়ির প্রতিষ্ঠা করবেন। সেই দুর্গাবাড়ির সমিতির উদ্যোগে একবছর কলবাদেবীর পুজো ক্রশ ময়দানে হয়েছিল। বিশাল আয়োজন হয়েছিল। অনেকখানি জায়গা ঘিরে শহরের মধ্যিখানে এই আয়োজন। কোলাবার শেষ প্রান্ত থেকে প্রায় প্যারেল পর্যন্ত অনেক বাঙালির সুবিধে হয়েছিল।

সঞ্জীবনবাবু বড় ব্যাঙ্কের স্থানীয় ম্যানেজার। পুজোর তিন মাস আগে থেকে তার আয়োজন নিয়ে এত ব্যস্ত হয়ে পড়েন যে তিনি কখন ব্যাঙ্কের কাজ করেন বুঝতে পারি না। মানুষটা সরল। তিন মাস ধরে পুজো ছাড়া তাঁর অন্য কোনও চিন্তা থাকত না। দুঃখের কথা তিনি তেমন সহযোগিতা পাননি। সবচেয়ে বড়

যে কাজ, টাকা তোলার কাজ, তাঁকে একা করতে হত। সানন্দে এবং সাফল্যের সঙ্গে করতেনও। ব্যাঙ্কের সূত্রে তাঁর সঙ্গে অনেক বড় বড় ব্যবসায়ীর পরিচয় ছিল।

আমিও দুর্গাবাড়ির পুজোর সঙ্গে জড়িয়ে পড়লাম। আমার অধিকাংশ বন্ধুবান্ধব বাস করতেন দক্ষিণ বোম্বাইয়ে। দাদারের দূরত্ব অতিক্রম করতে হত না। আমাদের সবার বাড়ির অপেক্ষাকৃত নিকটে তেজপাল হলে পুজোর আয়োজন হত। শুনেছি এখনও সেখানেই পুজোর আয়োজন হয়।

সঞ্জীবনবাবুর স্বপ্ন, বোম্বাইয়ের দুর্গাবাড়ি, আর গড়ে উঠল না। পুজোর পরে যে টাকা বাড়তি থাকত কয়েক বছর সে টাকা জমা করে বোম্বাইয়ের জমির ঊর্ধ্বগামী দামের সঙ্গে পাল্লা দেওয়া গেল না। তেজপালের সংলগ্ন এয়ার কন্ডিশন হলে থিয়েটার ও নৃত্যগীতানুষ্ঠান হত। যেটা অভাব ছিল সেটা হল খোলা মাঠ। দাদারে যেমন খোলা মাঠে সকাল সন্ধ্যা চেয়ার নিয়ে বসা যেত এখানে সে-সুযোগ ছিল না। ঠাকুরের মণ্ডপের সামনে সামান্যই জায়গা ছিল।

একটা বিষয় তখনও পীড়া দিয়েছিল, এখনও দেয়। নমঃ নমঃ করে লক্ষ্মীপুজো। শুনতে পাই দুর্গাপুজো করলে লক্ষ্মীপুজো করতেই হয়। কিন্তু দুর্গাপুজোর ক'দিনের সমারোহের পর লক্ষ্মীপুজোর জন্য প্রায় কিছুই করা হয় না। অন্যত্র একটা বড় ঘর ভাড়া নিয়ে লক্ষ্মীপুজোর আয়োজন। হয়তো সন্ধেবেলায় কুড়ি-পঁচিশজন এলেন। এর বেশি কাউকে দেখা যেত না। ছুটি নেই, সময় নেই। চারদিন যথেষ্ট সময় দেওয়া গেছে। এর থেকে বেশি অন্নচিন্তায় ব্যস্ত বাঙালিরা আর কী করতে পারত। জানি না, সেইজন্য হয়তো লক্ষ্মীর দাক্ষিণ্য থেকে বঞ্চিত।

১৯০০ সালে যখন সারা ভারতবর্ষে রবীন্দ্র শতবার্ষিকী পালিত হল তখন সেই মহাযজ্ঞে বোম্বাইয়ের দুর্গাবাড়িও যোগ দিয়েছিল। শৃঙ্খলার সঙ্গে মহাসমারোহে রবীন্দ্র জয়ন্তী পালিত হয়েছিল। শান্তিনিকেতন থেকে একটা দল এসেছিল। বাঙালি এবং অনেক অবাঙালি এক সন্ধ্যায় বাংলার সংস্কৃতির উৎকর্ষের পরিচয় পেয়েছিলেন।

বাঙালির আর কোনও পালাপার্বণ তেমন করে পালিত হত না বোম্বাইতে। অসংখ্য না হোক, অনেক সরস্বতী পুজো হত। বেশিরভাগই পারিবারিক বা কোনও ছোট গোষ্ঠীর। দুর্গাপুজোর মতো এমন আকুল করা আনন্দের আয়োজন সেখানে থাকত না।

মারাঠিদের একটা উৎসবের কথা বোম্বাইয়ে আসবার আগে জানতাম না। গণেশ পূজা। আমাদের দুর্গাপুজোর মতো ধুমধাম করে গণপতি পূজা হয়। প্যান্ডেলের সাজসজ্জা, আলোকের ছটা এবং লোক সমাগম যে-কোনও বাঙালি পুজোর থেকে কম নয়। বালগঙ্গাধর তিলক গণেশ পুজোকে জাতীয় উৎসবে উন্নীত করে রাজনৈতিক আশা-আকাঙ্ক্ষার সঙ্গে জড়িয়ে দিয়েছিলেন। সেই পরম্পরা এখনও চলছে। মূর্তি নির্মাণের বৈচিত্র্যে, স্টল সাজানোর ঘটায় সমসাময়িক কোনও ঘটনার ছাপ থাকে।

বিসর্জনের দিন আমাদের মতো ছোট কোনও গঙ্গার ঘাটে নয়, চৌপাটিতে এবং শিবাজি পার্কের সমুদ্র সৈকতে সার সার গণেশ প্রতিমা বিসর্জনের জন্য আসে। রাস্তাঘাট বন্ধ হয়ে যায়। গাড়ি চলাচল বন্ধ। লোক চলাচল সামলাতে পুলিশ হিমসিম।

কয়েক বছর পরে যখন পুনেতে থাকতে হয়েছিল তখন গণেশ পুজোর ঘটা দেখে আশ্চর্য হয়ে গিয়েছিলাম। অপেক্ষাকৃত ছোট পুনে শহর। বোম্বাইয়ের মতো মানুষের ভিড়। সারা রাত ধরে প্রত্যুষ পর্যন্ত শৃঙ্খলাবদ্ধভাবে প্রতিমা নিরঞ্জন হয়। কোনও সময় লোকসংখ্যা কমেছে বলে মনে হয় না। বাঙালিদের সিদ্ধিদাতা গণেশের পুজোয় তেমন অংশ নিতে দেখিনি। মারাঠিরা আমাদের বাঙালিদের মতো। উৎসবে অনুষ্ঠানে উদ্দাম হয়ে পড়ে। তাদের সঙ্গে আমাদের মনের মিল সহজাত। অথচ বাঙালি ছোট ছোট গোষ্ঠীর মধ্যে আবদ্ধ থাকে। মারাঠি বলতে পারেন এমন বাঙালির সংখ্যা সামান্য।

কলবাদেবীর বাঙালিদের সঙ্গে মেলামেশা কম ছিল বোম্বাইয়ের অন্য বাসিন্দাদের। তাঁরা নিজেদেব গণ্ডির মধ্যেই থাকতেন। কবে বোম্বাইতে এসেছিলেন কিন্তু এখনও বাঙালি ঐতিহ্য বজায় রেখেছেন। পোশাকে, আহারে, কথাবার্তায় এমনকী দেশজ উচ্চারণটিও। একটি নাটকে একজনের সংলাপ আমার এখনও মনে আছে। "দ্যান মোয়ারাজ দ্যান, অনুমতি দ্যান"। কিন্তু এঁরা মনে প্রাণে বাঙালি ছিলেন। আপন বৃত্তিতে এঁরা অতিশয় দক্ষ এবং সততার জন্য এঁদের সুনাম ছিল। সেই কারণে তাঁরা শতাধিক বৎসর বোম্বাইতে মর্যাদার সঙ্গে কাজ করেছেন।

সেই সময় বোম্বাই বাঙালিদের মধ্যে প্রধান ছিলেন বলা যায় পরেশচন্দ্র ভট্টাচার্য। তিনি তখন রিজার্ভ ব্যাঙ্কের গভর্নর। তারপর আরও একজন যিনি

পশ্চিম রেলের জেনারেল ম্যানেজার ছিলেন এম এন চক্রবর্তী। কে সি মৈত্রর নামও করতে হয়। তিনি ছিলেন গেস্টকিন উইলিয়ামসের ম্যানেজিং ডিরেক্টর। পরে চেয়ারম্যান।

সিনেমা সংক্রান্ত কাজে নায়ক থেকে শুরু করে টেকশিয়ান পদে বহু বাঙালি ছিলেন। তাঁরা বেশিরভাগই মালাদ অঞ্চলে থাকতেন। তাঁদের সঙ্গে সকলের যোগাযোগ হত না। তাঁরা কারও সঙ্গে যোগাযোগ রাখতে চাইতেন না। তাঁদের জগৎ অন্য। সেখানে অনেকের স্বাগত নেই। বেশি ব্রাত্যজনের সঙ্গে সদ্ভাব হলে তাঁদের অবমূল্যায়ন হয়।

ব্যতিক্রম ছিলেন শশধর মুখোপাধ্যায়, ফিল্মালয়ের প্রতিষ্ঠাতা। তাঁর ছেলে জয়। কয়েকটি ফিল্মে নায়কের অভিনয় করেছিল কিন্তু শেষপর্যন্ত বিশেষ নাম-ডাক হল না। জয়ের ভাইয়ের সঙ্গে তনুজার বিয়ে হয়। তনুজার মেয়ে কাজল, যার ফিল্ম জগতে অবিসংবাদিত উচ্চ স্থান। শশধর মুখার্জির সম্পর্কে নাতনি রানি মুখার্জি। মুখার্জিবাড়ির পুজোয় আমরা নিয়মিত গিয়েছি। সেখানে দু' দশ জন ফিল্মি ব্যক্তিত্বকে দেখা যেত।

বাঙালিদের মধ্যে বোম্বাইয়ের সবচেয়ে পুরনো বাসিন্দারা কলবাদেবীতে থাকেন। কলবাদেবীর বাঙালিরা একটু সংরক্ষণশীল। অন্য বাঙালিদের সঙ্গে তাঁদের যোগাযোগ কম। ভাব ও ভাবনার আদান-প্রদান নেই বললেই চলে। তাঁরা বেশিদিন বোম্বাইয়ের দুর্গাবাড়ির পুজোর সঙ্গে থাকতে পারলেন না। তাঁরা আবার কলবাদেবীর নিজস্ব পুজো শুরু করে দিলেন। কারও সঙ্গে তাঁদের অসদ্ভাব ছিল না। কিন্তু সম্প্রীতির অভাব ছিল। কেন না তাঁরা প্রায় অন্য জগতের অধিবাসী।

বাঙালিদের যেমন সর্বজনীন বা বারোয়ারি পুজো, মারাঠিদের গণপতি পুজো সেরকম। অনেকে বাড়িতে সেরকমই পুজো করেন। কিন্তু পাড়ার সর্বজনীন পুজোর সঙ্গেও তাঁদের যোগ। বলতে পারি গণপতি পুজো মারাঠিদের প্রাণের পুজো। বাল গঙ্গাধর তিলক একটু রাজনৈতিক স্পর্শ দিয়ে সেই পুজোকে আরও হৃদয়গ্রাহী করে দিয়েছেন। আমাদের মতো প্যান্ডেলে ঘটা। অভিনব প্রতিমা নির্মাণের রেষারেষি। প্যান্ডেলে সজ্জা ও আলোর ঝলমলানিতে বিশেষ করে বড় শহরগুলো যেন রূপান্তরিত হয়ে যায়। বিসর্জনের দিন চৌপাটি এবং দাদারের সমুদ্রবেলায় আকাশ বাতাস দীর্ণ হয় শোভাযাত্রীদের উল্লাস ধ্বনিতে "গণপতি বাপ্পা মোরিয়া, পুড়চা বরসা লৌকরি

আ”—আসছে বছর তাড়াতাড়ি এসো। আশ্চর্য হয়েছিলাম যে মারাঠিদের পাশাপাশি বাস করেও সর্বজনীন পুজোর ছোঁয়া লাগেনি গুজরাতিদের। তাদের কোনও সর্বজনীন উৎসব ছিল না। শুনেছি আজও সেই ছবি বদলায়নি।

গুজরাতিদের প্রধান উৎসব হল নবরাত্রি। সে সময় তারা ন' দিন ধরে পারিবারিক উৎসব করে। বাড়িতে বাড়িতে ছাদের ওপর ডাণ্ডিয়া নাচের আসর বসত। উৎসাহের অন্ত ছিল না। এখন নাকি পরিবারের গণ্ডি ছাড়িয়ে কয়েকটি আত্মীয় পরিবার নিয়ে ডাণ্ডিয়া রাসের আয়োজন হয়।

অন্য পক্ষে পারশিরা যারা গুজরাত ও মহারাষ্ট্রে ছড়িয়ে আছে তাঁদের ব্যক্তিগত উৎসব ছাড়া কোনও বড় অনুষ্ঠান হয় না। তাঁরা সংখ্যায় অল্প। শহরে ছড়িয়ে আছেন। ইচ্ছা থাকলেও তাঁদের পক্ষে সর্বজনীন অনুষ্ঠান করা সম্ভব হত না। এঁরা জন্ম, উপনয়ন এবং বিবাহের অনুষ্ঠান ঘটা করে সম্পন্ন করেন। কিন্তু সবই আপন আপন পরিবারের মধ্যে সীমিত থাকে। পারিবারিক উৎসবের দিনে আত্মীয় বান্ধবদের নিমন্ত্রণ হয়। তাও একটা নির্দিষ্ট নিয়মে বাঁধা ছিল।

বোম্বাইতে বাস করবার অল্পদিনের মধ্যে ওদের নবজ্যোত অনুষ্ঠানে নিমন্ত্রণ হয়েছিল। তাও যেন নিয়মের নিগড়ে বাঁধা ছিল। যাবতীয় অনুষ্ঠানের জন্যে আগিয়ারী অর্থাৎ অগ্নি মন্দিরের সংলগ্ন খানিকটা ঘেরা জায়গায় সবাই জড়ো হয়েছে। আগিয়ারী সংলগ্ন অঙ্গনে সার সার টেবিল পাতা হয়েছে। সেখানে সার সার কলাপাতা বিছানো এবং প্রত্যেকের পাশে এক বোতল শীতল পানীয়। নিমন্ত্রণ কর্তা আমাকে বললেন, মোরারজি দেশাই-এর মদ্যপান নিরোধ আইন না থাকলে আজ আমরা স্কচ হুইস্কি দিয়ে অতিথি সৎকার করতাম।

প্রথমে যেন কোনও সংকেতে যন্ত্রচালিতবৎ পরিবেশনকারীরা প্রত্যেক অতিথির পাতায় আচার দিয়ে গেল। তারপর রুটি এল দুই প্রকারের, গমের এবং চালের! রুটির বিশেষত্ব হল তারা নিখাদ এক রঙের। পুড়ে যাওয়া বা অত্যধিক গরমের ফলে কোনও কালো চিহ্ন নেই। তার ওপর পাতলা এবং কোমল। এরপর আসবে আলুভাজা। অতি পাতলা চাকা চাকা করে অথবা সরু করে কাটা মুচমুচে। আলুভাজা নিয়ে পারশিদের গর্বের অন্ত নেই। এখানেও বেশি বা কম ভাজা হয়েছে এমন হবে না।

এরপর মাছ। সেদিন এল পাতরানি মচ্ছি। আমাদের ভেটকি পাতুরির মতন।

এবারে মুরগির সময় হল। সুপুষ্ট কুক্কুটের একটি বৃহৎ খণ্ড ডিমে ডুবিয়ে ভাজা।

তারপর ছাগ মাংস। আমরা পেলাম গ্রেভিমা কাটলেট। ঈষৎ তারল্যে সিক্ত মাংসের কাটলেট। শেষ আমিষপদ ডিম। ডিমের পাক প্রকরণ নিয়েও পারশিদের গর্বের অন্ত নেই। ফ্রায়েড আন্ডার ধরনে। আলু, ট্যাড়স অথবা পালং শাকের সিংহাসনের ওপর আসীন। দীয়তাম ভুজ্যতাম চলতেই থাকল। এবারে এল পোলাও বা ইয়েলো রাইস এবং ডাল। সেই ইয়েলো রাইসের মধ্যে ছোট ছোট সুসিদ্ধ সুরভিত ছাগ মাংস খণ্ড।

নিয়ম হল ভোজন শেষে কলাপাতাটিকে সতর্কে এবং সন্তর্পণে ত্রিকোণাকারে মুড়ে দিতে হবে। পরিচারকরা তুলে নিয়ে যাবে। অতঃপর বাটিতে করে আসবে লগন নু কাস্টার্ড। সাহেবি কাস্টার্ড পুডিংকে সম্ভ্রান্ত বাদাম আখরোট পেস্তা সহযোগে এবং ঘনীভূত দুধ ব্যবহার করে যে অন্য মাত্রা পায় পারশিরা তার নাম রেখেছেন লগন নু কাস্টার্ড। অর্থাৎ বিয়ে বাড়ির কাস্টার্ড।

এতক্ষণে ভোজন শেষ হল। ব্যস্ততার চিহ্ন মাত্র নেই। কলরব তো নয়ই। পারশি নিমন্ত্রণের ভোজন অতি সুখদায়ক অভিজ্ঞতা।

পারশিদের একটি বিখ্যাত খাবার যা অভিনব, বিশিষ্ট, দৈনন্দিনের হয়েও সমৃদ্ধ, তার নাম ধানশাক। প্রকরণ ইরান থেকে আহৃত। কয়েক প্রকার ডাল সহযোগে মাংস রান্না। যেমন পাঞ্জাবিদের সর্ষো দা শাক, মক্কি দি রোটি অথবা আমাদের চিংড়ি মাছের মালাইকারি। অতীব প্রিয় কিন্তু প্রতিদিনের নয়। ধানশাক দিনগত ভোজ্য হয়েও পারশিদের এখনও সম্মোহিত করে রেখেছে।

কোনও বিচিত্র কারণে, কারণটা শুনেছিলাম কিন্তু মনে নেই, ধানশাক কোনও আনুষ্ঠানিক নিমন্ত্রণে পরিবেশিত হয় না।

বড় নিমন্ত্রণে শেষ পদ হবে কুলফি। শুনেছি মোগলরা এই পদটি শুরু করেছিলেন। আমার বিশ্বাস পারশিরা মোগলদের অনায়াসে অতিক্রম করে গেছে। একমাত্র ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়ালের মাঠে অথবা দিল্লির পাঁচকুইয়া রোডের ধারে এমন মায়াময় কুলফি পাওয়া যায়।

পারশিদের অতি প্রিয় ভোজ্য ধানশাক। সমগ্র দক্ষিণ ভারতে ডাল খাওয়া হয় অড়হর। সেই ডাল পাক করবার বিধি প্রায় সব রাজ্যে সমান। ওঁরা নাম দিয়েছেন সাম্বার। কতদিন ধরে এই বিধি চলেছে তার ঐতিহাসিক প্রমাণ আমার কাছে নেই। অনুমান করি এক-দু' হাজার বছর তো হবেই। দক্ষিণ

ভারতীয়রাই তো আসল ভারতবাসী। আড়াই হাজার বছর আগে আর্যদের আসবার পূর্বেও তাদের ভারত বাস।

বাঙালিরা যদিও অনেক প্রকার ডাল খায় এবং বিভিন্ন প্রকারের রন্ধন করে, আমাদের সঙ্গে ডালের পরিচয় বেশি দিনের নয় "বাঙালির ইতিহাসে" নীহাররঞ্জন রায় এই কথা লিখেছেন।

পারশিদের ডাল সম্বন্ধে একনিষ্ঠতা আছে। সেই একনিষ্ঠতা প্রতিফলিত হয় 'ধানশাকে'। ধানশাক না থাকলে পাবশি ভোজন প্রায় অসম্ভব।

বিভিন্ন নিমন্ত্রণ বাড়িতে প্রায় একই ভোজ্য দেখা যেত। খারাপ লাগেনি কোনও দিনও। যে শৃঙ্খলার সঙ্গে পরিবেশন হত সেটা অনুকরণীয়। কোথাও হাঁকডাক নেই। নীরবে পরিবেশিত হচ্ছে। অতিথিদের তৃপ্তি অবধারিত।

সে সময় পারশি নিমন্ত্রিতরা একটা অলিখিত নিয়ম পালন করতেন। খোঁজ করতেন কোন কেটারার এখানে খাবার দেবার ঠিকা নিয়েছেন। খাদ্যতালিকা সমান। শুধু বিভিন্ন কেটারারের বিভিন্ন রেট, যে কেটারার এ নিমন্ত্রণ বাড়ির ভার নিয়েছেন তাঁর রেট অনুযায়ী আপনারা যে কয়জন যাবেন সেই সংখ্যা দিয়ে গুণ করে আপনার দেয় উপহারের মূল্য স্থির হবে। অর্থাৎ আপনারা যে ভোজন করলেন তার পুরো দামটা দেওয়া হল। গৃহকর্তার বোঝাও বাড়ল না।

নিমন্ত্রণ বাড়ির বাইরে পারশি ভোজনের সঙ্গে পরিচয় না হলে মনে হতে পারে মাত্র এই ক'টি পদই পারশিদের পাক প্রক্রিয়ার সম্বল।

পারশি রন্ধন পরিবেশিত হয় এমন ভোজনশালা বেশি ছিল না বোম্বাইতে। তারদেও-র কাছে একটি মাত্র পারশি ভোজনশালা আমার জানা ছিল। সেখানে কয়েকবার গিয়েছি, আনন্দও পেয়েছি। পারশি রন্ধন শিল্পে খিচুড়ির স্থান অগ্রগণ্য। পনেরো-কুড়ি রকমেব খিচুড়ি পাওয়া যায়। সবগুলির সঙ্গে আমার পরিচয় হয়নি। এমনই অকৃতজ্ঞ মন আমার লেখার সময় এই ভোজনশালার নাম মনে কবতে পারছি না। আর এক স্থানে নিয়মিত পারশি খাবার পাওয়া যেত। শুধুমাত্র পারশি ভোজ্যই। সেটি ফোয়ারার কছে রিপন ক্লাবে। পারশিদের ক্লাব।

চিন অকস্মাৎ উত্তরপূর্ব ভারত আক্রমণ করেছে। নেহরু হতচকিত, বিবশ। নেহরুর প্রশ্নাতীত নেতৃত্ব ঝড়ের মুখে, ব্যর্থকাম, হতোদ্যম নেহরুকে সংসদের আক্রমণে কৃষ্ণ মেননকে বলি দিতে হল। অর্থমন্ত্রী মোরারজি দেশাই স্বর্ণনিয়ন্ত্রণ আইন চালু করলেন। দেশসুদ্ধ প্রতিবাদের ঝড়। পাকা সোনার দাম একশো ত্রিশ টাকা ভরির আশপাশে। বাইশ ক্যারেটের সোনা কেনা-বেচা হবে না। চোদ্দো ক্যারেটের ওপর সোনা নিষিদ্ধ। অল্পকাল পরেই এই বাংলায় ছানার ব্যবহার নিয়ন্ত্রিত হবে। সন্দেশ, রসগোল্লার থেকে বঞ্চিত সাধারণ মানুষ। কামরাজ প্ল্যানে মোরারজি দেশাই সহ আরও কয়েকজন মন্ত্রিসভা থেকে বর্জিত হলেন। পশ্চিমবাংলা সরকারে কংগ্রেসের পতন। যুক্তফ্রন্ট গঠিত হল দু'বার! কিন্তু সরকারে থাকতে পারল না। দু'বারই সেই সরকারের পতন হল। ভারতীয় কংগ্রেস দু'ভাগ হল। কমিউনিস্ট পার্টিও দু'ভাগে বিভক্ত। নকশালদের উত্তরণের সংকেত দেখা যাচ্ছে পশ্চিমবাংলায়। শিবসেনা মাথা চাড়া দিচ্ছে মহারাষ্ট্রে। অক্টলনির মনুমেন্টের নাম হল শহিদ মিনার। দেশ জুড়ে অস্থিরতা। পাকিস্তান ভারত আক্রমণ করেছে ষাট-এর দশকে। সেই সময়।

আমি কাশীর হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র। আমার সময় অধ্যক্ষ ছিলেন স্যার সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণাণ। এখন তিনি ভারতের রাষ্ট্রপতি। আমি একদিন তাঁর সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছিলাম।

যেহেতু আমি তাঁর সময় হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র ছিলাম তিনি তাঁর উষ্মা, আহত অভিমান আমার সামনে অকপটে উজাড় করে দিলেন। 'কোথায় চলেছে ভারতবর্ষের গৌরব, তার ঐতিহ্য, নেহরু তাঁর কর্তব্যে অবহেলা করছেন কেন?' রাষ্ট্রপতি আমাকে প্রশ্ন করলেন।

ভারতবর্ষের সংবাদ মাধ্যম বহুলাংশে স্বাধীন। এটাই সংবিধানের বিধান।

ছোট বড় ক্ষমতার অধিকারীরা মাঝে মধ্যেই সংবাদ মাধ্যম দখল করে। কখনও বাধ্যতার আশায়, কখনও শাস্তিস্বরূপ।

টাইমস অফ ইন্ডিয়া গোষ্ঠী সেই সময় একটি মারাঠি দৈনিক প্রকাশে উদ্যোগী হয়েছিল। মহারাষ্ট্র টাইমস। অনেক নতুন কর্মী নিযুক্ত হলেন ছাপাখানায়। মারাঠি সম্পাদকীয় বিভাগ গঠন করা হল। সহ সম্পাদনা, প্রতিবেদন আরও নানা কাজের মানুষ নিযুক্ত হলেন। এক্সপ্রেস গোষ্ঠীর অগ্রগণ্য মারাঠি কাগজ লোকসত্তার প্রধান সহকারী সম্পাদক যোগ দিলেন সম্পাদক হিসেবে। বাজারে আসন্ন নতুন সংবাদপত্রের ভূমিষ্ঠ হবার খবর প্রচারে কার্পণ্য করেনি টাইমস গোষ্ঠী।

টাইমসের ওপর সরকারের রোষ কারও অবিদিত নয়। অনেকে মনে করেন টাইমসকে জব্দ করবার জন্য হঠাৎ সরকারি একটি নিয়ম প্রবর্তিত হল যে নতুন কোনও দৈনিকপত্র দশ হাজারের বেশি কপি মুদ্রণ বা প্রচার করতে পারবে না। ভারতবর্ষের প্রয়োজনীয় নিউজপ্রিন্ট, যা দিয়ে দৈনিক কাগজ ছাপা হয়, তার আশি নব্বই ভাগই বিদেশ থেকে আনতে হয়। বৈদেশিক মুদ্রার ব্যয় সংকোচ হিসেবে সরকার নতুন কাগজের ওপর দশ হাজারের সীমা সহজেই প্রযুক্ত করেছিলেন।

টাইমসের পরিচালনার কর্মকর্তারা সরকারের এই অকস্মাৎ আঘাতে অতি বিব্রত, হতচকিত।

আবেদন নিবেদন করেও কোনও ফল হল না। ভারপ্রাপ্ত কেন্দ্রীয় মন্ত্রীকে বলা হল প্রায় শ' দুয়েক কর্মী কর্মচ্যুত হবেন সরকারের এই অপ্রত্যাশিত বিধিনিষেধে। মন্ত্রী বললেন দোষটা টাইমসের। পরিচালকেরা জানতে পেরেছিলেন সরকারের নিষেধাজ্ঞা আসন্ন। তাই সরকারকে বিব্রত করবার চেষ্টায় তড়িঘড়ি কর্মীদের নিয়োগ করেছেন। এই সময় টাইমস গোষ্ঠী থেকে সদ্য নিযুক্ত কর্মীদের কিছু খেসারত দিয়ে বিলগ্ন করা হল। অনেকে পুরনো কর্মক্ষেত্রে ফিরে গেলেন। যাঁদের পুরনো নিয়োগকর্তা ফেরত নিতে চাইলেন না তাঁরা বিনা দোষে কর্মহীন অভাবগ্রস্ত হয়ে গেলেন।

টাইমস এই বিষয়ে আইনজ্ঞের পরামর্শ নিতে লাগল। বড় প্রতিষ্ঠান— নড়তে চলতে সময় লাগে। ইতিমধ্যে তিন মাস পার হয়ে গেছে। নিউজপ্রিন্ট ব্যবহারের বিধিনিষেধ বদলে গেল। নতুন ফরমানে নতুন কোনও দৈনিক ত্রিশ হাজার কপি ছাপাতে পারা যাবে। তার জন্য যে পরিমাণ নিউজপ্রিন্ট প্রয়োজন

সরকার তা ব্যবহারের অনুমতি দেবে। তবে সংবাদপত্রের পৃষ্ঠাসংখ্যা আটের বেশি করা যাবে না।

আমরা হাতে চাঁদ পেয়ে গেলাম। প্রায় দু' শো মানুষকে কর্মহীন করবার লজ্জায় আমরা অধোমুখ। নতুন আইনের সুযোগ নিয়ে আমরা মহারাষ্ট্র টাইমস প্রকাশ করব। ছ' পাতার কাগজ। চল্লিশ হাজার পর্যন্ত ছাপতে পারব। ছাপানোর যে আগাম অর্ডার পাওয়া গেল তা ছিল সত্তর হাজারের অধিক। তবু যা পাওয়া গিয়েছে তাতেই সন্তুষ্ট থাকতে হবে। কর্মীদের একজোট করতে সময় লাগল না। কিছুদিনের মধ্যেই মহারাষ্ট্র টাইমস প্রকাশিত হল।

অনেকে বলেছেন সরকারের নিউজপ্রিন্ট আইনের পরিবর্তন সংবাদপত্রের প্রতি মমতাবোধের জন্য নয়, গণতন্ত্রের ভিত্তিভূমি দৃঢ় করবার জন্যও নয়। আসল কারণ অন্যত্র। সে সময় লখনউয়ের ন্যাশনাল হেরাল্ড, যার সঙ্গে নেহরুর আত্মিক যোগ, যিনি একদা তার সম্পাদক ছিলেন, সেই ন্যাশনাল হেরাল্ডের দিল্লি সংস্করণ প্রকাশের আয়োজন শুরু হয়েছে যাতে ন্যাশনাল হেরাল্ড নির্বাধ বিক্রি হয়।

ন্যাশনাল হেরাল্ড শুরু থেকে খর্বকায়। দিল্লির সংস্করণ দশ হাজার পার হয়েছিল কিনা আমার জানা নেই।

মহারাষ্ট্র টাইমসের সম্পাদক হয়ে যিনি এলেন তাঁর নাম ডি বি কার্নিক। রাজনৈতিক প্রাণী। সক্রিয় রাজনীতিতে অংশ নিয়েছিলেন একদা। পরে মানবেন্দ্র রায়ের সঙ্গে যোগ দিয়েছিলেন। মানবেন্দ্র রায়ের পার্টি সেই সময় নিশ্চিহ্ন হবার মুখে। টাইমস অফিসে এই প্রথম একজন রাজনীতিবিদকে দেখা গেল। অন্য সম্পাদকেরা টেবিল চেয়ার সমৃদ্ধ করে তাৎক্ষণিক রাজনৈতিক ঘটনার চুলচেরা বিশ্লেষণ করেন। রাজনীতির সঙ্গে তাঁদের কোনও প্রাণের যোগ ছিল না। এম এন রায় পন্থী কয়েকজনের সঙ্গে আমার অনেক দিনের পরিচয়। আমার বহুজনের বন্ধু সমরেন একনিষ্ঠ রায়-পন্থী। ডি বি কার্নিকের সঙ্গে সহজ সম্পর্ক হতে সময় লাগল না। মানুষটি ভাল, আবেগপ্রবণ। প্রধানত তাঁর জন্যই অনেক মারাঠি রাজনৈতিক নেতা ও কর্মীর সঙ্গে পরিচয় হয়েছিল।

মহারাষ্ট্র টাইমস প্রকাশের উদ্যোগপর্বে আমরা চেয়েছিলাম কাগজটি সর্বাঙ্গীন সুন্দর হোক। একজন কার্টুনিস্ট নিয়োগ করা স্থির হল। টাইমস অফ ইন্ডিয়ায় অনন্য কার্টুনিস্ট লক্ষ্মণের কার্টুনগুলি অবশ্য ছাপা যেত মহারাষ্ট্র

টাইমসে। কিন্তু মনে হয়েছিল যে একজন স্বতন্ত্র কার্টুনিস্ট, যার সঙ্গে মারাঠিদের প্রাণের যোগ আছে, এমন কাউকে পাওয়া গেলে ভাল হয়।

ফ্রি প্রেস গোষ্ঠীর মারাঠি কাগজ নবশক্তির কার্টুনিস্ট তখন বেশ নাম করেছেন। তীক্ষ্ণ বুদ্ধি। আঁকার হাত ভাল। লক্ষ্মণের কাছাকাছি যান।

তাঁর নাম বাল ঠাকরে। ঠাকরের সঙ্গে যোগাযোগ করলাম। তিনি একদিন আমার অফিসে এলেন। সম্মতও হলেন টাইমসে যোগ দিতে। কিন্তু অন্তরায় ছিল, তিনি 'সামনা' নামে একটি সাপ্তাহিক পত্রিকা প্রকাশ করেন। সেটি তাঁর নিজের। তার সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করতে পারবেন না। কার্টুনও আঁকবেন সেখানে, টাইমসে যোগ দেবার পরও।

টাইমসের নিয়ম শিথিল করে বাল ঠাকরের প্রস্তাবে রাজি হওয়া সম্ভব হয়নি। সেই বাল ঠাকরে আজ শিবসেনার সর্বশক্তিমান সর সঞ্চালক—বালা সাহেব ঠাকরে।

টাইমস গোষ্ঠীর মালিক শান্তিপ্রসাদ জৈন দূরদৃষ্টি-সম্পন্ন মানুষ ছিলেন। তিনি অনুভব করেছিলেন যে ভারতবর্ষে যতদিন পর্যন্ত শিল্পদ্যোগের অগ্রগতি হচ্ছে না ততদিন আমরা ভারতবাসীরা দারিদ্র্যে পীড়িত থাকব। তিনি স্বয়ং শিল্পপতি। তাঁর বিশ্বাস ছিল এ দেশে শিল্পের অগ্রগতির প্রথম প্রতিবন্ধক কেন্দ্রীয় সরকার। নানা নিয়ম কানুনের শৃঙ্খলে আবদ্ধ রেখে এবং নানা প্রকার কন্ট্রোল আরোপ করে তারা নিজেরাই শিল্পের বৃদ্ধির অন্তরায়। তার চেয়েও একটা বড় বাধা ছিল। সেটা ছিল শিল্প এবং অর্থনীতির বিভিন্ন খবর মানুষের কাছে সহজলভ্য নয়। ফলে জানতে পারা যায় না যে কোথায় কী সুযোগ আছে, আর কারণই বা কী আমাদের উদ্যোগের খর্বতার। প্রথমত প্রয়োজন হল দেশের এবং বিদেশের অগ্রগতির খবর পাওয়া। সম্ভাবনার সুযোগ নেওয়ার প্রতিবন্ধক দূর করা। এ-সবের জন্য প্রয়োজন হল প্রাসঙ্গিক সমস্ত খবর অনুসন্ধিৎসু পাঠকের কাছে পৌঁছে দেওয়া।

দেশ-বিদেশে ঘুরেছেন, বহু বিদেশের উন্নতি অগ্রগতি পর্যবেক্ষণ করেছেন। শান্তিপ্রসাদ জৈন এই সিদ্ধান্তে পৌঁছলেন যে, ব্যবসাবাণিজ্য এবং শিল্পের অগ্রগতি সম্বন্ধে একটি দৈনিক কাগজে বের করলে দেশের উন্নতির সুবিধা হবে। লন্ডনের 'ফিনানসিয়াল টাইমস' তাঁর আদর্শ ছিল। পৃথিবীর অন্যতম অর্থনৈতিক দৈনিক 'ফিনানসিয়াল টাইমস'-এর পরিচালকদের সঙ্গে আলোচনাও করেছিলেন। ভেবেছিলেন ওই সংবাদপত্রের মতো

ফিনানসিয়াল টাইমস নাম দিয়ে একটি খবরের কাগজ প্রকাশ করবেন।

কাজটা আদৌ সহজ ছিল না। অর্থ-জগতের খোঁজখবর পাবার জন্য দুটি মাত্র সাপ্তাহিক ছিল দেশে। ইংরেজি ভাষায় 'ক্যাপিটাল' এবং 'ইন্ডিয়ান ফিনান্স'। ভারতবর্ষের শ্রীবৃদ্ধির সোপান হিসাবে তারা যথেষ্ট নয়।

অতএব প্রস্তুতি শুরু হল ফিনানসিয়াল টাইমস নামে বোম্বাই থেকে একটি দৈনিক পত্রের প্রকাশের। ভাবী সম্পাদক নির্বাচন করা হল টাইমসের ব্যবসাবাণিজ্য পৃষ্ঠার সহ সম্পাদককে। তাঁকে লন্ডন, নিউ ইয়র্ক, টোকিও শহরে পাঠানো হল সেখানকার অনুরূপ সংবাদপত্রের চরিত্র ও গঠন অনুধাবন করার জন্য।

কাজ ভালই এগোচ্ছিল। বোম্বাইতে অন্যান্য প্রশিক্ষিত দক্ষ কর্মীর সন্ধান করছিলাম। নতুন কাগজের খসড়া তৈরি করা হচ্ছে। এমন সময় খবর পাওয়া গেল যে রামনাথ গোয়েঙ্কা একটি অর্থনৈতিক দৈনিক প্রকাশ করবার জন্য প্রস্তুত হচ্ছেন। শান্তিপ্রসাদ জৈন খুব ক্ষুণ্ণ হয়েছিলেন। তাঁর ধারণা তাঁর কাছ থেকেই রামনাথ গোয়েঙ্কা প্রথম এই আইডিয়ার সন্ধান পান।

একদিকে আমরা তৈরি হতে থাকি, দক্ষ লোকবল, প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি সংগ্রহ করি। দেশ-বিদেশের প্রশিক্ষিত সংবাদদাতা চিহ্নিত করা এবং তাদের সঙ্গে সংযোগ করা হল। অন্যদিকে খবর আসে রামনাথ গোয়েঙ্কা আরও দ্রুতগতিতে এগোচ্ছেন। আর তাই স্পষ্ট, আপাত-অদৃষ্ট রেষারেষি শুরু হয়ে গেল। আমাদের চেয়ারম্যান শান্তিপ্রসাদজি আমাকে বললেন রামনাথ গোয়েঙ্কাকে নিবৃত্ত করতে না পারলে অর্থনৈতিক কাগজটা প্রকাশ করায় অকারণ অন্তর্ঘাতী দ্বন্দ্ব শুরু হয়ে যাবে।

আমি তখন দিল্লিতে। এক সকালে শান্তিপ্রসাদজির বাড়িতে রামনাথজির সাথে দেখা হয়ে গেল।

শান্তিপ্রসাদ জৈন এবং রামনাথ গোয়েঙ্কা অনেক ব্যাপারে পরস্পরের নিকট। তাঁদের সম্বন্ধ দুই বৈবাহিকের। শান্তিপ্রসাদ জৈনের ভ্রাতুস্পুত্রীর সঙ্গে রামনাথজির পুত্র ভগবানদাসের বিবাহ হয়েছিল। দুই পরিবারের প্রধানদের মধ্যে বাইরে সদ্‌ভাব থাকলেও যথেষ্ট রেষারেষি ছিল। শান্তিপ্রসাদ জৈনের সঙ্গে খবরের কাগজের সম্পর্ক অপেক্ষাকৃত নতুন। তিনি তৈরি একটা সাম্রাজ্য হঠাৎ হাতে পেয়েছেন। অন্যপক্ষে রামনাথজি নিজের উদ্যোগে খবরের কাগজের ব্যাপারে মাদ্রাজ এবং বোম্বাইতে

সফলকাম হয়েছেন। এখন দিল্লিতে পা রাখবার জন্য প্রস্তুত হচ্ছেন।

রামনাথজির সঙ্গে কথা বলে আমার সেদিন সারা সকালটা কাটল। শান্তিপ্রসাদজি পরিকল্পিতভাবে উপস্থিত থাকলেন না। আমি প্রসঙ্গটা উত্থাপন করতেই রামনাথজি বললেন, শান্তিপ্রসাদের আরও অনেক ব্যবসা আছে। চিনি, সিমেন্ট, কাগজ, ব্যাঙ্ক ইত্যাদি বহু উদ্যোগে তিনি জড়িত। রামনাথজি শুধু কাগজ নিয়েই আছেন। এই ক্ষেত্রটা তাঁকে ছেড়ে দেওয়াই উচিত। শান্তিপ্রসাদজি কেন অকারণ নাক গলাবেন।

আমার দুটি মাত্র যুক্তি। শান্তিপ্রসাদজি প্রস্তাবিত সংবাদপত্রটি প্রথমে ভেবেছিলেন। আর দুই, টাইমস গোষ্ঠী এক্সপ্রেস গোষ্ঠীর চেয়ে অনেক অভিজ্ঞ ও মজবুত সংগঠন। আমার প্রথম যুক্তিটা রামনাথজি ভ্রূক্ষেপই করলেন না। শুধু বললেন ওটা বাজে কথা। এদেশে আমিই প্রথম অর্থনৈতিক দৈনিকের কথা ভেবেছি।

এ-বিষয়ে দু'জন মুখোমুখি বসে মিটিয়ে নেওয়া উচিত কিন্তু কোনও পক্ষই প্রকাশ্য দ্বৈরথে প্রস্তুত নন। অন্য যুক্তিটা উপস্থিত করতে আমার দ্বিধা হয়েছিল যে আমরা তাঁর সংগঠনের থেকে সবল, অভিজ্ঞ এবং সে কারণে উপযুক্ত।

তবু সেই সকালটির কথা আমার মনে আছে। মারোয়াড়ি ব্যবসায়ী রামনাথ গোয়েঙ্কাকে যেন নতুন আলোয় দেখা গেল। গীতা উপনিষদ থেকে নানা আপ্ত বাক্য উদ্ধার করে তিনি তাঁর বক্তব্যকে অলংকৃত এবং দৃঢ় করলেন। দেশ-বিদেশে ঘুরেছেন। তীক্ষ্ণ বুদ্ধি। তাঁর অভিজ্ঞতা, অন্তত এই বিষয়ে. তুল্য কোনও মানুষ আমি দেখিনি। তাঁর কথা শুনতে ভাল লাগছিল। কিন্তু আমার উদ্দেশ্যে পরাজিত হয়ে ক্ষুণ্ণ হয়েছিলাম। প্রস্তাব করলাম দুই গোষ্ঠী এই কাজটা, একটা নতুন অর্থনৈতিক দৈনিক যৌথভাবে কবতে পারে না?

রাজনাথজি বললেন নিশ্চয়ই পারেন। আমি আশায় উদ্দীপ্ত হয়ে বললাম, তা হলে তাই হোক। তিনি আমাকে এক বাক্যে দমিয়ে দিলেন। প্রস্তাবিত কাগজে সমান অংশ থাকবে, সমান অধিকারও থাকবে। কিন্তু পরিচালনা করবে কে? পরিচালনা তো একজনকেই করতে হবে। আমি মৃদুভাবে বললাম, আমরা অর্থাৎ টাইমস গোষ্ঠী সে ভার নিতে রাজি আছি।

রামনাথজি বললেন, দু'জনে মিলে নেতৃত্ব করাও যায় না। নেতা একজনই হয়। এই ধরনের বাক্য শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে বলেছিলেন। আমি হতবুদ্ধি এবং নীরব। ভগবান শ্রীকৃষ্ণের ওপর আমি আর কী কথা বলব।

রামনাথজি বললেন, তোমার বোঝা উচিত খবরের কাগজের প্রকাশ সম্পূর্ণ ভিন্ন ধরনের ব্যবসা। এটা লাভ লোকসানের ব্যবসা নয়। এটা প্রভাব প্রতিপত্তির প্রকল্প। কাগজটি যার পরিচালনায় থাকবে সে-ই সুফল ভোগ করবে।

অর্থাৎ স্পষ্ট বলেছিলেন তাঁর পরিচালনা না হলে তিনি স্বতন্ত্র কাগজ করতে বাধ্য হবেন।

রামনাথজি কূটবুদ্ধি সম্পন্ন মানুষ। তাঁকে বোঝাবার ক্ষমতা আমার নেই। আমি নিঃশব্দে হার স্বীকার করলাম। খবরটা শুনে শান্তিপ্রসাদজি ব্যথিত হলেন। কিন্তু অনমনীয়। বললেন দু' পক্ষের রেষারেষিতে যখন ফিনানসিয়াল টাইমস নাম দেওয়া সম্ভব নয় তখন আমরা নামটা রাখি ইকনমিক টাইমস। পরে শুনলাম রামনাথজির কাগজের নাম হবে 'ফিনানসিয়াল এক্সপ্রেস'। অর্থাৎ দু' পক্ষের আদর্শ ফিনানসিয়াল টাইমস নামটাকে দু' ভাগ করে গ্রহণ করা হল। মিলও হল। টাইম গ্রুপের ইকনমিক টাইমস। এক্সপ্রেস গ্রুপের ফিনানসিয়াল এক্সপ্রেস।

যথাকালে ইকনমিক টাইমস-এর প্রকাশের দিন ঘোষিত হল। ইকনমিক টাইমস প্রকাশিত হবার সাত-দশ দিন আগে ফিনানসিয়াল এক্সপ্রেস প্রকাশিত হল। রামনাথজি আমাদের থেকে এক ধাপ এগিয়ে থাকলেন। ফিনানসিয়াল এক্সপ্রেস দেখে আমাদের ভরসা হল আমাদের কাগজটা ওদের থেকে ভাল হবে। আমরা দেশে-বিদেশে সংবাদদাতা নিযুক্ত করেছি। ভারতবর্ষের প্রথম সারির ব্যবসায়ী, শিল্পপতি ও অর্থনীতিবিদদের সঙ্গে যোগাযোগ করেছি। আমরা নিঃসন্দেহে ফিনানসিয়াল এক্সপ্রেস-এর থেকে ভাল কাগজ বের করব।

নির্দিষ্ট দিনে ইকনমিক টাইমস প্রকাশিত হল। আশা করেছিলাম কুড়ি হাজারের মতো বিক্রি হবে। দশ-বারো হাজারে আটকে থাকতে হবে ধারণা করতে পারিনি। বিশ্বাস এই ছিল যে ফিনানসিয়াল এক্সপ্রেস-এর বিক্রি আমাদের চেয়ে অনেক কম। দুষ্ট এবং ঈর্ষাপরায়ণ লোকেরা আমাদের এই ক্ষুদ্র সাফল্যে খুশি হয়েছিল। অফিসেও এমন অনেকে ছিলেন যারা বিশ্বাস করতে পারেনি ইকনমিক টাইমস একটা সফল কাগজ হবে।

ইকনমিক টাইমস সাধারণ মানুষের কল্পনার বাইরে ছিল। আট-দশ পাতা ভরাবার জন্য প্রচুর ব্যবসা-বাণিজ্যের খবর পাওয়া যাবে এবং অন্তর্ভেদী আলোচনা করে পাতা ভরানো যাবে আমরা নিজেরাও ভাবিনি। ইকনমিক

টাইমসের অগ্রগতি ধীরগতিতে শুরু হয়েছিল। আমি যতদিন তার সঙ্গে যুক্ত ছিলাম কুড়ি-তিরিশ হাজারের বেশি বিক্রি হয়নি। এই মুহূর্তে ইকনমিক টাইমসের বিক্রি চার লক্ষেরও অধিক।

ইকনমিক টাইমস প্রকাশিত হবার দু'-একদিনের মধ্যে চেয়ারম্যান আমাকে আমেদাবাদে পাঠালেন। সেখানে মুখ্যমন্ত্রীর পৌরোহিত্যে মস্ত সভা করে ইকনমিক টাইমসকে স্বাগত করা হল। গুজরাতিরা এই কাগজের গুরুত্ব ও মর্যাদা বুঝতে পেরেছিলেন। তাঁরা বললেন গুজরাতি ভাষায় দুটি ব্যবসা সংক্রান্ত সাপ্তাহিক প্রকাশিত হয়। কিন্তু ইকনমিক টাইমসের ব্যাপ্তি অনেক বেশি। এই কাগজ নিশ্চয়ই সফল হবে।

গুজরাতিদের সঙ্গে আমার সেই প্রথম পরিচয়। যাঁদের সঙ্গে আলাপ হল তাঁরা প্রত্যেকেই উচ্চ পদাধিকারী কিন্তু ক্ষমতার প্রদর্শন করেন না। ধনী শিল্পপতিদের দেখলে সাধারণের সঙ্গে আলাদা করা যায় না। পরস্পরকে ভাই বলে ডাকার রীতি আছে। নীচের তলার কর্মীরাও উপরতলার ব্যক্তিকে স্বচ্ছন্দে কস্তুরভাই বলে ডাকে। কস্তুরভাইয়ের এখন অনেক বয়স হয়েছে। তিনি শিল্পপতিদের প্রধান। অভিজ্ঞ, বিচক্ষণ, সরল, চালচলনে, আচার ব্যবহারে কোথাও আত্মম্ভরিতা নেই।

সেই সময় আমাদের পরিচিত এক সংবাদদাতা ছিলেন। শিল্পপতি ব্যবসায়ী মহলে সেই ছেলেটি সবাইকে তখন বলতে থাকল টাইমস অফ ইন্ডিয়া, ইকনমিক টাইমস সব কাগজই এখানে প্লেনে করে আসে। বোম্বাই থেকে আসতে বেলা হয়। কাগজ পেতে অপরাহ্ণ। একটি ভাল ইংরেজি দৈনিক পত্র আমেদাবাদ থেকে প্রকাশ করলে বোম্বাই থেকে প্লেনযোগে আগত খবরের কাগজগুলির চেয়ে বিক্রি বেশি হবে। কথাটা সবাই স্বীকার করল। উদযোগী ছেলেটিকে সবাই উৎসাহ দিয়েছিল। তার প্রচেষ্টায় অর্থ বিনিয়োগের প্রতিশ্রুতিও দিয়েছিলেন। আমেদাবাদে কোনও ইংরেজি খবরের কাগজ নেই। যে প্রথম আসবে তার সাফল্য অবশ্যম্ভাবী।

ছেলেটি অত্যন্ত খুশি হয়ে একদিন কস্তুরভাই লালভাইকে অত্যন্ত আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে তার প্রকল্পের কথা জানাল। কস্তুরভাই বললেন, তুমি যা বলছ সবই ঠিক। কিন্তু তখন যদি টাইমস অফ ইন্ডিয়া এখান থেকে প্রকাশ হতে আরম্ভ করে তা হলে কী হবে। তুমি কি তার সঙ্গে প্রতিযোগিতায় পারবে?

ছেলেটি এই ঘটনা আমাকে নিজেই বলেছিল। তখনই আমার মাথায় এই

প্রকল্পের কথা ঢুকে গিয়েছিল। তারপর টাইমস অফ ইন্ডিয়ার অনেক দুঃসময় গেছে। কোর্টের অর্ডারে পরিচালক বোর্ডে অনেক অদল বদল হল। অনেক নবনিযুক্ত ডিরেক্টর টাইমসের পরিচালনায় অংশ নিতে আরম্ভ করলেন। টাইমস অব ইন্ডিয়ার আমেদাবাদ সংস্করণ আপাতত ধামাচাপা পড়ল।

টাইমস ছাড়বার বছর দুই আগে পরিচালকবর্গকে বোঝাতে পেরেছিলাম যে আমেদাবাদ সংস্করণ প্রকাশ করতে পারলে আমাদের প্রভূত লাভ হবে। প্রত্যহ অনেক মাসুল দিয়ে কাগজ পাঠিয়েও পাঠকবর্গকে খুশি করতে পারা যাচ্ছিল না। তা ছাড়া প্লেন অহরহ লেট হয়। ঘোর বর্ষায় অনেকদিন প্লেন বম্বে থেকে আমেদাবাদ যায় না।

বোর্ডের সম্মতির পর আমেদাবাদ সংস্করণের কাজ শুরু হয়। বলা হয়নি ইতিমধ্যে কয়েক বছর আগেই জয়চন্দ্র অবসর নিয়েছেন। সংগঠনের সম্পূর্ণ দায়িত্ব আমার কাঁধে।

আমেদাবাদে সম-ব্যবসায়ীদের সঙ্গে পরিচয় হল। তাঁদের তিন প্রধান দৈনিকের নাম গুজরাত সমাচার, সন্দেশ, জনসত্তা। কাগজগুলি খুব বড় নয়। প্রথম দুটির লাখের কাছাকাছি বিক্রি। জনসত্তা কম বিক্রি হয়। তার মালিক রমনলাল শেঠ নানা ঝঞ্ঝাটে তখন পর্যুদস্ত। নিচু স্বরে কথা বলেন।

গুজরাতে কোনও কাগজের মালিকদের বড় কোনও ইতিহাস নেই। সবারই উত্থান পঞ্চাশের দশকে। প্রধান কাগজ গুজরাত সমাচার সর্বাধিক বিক্রীত, তখনই সাফল্যের স্বাদ পেয়ে গিয়েছে। মালিক শান্তিলাল শা প্রথম জীবনে সামান্য কোনও কাজ করতেন, তারপর গুজরাত সমাচারের বিজ্ঞাপন ক্যানভাসার হয়েছিলেন। সাইকেলে চেপে সারা শহরে বিজ্ঞাপন জোগাড়ের কাজ করেছেন। ছোট কাগজ ভাল চলছিল না। কোনও শিল্পপতির অনুদানের সাহায্যে গুজরাত সমাচারের স্বত্ব কিনে নিলেন শান্তিলাল শা।

তারপর শুধুই ঊর্ধ্বগতি। আমার সঙ্গে যখন পরিচয়, তখন শহরের মধ্যে মস্ত বাড়িতে প্রেস বসেছে। সামান্য কয়েকজন কর্মী নিয়োগ করে শান্তিভাই মসৃণভাবে কাগজ চালাচ্ছেন।

আমেদাবাদে ভাল হোটেল নেই। একমাত্র বাসযোগ্য হোটেলের নাম কামা হোটেল। সেখানে থাকতে হত। খাওয়া-দাওয়া মনোমত নয়। তাই যখন শান্তিভাই প্রস্তাব করলেন যে দুপুর ও রাত্রে তাঁর বাড়িতে ভোজন করতে হবে, তখন সহজেই সম্মত হয়েছিলাম। দু'বেলা না হোক অন্তত একবেলা তাঁর বাড়িতে ভোজন নিয়ম হয়ে গিয়েছিল। তেতলার উপরে শান্তিভাই-এর বাসস্থান। দুই তরুণ ছেলে, বড় ছেলের বউ এবং স্ত্রী নিয়ে শান্তিভাই-এর সংসার। শান্তিভাইয়ের স্ত্রী আমার সামনে বেরুতেন না। বউমা স্মৃতিবেন আমাদের ভোজনের সময় উপস্থিত থাকতেন। দেখাশোনা করতেন।

সম্ভবত শান্তিভাই-এর সঙ্গে আমার সম্পর্কের গভীরতা সন্দেহ করে

সন্দেশের চিমন ভাই প্যাটেল আমার সঙ্গে কেতাদুরস্ত সম্পর্ক রাখতেন। তাঁর বাড়িতেও কয়েকবার নিমন্ত্রণ হয়েছে। আপ্যায়নের ত্রুটি রাখেননি তিনি। তিনি বরোদা না অন্যত্র কোথাও সামান্য চাকরি করতেন। এমন সময় সন্দেশ দৈনিক পত্রটি তাঁর হাতে এসে গিয়েছিল। পনেরো কুড়ি বছরের মধ্যে নতুন বাড়ি হল সন্দেশের। নতুন মুদ্রণ যন্ত্র এল, সগৌরবে জয়যাত্রা চলতে লাগল। সন্দেশ গুজরাত সমাচারের প্রতিযোগী।

তৃতীয় কাগজ জনশক্তির মালিক রমনলাল শেঠ। তিনি অপেক্ষাকৃত নতুন এই ব্যবসায়। তাঁর নতুন বাড়ি ছাপাখানা, আধুনিক স্টাইলে সুসজ্জিত। নতুন মুদ্রণ যন্ত্র। তাঁর বাসস্থানও অত্যন্ত মডার্ন। একতলা বাংলো। সাজসরঞ্জামে চোখ ধাঁধিয়ে দেবার মতো। কিন্তু মানুষটা ম্রিয়মাণ হয়ে থাকেন। তাঁর অনেক যন্ত্রণা। মোরারজি দেশাই কেন্দ্রে চলে যাবার আগে তাঁর বিরুদ্ধে আয়কর বিভাগকে দিয়ে বড় মামলা শুরু করিয়ে দিয়েছেন। আরও কিছু দায় তখন তাঁর ওপর। তাঁর কাগজ সর্বাধুনিক আয়োজন সত্ত্বেও তৃতীয়।

চিমনভাই প্যাটেল এবং রমনভাই শেঠের আদি এবং আসল অর্থ আহরণের সূত্র ক্রসওয়ার্ড পাজল। তাঁরা মস্ত মস্ত পুরস্কার দিয়ে বড় ক্রসওয়ার্ড পাজল চালাতেন। প্রবেশ মূল্য থেকেই প্রচুর আয় হত। পুরস্কার এবং অন্য খরচখরচা বাদ দিয়ে অনেক টাকা পেতেন।

রমনভাই কী কারণে মোরারজির রোষ দৃষ্টিতে পড়েছিলেন, এখন আর মনে নেই। সবাই তো অন্যায় ভাবে টাকা করে, আইন ফাঁকি না দিলে কি সঞ্চয় হয়। তা বলে শুধু তার ওপরেই আক্রমণ কেন? এই ভেবে প্রথম দিকে কাগজটা হবার পর রমনভাই মোরারজির প্রচুর সমালোচনা ও নিন্দাবাদ করেছিলেন। তাঁর ধারণা এ-কারণেই আয়কর বিভাগ তাঁর ওপর এত রুক্ষ ও কঠিন, তাঁর যাবতীয় সম্পত্তি গ্রাস করতে বদ্ধপরিকর।

রমনভাই-এর বাড়িতে অনেক ডিনার ও মধ্যাহ্ন ভোজে তাঁর আক্ষেপ শুনেছি। ভোজন ভাল হত, কিঞ্চিৎ পাশ্চাত্যের ছোঁয়া থাকত। স্যুপ, চিজ সহযোগে সবজি বেক, শেষে নিরামিষ পুডিং—তাঁর খানায় বৈচিত্র্য আনত।

এঁরা তিনজনই পরস্পরের অন্ধ প্রতিযোগী। সব সময় খবর রাখতেন, অন্যেরা কী করছেন। তিনজনের দেখা সাক্ষাৎ ছিল না তা নয়। কিন্তু সে তো সামাজিক সম্পর্ক। যদিও ব্যবসার কথা সব সময়ে মনে আছে, প্রতিযোগিতারও, তবু নিজেদের মধ্যে মেলামেশার কোনও ত্রুটি থাকত না।

এঁরা সবাই যে আমাকে গ্রহণ করেছিলেন, বন্ধুত্বের হাত বাড়িয়ে দিয়েছিলেন, তার প্রধান কারণ, গুজরাতিদের স্বভাবগত অতিথিবাৎসল্য। আমি বম্বে থেকে এসেছি। অতিথি, আমার দেখাশোনা করা তাঁদের কর্তব্য। আমি জানি, মনে মনে এঁরা কিঞ্চিৎ ভয় পোষণ করতেন, আমাদের অমিতবিক্রম নিয়ে আমরা একদিন যদি গুজরাতি কাগজ বার করি। আমার সঙ্গে যোগাযোগ থাকলে, তাঁরা টাইমসের ভবিষ্যৎ পরিকল্পনার আভাস পাবেন এমন ধারণাও তাঁদের মনে থাকত।

এঁরা আদ্যন্ত ব্যবসায়ী, বেনিয়া। রাজনীতিতে অংশ নেন, নিতেই হয়, তার কারণ তাতে ব্যবসায় সুবিধা হবে। এঁদের কাগজের পরিচালনায় কোনও প্রশিক্ষিত মনের ছাপ ছিল না। কোন সিদ্ধান্তে লাভ বেশি হয় তাঁরা অনায়াসে নির্ধারণ করতে পারতেন।

অবশ্য বহু সিদ্ধান্ত তাঁরা নিতেন সাময়িক আবেগের কারণে। তিনজনই আপন আপন পারিষদ সঙ্গে নিয়ে বেড়াতে বেরোতেন। পারিষদরা নানা খবর আনতেন। একদিন শান্তিভাই হয়তো শুনলেন যে চিমনভাই তাঁর গোষ্ঠীতে একটি নতুন সংযোজন করতে প্রবৃত্ত হয়েছেন, একটি ধর্ম সংক্রান্ত মাসিকপত্র। শান্তিভাই অফিসে ফিরে তৎক্ষণাৎ অনুচরদের ধর্ম সংক্রান্ত পত্রিকা প্রকাশের আয়োজন করতে বলবেন, এটা স্বতঃসিদ্ধ ছিল।

কাজেই প্রত্যেক গোষ্ঠীর একাধিক পত্র-পত্রিকা ছিল। সিনেমা, কিশোর, ধর্ম, কাহিনী, সাহিত্য, জ্যোতিষ কোনও বিষয়ই বাদ ছিল না। প্রত্যেক বিষয়ের জন্য একটি স্বতন্ত্র পত্রিকা।

পরিচয়ের বৃত্ত ক্রমশ বাড়ছিল। আমেদাবাদের বিখ্যাত মঙ্গলদাস পরিবারের প্রধান তখন টেক্সটাইল মিল ওনার্স অ্যাসোসিয়েশনেব সভাপতি। ভারতীয় শিল্পপতিদের কোনও সংস্থার অধিবেশন উপলক্ষে তিনি কলকাতা গিয়েছিলেন। সদ্য ফিরেছেন। তারপর তাঁর বাড়িতে আমার মধ্যাহ্নভোজের নিমন্ত্রণ হল। যথাসময়ে উপস্থিত হলাম একটি সুপরিকল্পিত, সুন্দর গৃহে। গৃহনির্মাণে যে কোনও খ্যাতিবান স্থপতির সাহায্য নেওয়া হয়েছিল, বুঝতে অসুবিধা হয় না।

মঙ্গলদাস, তাঁর স্ত্রী, যিনি বড় শিল্পপতি অম্বালাল সরাভাই-এর কন্যা, এবং আমি একটি টেবিলের তিনদিকে আসীন হলাম। একটি আসন খালি। সেখানে কিছুক্ষণ পরে মঙ্গলদাসের পুত্রবধূ এসে বসবেন। এখন তিনি আমাদের ভোজ্য

পরিবেশনে ব্যস্ত, একজন পরিচারকও তাঁকে সাহায্য করছে। বিবিধ ব্যঞ্জন পরিবেশনের পর তিনি চতুর্থ চেয়ারে বসলেন। বাটিগুলি বার বার ভর্তি করে দিতে লাগল পরিচারক।

খাওয়া-দাওয়া সাধারণ, আমার জন্য বিশেষ কোনও আয়োজন করা হয়েছে মনে হয় না। অতিথি তাই আড়ষ্ট থাকেন না সহজ হয়ে যেতে পারেন। পাককার্য দক্ষতার সঙ্গে করা হয়েছে, প্রতিটি পদ যত্ন করে প্রস্তুত করা।

মঙ্গলদাস আমাকে তাঁর কলকাতা যাওয়ার কথা বলছিলেন। অবশ্য ওই প্রথম তিনি কলকাতা গেলেন। শহরটা ভালয় মন্দয় আর একটু পরিচ্ছন্ন হলে আরও ভাল লাগত। তাঁর কয়েকটি মারোয়াড়ি শিল্পপতির বাড়িতে নিমন্ত্রণ হয়েছিল। তাদের সম্পদের প্রদর্শনী দেখে তিনি অবাক। বললেন, আমি তো ভাবতেই পারি না, কেউ এমন করে তার ঐশ্বর্যের প্রদর্শনী করে। কলকাতার এই দিকটাই তাঁর বড় আশ্চর্য লেগেছিল।

লাগবার কথা। কারণ মঙ্গলদাস পরিবার ও তাঁদের মতো অন্য শিল্পপতিরা সম্পদে কারও চেয়ে কম নন। অথচ, তাঁদের আড়ম্বরহীন ব্যবহারে তার চিহ্নমাত্রও পাওয়া যায় না। এই হল গুজরাতি চরিত্র।

মঙ্গলদাস খবর দিলেন কলকাতার শ্রমিক-মালিক বিরোধও তাঁকে আশ্চর্য করেছে। আমেদাবাদে কোনওদিন শ্রমিক ধর্মঘট হয়নি।

ব্যবসা ও লাভ গুজরাতিদের শোণিত-প্রবাহে। ধন্দা ও মুনাফা তাঁদের শিক্ষার অঙ্গ। গুজরাতিরা ব্যবসাকে বলেন ধন্দা, বড় ছোট সব ব্যবসাকে। এক লঘু মুহূর্তে চিমনভাই আমাকে একটা গল্প বলেছিলেন।

বললেন, জানেন পিকেভাই, এক গুজরাতি মৃত্যুর পর যমরাজের কাছে উপনীত হয়েছে। যমরাজ বললেন, তোমার ইতিহাস দেখছি। তুমি জীবনকালে ভাল মন্দ দু'রকম কাজই করেছ। সুতরাং তোমার কিছুদিন স্বর্গবাস এবং কিছুদিন নরকবাস বরাদ্দ করলাম। তুমি সরল মানুষ, তাই তোমাকে একটা সুযোগ দেব। তুমি আগে স্বর্গবাস করবে, না আগে নরকবাস, তোমার ইচ্ছামতো সেই ব্যবস্থা করে দেব।

গুজরাতি মানুষটি কিছুক্ষণ চিন্তা করে বলল, হুজুর, স্বর্গ আর নরকের কোনওটাই আমার পরিচিত নয়। যদি বলে দেন কোথায় ধন্দা আর মুনাফা বেশি হয়। আমি সর্বাগ্রে সেখানে যাব।

এই হল গুজরাতি চরিত্র। মানুষগুলি শান্ত, নির্বিবাদী। ধন্দা ভাল হলেই

খুশি। অন্য কিছু চান না। ধন্দায় পরাস্ত হয়ে গেলেন জনসত্তার রমনভাই। আমাকে একদিন বললেন, সরকারের নানা জাঁতাকলে আমি পর্যুদস্ত। তোমরা জনসত্তা কাগজটা নিয়ে নাও। কাগজের দেনা পাওনা যা আছে, তোমরা সবটার ভার নিয়ে আমাকে মুক্ত করো। ইচ্ছে হলে কিছু মূল্য দিয়ো, না দিলে তাও স্বীকার। শুধু আমার সাধের এই বসতবাটিটি আমাকে রাখতে দিয়ো।

আমরা রমনভাই-এর প্রস্তাব গ্রহণ করতে পারলাম না। দেনার দায় অনেক বেশি, পাওনার অঙ্কের চেয়ে। রমনভাইকে নিরাশ করতে হয়েছিল।

অল্প কয়েকদিনের মধ্যে রমনভাই জনসত্তা কাগজটি এক্সপ্রেস গোষ্ঠীকে দিয়ে দিলেন। শুনেছি বসতবাড়িটাও রাখতে পারেননি।

কিছুদিনের মধ্যেই রমনভাই আত্মহত্যা করেন। ধন্দায় পরাজিত হবার অধিক আর কী দুর্ভাগ্য থাকতে পারে। জনসত্তা এক্সপ্রেসের পতাকার নীচে এখনও চলছে। কিন্তু যে শিখরে পৌঁছে গিয়েছে গুজরাত সমাচার এবং সন্দেশ তার ধারে কাছেও পৌঁছতে পারেনি। গুজরাত সমাচার এখন গুজরাতের অনেক শহর থেকে প্রকাশিত হয়। বিক্রয় সংখ্যা দশ লাখের আশপাশে। সন্দেশও নেহাত কম যায় না। গুজরাত সমাচার বোধহয় নিউইয়র্ক অথবা আমেরিকার অন্য কোনও শহর থেকেও প্রকাশিত হয়।

সেই সময় শব্দশৃঙ্খল বা ক্রসওয়ার্ড অতি জনপ্রিয় হয়েছিল। আগে আমার পরিচয় হয়েছিল ইলাস্ট্রেটেড উইকলির ক্রসওয়ার্ড পাজলের সঙ্গে। সোজাসুজি বা ওপর নীচে যে খালি ঘরগুলি সেখানে অক্ষর লিখে একটি শব্দ তৈরি হবে। শব্দশৃঙ্খল এমনভাবে তৈরি করা হয় যে অন্তত দুটি শব্দ সম্ভাব্য উত্তর বলে মনে হবে। বস্তুত, আসল শব্দটি নির্বাচন করা কঠিন কাজ ছিল।

পুরস্কার দেওয়া হত সঠিক উত্তরদাতাকে। আশঙ্কা ছিল যে শব্দশৃঙ্খলের মালিকেরা এমন শব্দগুলি নির্বাচন করবেন, যে বেশি উত্তরদাতা বা একজনও নির্ভুল উত্তর দিতে পারবেন না। তা হলে পুরস্কার বিতরণের অঙ্ক অনেক কম হয়ে যাবে। ইলাস্ট্রেটেড উইকলিতে ওই ধরনের ভ্রষ্টাচার পরিহারের জন্য, উত্তর ঠিক করা হত একটি কমিটির দ্বারা। সেই কমিটিতে কাগজের সম্পাদক, আমি এবং বম্বের ম্যাজিস্ট্রেট সাহেব থাকতেন। পক্ষপাতশূন্য নিশ্চিত বিচার হত।

আর এম ডি সি নামের এক প্রতিষ্ঠান কোনও পত্র-পত্রিকার সাহায্য ছাড়া

স্বতন্ত্রভাবে তাঁদের ক্রসওয়ার্ডের প্রবর্তন করেছিলেন। পুরস্কারের পরিমাণ অনেক বাড়িয়ে দিলেন। প্রতিযোগিতার ফর্ম সামান্য মূল্যে যত্রতত্র কিনতে পাওয়া যায়। তাঁরা উত্তর খোঁজবার কাজটাও আরও সহজ করে দিলেন। সম্ভাব্য যে দুটি সমার্থক শব্দ নির্দিষ্ট ঘরগুলি ভরতে পারে, তাও ছেপে দিতেন ফর্মে। ফলে ইংরেজি আদৌ জানবার প্রয়োজন হয় না। যে কেউ প্রত্যেক খাঁচায় দুটি সম্ভাবনার একটিকে বেছে ফর্ম ভরে দিতে পারতেন। বুদ্ধির খেলাটা হয়ে দাঁড়াল ভাগ্যের খেলা।

আর এম ডি সি-র মালিক মি. চামারবাগওয়ালা ক্রমশ পুরস্কারের টাকা বাড়িয়ে দিতে থাকলেন। তিনি আমাকে বলেছিলেন, ইলাস্ট্রেটেড উইকলির ক্রসওয়ার্ড বন্ধ করিয়ে দেওয়াই তাঁর অভীষ্ট।

এইবারে মহারাষ্ট্র সরকার হস্তক্ষেপ করলেন। আইন হল যে প্রাইজগুলি অর্থাৎ পুরস্কার পঞ্চাশ হাজার বা তারও কমে রাখতে হবে। অতটা আমার মনে নেই। তার ওপর আরও নিয়ম হল প্রত্যেক প্রতিযোগিতাতে সীমিত সংখ্যক উত্তরপত্র নেওয়া যেতে পারবে। অর্থাৎ, অধিক সংখ্যক মানুষের ওই ফর্ম কিনে অথবা ইলাস্ট্রেটেড উইকলির উত্তর দেবার জন্য ওই পত্রিকাটি কিনে, তাঁদের উত্তরপত্র গৃহীত হবে কি না জানতেও পারবেন না। পুরস্কার পাওয়া তো পরের কথা।

ইলাস্ট্রেটেড উইকলিতে ক্রসওয়ার্ড বন্ধ হয়ে গেল। টাইমস গোষ্ঠীর শেষ দু'জন ইংরেজ কর্মচারী যাঁরা ক্রসওয়ার্ড তৈরি করতেন, তাঁরা দেশে ফিরে গেলেন। মি. চামারবাগওয়ালা তাঁর ব্যবসা বাঙ্গালোরে সরিয়ে নিয়ে সদর্পে ক্রসওয়ার্ড চালাতে লাগলেন। বম্বের বাইরে তখনও এমন কোনও নিয়ম ছিল না যা ক্রসওয়ার্ড প্রতিযোগিতাকে বন্ধ করতে পারে।

আমেদাবাদের দুই কাগজের মালিক প্রথম ক্রসওয়ার্ড চালু করেছিলেন গুজরাতি ভাষায়। ওঁরা বলতেন হরিফাই, কম্পিটিশন। তাঁরা তড়িঘড়ি তাঁদের ক্রিয়াকলাপ ইন্দোরে স্থানান্তর করে কিছুকাল চালিয়েছিলেন। রমনভাইয়ের কাল হল সেই ক্রিয়াকলাপ। চিমনভাই কোনও ক্রমে গা বাঁচালেন।

কিছুকাল পরে সবক'টি ক্রসওয়ার্ডই বন্ধ হয়ে গিয়েছিল।

টাইমস অব ইন্ডিয়ার আমেদাবাদ সংস্করণকে সাদরে গ্রহণ করেছিলেন গুজরাতবাসীরা। গুজরাতের প্রথম ইংরেজি দৈনিক, বিক্রয় সংখ্যা শুরু থেকেই আমাদের মনোমতো হয়েছিল। ঠিক মনে নেই, টাইমস প্রকাশের

কয়েক মাসের মধ্যেই ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেসেরও আমেদাবাদ সংস্করণ প্রকাশিত হয়েছিল। স্থানীয় সেই যুবক সাংবাদিক, যার কথা আগে বলেছি, তার উদ্যোগে ইংরেজি কাগজ ওয়েস্টার্ন টাইমসও শুরু হল আমেদাবাদ শহর থেকে। কিন্তু ততদিনে টাইমস অফ ইন্ডিয়া অনেক এগিয়ে গিয়েছে।

টাইমস অফ ইন্ডিয়ার বম্বে থেকে প্রকাশিত একটি পত্রিকা পাঠকের প্রভূত সমাদর পেয়েছিল। পত্রিকাটির নাম ফিল্মফেয়ার, পাক্ষিক। ফিল্মফেয়ারের আরম্ভ হয় আমি বম্বেতে পৌঁছবার আগে। তখন একটিমাত্র নাম করবার মতো ফিল্ম সংক্রান্ত পত্রিকা ছিল বম্বেতে, ফিল্মইন্ডিয়া। সেটি মাসিকপত্র। আর্টপেপারে ছাপা, তাই দাম বেশি। ফিল্মফেয়ারের দাম ছিল ছ' আনা, ফিল্মইন্ডিয়ার এক টাকা। তার কারণ ফিল্মফেয়ার ছাপা হত সস্তার কাগজ নিউজপ্রিন্টে, আর ফিল্মইন্ডিয়া মূল্যবান আর্টপেপারে। তা ছাড়া, টাইমস অফ ইন্ডিয়ার মতো বড় গোষ্ঠীর কাগজ, ফটোগ্রাভিওর পদ্ধতির দৌলতে তার ছাপাও ভাল ছিল।

অল্পকালের মধ্যেই ফিল্মইন্ডিয়া তার সিংহাসন চ্যুত হল। ফিল্মইন্ডিয়ার প্রতিষ্ঠাতা সম্পাদক এবং মালিক ছিলেন বাবুরাও প্যাটেল। পাঠকের প্রশ্নের তীব্র, রসালো উত্তর ছাপতেন বাবুরাও প্যাটেল। পাঠক তাঁর মন্তব্য মন দিয়ে পড়ত, আনন্দ পেত। আমিও বাবুরাওয়ের উত্তর পড়ে অবাক হয়েছি। এমন বোকা বোকা প্রশ্ন পাঠক কেন করেন, আর এমন ব্যঙ্গাত্মক উত্তর বাবুরাও কেমন করে উদ্ভাবন করেন, ভেবে কূল পাইনি। তখন জানি না প্রশ্ন এবং উত্তর দুই-ই অফিসের টেবিলে বসে সম্পাদক বা তাঁর অনুচরেরা তৈরি করেন। যেমন, ছোটবেলায় ভেবেছি সম্পাদক কেমন করে কাগজের সব পাতা নিটোল করে তৈরি করেন। ছাপার অক্ষরে কেমন করে পূর্ণ করেন প্রথম থেকে শেষ লাইন পর্যন্ত। সব ক'টি পাতাই সম্পূর্ণ, কোথাও খালি জায়গা থাকে না, কিছু বাড়তি হয় না। প্রথম খবরের কাগজে কাজ করতে এসে এই রহস্যের সহজ উত্তর দেখে অবাক হয়েছিলাম। প্রত্যেক পাতার জন্য প্রয়োজনেরও কিছু বেশি আয়োজন রাখতে হয়। তারপর বাড়তি কিছু অংশ বাদ দিলেই তো কাগজটা শেষ লাইন পর্যন্ত অক্ষরে পূর্ণ হয়।

বাবুরাও প্যাটেল আমাদের সাফল্যে বিচলিত হয়ে আমাদের বিরুদ্ধে যথেচ্ছ লিখতে থাকলেন। আমরা তাঁকে সম্পূর্ণ অগ্রাহ্য করলাম। বাবুরাওয়ের পক্ষে কাগজের দাম কমানো সম্ভব নয়। মুদ্রণের যে অস্ত্র আমাদের আয়ত্তে,

সেই অস্ত্রে তাঁর অধিকার নেই। ফটোগ্রাভিওর মুদ্রণযন্ত্র সারা ভারতবর্ষে শুধুমাত্র টাইমস গোষ্ঠীরই আছে। পরে অবশ্য এক উদ্যোগী বাঙালি কলকাতায় একটি ফটোগ্রাভিওর মুদ্রণযন্ত্র স্থাপন করে, ওরিয়েন্ট নাম দিয়ে একটি ইংরেজি সাপ্তাহিক প্রকাশ করেছিলেন। তাঁর কথা আগে বলেছি। ওরিয়েন্ট দামে কম ছিল, কিন্তু তাঁর কোম্পানির সাধ্য ছিল না আমাদের বৃহৎ প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেন। ওরিয়েন্ট অল্পদিনই চলেছিল। প্রযুক্তির জয় দেখে তখন বিস্মিত হয়েছি।

মার্শাল ম্যাকলুহানের চমকে-দেওয়া বাণী 'মিডিয়া ইজ দি মেসেজ' তখন পড়েছিলাম। তাৎপর্য বুঝতে অনেক সময় লাগল। ম্যাকলুহানের বক্তব্য ছিল, মাধ্যমই বক্তব্যের চরিত্র নির্ধারণ করবে। মাধ্যমের প্রভাব বেশি হবে বক্তার চেয়ে। টেলিভিশনের প্রবর্তন এখন আমাদের শিখিয়ে দিয়েছে, ছবি দিয়ে যতটুকু বলা যায় বা দেখা যায় তার উপযোগী করতে হবে আমার বক্তব্যকে। মাধ্যম অনুগত বাহক নয়। মাধ্যম শুধু প্রধান নয়, বরং মাধ্যমের ব্যবহারকারীকে সেই মাধ্যমের সঙ্গে পা মিলিয়ে চলতে হবে।

কয়েক বছরের মধ্যেই 'ফিল্মইন্ডিয়া' অচল হয়ে গিয়েছিল। বাবুরাও প্যাটেল 'মাদার ইন্ডিয়া' নাম দিয়ে একটি রাজনৈতিক সামাজিক আলোচনার কাগজ করেছিলেন। তাঁর তীব্র লেখনী সেই কাগজটাকেও বেশিদিন চালাতে পারল না।

বাবুরাওয়ের সঙ্গে তখন আমার পরিচয় ছিল না। প্রকাশনের ক্ষেত্রে আমরা প্রতিদ্বন্দ্বী, পরিচয়ের আগ্রহও ছিল না। কয়েক বছর পরে বাবুরাওয়ের সঙ্গে আলাপ হল। সে-পরিচয় অল্পদিনের মধ্যে বন্ধুত্বে পরিণত হয়েছিল। আমার সঙ্গে তাঁর বয়সের অনেক তফাত ছিল। সে কাহিনী পরে সুযোগ হলে বলব।

কত অভাবিত ঘটনাই মানুষের জীবনে ঘটে। আমি তখন ভাবতেই পারিনি, কোনওদিন আমাকে টাইমস অফ ইন্ডিয়া ছাড়তে হবে। নেপথ্যে আমার অগোচরে তার প্রস্তুতিও শুরু হয়ে গিয়েছে তখন।

মুদ্রণ সৌকর্যে এবং বিষয়ের গুণে ফিল্মফেয়ারের বিক্রয়ের সংখ্যা দ্রুত বাড়তে লাগল। বাবুরাওয়ের দ্বারা সন্ত্রস্ত এবং উৎপীড়িত অনেক তারকার সঙ্গে আমাদের সুসম্পর্ক গড়ে উঠল। যতদূর সম্ভব নৈর্ব্যক্তিক সমালোচনা মানুষের মনে আমাদের সম্বন্ধে ভাল ধারণা সৃষ্টি করেছিল। অনেক তারকার সঙ্গে আলাপ হওয়া স্বাভাবিক ছিল। পূর্বে তাদের সঙ্গে সাক্ষাৎ বা পরিচয় হয়নি এমন নয় কিন্তু এখন আমি ফিল্মফেয়ারের সঙ্গে যুক্ত। তাই আমার মূল্য তাদের কাছে বেড়ে গিয়েছিল। দেখা হলে বন্ধুত্বপূর্ণ আলোচনা হত। তবে এঁদের প্রায় সকলেরই একমুখী মন। উন্নতির সোপানে এবং দ্রুত জনপ্রিয়তার খ্যাতিতে আরোহণ।

রাজকাপুরের সঙ্গে বোধহয় সদ্ভাব বেশি ছিল। কিছুটা বাংলা বলতে পারতেন। কলকাতায় বাল্যকাল কেটেছে। দেখা বলেই উদ্ভাসিত মুখে বলবেন, 'কী রায়মশাই কেমন আছেন।' অথচ, আশ্চর্য, সেই রাজকাপুরের সঙ্গেই আমাদের প্রথম সংঘাত বাধল।

তারকারা সহজেই বিরক্ত হন। নিজের প্রশংসা ছাড়া আর কিছু শুনতে চান না। প্রতিদ্বন্দ্বীর প্রশংসা শুনলে বিরক্ত হন। ফিল্মফেয়ারে রাজকাপুরের সমালোচনায় কোনও বিরূপ মন্তব্য করা হয়েছিল। তার সঙ্গে আমার কোনও সম্পর্ক ছিল না। আমি প্রতিবেদক নই, সম্পাদক নই, প্রকাশক মাত্র। তাঁর বিরূপ সমালোচনা আমি পড়িওনি। রাজকাপুর একদিন আমাকে টেলিফোনে তিক্ত কণ্ঠে কিছু কটু কথা বললেন। সেই কথা সম্পাদককে বলায় তিনি অত্যন্ত বিরক্ত হলেন এবং পরের সংখ্যায় রাজকাপুর সম্পর্কে আরও বিরূপ কথা

লেখা হল। বলাবাহুল্য, রাজকাপুর আরও বিরক্ত হলেন। একদিন তাঁর ছবি তোলবার সেটে আমাদের প্রতিবেদককে প্রকাশ্যে তিরস্কার করেছিলেন। প্রতিবেদক আমাদের বললেন তাঁকে বলা হয়েছে যে, রাজকাপুরের সেটে ফিল্মফেয়ারের কোনও প্রতিনিধি যেন পদার্পণ না করেন।

স্থির হল ফিল্মফেয়ার তাঁর কোনও সেটে উপস্থিত থাকবে না এবং তাঁর কোনও অনুষ্ঠানে যোগ দেবে না।

নিজেদের মধ্যে আলোচনা করেই স্থির হয়েছিল আমরাও রাজকাপুরের কোনও খবর ছাপব না। তাঁর প্রদর্শিত বা আসন্ন কোনও ছবির আলোচনা ফিল্মফেয়ারে ছাপা হবে না। রাজকাপুরের ছবিও ফিল্মফেয়ারে ছাপা হবে না।

ভাবা হয়েছিল ফিল্মফেয়ারে প্রচার না পেলে রাজকাপুর সন্তপ্ত হয়ে আমাদের সঙ্গে কলহ মিটিয়ে নেবেন। প্রায় বছরখানেক এই অবস্থা চলল। পাঠকেরা জিজ্ঞাসা করতে আরম্ভ করলেন আমরা কেন রাজকাপুরের ছবির বিষয়ে লিখি না অথবা তাঁর ছবি কেন ছাপি না।

রাজকাপুর তখন জনপ্রিয়তার শীর্ষে। অসাধারণ মেধা-সমৃদ্ধ অভিনেতা, বলিষ্ঠ পরিচালক। তবু আমাদের বিশ্বাস ছিল আমাদের অবহেলায় দুঃখিত হয়ে তিনি আমাদের কাছে ফিরে আসবেন। শেষে কীভাবে যেন একদিন মীমাংসা হয়ে গেল। আমি তাঁকে টেলিফোনে বললাম তাঁর বিরুদ্ধে কিছু লেখা আমাদের স্বভাবগত নয়। অনিচ্ছায় এমন কিছু ছাপা হয়েও যেতে পারে যা তাঁকে আঘাত করবে। তিনি এ-কথা আমায় কেন বলেননি। কেন তিনি অকারণে রুদ্র মূর্তি ধারণ করলেন।

রাজকাপুরের মতো চটুল এবং করুণ ভূমিকায় অভিনয় করবার ক্ষমতা আর কারওর ছিল বলে মনে করি না। অবশ্য বরাবর মনে হয়েছে তিনি চটুলতার কিছু বাড়াবাড়ি করেন।

এরপর তাঁর বাড়িতে কয়েকবার নিমন্ত্রণে গিয়েছি। তিনিও আমার বাড়িতে এসেছেন। কিছুদিনের কলহ নিঃশেষে মুছে গিয়েছিল।

অনেক পরের ঘটনা। তবু এখানে বলে রাখি। আমার মনে হত রাজকাপুর সব কাজই অভিনয়ের মুদ্রায় করতেন। কথোপকথন নাটকীয় সুরে হত। তাঁর মেয়ের বিয়েতে নিমন্ত্রণ হয়েছিল। তাঁর মেয়ের সঙ্গে বিয়ে হল দিল্লির প্রখ্যাত শিল্পপতি এসকর্ট কোম্পানির মালিকের ছেলের। বম্বে দিল্লির অনেক শিল্পপতি

ব্যবসায়ী সেখানে উপস্থিত ছিলেন। মোরারজির মদ্য-নিরোধ আইনকে বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ দেখিয়ে পানীয়ের বন্যা বয়েছিল। চারপাশে স্থির ও চলচ্চিত্রের আধুনিক ক্যামেরার জটলা। ফ্ল্যাশ জ্বলছে ঘনঘন। ফটোগ্রাফাররা দৌড়োদোড়ি করছে। মস্ত বড় মণ্ডপে রাজকাপুর কন্যা সম্প্রদান করছেন। সম্প্রদানের সময় রাজকাপুরের দু' চোখে জলধারা বইতে লাগল। কখনও ফুঁপিয়ে, কখনও কান্নার রোল তুলে তিনি তাঁর দুঃখ বোধহয় আমাদের মধ্যেও সঞ্চারিত করেছিলেন। মেয়ে পতিগৃহে চলে যাচ্ছে, পিতার আকুলতা, বিচ্ছেদের সদ্য সম্ভাবনায় পিতৃ-হৃদয় ব্যথিত হবে। এটাই তো স্বাভাবিক। কিন্তু আমার মনে হল যেন কোনও সিনেমার পর্দায় বিচ্ছেদের নাটক দেখছি। অলীক বস্তুকে বাস্তবের রূপ দেওয়ার ক্ষমতা কুশীলবের অভিনয়ের দক্ষতার উপর নির্ভর। রাজকাপুরের সেই ক্ষমতা ছিল, সবাই জানে। তাঁর কন্যা-সম্প্রদান অন্য কোনও স্তরে উঠে গিয়েছিল।

আরও দু'জন মহানায়কের সঙ্গে আমার সদ্ভাব হয়েছিল। একজন দিলীপকুমার। শোনা যেত দিলীপকুমারের লেখাপড়া-করা পরিশীলিত মন। তখনও তাঁর যে ক'টি ছবি দেখেছি, আতিশয্য ছিল না। ঘটনাকে সহজভাবে ফুটিয়ে তোলার তাঁর আশ্চর্য ক্ষমতা ছিল। কথা বলতেন ধীরে ধীরে গম্ভীর গলায়। অতিথি আপ্যায়নে তৎপর। সবাই হয়তো হাসির ফোয়ারা ছুটিয়েছেন। কিন্তু একটা প্রচ্ছন্ন গাম্ভীর্য তাঁকে সবসময় আলোকিত করত। তাঁর বাড়িতেও কয়েকবার গিয়েছি। নিমন্ত্রণ রক্ষার জন্য। দিলীপকুমারের বিবাহের দিনে উপস্থিত ছিলাম। দিলীপকুমারের বিবাহ হল সায়রা বানুর সঙ্গে। সেকালের ডাকসাইটে সুন্দরী। তাঁর অভিনয় ক্ষমতা তত বেশি ছিল না, অথবা দিলীপকুমারের সঙ্গে বিবাহ চিত্রজগতে তাঁর উন্নতির অন্তরায় হয়েছিল। মনে আছে, বিবাহের দিনে মুসলিম বিবাহপ্রথা দেখেছিলাম। অনুষ্ঠানে ধার্মিক নিয়ম পালনের কোনও ত্রুটি ছিল না। দিলীপকুমার যে আসলে ইউসুফ খান এবং তিনি মুসলিম সে-তথ্য জানা ছিল। কিন্তু তাঁর বিবাহের প্রক্রিয়ার পূর্বে কখনও অনুভব করিনি।

দিলীপকুমার থাকতেন পালি হিলস অঞ্চলে। তখন খার, পালি হিল অঞ্চলে অনেক চিত্রতারকা থাকতেন। তাঁরা অনেকেই দিলীপকুমারের বিবাহসভায় এবং পরে ভোজনসভায় উপস্থিত ছিলেন। পালি হিল খানিকটা উঁচু টিলার ওপরে বলা যেতে পারে। ঠিক পাহাড় নয় কিন্তু রাস্তা উঁচু-নিচু।

বরবেশে দিলীপকুমারের ঘোড়ায় চড়ার দৃশ্যটা মনে থাকবে। উঁচু-নিচু রাস্তা বলে তাঁর অশ্বারোহণে কিছুটা অসুবিধা হচ্ছিল। আমার মনে পড়ল তাঁর কোনও একটা ছবিতে দ্রুত ধাবমান অশ্বপৃষ্ঠে তাঁকে দেখেছি। তারকাদের জীবন বোধহয় এমনই। বাস্তব আর অলীক মেশানো।

রাজকাপুরের সঙ্গে যে কলহের কথা বলেছি তেমনই ঘটনা ঘটেছিল বৈজয়ন্তীমালার সঙ্গে। নৃত্যপটিয়সী, অভিনয়ে অনন্যা বৈজয়ন্তীমালা তখন বোধহয় খ্যাতির চূড়ায়। বৈজয়ন্তী চেম্বুর বা তার আশপাশে কোথাও থাকতেন। নিকটেই থাকতেন চিকিৎসক ডা. বালী। স্ত্রী পুত্র কন্যা নিয়ে ডা. বালীর সংসার। প্রেমের কুহকে পড়ে ডা. বালী তাঁর স্ত্রী পরিজন বর্জন করে বৈজয়ন্তীমালাকে বিবাহ করেছিলেন। তারপর প্রণয়ীযুগলের সংসার উঠে এল মালাবার হিলসে, আমার বাসস্থানের কাছাকাছি। তাঁর সম্বন্ধে ফিল্মফেয়ারে কিছু বিরূপ মন্তব্য ছাপা হওয়াতে ডা. বালী ক্ষিপ্ত হলেন। ক্ষিপ্ত হয়ে তিনি আমাদের অফিসে ধমকধামক দিয়েছিলেন।

ফিল্মফেয়ারও ঠিক করেছিল বৈজয়ন্তীমালাকে বর্জন করা হবে। দেখা যাক দাপট কার বেশি। জনগণ-চিত্তহারিণী-নায়িকা বৈজয়ন্তীমালার, না, প্রতিষ্ঠিত ফিল্মপত্রিকা ফিল্মফেয়ারের। তার পাঠক সংখ্যাও কম নয়। সম্পাদক প্রস্তাব করেছিলেন রাজকাপুরের মতো বৈজয়ন্তীমালাকে বর্জন করা হোক। প্রকাশক সংস্থার সে-প্রস্তাবে সম্মত হওয়া সম্ভব হল না। এই সব তুচ্ছ কারণে কাজিয়া করা অভিজাত পত্রিকার শোভা পায় না। লাভেরও অন্তরায় হয়। অতএব এক অপরাহ্ণে ডা. বালীর সঙ্গে দীর্ঘ আলোচনা করে কলহ মিটিয়ে ফেলা হয়। আমি তাঁর গৃহে প্রস্তুত সদ্যভাজা দোসায় আপ্যায়িত হলাম। বৈজয়ন্তীমালাও তারপর আমার বাড়ি এসেছেন। কিন্তু কাছাকাছি থাকা সত্ত্বেও তেমন ঘনিষ্ঠতা হয়নি।

প্রধানত, তারকাদের সঙ্গে সময় মিলিয়ে বন্ধুত্ব রক্ষা সম্ভব হয় না। দ্বিতীয়ত, স্বাস্থ্যরক্ষা স্থির-সৌন্দর্যের প্রথম সোপান বলে নায়িকাদের আহারের নানা বিধিনিষেধ মানতে হয় এবং স্বাস্থ্যচর্চা করতে হয়। সে সময় তারকারা বিশেষ তন্বী ছিলেন না। দক্ষিণ দেশ থেকে আগতা নায়িকারা আদৌ মেদহীনতার পূজারিণী ছিলেন না।

ব্যক্তি হিসেবে আমার সব থেকে ভাল লেগেছিল দেবানন্দকে। মনে হয় তাঁর ব্যবহারে কোথাও কোনও নটসুলভ ছাপ থাকত না। তাঁর সঙ্গে

অনেকবার দেখা হয়েছিল। বাড়িতে যাতায়াত ছিল। জুহুর সমুদ্রতটে উত্তরের শেষ সীমায় তাঁর বাংলো। সেখানে চোখ ঝলসে দেওয়া আয়োজন করে অতিথিদের আপ্যায়ন হত। মদিরা ও ভোজ্যের প্রাচুর্য অতিথিদের বাক্যহারা করে রাখত। বয়স বাড়তে থাকলেও দেবানন্দের চেহারার বিশেষ পরিবর্তন হয়নি। তিনি বিয়ে করেছিলেন আর এক অভিনেত্রী কল্পনা কার্তিককে। আমি কখনও তাঁকে দেখিনি অথবা দেখে থাকলেও শনাক্ত করতে পারিনি। দেবানন্দের বাড়িতে নিমন্ত্রণ বরাবব আকাঙ্ক্ষিত ছিল।

বম্বের ফিল্মজগতের অভিনেতা অভিনেত্রীদের মধ্যে নার্গিস স্বমহিমায় স্বতন্ত্র ছিলেন। কোনও সামাজিক অনুষ্ঠানে তাঁর সঙ্গে পরিচয় হয়নি। সব জায়গায় সম্ভবত আসতেন না। এলে দূর থেকে শ্বেতাম্বর-পরিহিতা এই মহিলাটির আভিজাত্য সহজেই দৃষ্টি আকর্ষণ করত। কাথিড্রাল স্কুলে অভিভাবক সমিতির সদস্য ছিলেন তিনি। আজকের যে যুবকটি, সঞ্জয় দত্ত, নানা হাঙ্গামায় জড়িয়ে পড়েছে, তখন সে ক্যাথিড্রাল স্কুলের ছাত্র। আমার মেয়েও ওই স্কুলে পড়ত। সে কারণে আমিও অভিভাবক কমিটির সদস্য। তিন-চার মাস অন্তর আমাদের মিটিং হত। আমি ও নার্গিস সেখানে গিয়েছি। সমিতির কথাবার্তা ছাড়াও নিজেদের মধ্যে বাক্যালাপ হত। সংযত, প্রায় উচ্ছ্বাসহীন তাঁর বক্তব্য আর কয়েকজন সদস্যদের মতো আমাকেও আকর্ষণ করত। নার্গিসের উপস্থিতি কিছুটা আড়ষ্ট করে রাখত অন্যান্য সদস্যদের। তাঁর কথাবার্তায় চালচলনে কৌলীন্য আমাদের সবাইকে মুগ্ধ করেছিল।

ফিল্মফেয়ারের একটা বাৎসরিক অনুষ্ঠানে আগের বছরের জনপ্রিয় হিন্দি ছবির নানা বিভাগেব জন্য পুরস্কার দেওয়া হত। আলো ঝলমল বৃহৎ প্রেক্ষাগৃহ তারকাদের উপস্থিতিতে আরও উজ্জ্বল হয়ে উঠত। এই পুরস্কার দেওয়া হত পাঠকসাধারণের ভোট নিয়ে। পাঠকদের মতামতের বিচারের জন্য একটা কমিটি তৈরি করা হয়েছিল। পাঠকরা অনেক সময় আবেগে তাড়িত হয়ে ছবির গুণ অপেক্ষা জনপ্রিয়তাকে প্রাধান্য দিত। সেটা যাতে না হয় তার জন্য এই কমিটি।

কমিটিতে একজন হাইকোর্টের বিচারপতি, কোনও বড় শিল্পপতি, নামী কোনও পরিচালক (যাঁর ছবি প্রতিযোগিতায় নেই) এবং পদাধিকার-বলে আমিও থাকতাম।

হিন্দি ছবিতে আমার মন নেই। এই কমিটিতে আমার থাকার ইচ্ছাও নেই। কিন্তু যেহেতু পুরস্কার দেওয়া হয় ফিল্মফেয়ারের পক্ষে এবং যেহেতু আমি তার প্রধান, তাই আমাকে কমিটিতে থাকতেই হয়।

কোনও মিনি সিনেমা কক্ষে বিচারকেরা, অফিসের কয়েকজন লোক এবং কিছু নিমন্ত্রিত বন্ধুবান্ধব পাঠক-নির্বাচিত ছবিগুলি দেখতেন। এই কমিটির বিচারই চূড়ান্ত।

বম্বের ঘর্মাক্ত এক দ্বিপ্রহরে আরামদায়ক শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত ক্ষুদ্র হলে বসে ছবি দেখা হচ্ছে। ছবিতে আমার আদৌ মন নেই। তার ওপর বাইরের গরম থেকে এসে এখানে আরামের প্রাচুর্যে ঘুম এসে গিয়েছিল। বহু কষ্টে চোখ খোলা রাখতে পারছিলাম। এক সময় ঘুম এসেই গেল। ঘুমোলে আমার নাসিকা ডেকে ওঠে। সেদিনও তাই হল। হঠাৎ অনপেক্ষিত নাসিকা গর্জনে সবাই চকিত। আমার ঘুমের চটকা তখনই ভেঙে গিয়েছিল। কিন্তু আমার লজ্জার সীমা থাকল না। আমার স্ত্রী সেদিন ওই সিনেমা কক্ষে উপস্থিত ছিলেন। তাঁর লজ্জা আরও বেশি। সবাই চমকে উঠে যখন অবাঞ্ছিত শব্দের উৎস খুঁজছেন তখন তিনি নির্ভুল বুঝে গিয়েছিলেন এই আওয়াজ কোথা থেকে আসছে।

ফিল্মফেয়ারের পুরস্কার বিতরণ উৎসবে আমার অজ্ঞতার পরিচয় স্পষ্ট হয়ে গিয়েছিল।

বম্বের বিশাল সম্মুঘম প্রেক্ষাগৃহে অনুষ্ঠান হচ্ছে। আলো দিয়ে সুন্দর করে সাজানো। বিশাল একটি জনতা অভিনেতা অভিনেত্রীদের দেখবার জন্য জড়ো হয়েছে। পুলিশের সাহায্যে তাদের ঠেকিয়ে রাখা হচ্ছে।

ফিল্মফেয়ারের সম্পাদক এবং কোম্পানির চেয়ারম্যানকে নিয়ে আমি অতিথিদের স্বাগত জানাচ্ছি। এক একজন চিত্রতারকা আসছেন, জনতা উদ্বেল হয়ে উঠছে। পুলিশ সন্ত্রস্ত। আমি একটু এগিয়ে গিয়ে তারকাদের অভ্যর্থনা করছি। তারপর তাঁদের নির্দিষ্ট আসনে নিয়ে যাবার জন্য কোনও সহকর্মীকে সোপর্দ করে দিচ্ছি। একজন অলংকারে উদ্ভাসিত তারকা এলেন। আমি তাঁকে সংবর্ধনা করলাম। সহকর্মীদের কেউ তাঁকে নির্দিষ্ট আসনে বসাবে এমন কাউকে দেখতে পেলাম না। নিরুপায় আমি তাঁকে সঙ্গে নিয়ে প্রেক্ষাগৃহে প্রবেশ করলাম। তাঁর আসন কোথায় হয়েছে আমি জানি। খুঁজে পেতে বিন্দুমাত্র অসুবিধা হল না। এই আসন ঠিক করা নিয়েও অনেক

মান-অভিমানের সম্মুখীন হয়েছি। একেবারে সামনের সারিতে না হয়ে কেন তাঁকে দ্বিতীয় সারিতে দেওয়া হল এই নিয়ে গঞ্জনা শুনেছি। কেন কারও আসন ধারের দিকে হল, কেন সভার কেন্দ্রে হল না এই ভেবে কেউ কেউ ক্ষুণ্ণ হতেন, বিশেষ করে তাঁর প্রতিদ্বন্দ্বী কাউকে তাঁর থেকে ভাল আসনে যদি বসানো হয়ে থাকে।

যাই হোক সেই সন্ধ্যায় অতিথিকে সঙ্গে নিয়ে আমি তাঁর আসন দেখিয়ে দিলাম। আসনে অতিথির নাম লেখা আছে। তাঁর বুঝতে অসুবিধা হবে না। সালংকারা দ্যুতিময়ী অতিথি আসনে বসতে গিয়ে ছিটকে বেরিয়ে এলেন। রুষ্ট কণ্ঠে বললেন আমি কি দুর্গা খোটে? আপনি ভেবেছেন কী। আমি শোভনা সমর্থ। এক কালের সফল অভিনেত্রী শোভনার মেয়ে নূতন পরে অনেক নাম ডাক করেছিল। দুর্গা খোটে মহিয়সী বর্ষীয়সী রমণীর ভূমিকায় অনবদ্য ছিলেন। আমার দুর্ভাগ্য আমি শোভনা আর দুর্গা খোটেকে আলাদা করতে পারিনি। কোনও দুঃখ প্রকাশ যথেষ্ট নয়। এমন ভুল আমার আরও হয়েছে।

বম্বে ছাড়বার পরই চিত্রতারকাদের সঙ্গে সংযোগ ছিন্ন হয়ে গিয়েছিল। এখন স্মৃতি থেকেও প্রায় মুছে গিয়েছে। কিন্তু ঠিক ফিল্ম জগতের নয়, একদা ফিল্ম জগতের সঙ্গে জড়িত ছিলেন এবং পরেও তাঁর যোগ ছিল প্রযোজনা করার ব্যাপারে এমন একজন মানুষের কথা মনে পড়ে।

দেখলে আদৌ মনে হবে না, ছোটখাটো চেহারা, কিঞ্চিৎ দ্রুত কথা বলেন, তিনি চেনেন না এমন গুরুত্বপূর্ণ মানুষ তাঁর সময়ে বম্বেতে ছিল না। তাঁকে চেনে না বম্বেবাসী এমন বাঙালির সংখ্যা অল্প।

তাঁর নাম হীতেন চৌধুরী। তাঁর দুই ভাই জনমানসে স্থান পেয়েছিলেন। একজন শঙ্খ চৌধুরী—ভাস্কর। অন্যজন শচীন চৌধুরী, অর্থনীতিবিদ এবং ইকনমিকস অ্যান্ড পলিটিক্যাল উইকলির সম্পাদক। লেখাপড়া করেন, সমাজতত্ত্ব এবং অর্থনীতির খোঁজখবর রাখেন এমন মানুষেরা অনেকে শচীন চৌধুরীর ভক্ত ছিলেন। বিশ্বাসে বামপন্থী, যদিও কোনও দলের সদস্য নন, অনেকে তাঁর মতামত স্বীকার করত না কিন্তু কারও সাধ্য ছিল না তাঁকে অগ্রাহ্য করে।

বম্বেতে পদার্পণের দিন থেকে তাঁর নাম শুনেছি। তাঁর বাড়িতে বুদ্ধিজীবীদের জটলা হয়, পরের পর চা চলতে থাকে। সেখানে আমার পরিচিত অনেকেরই যাতায়াত—এ-সব শুনেও তাঁর সঙ্গে পরিচয় করবার আমার বিশেষ আগ্রহ ছিল না।

একদিন তাঁর সঙ্গে পরিচয় হয়ে গেল। টাইমসের সহকারী সম্পাদক ছিলেন ডি কে শারদা। তাঁর বাড়িতে এক নৈশভোজের নিমন্ত্রণে শচীন চৌধুরীর সঙ্গে দেখা হল। দেখলাম অহমিকা-বর্জিত একটি মানুষ, তাঁর নিজের বক্তব্য বলতে দ্বিধা করেন না, খুঁচিয়ে না দিলে অর্থনীতির সম্বন্ধে কথা বলেন না। পাণ্ডিত্যের অভিমান নেই। অ-পণ্ডিতকে অগ্রাহ্য করা তাঁর স্বভাব নয়। মানুষটাকে আমার প্রথম পরিচয়ে ভাল লেগেছিল। আক্ষেপ হল কেন পূর্বে পরিচয় করিনি।

শারদার স্ত্রী ভোজনের উত্তম ব্যবস্থা করেছিলেন। তাঁর পাকশাস্ত্রে অধিকার ছিল। বিশেষভাবে প্রস্তুত বিরিয়ানির একটি রূপ শচীন চৌধুরিকে এবং আমাকেও আনন্দ দিয়েছিল। শচীন চৌধুরী হালকাভাবে বিরিয়ানির ইতিহাস বললেন।

তারপর থেকে আমাদের বাড়িতে কোনও অনুষ্ঠান হলে তাঁকে নিমন্ত্রণ করতাম। তিনি আসতে দ্বিধা করেননি, যদিও দেখেছি বেশি ভিড় তাঁর পছন্দের নয়। খেতে ভালবাসতেন, একদিন বললেন, ফিলিপিন্সে তিনি পান দেখেছেন। নানা দেশের নানা গল্প করতেন। অর্থনীতির ভার তাঁর গল্পকে রসহীন করত না।

তাঁর ছোট ভাই হীতেন চৌধুরী। হীতেনবাবু কী করতেন বা কী কী করতেন আমার জানা ছিল না। শচীন চৌধুরীর মৃত্যুর পর জানতে পেরেছিলাম ইকনমিক এবং পলিটিক্যাল উইকলির প্রতিষ্ঠা এবং পরিচালনায় তাঁর বড় ভূমিকা ছিল। শচীন চৌধুরীর মৃত্যুর পর তিনি কিছু অর্থ সংগ্রহ করে উইকলির ভার একটি ট্রাস্টের ওপর ন্যস্ত করে দিয়েছিলেন যাতে ভবিষ্যতে কাগজটার কোনও ক্ষতি না হয়।

হীতেনবাবুর সঙ্গে ফিল্ম জগতের সবার পরিচয়। বম্বে যাবার আগেই আমি তাঁর নাম শুনেছিলাম। তিনি সেকালের একটি বিখ্যাত ছবি প্রযোজনা করেছিলেন, নৌকাডুবি। ছবিটির বিশেষত্ব ছাড়াও, আমাদের আশ্চর্য করেছিলেন দুই আই সি এসের স্ত্রী। সম্ভবত তাঁদের প্রথম অভিনয়। মীরা সরকার এবং মীরা মিশ্র। কে বলবে ওই তাঁদের প্রথম ছবি, এত ভাল তাঁদের অভিনয়।

সুন্দরী রমণীদের আকর্ষণ করার সহজাত কোনও ক্ষমতা ছিল হীতেনবাবুর। বিভিন্ন সময়ে তাঁর রোমান্সের গল্প শুনেছি। সবাই জানেন রোমান্সের পরিণতি হবে বিবাহে, কিন্তু কোনও অজ্ঞাত কারণে সেখানে পর্যন্ত

পৌঁছননি। তাঁর একদা প্রণয়িণীদের সঙ্গে আমার সামান্য জানাশুনা ছিল। তাঁদের সঙ্গে হীতেনবাবুর বন্ধুত্বও অটুট ছিল, সেটা বোঝা যেত তাঁর বাড়ির কোনও বড় নৈশভোজে, সেখানে তাঁদেরও দেখা যেত।

পালি হিলসের মস্ত বড় একটা বাংলোয় দোতলায় তিনি একলা থাকতেন। তখন গিয়েছি। তখন যখন তাঁর বিবাহ হল তারপরও অনেকবার। তাঁর কোনও পার্টিতে কোনও ফিল্মস্টার দেখিনি। পান ও আহারের প্রভূত আয়োজন স্বাভাবিক ছিল। নানা গল্পে মাতিয়ে রাখতেন। তাঁর বিবাহ হল অকস্মাৎ। প্রাক-বিবাহ প্রণয় আদৌ হয়েছিল কিনা, জানি না। তাঁর স্ত্রী কমলা সুন্দরী, বিদুষী, সুভাষিনী। হীতেনবাবুর মৃত্যুর পর কমলার সঙ্গে আর যোগাযোগ হয়নি।

চৌধুরীদের কাহিনী লিখতে গিয়ে আমার আর এক চৌধুরীকে মনে পড়ছে। তিনি আনন্দবাজার পত্রিকার বম্বে অফিসের ম্যানেজার ছিলেন। তাঁর নামও শচীন চৌধুরী।

কলকাতায় যখন আমি একটা ছোট ছাপাখানা নিয়ে প্রকাশক হবার স্বপ্ন দেখছি, বম্বে আসার অনেক আগে, তাঁর সঙ্গে আমার পরিচয় হয়েছিল। তিনিও স্বপ্ন দেখতেন। প্রথম জীবনে একটি বিজ্ঞাপন কোম্পানির অংশীদার হয়েছিলেন। তারপর বড় ছাপাখানা করবার উচ্চাশায় তিনি দুটো লাইনোটাইপ যন্ত্র কিনেছিলেন। নিজের মত এবং পথকে যুক্তি দিয়ে সমর্থন করতেন জোরের সঙ্গে। বলা বাহুল্য, অন্য লোকের মতামত বিশেষ গ্রাহ্য করতেন না। মানুষটি অনেক কথা বলেন, নিজের কাজে দক্ষ। বম্বে এসে তাঁর সঙ্গে বন্ধুত্বও হয়ে গেল। একবার নিজের খরচায় জাহাজে করে মাস দুয়েক ইউরোপ ঘুরে এলেন। কিউরিও, কোনও মূল্যবান যন্ত্রপাতি, ঘড়ি কিংবা ক্যামেরা নয়, ফিরলেন দু' ট্রাঙ্ক বোঝাই ট্যুরিস্ট কোম্পানির বহু কাগজপত্র নিয়ে। প্রচণ্ড উৎসাহের সঙ্গে লেগে পড়লেন কেমন করে এখানে ট্যুর কোম্পানি প্রতিষ্ঠা করা যায়।

ট্যুরিস্ট এজেন্সি হল না। তখন বম্বেতে ওনারশিপ আবাসনের চল হয়েছে। কলকাতায় সেই ব্যবসার পত্তন করবার জন্য উঠেপড়ে লেগেছিলেন। জমি কিনে একটা চারতলা বাড়িও করে ফেললেন। সেখানে কয়েকটি ফ্ল্যাট। কলকাতায় তখন এই ধারা অপরিচিত। ফ্ল্যাট বিক্রি করতে হিমসিম খেয়ে গিয়েছেন। অন্য সব স্বপ্ন আপাতত স্থগিত রইল।

বিমল রায় তখন ফিল্ম পরিচালক হিসাবে খ্যাতির চূড়ায়। গম্ভীর প্রকৃতির মানুষ, অল্প কথা বলেন। প্রতিভাধর পরিচালক বলে বোঝা যেত না। ফিল্মফেয়ারে পুরস্কার দেওয়ার রাত্রে আসতেন। অনুষ্ঠান শেষে চলে যেতেন। বিশেষ কারও নজরে পড়তেন না। যে-বার অনেকগুলি পুরস্কার পেলেন, বোধহয় 'দো বিঘা জমিনে'-এর জন্য, সে-বারও অনুষ্ঠান শেষে চুপচাপ চলে যাচ্ছিলেন। রিপোর্টাদের দল ছিল সেখানে, তাঁরা তাঁকে ধরে বসল। কিছু বলতেই হল তাঁকে। কী বলেছিলেন মনে নেই। তারপর কোথাও দেখা হলে কুশলপ্রশ্ন বিনিময় হত। কেমন করে যেন আমরা তাঁর পরিবারের ঘনিষ্ঠ হয়ে পড়লাম। নৈশভোজে নিমন্ত্রণ হলে খুশি হতাম। কারণ, তাঁর স্ত্রী নানা গুণে গুণবতী, তার মধ্যে অতিথি সৎকার অন্যতম। রান্নাবান্নায় পটিয়সী ছিলেন, তাঁদের পাচকও ভাল। ভোজন পরম উপভোগ্য হত। এই সময় কালব্যাধি বিমলবাবুকে আক্রমণ করল। চিকিৎসা ব্যবস্থার ক্রটি ছিল না। একবার চিকিৎসার জন্য লন্ডন গেলেন। বুঝি কিছু আশ্বাসের কথা শুনে ফিরেছিলেন। হয়তো সান্ত্বনাবাক্য মাত্র ছিল। তার অল্প কিছুদিনের মধ্যেই তাঁর মৃত্যু হয়।

মৃত্যুর কিছু আগে তাঁর বাড়িতে কালীপুজোর আয়োজন হয়েছিল। মধ্যরাত্রির পর পুজো হবে। হাওয়াতে শীতের আভাস। তাঁর সঙ্গে অনেক গল্প হল সে রাত্রে। অসুস্থ শরীর, তবু সারারাত্রি বসে থাকলেন। সব অতিথি চলে গেল। আমার স্ত্রী আর আমি যখন উঠলাম তখন পুব দিকে আলোর রেখা ফুটছে। শেষ আসন্ন বুঝতে পেরেছিলেন, আমিও তখন মানসিক অবসাদের শিকার। পরস্পরের দুঃখ বোধহয় দু'জনকেই ছুঁয়ে যাচ্ছিল। সারারাত্রের আকুল প্রার্থনা, সূর্যোদয়ে কোনও সান্ত্বনা নিয়ে এল না।

ফিল্মফেয়ারের মতো ফেমিনা-র, মেয়েদের কাগজ, একটি বাৎসরিক উৎসব হত। ভারত সুন্দরী নির্বাচন। ভারতবর্ষের চার-পাঁচটি শহর থেকে সুন্দরী শ্রেষ্ঠা নির্বাচন করে তাদের বম্বেতে আনা হত এবং সেখানে ভারত শ্রেষ্ঠা নির্বাচন হত। শুধু সুন্দরী নির্বাচন সামান্য কাজ। এই অনুষ্ঠানকে বড় করবার জন্য সঙ্গে একটা ফ্যাশানের মেলা হত। কয়েকজন মডেল এবং তাদের পরিধানের নানাবিধ পোশাক সঙ্গে নিয়ে ফিল্মফেয়ার কর্মীরা পাঁচ শহরে যেতেন। খুব ঘটা ছিল। একবার ফাইনালে ভারত সুন্দরী নির্বাচিত হলেন নায়ারা মির্জা। এবং বিশ্ব-সুন্দরী প্রতিযোগিতায় ভাগ নেবার জন্য তাকে

পাঠানো হল আমেরিকায়। সেখানে সে বিশেষ কোনও স্থান পায়নি। যে রাত্রে ভারতবর্ষে ফিরবে আমাদের সম্পাদক বললেন তাঁকে টাইমসের গেস্ট হাউসে রাখা হবে এবং অভ্যর্থনা করবার জন্য তিনি এয়ারপোর্টে যাবেন। রাত প্রায় তিনটে নাগাদ আমার টেলিফোন বেজে উঠল। ওপার থেকে নারীকণ্ঠ শুনলাম। আমি নায়ারা মির্জা, কিছুক্ষণ আগে বম্বে এয়ারপোর্টে পৌঁছেছি। আমাকে কেউ নিতে আসেনি। কোথায় যাব জানি না।

আমি তাঁকে বললাম, তুমি এয়ারপোর্টে অপেক্ষা করো। আমাদের গাড়ি যাবে তুমি তাতে চলে এসো। সে তোমাকে টাইমসের গেস্ট হাউসে পৌঁছে দেবে। অতঃপর ফোন করলাম সম্পাদকের বাড়িতে—কেউ টেলিফোন ধরল না। রাত তিনটে—কে টেলিফোন ধরতে চায়। এবারে অফিসে টেলিফোন করলাম। রাত্রে একদল প্রহরী অফিসে থাকে, তাদের প্রধানকে বললাম যে তুমি একটা গাড়ি নিয়ে আমার বাড়িতে চলে এসো। যদি বাড়িতে আসতে না বলতাম তা হলে সেই প্রহরী-প্রধান গাড়ি নিয়ে এয়ারপোর্ট যেত এবং ভারত সুন্দরীকে সেই গাড়ি চড়িয়ে গেস্ট হাউসে নিয়ে যেত। প্রহরীদের তদারকে যে গাড়িগুলি থাকে সেগুলি নিউজ প্রিন্ট বহনের ট্রাক। ফলে যা হতে পারত, ড্রাইভার এয়ারপোর্টে পৌঁছে বিশ্ব সুন্দরীকে ট্রাকে চড়িয়ে শহরে নিয়ে আসত। চব্বিশ ঘণ্টা বিমান যাত্রার পর শহরে পৌঁছে ড্রাইভারের সংবর্ধনা এবং ট্রাকে চড়ে শহরে আসা তার কেমন লাগত?

ভাগ্যক্রমে গাড়ি আমার বাড়িতে আনিয়েছিলাম ভাল করে বুঝিয়ে দেবার জন্য। ড্রাইভার আমার বাড়ি পৌঁছে নীচ থেকে টেলিফোন করল, হুজুর ট্রাক এনেছি। আমি তখনই বুঝলাম অসম্পূর্ণ নির্দেশে কত ভুল কাজ হতে পারে। তা ছাড়া এক শব্দ সকলেব কাছে সমার্থ বহন করে না। আমার কাছে গাড়ি মানে মোটরকার। কিন্তু যে গাড়ি চড়ে না তার কাছে গাড়ি মানে ট্রাক।

ফেমিনা-র উৎসব নিয়ে আরও একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা ঘটেছিল। কলকাতার সুন্দরী নির্বাচনের রাত্রে আমরা ক্রিস্টিন কোম্পানির মডেল আনবার ব্যবস্থা করেছিলাম। তাদের পরিকল্পিত পোশাক দেখাবার জন্য। মডেলরা পৌঁছে গেল। গ্র্যান্ড হোটেলে তাদের অধিষ্ঠান। সন্ধ্যায় বহু মান্য নিমন্ত্রিত ব্যক্তির সামনে তারা তাদের পোশাক পরিচ্ছদ অথবা তার অভাব দেখাবে। আমরা অতিথিবর্গ নিয়ে বসে আছি। তখনও মডেলদের পোশাক ব্যাঙ্কক থেকে এসে পৌঁছল না। সকলে নীরবে বসে থাকলেন। গ্র্যান্ড হোটেল কর্তৃপক্ষ

বল ড্যান্সের আয়োজন করেছিলেন। অতিথিরা জোড়ায় জোড়ায় মঞ্চে অবতীর্ণ হলেন। কয়েকজন সাহস করে এসে মডেলদের অনুরোধ করলেন তাদের সঙ্গে নাচবার জন্য। মডেলরা সবাইকে প্রত্যাখ্যান করলেন। আমি এক মডেলকে জিজ্ঞাসা করলাম আপনারা নাচের আসরে নামছেন না কেন। তিনি বললেন সভ্য সমাজে নিয়ম হল প্রথমে নিমন্ত্রণ-কর্তার সঙ্গে নাচতে নামা। আপনি যদি অনুরোধ করতেন আমরা অবশ্যই নাচে যোগ দিতাম। আমাকে এই প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করতে হয়েছিল কারণ কোনওপ্রকার নৃত্যে আমার পারদর্শিতা নেই। আমার চরিত্রে অনেক অভাবের মধ্যে এটা অন্যতম।

পুনে মহারাষ্ট্রের বিদ্বজ্জনের শহর। পেশোয়াদের সময় থেকেই পুনের এই খ্যাতি। বম্বে শহরের তখন বিশেষ নামডাক ছিল না। পেশোয়াদের বম্বে পছন্দ হয়নি। বিংশ শতাব্দীর শুরু থেকেই তাবৎ প্রথিতযশা মারাঠি—মহর্ষি কারভে, বাল গঙ্গাধর তিলক, গোখলে—এঁরা সবাই পুনেকে তাঁদের কর্মযজ্ঞের কেন্দ্র করেছিলেন। বিদ্যার কেন্দ্রও হয়ে দাঁড়িয়েছিল পুণে, যদিও অবিভক্ত বম্বে প্রদেশে বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপিত হয়েছিল বম্বেতে ১৮৫৭ সালে, পুণে বিশ্ববিদ্যালয়ের অনেক আগে।

বম্বেতে থাকার সময় পুনেয় খুব যাতায়াত ছিল। ছুটি কাটাবার একটা জায়গা, এত নিকট, এত সুন্দর সবসময় আকর্ষণ করত। বিশেষ করে বম্বে পুনের একশো কুড়ি মাইল পথটি। পুনে সমুদ্রতল থেকে প্রায় দু'হাজার ফুট উঁচুতে, অধিত্যকায়। বম্বে শহরের সীমানা ছাড়ালে সবুজ খোলা প্রান্তর। একটু পরেই পাহাড়ের রেখা দেখা যায় দূরে। ক্রমশ পাহাড় এগিয়ে আসতে থাকে। সমতলের শেষ ঘাঁটি খপোলি থেকে পাহাড়ে ওঠবার রাস্তা। অত্যন্ত বেশি খাড়াই। চিরকাল গাড়ি চালাতে অসুবিধা বোধ করেছি। পাহাড়ি রাস্তার মাঝামাঝি একটি মন্দির ছিল। তারপর শেষ খাড়াই, দুর্জয়।

প্রায় নিয়মে দাঁড়িয়ে গিয়েছিল, সব গাড়ি সেখানে থামত। ইঞ্জিনের তেল-জল পরীক্ষা করা হত। গাড়িও সামান্য বিশ্রাম পেত। মন্দিরে পুরোহিত সবসময়ই উপস্থিত। চার-ছ'আনা প্রণামী দেওয়া নিয়মের মধ্যে ছিল। যার কাছেই হোক মনে মনে প্রার্থনা, যেন নির্বিঘ্নে পাহাড়ের ওপরে উঠে যাই খাণ্ডালায়। খাণ্ডালায় রাজমাচি পয়েন্ট। এই পয়েন্ট সর্বোচ্চ জায়গা। চা কফির সামান্য আয়োজন আছে। কিছুক্ষণ বিশ্রাম নিয়ে আবার পুনের দিকে রওনা, আরও বোধহয় পঁয়ত্রিশ মাইল।

রাজমাচি পয়েন্ট থেকে নীচে প্রসারিত সমতলভূমি দেখা যায়। সদ্য যে পথ

দিয়ে এসেছি তারও খানিকটা নজরে আসে। বর্ষাকালে গভীর সবুজ, এখানে ওখানে জলধারা নামছে প্রপাতের মতো। হঠাৎ মেঘ এসে সব ঢেকে দিল, যেমন দেখা যায় দার্জিলিঙে বা কার্শিয়াঙে। পাহাড়ের ওপর ছোট দুটি শহর, খাণ্ডালা আর লোনাভালা। অবসরপ্রাপ্তদের ছোটবড় বাংলো। কেউ পাহাড়ের ঢালে, কেউ উঁচুতে। বম্বে থেকে এসে এই দৃশ্যই চোখ জুড়িয়ে দিত, মনে হত এই অঞ্চলে বুঝি পরম শান্তি।

প্রথমবার গিয়ে আশ্চর্য হয়েছিলাম। পাহাড়ে উঠেছি, এবার পাহাড় থেকে নেমে পুণে পৌঁছব। কিন্তু একেবারেই নামতে হল না। ওই যে দু'হাজার ফুট উঁচুতে উঠেছি সেই উচ্চতাই বজায় থাকবে বাঙ্গালোর পর্যন্ত, ডেকান প্ল্যাটো বা অধিত্যকা।

একটু আগে নিয়মের কথা বলেছি। এই পথে প্রায় নিয়মের মতো হয়ে গিয়েছিল খপোলিতে থামা। পাহাড়ের ঠিক নীচে, সামনে অলঙ্ঘ্য প্রাচীরের মতো খাড়া পাহাড় দাঁড়িয়ে আছে। শনি রবিবার খপোলি মেলার মতো মনে হত। অনেক গাড়ি দাঁড়িয়ে আছে। সওয়ারিরা রাস্তায় নেমে ঘোরাফেরা করছেন, সব দোকানে বিশেষ করে খাবারের দোকানে ভিড়। আমাদের প্রিয় ভোজনশালা ছিল 'সন্তোষ ভুবন'। ভাঙাচোরা কাঠের টেবিল, অনেক চেয়ার। আমাদের মতো আরও অনেকে সেখানে বিশ্রাম নিচ্ছেন আর অপেক্ষা করছেন আলু বোণ্ডার জন্য। দোকানটি এই পদটির জন্য অত্যন্ত জনপ্রিয় ছিল। তিন-চার জন মানুষ বোণ্ডা ভাজছে, ভেজে কূল পাচ্ছে না। একটা অস্পষ্ট চাটনির সঙ্গে অতি তপ্ত বোণ্ডা আধ-ভেজা প্লেটে করে এসে পৌঁছত, তারই জন্য অপেক্ষা। আমাদের আলুর চপ যেমন কড়া ভাজা হয়, ভাজলে ভাল লাগে, তেমন নয়। আলু বোণ্ডা ভাজার পর বেসনের রঙের পরিবর্তন হয় না। ভেতরের পুরটাও অল্প মশলায় তৈরি। স্বাদের বৈশিষ্ট্য বম্বে পুনের যাত্রীদের আকৃষ্ট করে রাখত; সন্তোষ ভুবনে সবচেয়ে বেশি ভিড়।

খপোলি পৌঁছনোর আগে আরও একটি স্থানে যাত্রীরা থামতেন, একটি ভোজনশালায়, যদি সেটা দ্বিপ্রহর বা নৈশভোজনের সময় হয়। স্থানটির নাম তলোজা। ভোজনশালার যে পদটির সন্ধানে মধুর ওপর মধুমক্ষীর ঝাঁকের মতো যাত্রীরা এসে পৌঁছত সেই পদটি বিরিয়ানি। অপূর্ব স্বাদ ছিল তার বিরিয়ানির। হয়তো হায়দরাবাদি ঢঙে প্রস্তুত। চালগুলি সুসিদ্ধ হয়েও অটুট।

মাংস খণ্ডগুলি নরম এবং সরস। পুনে থেকে ফেরার পথে সন্ধ্যায় তলোজাতে থামা একটা নিয়মের মতো দাঁড়িয়েছিল।

আমার বম্বে ছাড়বার আগে তলোজার সেই ভোজনশালা তার জনপ্রিয়তা হারিয়ে ফেলেছিল। ভোজ্য বস্তুর কোনও ত্রুটিতে নয়। গ্রাহকদের প্রতি আচরণের জন্যও নয়। থানা থেকে তলোজা হয়ে পানভেল ও খপোলি যাওয়ার পথটি বদলে গিয়েছিল। বম্বে থেকে পানভেলে যাওয়ার নতুন রাস্তা তৈরি হল আরও পুবদিক ঘেঁষে সমুদ্রের নিকটে। আসলে সেটাই সোজা রাস্তা। কিন্তু সমুদ্রের খাঁড়ির জন্য খাঁড়িকে বেড় দিয়ে থানা থেকে তলোজা, পানভেলে পৌঁছতে হত। তারপর খাঁড়ির ওপর সেতু তৈরি হল। বম্বে চেম্বুর অঞ্চল থেকে সোজা পানভেল। ফলে মানুষের যাত্রাপথ বদলে গেল। তলোজার সেই একদা-প্রিয় ভোজনশালা অবহেলায় নষ্ট হয়ে গিয়েছিল।

বেড়াতে এলে পুনে থেকে যাওয়া হত খড়কভাসলা। যেখানে ভারতীয় মিলিটারি একাদেমি। ওই অঞ্চলটার নিসর্গ অপরূপ। ছোট বড় পাহাড় ছাড়া নির্বাধ রাস্তা অনেক দূর পর্যন্ত দেখা যায়। আকাশে হেলান দিয়ে পাহাড়কে এখানেই ঘুমাতে দেখেছি। পুনের বিশেষ দ্রষ্টব্য ছিল ভবানী মন্দির। শিবাজির আরাধ্যা দেবী। একটা ছোট পাহাড়ের মাথায়, অনেক সিঁড়ি ভাঙতে হত।

পুনেয় ভাল হোটেল ছিল না। তখনও ব্লু ডায়মন্ড হোটেল হয়নি। থাকার স্থান ছিল পুণে ক্লাব বা বোট ক্লাব। বেড়াবার জায়গা ছিল ক্যাম্প। অর্থাৎ পুনে ক্যান্টমেন্ট আর পুনে শহরের মাঝখানে দোকান বাজার অঞ্চল।

আমার মহারাষ্ট্র বাস যে পুনেয় এসে শেষ হবে তখন সে-কথা ভাবিনি। সেই পুনেয় একদিন এসে পৌঁছলাম। তারপর তিন বছর পুণেয় ছিলাম।

আরও অনেক শহরের মতো পুনে শহরটাও দু'ভাগে বিভক্ত ছিল। একটা অংশ পুনের অন্দর মহল। সেটাই বড়। মারাঠিরা বেশিরভাগ সেই অঞ্চলে থাকে। আর একটা অঞ্চল ক্যাম্প, সেখানে গুজরাতি, পারশি ইত্যাদি অন্যান্য ভাষাভাষী বাস করে। এটা যেন ধনীদের অঞ্চল এবং কিছুটা পাশ্চাত্য রীতিনীতি প্রভাবিত। অনেক পারশি বা গুজরাতি পুনের বহুদিনের বাসিন্দা। তারা বোধহয় সম্পূর্ণভাবে মারাঠিদের সঙ্গে মিশে যেতে পারেনি। ক্যাম্প অঞ্চলে দোকানপাটও বড় এবং বিশিষ্ট। সাজানোর ঘটাও অনেক।

সন্ধ্যায় বহুদিন ক্যাম্প অঞ্চলে ঘুরেছি। এখানে দুটি প্রতিষ্ঠানের কথা মনে পড়ে। একটি হল গ্রিন ফিল্ডস। গ্রিন ফিল্ডসে পারশি খাবার পাওয়া যেত এবং

এদের ধানশাক আর বিরিয়ানি উচ্চ শ্রেণীর ছিল। অনেক সন্ধ্যায় গ্রিন ফিল্ডসের আতিথ্য নিয়েছি।

ইংরেজিতে যাকে বলে কনফেকশনার্স, কয়ানি সেই জাতের। এদের কেক পেস্ট্রি বিস্কুট প্রভৃতির খুব সুনাম। পুনে আসবার পথে যে নিয়মের কথা বলেছি তেমন একটি নিয়ম ছিল পুনে থেকে ফেরবার পথে। সবাই ফেরার পথে কয়ানি থেকে শ্রুসবেরি বিস্কুট নিয়ে যেতেন। প্রত্যেক গাড়ির পেছনের সিটের মাথার দিকে, যেখানটা পিছন থেকে দেখা যায়, শ্রুসবেরি বিস্কুটের প্যাকেট প্রায় অবধারিত ছিল। যে-গাড়ি চলেছে বম্বের দিকে সেখানে কয়ানির প্যাকেট আছে কি না দেখা আমাদের একটা খেলার মতো হয়ে গিয়েছিল।

মারাঠি পুনের দুই অংশ। এক অংশ ছাত্রছাত্রীদের। অন্য বাকিটা অধিবাসীদের। ভাল স্কুল কলেজ ছিল। ফার্গুসন কলেজ তার অন্যতম। সংলগ্ন অঞ্চলটার নাম ডেকান। নিকটেই পুনের বিখ্যাত খেলাধুলার ক্লাব—ডেকান ক্লাব। তার থেকে অঞ্চলের নাম হয়েছে ডেকান।

সন্ধ্যাবেলা এই অঞ্চলে ছাত্রছাত্রীরা ঘুরে বেড়াচ্ছে। ছোটখাটো চা কফির দোকানে তাদের ভিড়, উত্তপ্ত আলোচনা। অঞ্চলটা যেন তরুণদের জন্য চিহ্নিত ছিল। ডেকানের দোকানপাট ভাল। ভোজনশালাগুলিও খারাপ নয়। এইখানে মারাঠি থিয়েটার হত। বাঙালিদের মতো মারাঠিদের নাটমঞ্চের প্রতি গভীর অনুরাগ। ভাল মঞ্চের জন্য তৈরি কোনও প্রেক্ষাগৃহ নেই। তবুও শনি রবিবার পুনেয় একটি-দুটি থিয়েটারের অনুষ্ঠান থাকত।

আর একটা সাংস্কৃতিক আন্দোলন সেই সময় লুপ্ত হবার মুখে। তার নাম তামাশা। ধরনটা যাত্রার। অভিজাত কিছু নয়। কিন্তু তার সম্পর্ক মাটির সঙ্গে। অভিজাত নয় বলেই তার শ্লীলতা অশ্লীলতার কোনও দায় ছিল না। শ্লীলতার মাত্রা ছাড়িয়ে যাবার প্রবণতা অনেকের অনুরাগের ছিল, তাদের পৃষ্ঠপোষকতায় তামাশা চলত।

ক্রমশ যখন মানুষের রীতিনীতি শিক্ষা বদলাল, পাশ্চাত্যের সঙ্গে সম্পর্ক বাড়তে লাগল, তামাশার আদরও চলে গেল। তবুও মাঝে মাঝে তামাশা অনুষ্ঠান হত। শহরের বাইরে হয়তো তখনও প্রচলন ছিল। ইতিমধ্যে দায়বদ্ধ, সমাজমনস্ক আধুনিক নাট্যকারেরা উঠতে আরম্ভ করেছে। সিরিয়াস নাটক, ভাবনাকে পীড়িত করার নাটক অনেক দেখা গিয়েছে তখন। কিন্তু যে নাট্যানুষ্ঠানের প্রবল জনপ্রিয়তা হল সে-সব হাসির নাটক। তখন পু লা

দেশপাণ্ডের উত্থান হয়েছে। পু লা দেশপাণ্ডে একযোগে গভীর এবং লঘু মারাঠি নাটককে বাঁচিয়ে রেখেছিলেন পঁচিশ বছর।

দেশপাণ্ডে বাংলা-নাটক এবং নাট্য আন্দোলনের অনুরক্ত ছিলেন। শম্ভু মিত্রের ভক্ত। মনে করতেন মানুষকে হাসাতে পারলে তবেই নাটকের সার্থকতা। গভীর এবং গুরুতর কথা বলার সব থেকে সার্থক মিডিয়াম হল হাসির নাটক।

পু লা দেশপাণ্ডের রাজত্বের সময় পুনেতে একাধিক প্রেক্ষাগৃহ তৈরি হয়ে গিয়েছিল। বালগন্ধর্ব প্রেক্ষাগৃহ হল তার অন্যতম।

বম্বের উন্মত্ত ব্যবসাবাণিজ্যের সমুদ্র থেকে পুনে অনেক দূর। কিন্তু সমাজটা নিস্তরঙ্গ নয়। সামান্য কোনও ঘটনাতে উদ্বেল হয়ে ওঠে। মধ্যবিত্তের সব দোষ এবং গুণগুলি তার মধ্যে প্রকট। জ্বলে ওঠে মুহূর্তে, আবার নিঃশব্দে নিভে যায়। বাঙালিদের সঙ্গে ভারী চরিত্রগত মিল।

দেশপাণ্ডে একদিন বলেছিলেন, বাঙালি আর মারাঠি মিলে অনেক বড় কাজ করা যায়। কিন্তু আমাদের আম জনতা বাঙালিদের খবর রাখে না। বাঙালিরাও আমাদের সম্বন্ধে শিবাজি, তিলক বা গোখলের অধিক আর কিছু জানে বলে মনে হয়নি। দেশপাণ্ডে কয়েকবার শান্তিনিকেতনে এসে কয়েক সপ্তাহ ছিলেন। তাঁর শান্তিনিকেতন বাসের অভিজ্ঞতার কথা সলিল ঘোষের কাছে শুনেছি।

সলিল বম্বের অন্যতম প্রাচীন বাঙালি বাসিন্দা। তখন সবে পঞ্চাশ পার হয়েছে কি হয়নি, মানুষটা সতত চঞ্চল, সহসা আবেগে উচ্ছ্বসিত এবং কাজে একনিষ্ঠ। বিপরীত এই সব গুণ ছিল বলে সলিল বম্বেতে অত জনপ্রিয়। কোনও কাজের ভার দিলে প্রাণ দিয়ে লেগে পড়বে। তার গতি সর্বত্র। সবাই তাকে চিনত। নৌ বিদ্রোহের আগে বম্বেতে এসেছিল। তার আদিভূমি শান্তিনিকেতন। কর্মভূমি বম্বে। খবরের কাগজের নিউজ রুম থেকে টাটার বোর্ডরুম তার সর্বত্র গতি। তখনকার রাজ্যপাল নবাব ইয়ারজঙের অত্যন্ত প্রিয় পাত্র। বাংলাদেশ মুক্তি পাবার সময় প্রচারে এবং টাকা তোলার জন্য অনেক কাজ করেছিল। ভারত সরকার সলিলকে পদ্মশ্রী দেবে এটা অপ্রত্যাশিত কিছু নয়।

বুনো মোষ তাড়ানোয় ব্যস্ত সলিলের নাইবার খাবার সময় হয় না। নানা ধরনের মানুষের সঙ্গে তার যোগাযোগ ছিল। ঠিক মনে পড়ে না, আমার সঙ্গে

হয়তো তার সূত্রেই পু লার পরিচয় হয়। পু লা শুধু নাট্যকারই নয়, অভিনয় এবং পরিচালনায় সমান কৃতী।

পুনের দু'জন প্রতিষ্ঠিত মানুষের সঙ্গে আমার পূর্ব পরিচয় ছিল। প্রথম জন নারায়ণ ভিখাজি পারুলেকার। তাঁকে সবাই বলত নানাসাহেব। নানাসাহেব পারুলেকর। তিনি বিশ্রুত দৈনিক কাগজ 'সকালের' সম্পাদক। অপর জন মুকুন্দ কির্লোসকার। মারাঠি শিল্পোদ্যোগী কির্লোসকার পরিবারের মানুষ মুকুন্দ। মুকুন্দ কির্লোসকার দুটি মারাঠি মাসিক পত্রিকার সম্পাদক—'স্ত্রী' ও 'কির্লোসকার'। পরিধানে সাফারি স্যুট। দুই বুক-পকেটে পাঁচ ছয়টি কলম, বল পয়েন্ট। সব সময়ে ব্যস্ত। হাতে অন্তত পাঁচটি ছোট নোট বই। একটা অ্যাপয়েন্টমেন্ট লেখার। বাকিগুলিতে বিভিন্ন তথ্য, তাৎক্ষণিক অথবা পুরাতন। শ্রেণী ভাগ করে বিভিন্ন নোটবুকে লিখে রাখত। অনবরত হাতের ঘড়ি দেখছে। যখন দিল্লিতে আসত তখন তার ব্যস্ততা আরও বেড়ে যেত। সচরাচর সন্ধ্যায় কাজ থাকত না। অনেক গল্প করেছি তার সঙ্গে। তার সম্পর্কে ঠাকুরদা, আদি কির্লোসকার, মুকুন্দের কাকা। লক্ষ্মণ রাও-এর ছেলে শান্তনু রাও। ক্ষুদ্রাবস্থা থেকে মহারাষ্ট্রের শিল্পপতিদের উচ্চস্থানে। ভারতীয় শিল্পজগতেও তিনি স্থান করে নিয়েছেন।

মুকুন্দের অস্থির ঘোরা-ফেরা অ্যালিস ইন ওয়ান্ডারল্যান্ডের একটা চরিত্রের কথা মনে করিয়ে দিত।

নানাসাহেব পারুলেকার অন্য চরিত্রের মানুষ। কী করতে হবে, কী করবেন সব তাঁর মনে আছে। ভুল হবে না। সেখান থেকে বিচ্যুতও হবেন না। নানাসাহেবের সম্বন্ধে অনেক কথা বলার আছে।

দেশে অনিশ্চয়তা। বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে ভারত ও পাকিস্তানের সংগ্রাম শেষ হয়েছে। সিমলায় ইন্দিরা গান্ধী ও জুলফিকার আলি ভুট্টোর চুক্তি স্বাক্ষরিত হল। বহু বিতর্কিত রাজন্যভাতার বিলুপ্তি। কলকাতার বই মেলার শুরু। পোখরানের মরুভূমির ভূগর্ভে ভারতের প্রথম পারমাণবিক বোমার বিস্ফোরণ। অকল্পনীয় বৃষ্টিতে কল্লোলিনী কলকাতায় মহাপ্লাবন। এলাহাবাদ উচ্চ আদালতে ইন্দিরা গান্ধীর নির্বাচন নাকচ। সংবিধান পরিবর্তনের ফলে ইন্দিরার বিরুদ্ধে এলাহাবাদ হাইকোর্টের রায় খারিজ করে দিল সুপ্রিম কোর্ট। সমগ্র ভারতবর্ষে জরুরি অবস্থা জারি। সাধারণ নির্বাচনে ইন্দিরার পরাজয়। দিল্লিতে প্রথম অ-কংগ্রেসি সরকার।

ঐতিহাসিক ঘটনার এমন সমাবেশ মনে হয় আগে কখনও হয়নি। সত্তরের দশক।

টাইমস অফ ইন্ডিয়া ছাড়ব কখনও মনে করিনি। তাই ঘটনার দ্রুত পট পরিবর্তনে বিব্রত এবং বিধ্বস্ত হয়েছিলাম, যখন টাইমসের পুরনো বোর্ড অফ ডিরেক্টরসের সঙ্গে আমাকেও টাইমস ছাড়তে হল। এখন কী করব স্থির হয়ে ভাববার আগেই পুনে থেকে ড. পারুলেকরের ফোন এল। বললেন, বড় কাগজে অনেকদিন অনেক কাজ করেছ। এবার যখন সুযোগ হয়েছে, ছোট কাগজের জন্য কিছু কাজ করো। সকালের পরিবারে যোগ দিলে আমি অত্যন্ত খুশি হব।

মনস্থির করতে সময় লাগল না। ড. পারুলেকরের চরিত্রের দৃঢ়তা এবং তাঁর কর্মক্ষমতা আমাকে বরাবর মুগ্ধ করেছে। তাঁকে বন্ধু বলে গণ্য করি। এক বিকালে বাক্স বিছানা নিয়ে পুনে শহরে ভাড়া বাড়িতে এসে উঠলাম।

পুনের অনেক অঞ্চলের নাম সপ্তাহের বারের নামে। যেমন মঙ্গলবার, বুধবার। আসলে বুধবার ওয়াড়া, মঙ্গলবার ওয়াড়া। একদা সপ্তাহের ওই দিনে হাট বসত। সকালের অফিস বুধবার ওয়াড়ায়। একাংশ পুরনো বাড়ি। বাকিটা নতুন তেতলা। সম্পত্তি সকলের নিজস্ব। কোনও মারাঠির সঙ্গে পরিচয় হলে সকালে কাজ করি বললে একটু চমকে যেত। সকালের প্রকাশক, এ কেমন মানুষ, মারাঠি বলতে পারে না।

বম্বে শহরে স্থানীয় ভাষা বলবার বাধ্যতা ছিল না। ইংরেজি বলতে পারলে যথেষ্ট। সেই জন্যেই মারাঠি বা গুজরাতি ভাষা শেখা হয়নি। ভাগ্যক্রমে দুটি ভাষাই সংস্কৃত থেকে উদ্ভূত। মারাঠি বুঝতে অসুবিধা হত না। পড়তেও নয়। কারণ মারাঠিতে দেবনাগরী অক্ষর ব্যবহার হয়। সকাল কাগজটা মন দিয়ে নিয়মিত পড়ে মারাঠিতে কাজ চলা জ্ঞান হয়েছিল। অফিসে মারাঠি ছাড়া অন্য ভাষাভাষী কোনও মানুষ নেই। অথৈ জলে পড়বার কথা। কিন্তু মারাঠিদের স্বভাব এমন যে তারা আমাকে সাদরে গ্রহণ করল। একটাই অসুবিধা। অফিসে সব কাজ মারাঠিতে হয়। কোনও নোট বা দরখাস্ত পড়তে সময় লাগে, বিশেষ করে হাতে লেখা হলে।

পুনের আবহাওয়া মনোরম। গরমের সময় দু'-তিন মাস ছাড়া পাখা বা এয়ার কন্ডিশনিং ব্যবহার করতে হয় না। আমার অফিস ঘরের পাশে একটা মস্ত আম গাছ। যেন ঘরটার সজ্জায় সাহায্য করবার জন্য।

পুনেয় বন্ধু-বান্ধব বিশেষ নেই। বম্বের সদা ব্যস্ত জীবনের পর আমি হঠাৎ নির্বাসিতের মতো। আমার বাড়ির থেকে ক্যাম্পের দোকানপাট কাছে। অফিস অনেকখানি দূরে। ডেকান আরও দূর। তবু সন্ধ্যায় হয় ডেকানে, নয় ক্যাম্প অঞ্চলের বাজারে যাওয়া চাই। ক্যাম্প অঞ্চলে একটা খানদানি ভোজনশালা ছিল। দোরাবাজি। কাছেই ওই নামে একটা বড় ডিপার্টমেন্ট স্টোরও ছিল।

দোরাবজি ভোজনশালা ঐতিহ্যে প্রাচীন। মারাঠিদের মধ্যে আমিষ-ভোজীর সংখ্যা কম। ব্রাহ্মণরা কঠোর নিরামিষাশী। দোরাবজির পৃষ্ঠপোষক ছিল পারশিরা এবং অন্য প্রদেশবাসীরা। অনেকটা কলকাতার সেকালের চাচা কিংবা অ্যালেনস কিচেনের মতো।

টেবিলচেয়ারের কোনও শোভা নেই। দেয়ালে কলি ফেরাবার কথা মনে পড়ে না। আমাদের ভোজনশালার মতো তেমন নির্বিকার নয়। দেখলেই বোঝা যায় দোরাবজির পরিচ্ছন্নতা বেশি। কোনও সাজসজ্জায় মন দেয় না। দোরাবজি রবীন্দ্রসংগীত নিশ্চয় জানত না। না হলে বলতে পারত যে খদ্দেরদের রূপে ভোলাবার চেষ্টা নেই তার, ভালবাসায় ভোলাবে।

ভালবাসা ছিল দোরাবজির বিভিন্ন ব্যঞ্জনের স্বাদে ও গন্ধে। খাদ্য তালিকা বড় ছিল না। তার মধ্যে দুটি পদ আমার বিশেষ প্রিয় ছিল। ফ্রায়েড চিকেন এবং সাল্লি গোস্ত। ফ্রায়েড চিকেন ডিশ বা অন্য কোনও অনুপানে মোড়া কাটলেটের ধরনে। এই পদটি মুসলমানদের নিজস্ব কি না বলতে পারব না। বোহরা মুসলমানদের বাড়িতে এই পদটির অপরূপ ভাষ্য ভোজনকালে উপস্থিত হয় সন্ধ্যাটাকে মাতিয়ে দেবার জন্য।

দোরাবজিও এ কাজে পিছিয়ে নেই। দোরাবজির ফ্রায়েড চিকেন অনবদ্য ছিল। কুক্কুট মাংস কেমন করে যুগপৎ এমন নরম, রসস্নিগ্ধ এবং মুচমুচে হতে পারে ভেবে পাই না। ওপরের আস্তরণ কী দিয়ে তৈরি তা কখনও জিজ্ঞাসা করিনি। কিন্তু দুয়ে মিলে কল্পনাতীত আনন্দের জোগান দিত। দ্বিতীয় যে-পদটি দিয়ে সন্ধ্যার ভোজন শেষ হত সেটি সাল্লি গোস্ত। অর্থাৎ ছাগ মাংসের ব্যঞ্জন, সরু করে কাটা আলুভাজা সহ। যার নাম সাল্লি। পারশিরা সাল্লির বড় ভক্ত। অনেক পদে রন্ধনের পরে ওপরে সাল্লি ছড়িয়ে দেওয়া হয়। মাংসের সঙ্গে সাল্লি যুক্ত হয়ে যে-পদটির সৃষ্টি হত দোরাবজিতে তার স্বাদ অকল্পনীয় মোহকর ছিল। প্রথম দু'-একবার সুখাদ্যের সন্ধানে দোরাবজির মেনুতে ইতস্তত বিচরণ করেছি। তারপর একনিষ্ঠ প্রেমিকের মতো এই দুটি পদের ভক্ত হয়ে গিয়েছিলাম।

দুটি পদের ভক্তকে কি একনিষ্ঠ বলা যায়? অন্য এক ক্ষেত্রে এমন একনিষ্ঠতার পরিচয় আমাকে অপার বিস্মিত করেছিল।

একবার দিল্লিতে নানাসাহেব বললেন, আজ সন্ধ্যায় বাবুরাও ডিনারে নেমন্তন্ন করেছেন। চলো দু'জনে যাই।

আমি বললাম আমার তো নিমন্ত্রণ হয়নি। তা ছাড়া আমি তো বাবুরাওকে চিনি না। বাবুরাও মানে বাবুরাও প্যাটেল। যিনি একদা ফিল্মের তারকা, উল্কা এবং পুড়ে যাওয়া তুবড়িদের ত্রাসের কারণ ছিলেন।

জানতাম বাবুরাও প্যাটেল দিল্লিতে থাকেন। তাঁর সঙ্গে নানাসাহেবের বন্ধুত্ব আছে অজানা ছিল। বাবুরাও তখন গোয়ালিয়রের রাজমাতার সৌজন্যে লোকসভার নির্বাচিত সদস্য। তবুও সন্ধ্যায় বাবুরাও-এর বাড়িতে গেলাম। তিনি আমাকে আন্তরিকতার সঙ্গে অভ্যর্থনা করলেন। ফিল্মফেয়ারের খুব তারিফ করলেন। সময়ের বিবর্তনে ফিল্মইন্ডিয়ার পরাজয় স্বীকার করলেন।

একটু পরে আমাদের সঙ্গে যোগ দিলেন সালংকারা, সুসজ্জিতা, সুন্দরী এক রমণী। তিনি বাবুরাও-এর দ্বিতীয় স্ত্রী। সুশীলা রানি। সুশীলা রানি ইংরেজি বলতে পারেন। সহজ এবং সাবলীলভাবে আমাদের আলাপচারিতে যোগ দিলেন।

বাবুরাও একবার জিজ্ঞাসা করলেন সুশীলা রানিকে, বড় কী করছে? বড় অর্থে বাবুরাও-এর প্রথমা স্ত্রী। তার বয়স বেশি। হয়তো বাবুরাওয়ের সমান বয়স। ইংরেজি বলতে পারেন না।

সুশীলা উত্তর দেবার আগেই বাবুরাও বললেন, কী করছেন তাও আমি জানি। আমাকে পঞ্চাশ বছর ধরে খাইয়েও তাঁর আশা মিটল না। এখনও সারা সন্ধ্যা আমার জন্য পাকশালায় বসে থাকেন।

খাবার ঘরে গিয়ে দেখি টেবিলে চারটি থালা রয়েছে। মারাঠা রীতিতে কয়েকটি বাটি থালাতেই বসানো। একটু পরেই যিনি এলেন তিনি বাবুরাও-এর প্রথম। তিনি স্বহস্তে বাটিগুলি ব্যঞ্জনে ভর্তি করে দিলেন। পরের পর তপ্ত রুটি এল। ব্যঞ্জনের বাটিগুলি বারবার পূর্ণ হতে থাকল। তিনি আমাদের সঙ্গে খেতে বসলেন না। শুধু পরিবেশন করলেন। বাবুরাও কম খাচ্ছেন বলে স্নেহের সঙ্গে তিরস্কার করলেন। বাবুরাও যে তাঁর ভালবাসার মানুষ সেটা স্পষ্ট ছিল। বাবুরাও তাঁর সঙ্গে মধুর ভাবে কথা বললেন। বললেন, ও না থাকলে আমার জীবনটা ছারখার হয়ে যেত। আমার সঙ্গে অনেক কষ্টের সমুদ্র পার হয়েছে। সুশীলা তো সেদিনের।

সেদিন মানে হয়তো পনেরো বছর আগে। ফিল্ম পত্রিকার সম্পাদক বাবুরাও-এর হঠাৎ মনে হয়েছিল, এখন তিনি ফিল্ম তৈরি করবার দক্ষতা অর্জন করেছেন। তাঁর ছবিতে নায়িকার ভূমিকার জন্য দক্ষিণ ভারত থেকে উদীয়মানা অভিনেত্রী সুশীলা রানিকে নিয়ে এলেন। ছবিটা আদৌ চলল না। বাবুরাও সুশীলা রানির প্রেমে পড়ে গেলেন। বিবাহও হল। প্রথমা স্ত্রীর সম্মতিক্রমে তিনি বাবুরাওকে বিবাহ উৎসবে যাওয়ার জন্য নিজে সাজিয়ে দিয়েছিলেন কিনা সে-কথা আমি বাবুরাওকে জিজ্ঞাসা করিনি, যদিও তার সঙ্গে আমার বন্ধুত্ব হয়ে গিয়েছিল। বম্বেতে পালি হিলসে তাঁর নিজস্ব বাড়ি। সেখানেও কয়েকবার গিয়েছি। এক কন্যে রাঁধেন বাড়েন, এক কন্যে খান, তাঁদের কেউ রাগ করে বাপের বাড়ি চলে যান না—এমনটা আমি আর দেখিনি।

নানাসাহেব পারুলেকারের সঙ্গে আমার প্রথম সাক্ষাৎ হয় ইন্ডিয়ান নিউজপেপার সোসাইটির মিটিংয়ে দিল্লিতে। অগোছাল পোশাক, সুতির নেতিয়ে পরা স্যুট পরা, রোগাসোগা মানুষটা সহজে কারুর নজরে পড়ে না। যখন কথা বলেন যুক্তির প্রাধান্য থাকে। অকারণে নিজের মতের ওপর জোর দেন না। লাঞ্চ-এর সময় পরিচয় হল। তিনি পুনের বিখ্যাত মারাঠি দৈনিক 'সকালের' সম্পাদক। হাতে সর্বদা দু'-একটা বই বা কাগজপত্র থাকত। আমরা দু'জনে একই হোটেলে ছিলাম। আমাকে সন্ধ্যার পরে তাঁর ঘরে যাবার নিমন্ত্রণ করলেন। গিয়ে দেখি তিনি একতাড়া কাগজ নিয়ে লিখতে বসেছেন। বললেন, কিছু সম্পাদকীয় লেখবার ছিল। তাই লিখছি। কাল পুনে পাঠাতে হবে।

আমি যা দেখেছি, সম্পাদকেরা তাঁদের লেখা লিখে ফেললে প্রেসে পাঠিয়ে দেন। কাল সকালে ছাপা হবে। আমি একটু আশ্চর্য হলাম। সম্পাদকীয় মন্তব্য এত পুরাতন করে ছাপা হবে। নানাসাহেব বললেন, তাতে কী হয়েছে। একটা বিষয়ের বিশ্লেষণ পাঠকের জানার দরকার। তাই লিখছি। সেটা তাকে এই মুহূর্তে বা এখনই জানতে হবে এমন তো নয়। তা ছাড়া মার্জিত যুক্তিপূর্ণ সিদ্ধান্তের জন্য দু'-একদিন দেরি হলে কী এসে যায়।

যেদিন আমাদের দিল্লিতে মিটিং ছিল তার আগের দিন লোকসভায় বাৎসরিক বাজেট পেশ করেছেন অর্থমন্ত্রী। নানাসাহেব সে-বিষয়েও লিখতেন। সমস্ত সম্পাদকীয় তিনিই লেখেন, যদিও একজন সহকারী সম্পাদক আছেন। তিনি অন্যান্য কাজ করেন। কাগজ, ছোট বড় যেমন কাগজই হোক— এমন স্বেচ্ছাচার কী করে করতে দেওয়া হয় আমি বুঝে উঠতে পারলাম না। পরে জানলাম এই কাগজের প্রতিষ্ঠাতা, মালিক এবং সম্পাদক তিনি স্বয়ং। কিন্তু সম্পূর্ণ নতুন ধারায় কাগজ চালিয়েও তাঁর কাগজের এত বিক্রি কেন এ-সব তথ্য পরে জেনেছি। তখনও জানি না আমিও একদিন সকালের অংশ

হব। পুনেতে সকালের কাজ করব। ড. পারুলেকারের পছন্দ অপছন্দ খুব স্পষ্ট—এদিক ওদিক হবার উপায় নেই।

তারপর থেকেই মানুষটার সঙ্গে ইন্ডিয়ান নিউজপেপার সোসাইটির মিটিংয়ে দেখাসাক্ষাৎ হয়। ক্রমশ তাঁর কাগজের বিষয়েই অনেক খবর জানতে হল। তিনি কাগজের বিষয়েই অনেক খবর জানতে হল। তিনি কাগজের প্রতিষ্ঠাতা বটে কিন্তু যখন কাগজ প্রতিষ্ঠা করেন তখন তাঁর ব্যাঙ্কে পাঁচ হাজার টাকা ছিল। আমাকে এই খবর দিয়ে গর্বের সঙ্গে বললেন, সকাল প্রথম বছরের শেষেই আয়কর দিয়েছিল। তাঁর নজর শুধু সম্পাদকীয়ের ওপর ছিল তা নয়, আর্থিক দিকটাতেও নজর দিতেন। কম খরচে কাগজ চালাতে জানতেন। সকাল অফিসে কর্মী সংখ্যা কম ছিল। পরে দেখেছি তারা সকলেই ড. পারুলেকারের অনুরক্ত ছিল। মাইনে বেশি পায় না, কোনও সুযোগ সুবিধা নেই।

ড. পারুলেকার শৈশবে পিতৃমাতৃহীন হয়েছিলেন। নিজের চেষ্টায় বোম্বে থেকে স্নাতক হয়ে আমেরিকায় চলে যান। মাঝে ফ্রান্সেও ছিলেন। তাঁর স্ত্রী ফরাসি। মাদামের সঙ্গে তাঁর সাক্ষাৎ যদিও আমেরিকাতে হয়েছিল, আমেরিকায় ছোটখাটো কাজ করেছেন। কারুর সাহায্য বিনা লেখাপড়া করে ডক্টরেট হয়েছিলেন। খবরের কাগজের সঙ্গে যোগাযোগ আমেরিকাতেই হয়েছিল। যখন দেশে ফিরলেন তখন কয়েকটি আমেরিকান সংবাদপত্রের সংবাদদাতা ছিলেন। ঠিকে কাজ। পারিশ্রমিক সামান্য। কিন্তু আন্তর্জাতিক যোগাযোগ তাঁকে তুষ্ট করেছিল। ড. পারুলেকারের শুধু পোশাকের দিকে নজর ছিল না তা নয়, খাওয়াদাওয়ার দিকেও নজর ছিল না। নিজের জমির প্রকাণ্ড চৌহদ্দির মধ্যে তাঁর বাড়ি, প্রখ্যাত স্থপতিকে দিয়ে তৈরি করিয়েছিলেন। কোথাও ব্যয়ের বাহুল্য ছিল না, নিরামিষভোজী, মদ্যপানে আসক্তি নেই। নিজের অন্যান্য প্রয়োজন অতি সামান্য।

তাঁদের একটি সন্তান। তার নাম লীলা। আমি যখন লীলাকে দেখেছি তখন সে এম এ পড়ে। সুন্দরী, স্মার্ট, সপ্রতিভ ও সকলের সঙ্গে সহজেই মিশতে পারে। আবার অনেক পুরুষের নিকটে আসার চেষ্টাও অনায়াসে প্রতিহত করে। কিছুদিনের মধ্যে আমেরিকাতে চলে গেল। সেখানে কলম্বিয়া ইউনিভার্সিটিতে ভর্তি হল।

বোম্বাই বা দিল্লিতে মিটিং হলে লীলা তার বাবার সঙ্গে থাকত। তখন

দেখেছি ড. পারুলেকার মেয়ের জন্য চিন্তিত ছিলেন। আশ্চর্য হইনি। একমাত্র মেয়ে। মেয়েটিকে মনের মতন করে তৈরি করছেন।

স্বভাবত মৃদুভাষী নানাসাহেব নিজের সম্বন্ধে কিছুই বলেন না। কোনও কিছুর প্রয়োজন আছে কি নেই বুঝতে পারা যায় না। অফিসেও বিশেষ কারুর সঙ্গে যোগাযোগ নেই। চার পাঁচজন ওপরের দিকের কর্মচারী ছাড়া তাঁর কারুর সঙ্গে দেখাসাক্ষাৎ নেই। সবসময়ে হয় লিখে যাচ্ছেন বা পড়ে যাচ্ছেন।

একটা রীতি ছিল যে ওপরের দিকে কয়েকজনকে নিয়ে বেলা এগারোটার সময় চা-চক্রে মিলিত হবেন। তিনি একটু খালি হলে আমাদের খবর দেবেন। খবর আসতে প্রায়ই দেড়টা বেজে যেত। তবু কেউ চা-চক্রের সুযোগ ছাড়ত না। ওই একটা সময় যখন ড. পারুলেকারের সঙ্গে খোলামনে কিছু কথাবার্তা বলা যায়। মানুষটা অত্যন্ত দৃঢ়চেতা ছিলেন। স্রোতের বিরুদ্ধে যাওয়া তাঁর স্বভাবের অঙ্গ। যখন বোম্বাই রাজ্যকে গুজরাত ও মহারাষ্ট্রে ভাগ করা নিয়ে তুমুল আন্দোলন চলছে, মহারাষ্ট্রের অনেক জায়গায় আগুন জ্বলছে, মারাঠিরা, মনে হয়েছে, সবাই রাজ্যকে দু'ভাগ করার পক্ষে। মানুষ সমষ্টিগত ও ব্যক্তিগতভাবে বোম্বাইয়ের দু'ভাগ চাইছে সমস্ত খবরের কাগজ এই বিভাজনের পক্ষে। তখন ড. পারুলেকার বিভাজনের বিরুদ্ধে লিখতে লাগলেন। তিনি মনেপ্রাণে বিশ্বাস করতেন গুজরাত ও মহারাষ্ট্র আলাদা হয়ে গেলে সুফল হবে না। এমনও হয়েছিল জনমতের বিরুদ্ধে যাওয়ার জন্য তাঁকে জনরোষে পড়তে হয়। সকাল দৈনিকপত্র বন্ধ হয়ে যাওয়ার মুখে। কে বা কারা রাতের অন্ধকারে অগ্নিসংযোগ করার চেষ্টা করেছে। তখনও অকুতোভয় ড. পারুলেকার তাঁর নিজের বিশ্বাসে অবিচল ছিলেন।

সকাল জনপ্রিয় ছিল সন্দেহ নেই কিন্তু জনমত তৈরি করতে পারেনি। কোনও সংবাদপত্রই পারে না। আমরা ভ্রান্ত ধারণায় সংবাদপত্রের প্রভাবের কীর্তন করি। সংবাদপত্র নিঃসন্দেহে একটা সাময়িক উত্তেজনা সৃষ্টি করতে পারে। চিন্তাহীন আবেগ তাকে উত্তেজিত করে। সেই আবেগ স্তিমিত হয়ে গেলে দেখা যায় সাধারণ মানুষ সঠিকপথে চলতে চায়।

বোম্বাই রাজ্যের বিভাজনের পরেও সকালের ক্রমাগত উন্নতি দেখা গেল। ড. পারুলেকারের সঙ্গে একটা বন্ধুত্বর সম্পর্ক গড়ে উঠল। ইন্ডিয়ান অ্যান্ড ইস্টার্ন নিউজপেপার সোসাইটির মিটিং ছাড়া সচরাচর দেখাসাক্ষাৎ হয় না। দেখা হলে লীলাও আমাদের সঙ্গে যোগ দেয়। লীলা বাপের মতো নিরামিষাশী

নয়। অনেককাল ইউরোপ ও আমেরিকায় ছিল। ভোজের সঙ্গে একটু মদিরা অবাঞ্ছিত নয়।

এমনও হত মাঝে মাঝে, তিনজন গল্প করছি। নানাসাহেব বললেন, আমি বড় ক্লান্ত বোধ করছি। বিশ্রাম করব। তোমরা বরং খেয়ে এসো। আমরা দু'জনে কোনও ভোজনশালা থেকে ফিরে আসবার পর ড. পারুলেকার অব্যর্থ জিজ্ঞাসা করবেন, কী খাওয়া হল, কেমন ছিল খাবার? আমরা মদিরা পেয়েছিলাম কিনা।

কোনও অজ্ঞাত কারণে তাঁর ধারণা হয়েছিল আমি সাহেবদের মতো একপাত্র হুইস্কি সন্ধ্যায় প্রত্যাশা করি। সন্ধ্যার দিকে তাঁর বাড়িতে গেলে আমার জন্য একপাত্র হুইস্কি আসত। কয়েক বছর পর পুনের সেই সকালে কাজ করতে এলাম। আমার পদ হল প্রকাশক। ড. পারুলেকারের সাংবাদিক জীবন আমেরিকার পরম্পরায় গড়ে উঠেছে। তিনি আমাকে বললেন, তোমাকে যে পদ দেওয়া হল তাতে আমার ওপরে তুমি এখন অনায়াসে আদেশ করতে পারো। পুনেয় আসবার পরে স্বাভাবিকভাবে নিত্য দেখা হত ড. পারুলেকারের সঙ্গে। অপরাহ্ণে তাঁর বাড়িতে চা পান করতে যেতাম। বিকেল গড়িয়ে সন্ধ্যা হয়। তিনি বলবেন, তোমার হুইস্কির সময় হয়ে গিয়েছে। আমি যে সুরাপানে আসক্ত আমার শত্রুরাও বলবে না। আমি সুরাপানের বিরোধী নই। অল্প সুরাপানে মনে সতেজতা আসে এই আমার ধারণা।

সকালের মালিক নানাসাহেব পারুলেকর যেমন সাধারণ চরিত্রের ছিলেন না, তাঁর প্রতিষ্ঠিত দৈনিকপত্র সকালও স্বতন্ত্র চরিত্রের ছিল। পাঠকের মতামতের গুরুত্ব বুঝতেন নানাসাহেব। সকালে প্রতিদিন প্রথম পাতায় একটি পাঠকের লেখা চিঠি ছাপা হত। ভারতবর্ষের আর কোনও কাগজে এই প্রথা ছিল না।

সকালের প্রতিষ্ঠা হয়েছিল ১৯৩২ সালে পয়লা জানুয়ারি। বছরের ওই একটা দিনই সকালের অফিসে ছুটি থাকত। পরের দিন কাগজ বেরোত না। আর সব কাগজে বছরে কয়েকটি ছুটি থাকত। অন্তত হোলি, দিওয়ালি, জনতন্ত্র দিবস ইত্যাদিতে। সকাল সে-প্রথা কখনও অনুসরণ করেনি।

আমি সকালে যোগ দেবার পর পয়লা জানুয়ারি সকাল প্রতিষ্ঠা দিবস পালিত হল। রিসেপশন বা প্রীতি সম্মেলন। শহরের গণ্যমান্য সবাই নিমন্ত্রিত হতেন। প্রচুর লোকসমাগম হত। সবাই সকালকে শুভেচ্ছা জানাতে আসতেন।

সকালের অধিকাংশ কর্মী উপস্থিত থাকতেন। মারাঠিরা এমন রিসেপশনকে বলেন পানসুপারি। অতিথিকে আপ্যায়ন করে তাঁর হাতে একটি গোটা পান ও একটি সুপারি তুলে দেওয়া হবে। সম্মান ও আদরের প্রতীক। সামান্য সাধারণ পানীয় ছাড়া অন্য কোনও আয়োজন থাকত না। পানসুপারিতে মিলন ও শুভেচ্ছা বিনিময়ই প্রধান, পান-ভোজন সম্পূর্ণ প্রক্ষিপ্ত।

বারোজন বা ষোলোজন ব্রাহ্মণ নিমন্ত্রিত হতেন। তাঁদের মাথায় পুষ্ট দীর্ঘ শিখা। উর্ধ্বাঙ্গ অনাবৃত, পরিধানে ছোট ধুতি। তাঁরা গুরুগম্ভীর স্বরে বেদের কোনও অংশ সমবেত কণ্ঠে উচ্চারণ করতেন। তারপর তাঁদের এক গেলাস দুগ্ধযুক্ত পানীয় দেওয়া হত। ব্যস, ঔপচারিক অঙ্গ এইটুকুই।

অনেক মারাঠি ভদ্রজনের সঙ্গে পরিচয় হল। তাঁরা একজন বহির্দেশীয় উচ্চাধিকারীকে দেখে অবাক হয়েছিলেন। মধ্যবিত্ত মারাঠিরা ভাবনায়, আচরণে বাঙালিদের মতো। রাজনীতিতে প্রবল অভিরুচি। সর্বদা তর্কের জন্য প্রস্তুত। তাঁদের অনেকেই সকালের মতের সমর্থন করতেন না। অনেকে বিরূপ মন্তব্যও করতেন। অথচ সকাল প্রত্যহ তাঁদের নিয়মিত পাঠের কাগজ। না পড়ে থাকতে পারেন না। সকালের দেওয়া খবরে বিশ্বাস করেন, ভরসা করেন।

সকালের প্রতিযোগী দৈনিকপত্র কেশরী। বাল গঙ্গাধর তিলকের প্রতিষ্ঠা করা কাগজ। ঐতিহ্যে সকালের চেয়ে উচ্চস্থানে, কিন্তু বিক্রির সংখ্যায় অনেক পিছিয়ে।

পঁচিশ বছর আগে প্রথম পুনেয় এসে কেশরীর অতিথিশালায় ছিলাম। দুর্দান্ত ব্যারিস্টার নির্মলচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের সঙ্গে কলকাতা থেকে বম্বে হয়ে পুনে এসেছিলাম। তিনি তখন হিন্দু মহাসভার সঙ্গে যুক্ত। বিকালে শনওয়ারওয়াড়া অর্থাৎ শনিবার ওয়াড়াতে প্রকাণ্ড সভা হয়েছিল। হিন্দু মহাসভার ড. বি এস মুঞ্জে দারুণ জ্বালাময়ী বক্তৃতা দিলেন। তিনি অবশ্য মারাঠিতে তাঁর ভাষণ দিয়েছিলেন। অপরিচিত ভাষা বুঝতে অসুবিধা হল না। প্রকাণ্ড জমায়েত হাততালিতে ফেটে পড়ল। তাঁর পরের বক্তা মি. চ্যাটার্জি। শ্রোতাদের সুবিধার জন্য তাঁকে হিন্দিতে বলতে হল। তাঁর বাঙালি হিন্দি আমার কৌতুকের কারণ হলেও, মারাঠি শ্রোতারা সরবে প্রশস্তি জানাল। হিন্দি ভাষার এত কাছাকাছি হয়েও মারাঠিদের হিন্দি ভাল নয়। উর্দুর ছিট দেওয়া হিন্দি তাদের বুঝতে অসুবিধা হয়। তাদের হিন্দি

উচ্চারণ সুখশ্রাব্য নয়। সে দোষ আমরা বাঙালিরা ধরতে পারি না।

সেবারে পুনে শহরের আর কোথাও যাওয়া হয়নি। ফেরার সময় সকালবেলা ভোরঘাট থেকে পাহাড়ের মধ্যে দিয়ে নীচে নামা অপরূপ মনে হয়েছিল। তখন বর্ষাকাল। মেঘ ও কুয়াশা রোমাঞ্চকর দৃশ্যের ছবি আঁকছিল।

পুনে থেকে খাণ্ডালা পর্যন্ত পথ প্রায় সমতল। ওঠা নামা বেশি নেই। কাছে, দূরে ছোট ছোট পাহাড়। এই নিসর্গের অলৌকিক রূপ দেখেছি তলেগাঁওতে।

পুনেয় বাস করতে এসে শনি রবিবার খাণ্ডালা পর্যন্ত বেড়াতে আসতাম। খাণ্ডালার একটা বিশেষ আকর্ষণ ছিল। খাণ্ডালার চিকি। এমন নয় যে সে চিকি পুনেতে পাওয়া যায় না। কিন্তু খাণ্ডালায় এসে চিকি কেনার একটা অন্য আনন্দ ছিল।

চিকি মানে, আমরা যাকে মুড়ির চাক, ছোলার চাক বলি সেই ধরনের খাবার। নাড়ুর ধরনের নয়, নিমকির ধরনে। গুড় দিয়ে তৈরি, বাদামের, তিলের, ছোলার চাক সবারই ভাল লাগত।

খাণ্ডালা অঞ্চলে বাদাম বা ছোলার বলবার মতো চাষ হয় না। গুড় প্রস্তুতের ক্ষেত্রেও খান্ডালার কোনও লক্ষণীয় খ্যাতি নেই। চিকি তৈরির জন্যও কোনও বিশেষ কৌশল দরকার হয় না। তা হলে কেন খাণ্ডালার চিকির এত আদর জানতে সময় লেগেছিল। বছর চল্লিশ আগে জনৈক আগরওয়াল স্বাস্থ্যোদ্ধারের জন্য লোনাভালায় কিছুকাল বাস করছিলেন। ব্যবসায়ী মানুষ, অলস বসে থাকার যন্ত্রণা সইতে পারেন না। কোন খেয়ালে তিনি হঠাৎ চিকি তৈরিতে মন দিলেন, তাঁর অধস্তন পুরুষরা বলতে পারেন না। পরে কেমন করে তাঁর প্রস্তুত মগনলাল চিকি বাজারে প্রসিদ্ধি লাভ করল তার কোনও লিখিত ইতিহাস নেই। মগনলালের উত্তর পুরুষ শুধু এইটুকু জানেন যে সপ্তাহের শেষ দিকে পঞ্চাশ হাজার থেকে এক লাখ যাত্রী এই পথ দিয়ে যাবেন। এবং অনেকেই চিকি কেনার জন্য এখানে থামবেন। মগনলাল চিকির এখন মস্ত কারখানা।

অভিজ্ঞ মানুষেরা জানেন যে চিকি তৈরির জন্য কোনও কারিগরি পটুত্ব লাগে না। বাজারের সব ছাপের চিকিই সমস্বাদের। তবু তাঁদের প্রথম পছন্দ মগনলাল চিকি। বাজারের কাছে গাড়ি থামা মাত্রই অথবা বাস এসে স্ট্যান্ডে দাঁড়ানোর সঙ্গে সঙ্গেই পরিপাটি ফেরিওয়ালারা প্যাকেটবদ্ধ চিকি নিয়ে

যাত্রীদের ঘিরে ধরবে। ভোর থেকে অনেক রাত্রি পর্যন্ত ফেরিওয়ালারা চিকির প্যাকেট হাতে রাস্তার মোড়ে দাঁড়িয়ে থাকে।

খাণ্ডালা-পুনের পথে একটি নগণ্য গ্রাম ছিল। তার নাম তলেগাঁও। এখানের পয়সা গ্লাস ফ্যাক্টরি তিলকের উদ্যোগে প্রতিষ্ঠা হয়েছিল। তিলক সাধারণ মানুষকে দেশের সব কাজে যুক্ত করার একটি উপায় উদ্ভাবন করেছিলেন। প্রত্যেকের কাছ থেকে এক পয়সা চাঁদা সংগ্রহ করে মূলধন তৈরি করা হয়। সেই সঞ্চিত মূলধন থেকে পয়সা গ্লাস ফ্যাক্টরির উদ্ভব হয়েছিল। কাচের প্লেট গেলাস ইত্যাদি সাধারণ জিনিস তৈরি হত পয়সা গ্লাস ফ্যাক্টরিতে। আমি যখন দেখেছি তখন চুড়িও তৈরি হয় ওই ফ্যাক্টরিতে। যেমন হয়, বারো জনের হাতে ফ্যাক্টরির বিশেষ উন্নতি হল না। তখন প্রায় বন্ধ হয়ে এসেছে।

দূরে দু'দিকে পাহাড়ের শ্রেণী, মেঘের সঙ্গে একাকার হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। সামনে উন্মুক্ত মালভূমি, অনেক দূর পর্যন্ত দেখা যায়। তলেগাঁও আমার ভাল লাগত এই জন্য যে, এ অঞ্চলে সর্বক্ষণ হাওয়া দেয়। বিশুদ্ধ, নির্মল, ঠান্ডা হাওয়া। একমাত্র ওই বন্ধ হয়ে যাবার মুখে পয়সা গ্লাস ফ্যাক্টরি ছাড়া ত্রিসীমানায় কোনও কলকারখানা নেই।

সপ্তাহান্তে তলেগাঁও আসি। কারণ ফণী ভৌমিক ওখানে তার নিজের প্ল্যানে একটা বাড়ি তৈরি করেছে। একটা ছোট পাহাড়ের আশ্রয়ে তার বাড়ি। দশ মিনিট চড়াই ভাঙলেই পাহাড়ের চূড়া।

ফণী ভৌমিকের সঙ্গে আমার ভালবাসা বম্বে থেকে। বম্বেতে তার সফল ব্যবসা আছে। ফণীর স্ত্রী ঊষা আমার ভগিনীসমা বা তারও অধিক। ফণী প্রায় প্রত্যেক সপ্তাহে একবার তলেগাঁও আসে। ঊষা আসতে পারে না। সে নানা কাজে ব্যস্ত, মূলত সমাজসেবা, তাই সহসা বম্বে ছেড়ে আসতে পারে না।

ফণী সর্বপ্রকার হাতের কাজে দক্ষ। সেই হাতের কাজের মধ্যে রান্নাও পড়ে। এমন অবলীলায় রান্না করে যে দেখে বোঝা যায় না যে চারটে ব্যঞ্জন রাঁধতে তার কোনও শ্রম হয়েছে। অসাধারণ রান্নার হাত।

তলেগাঁওতে যেন সর্বদা শীতের শিহরন। গায় একটা হালকা চাদর জড়িয়ে বারান্দায় বসে সদ্য প্রস্তুত তপ্ত ভোজ্যগুলির সদ্ব্যবহার করে ওই বারান্দায় কম্বল মুড়ি দিয়ে শয়ন—এমন সুখের রচনা করত যে, পরিবার এবং গৃহবিচ্যুত আমি পরম আনন্দ পেতাম।

শনি ও রবিবার রাত্রি তলেগাঁওতে কাটিয়ে সকালের ট্রেনে পুনেতে

নেমে সোজা অফিস। আবার ছ'দিন দিনগত কর্তব্যের বৃত্তে বন্দি হব।

সকাল-এ কাজ বেশি নেই। দৈনন্দিন কাজ তৈলযুক্ত যন্ত্রের মতো নির্বিঘ্নে ও নিঃশব্দে সম্পন্ন হয়। নতুন কিছু করবার স্থানও নেই। তার ওপর গণতান্ত্রিক কেন্দ্রীয় সরকার নানা বিধিনিষেধ আরোপ করে খবরের কাগজের বৃদ্ধি রোধ করবার জন্য সচেষ্ট। বিশেষ করে বড় খবরের কাগজগুলির। যেহেতু তারা আর্থিক সচ্ছলতা আয়ত্তে এনেছে, তাই তারা ছোট কাগজগুলির প্রগতিতে বাধার কারণ—সরকার এই বিষয়ে নিশ্চিত।

ছোট কাগজগুলির উন্নতির জন্য, বড় কাগজগুলির গতিরোধ করার উদ্দেশ্যে কেন্দ্রীয় সরকার নানা সময়ে নানা আইন করেছিলেন। সেগুলি সুপ্রিম কোর্টে ধোপে টেকেনি। হঠাৎ একটা নতুন আইন হল, প্রাইস-পেজ-শিডিউল, অর্থাৎ কাগজের পাতার সংখ্যার সঙ্গে তার দামের সম্পর্ক। বড় কাগজগুলি, যাদের বেশি পাতা, তাদের দাম বেশি রাখতে হবে। দাম বেশি হলে সে কাগজের বিক্রি কমে যাবে, এবং ছোট কাগজগুলি সুযোগ পাবে বৃদ্ধির। এই ছিল সরকারের ইচ্ছা।

ভারতবর্ষের বড় কাগজগুলি বিশেষ বিচলিত হয়েছিল। তাদের আঘাত করার জন্যই যে এই আইন, বুঝতে অসুবিধে হয়নি। এই আইন যে সংবাদপত্রের স্বাধীনতার পরিপন্থী, এ-কথা সরকারকে বোঝানো গেল না। এই আইনে সকাল-এর কোনও ক্ষতি হত না। সকাল মাঝারি মাপের কাগজ। বড় কাগজগুলি জব্দ হলে বরং সম্ভাবনা ছিল যে সকালের কিছু সুবিধা হবে।

নানাসাহেব পারুলেকর নিজের লাভের সম্ভাবনা গ্রাহ্য করলেন না, সংবাদপত্রের স্বাধীনতার বিরুদ্ধে কোনও চক্রান্ত তাঁর সহ্য হয় না। তিনি ঘটনাটা আরও বৃহৎ পরিপ্রেক্ষিতে দেখে সরকারের বিরুদ্ধে সুপ্রিমকোর্টে আবেদন করলেন। নিজের কাজ ছেড়ে দিয়ে সলিসিটারকে সঙ্গে নিয়ে কয়েক সপ্তাহ তাঁকে দিল্লিতে থাকতে হয়েছিল, খরচও অনেক। তবু নানাসাহেব অদম্য। শেষ পর্যন্ত তাঁর জয় হল সর্বোচ্চ আদালতের রায়ে। প্রাইস পেজ শিডিউল অবৈধ ঘোষিত হয়েছিল।

এই ঘটনা আমি পুনে পৌঁছনোর আগের। তারপরও সরকারের কোনও প্রকার অনৈতিক আচরণ দেখলে পারুলেকর জ্বলে উঠতেন। সংবাদপত্রের স্বাধীনতার ক্ষেত্রে তাঁর প্রয়াস সবাই তারিফ করেছিল। বেশিরভাগ কাগজ নড়বড়ে অবস্থায়, সরকারের সঙ্গে লড়াই করবার সামর্থ্য নেই সাহসও নেই।

দু'জন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধীর পরম সহায়ক ছিলেন, তাঁর সংবাদপত্রকে নিয়ন্ত্রণ করবার প্রয়াসে। একজন ইন্দ্রকুমার গুজরাল, অন্যজন নন্দিনী শতপথী। বিভিন্ন সময়ে এঁরা তথ্যমন্ত্রী ছিলেন। ইন্দিরা গান্ধীর তুষ্টির জন্য নানাপ্রকার আইনকানুন করে সংবাদপত্রকে নিয়ন্ত্রণ করার চেষ্টা করেছিলেন। ইন্দিরা গান্ধীর প্রসাদও পেয়েছিলেন।

কার্যালয় মানে যে অফিস বা দফতর নয়, এটা জানলাম পুনেতে এসে। সহকর্মী মুহুরিরের বিয়ে হবে, আমাকে নিমন্ত্রণ করতে এসেছে। সে পুনের অধিবাসী নয়, চাকরিসূত্রে এখানে এসেছে। জিজ্ঞাসা করলাম অনুষ্ঠান কোথায় হবে? সে বলল, কেন? কার্যালয়ে।

তার মানে সকালের অফিসে খাওয়াদাওয়া হবে? মুহুরিরে তাড়াতাড়ি বলল, তা কেন? মাল্ডোই-এর কাছে যে কার্যালয় আছে, সেখানে হবে।

বুঝতে সময় লেগেছিল, কার্যালয় মানে একটি ভাড়াবাড়ি, এবং তার অধিক। বিয়ে, উপনয়ন ইত্যাদি অনুষ্ঠানের জন্য। অনুষ্ঠানের দু'-একদিন আগেই, যাঁরা ভাড়া নিয়েছেন তাঁরা এসে থাকতে পারেন। সব ব্যবস্থা আছে। কার্যালয়ে দু'বেলা সাধারণ খাওয়াদাওয়ার ব্যবস্থা তো আছেই। প্রধান অনুষ্ঠানের আগে বা পরে যে-সব ছোটখাটো আয়োজন করতে হয়, তার সব ব্যবস্থা কার্যালয় করে দেয়। অর্থাৎ নিমন্ত্রণপত্র ছাপানো থেকে শুরু করে, পত্র বিলি করা, দশকর্মভাণ্ডারের যাবতীয় জিনিসপত্র কেনাকাটা করা, স্থানটির সাজসজ্জার ব্যবস্থা করা, অতিথি অভ্যর্থনার জন্য প্রবেশপথে দাঁড়িয়ে থাকা পর্যন্ত সব কাজ কার্যালয় করে দিতে থাকে। যাকে বলে প্যাকেজ। আমার মনে হয়েছিল, হয়তো পাত্র বা পাত্রীর সন্ধানও করে দেয়।

ব্যবস্থা শুনে চমৎকৃত হয়েছিলাম। কিন্তু ভোজনে ধাক্কা খেলাম বলাই ভাল। মারাঠিদের পাকশাস্ত্র বিশেষ বড় কিছু নয়। ভারতীয় পাকপ্রণালীর কোনও বই খুললে দেখি, দু'-চার পাতায় মাত্র কয়েকটি পদের পাককৌশল, যেখানে গুজরাতি বা পাঞ্জাবি ব্যঞ্জনের বিশাল উপস্থিতি অনেক পাতা জুড়ে।

মুহুরিরের বিয়েতে নিরামিষ ভোজন ছিল। ব্রাহ্মণ ও উচ্চশ্রেণীর মানুষরা আমিষের ধার দিয়েও যান না। মুহুরিরের বিবাহ হল দিবাকালে। বিবাহের পরই অতিথিরা ভোজনের আসন নিলেন। ভাত ছিল তিনপ্রকার—সাদা ভাত, মশলা ভাত এবং মিষ্টি ভাত। এবং পুরি। সবজি বোধহয় একটাই ছিল।

পাতরেল অর্থাৎ কচুপাতায় মুড়ে বাটাডাল ভাজা ছিল। আর ছিল পাতলভাজি। এটি মারাঠিদের পরমপ্রিয় নিরামিষ ব্যঞ্জন। কচুপাতা বহুক্ষণ সিদ্ধ করে প্রায় পায়সের ঘনত্বে আনতে হয়। অবশ্যই মশলাপাতি ব্যবহৃত হয়। তবে তাও সামান্য। মিষ্টান্নর দিকটা দুর্বল ছিল। বেসনের মিষ্টি এবং জিলিপি। মনে হয়েছিল মারাঠিরা সত্যিই উচ্চমার্গের মানুষ। ভোজন নিয়ে অকারণ ব্যস্ত হয় না।

মহারাষ্ট্রের একটি মিষ্টান্ন আমায় মায়াবদ্ধ করেছে। সেটি সব অনুষ্ঠানে উপস্থিত হয় না। কিন্তু পৌঁছলে তার আদরের সীমা থাকে না। দই-জাত এই মিষ্টান্নের নাম শ্রীখণ্ড। শ্রীখণ্ড সহযোগে তপ্ত পুরি, সুখের শিখর নির্দেশ করে। শ্রীখণ্ড আমাদের মিষ্টি দই এবং ভাপা দই-এর মধ্যবর্তী। তাতে করে কিছুই বোঝানো গেল না। যেমন গরিলা, ওরাংওটাং ও মানুষের মধ্যবর্তী বললে কি সবটা বোঝানো যায়? শ্রীখণ্ডের আসল প্রকরণ হল দই থেকে জলের সম্পূর্ণ বহিষ্কার। বিবিধ সুগন্ধি মিশিয়ে শ্রীখণ্ডকে আরও মনোহর করা হয়। এলাচ, জাফরান ইত্যাদি।

আর একটি মিষ্টান্ন, মারাঠিদের ঐতিহ্যের সঙ্গে জড়িয়ে আছে, তার নাম পুরনপোলি। সহজভাষায় বলতে গেলে রুটির পাটে পাটে মিষ্টি মেশানো ছোলার ডালের পুর। এর দ্বারা কিন্তু পুরনপোলির পূর্ণ মর্যাদা প্রকাশিত হল না। সেই রুটি শুধু কোমল নয়, তাতে সামান্য কলঙ্কের দাগ থাকবে না। অর্থাৎ সেঁকার সময় আগুনের সামান্যতম ছেলেখেলা চলবে না, রুটি হবে নিষ্কলঙ্ক। কিন্তু এ হল বাইরের রূপ। ভেতরের কলাকৌশল পারিবারিক স্মৃতিতে প্রোথিত। শুনেছি সেদিন পর্যন্ত নাকি বিবাহযোগ্যা মেয়েদের যোগ্যতার চিহ্ন ছিল তার পুরনপোলি প্রস্তুত করার দক্ষতা।

অবিবাহিতা মেয়েকে পুরনপোলি তৈরি করায় পারদর্শী হতে হয়। অনেকটা আমাদের মেয়েদের কৈশোরে গান শেখার বাধ্যতার মতো। পাত্রপক্ষ যেমন বলতেন, মা, একটা গান শোনাও তো। মহারাষ্ট্রেও নাকি পুরনপোলি প্রস্তুতের ব্যাপারে প্রশ্ন করা পাত্রপক্ষের রেওয়াজ ছিল।

এ-সব আমার শোনা কথা। অভিজ্ঞতা থেকে বলতে পারি, পুরনপোলি এমন কোনও পরম স্বাদিষ্ট মিষ্টান্ন নয়। ভিন্ন রুচির্হি লোকাঃ।

রবীন্দ্রনাথের সেই লাইনদুটি মনে আছে? বেলা দ্বিপ্রহরে যে যাহার ঘরে সেঁকিছে জোয়ারি রুটি। সাধারণত বাজরা দিয়ে তৈরি হয়, জোয়ারের

ব্যবহারও চলে ভাখর রন্ধনপ্রকল্পে। ভাখর মারাঠিদের অত্যন্ত সুখের ভোজ্য, দূরযাত্রার অবলম্বন, স্বল্পবিত্তের নিয়মিত আহার্য এবং ধনীর সুখের অবসরের ভোজ্য। ভাখরের সর্বত্র উপস্থিতি। ভাখর মারাঠিদের আকাঙ্ক্ষিত ভোজ্য। বলতে পারি জাতীয় খাদ্য। প্রস্তুত করা কঠিন নয়। জোয়ার বা বাজরার আটা ভাখরের প্রধান উপকরণ। জল দিয়ে মেখে চাকিতে বেলা যায় না। দু'হাতের চাপে তৈরি ভাখর কিঞ্চিৎ মোটা হয়। সেঁকার পর অনেকদিন রেখে দিলেও খারাপ হয় না। দূর পথের যাত্রীর একদা ভরসা ছিল ভাখর।

দৈনন্দিন ভোজনের সময় ভাখরের অনিবার্য সঙ্গী ঝুনকা। ঝুনকা প্রস্তুতের প্রণালীও সহজ। বেসনকে খানিকটা জলে গুলে কড়ায় ফুটিয়ে নিলেই হল। তেল ছাড়াও মশলা কিছু দিতেই হয় রন্ধনকালে। আদা, পিঁয়াজ ধনেপাতা হতে পারে অথবা শুধুই কারিপাতা। মারাঠিদের রসনায় ভাখর ঝুনকার মতো এমন সাধারণ অথচ এমন আদরের ভোজ্য বিশিষ্ট স্থান করে নিয়েছে।

অনেকদিন পরে, এই সেদিনের ঘটনা। মারাঠিদের এই দুর্বার আকর্ষণের জন্য একদা নতুন মহারাষ্ট্র সরকার রেশনের দোকানের মতো সার সার দোকান খুলে ভাখর ঝুনকার আপ্যায়ন করিয়েছিলেন। এক টাকায় এক বেলার ভোজন হত। একাধারে প্রিয় ও পুষ্টিকর এই আহার্যের আয়োজন বেশিদিন চলেনি। শুনেছি আমাদের অন্য অনেক শুভ প্রচেষ্টার মতো অচিরে ভ্রষ্টাচারের যন্ত্রণায় সরকারকে পিছিয়ে আসতে হয়েছিল।

পুনে শহরে ছাত্রছাত্রীদের প্রিয় দুটি ভোজনশালা ছিল পুনে শহরের ডেকোন অঞ্চলে। গুডলাক রেস্টুর‍্যান্ট এবং লাকি রেস্টুর‍্যান্ট। তাদের নিবেদনগুলি ভাল ছিল সন্দেহ নেই, কিন্তু আমি দোরাবজিকে উচ্চস্থান দিই।

তবে গুডলাক বা লাকি রেস্টুর‍্যান্ট তো শুধুমাত্র ভোজনশালা ছিল না। ছাত্রছাত্রীদের আড্ডা দেবার, অভিভাবকের চোখের আড়ালে সিগারেট ধরাবার, আলোচনা করবার এবং সময়ে সময়ে তুমুল তর্ক করবার স্থান ছিল। সর্বদা প্রাণোচ্ছল, তরুণদের অলস অবসর বিনোদনের, সর্বদা মুখর জায়গা দুটি বয়স্কদেরও ভাল লাগত।

অনেক কাল আগে বাবা একটা শের শুনিয়েছিলেন:

আতা হ্যয় তুফাঁ তো আনে দো
কিশ্‌তি কা খুদা খুদ হাফিজ হ্যয়

মুশকিল তো নহি ইন মৌজোঁমে
বহতা হুয়া সাহিল আ যায়।

ঝড় উঠেছে, উঠুক, স্বয়ং ভগবানই নৌকার সহায়। এই তরঙ্গের মধ্যে একটা দ্বীপ ভেসে আসা অসম্ভব নয়।

বিপত্তির সময়ে সকাল-এ কাজ করবার সুযোগ যেন তরঙ্গসংকুল সমুদ্রের মধ্যে অভাবনীয় দ্বীপের মতো ভেসে এসেছিল। আশ্রয় নিতে দ্বিধা করিনি। কাজে যথেষ্ট আনন্দ পেয়েছি। কিন্তু কাজের পরিমাণ সামান্য। আট-দশ পাতার দৈনিকপত্র। অল্প কয়েকজন কর্মী। কোথাও কোনও সমস্যা নেই। তরঙ্গহীন সমুদ্রে মসৃণ এগিয়ে চলেছে।

মনে হল সকালের যাত্রায় অনেক গতি আনবার সুযোগ আছে। মহারাষ্ট্রের একপ্রান্তে প্রকাশিত সকাল যেন তার যোগ্য মর্যাদা পাচ্ছে না। যতই হোক, পুনে মফস্‌সল শহর। রাজধানী থেকে প্রকাশিত না হলে সকাল-এর ন্যায্য বৃদ্ধি হবে না। নানা সাহেবকে রাজি করাতে অসুবিধা হল না। তার আগে কয়েকটি দৈনিকপত্র শুরু করবার অভিজ্ঞতা আছে আমার। সকাল বম্বে থেকেও প্রকাশিত হবে।

নানাসাহেব সাধারণত কোনও কঠিন পরিকল্পনায় যেতে চান না। অবশ্য নীতিগত প্রশ্ন জড়িত থাকলে যে-কোনও বিপজ্জনক, নিজের ক্ষতিকর কাজ করতেও দ্বিধা করেন না। সতেরো-আঠারো বছর আগে এমনই নীতিগত কারণে সকল কেন্দ্রীয় সরকারের বিজ্ঞাপন ছাপা বন্ধ করে দিয়েছিল। কেন্দ্রীয় সরকারের এই বিজ্ঞাপন প্রসাদের আকাঙ্ক্ষায় অন্য বেশির ভাগ খবরের কাগজ, বিশেষ করে দুর্বল কাগজগুলি ব্যগ্র হয়ে থাকত, সেক্ষেত্রে সরকারের অন্যায় আচরণের প্রতিবাদ-স্বরূপ সকাল তাদের বিজ্ঞাপন ছাপত না। ক্ষতি বেশি হত কাগজের। কেন্দ্রীয় সরকারেরও ক্ষতি হত। কিন্তু সে তো বারোভূতের মা, লাভলোকসানে তার কী আসে যায়। কেন্দ্রীয় সরকার কাগজে বিজ্ঞাপন ছাপার যে হার ঘোষিত হত, তা দিতে চাইতেন না, নিজেরা বিজ্ঞাপন ছাপানোর দাম ঘোষণা করতেন। ভারতবর্ষের প্রায় সব কাগজই এই অবাঞ্ছিত হস্তক্ষেপ কার্যত স্বীকার করে নিয়েছিল। ড. পারুলেকর সতেরো-আঠারো বছর প্রতিবাদে সরকারি বিজ্ঞাপন বর্জন করেছিলেন।

তিনি বম্বে থেকে সকাল প্রকাশের লাভক্ষতির অনিশ্চয়তা ভুলে আমার সঙ্গে প্রস্তুতিপর্বে কোমর বেঁধে যোগ দিলেন।

বাড়ি ভাড়া করে সকাল প্রকাশ করায় তাঁর ঘোর আপত্তি। আমরা দু'জন সপ্তাহে এক দু'বার বম্বে যাই, কোথায় আমাদের কাজের উপযুক্ত জায়গায় বাড়ি পাওয়া যায়, তার সন্ধানে। মনোমতো একটা সুযোগ এসেও গেল। বড় জমির একপাশে দোতলা বাড়ি, সামনের অংশে কারখানা বসবার যোগ্য মস্ত একটা হলঘর। নিশ্চয় দরকষাকষি করলে আরও কমদামে পাওয়া যেত। কিন্তু নানাসাহেব অধৈর্য। সিদ্ধান্ত যখন হয়েই গিয়েছে, তা হলে কয়েক লক্ষ টাকা বাঁচাবার জন্য দেরি করা তাঁর স্বভাবে নেই।

শহরের কেন্দ্রে প্রভাদেবী অঞ্চলে সকালের বাড়ি কেনা হল।

আমাদের কাজের উপযোগী করতে মাস তিনেক সময় লাগল। ইতিমধ্যে পুনে থেকে নতুন, অব্যবহৃত একটি মুদ্রণযন্ত্র এসে গিয়েছে, চালু করবার কাজ চলেছে। মুদ্রণযন্ত্রটি আমেরিকার বিখ্যাত গস কোম্পানির তৈরি। নাম সাবার্বান অফসেট প্রেস। তখনও অফসেট পদ্ধতিতে দৈনিক কাগজ ছাপা শুরু হয়নি ভারতবর্ষে। শুধু ইন্দোরের দুঃসাহসী কাগজ নঈ দুনিয়া বছর দশেক আগে অফসেট পদ্ধতিতে ছাপতে আরম্ভ করেছে। পাঞ্জাবে পাঞ্জাব কেশরী—হিন্দ সমাচার গোষ্ঠী এই পদ্ধতিতে যাবার কথা ভাবছে। তখনও কেউ ভাবছে না যে আজকের লেটারপ্রেস পদ্ধতি অচল হয়ে গিয়ে দশ বছরের মধ্যে সারা পৃথিবী এবং ভারতবর্ষে অফসেট ছাড়া গতি থাকবে না।

বম্বেতে সকালের অফিস হবার বছর তিনেক আগে নানাসাহেব আমেরিকায় গিয়েছিলেন। অভিজ্ঞ, অনুভূতিশীল মানুষের বুঝতে অসুবিধা হয়নি যে, অফসেটই মুদ্রণশিল্পের ভবিষ্যৎ। তৎক্ষণাৎ নামী কোম্পানির সাবার্বান প্রেসের বরাত দিয়েছিলেন। যন্ত্রটি আমি পুনে যাবার আগে এসেও গিয়েছিল। এখন বম্বেতে এনে বসানো হল।

পুনে ও বম্বেতে একযোগে সকাল প্রকাশিত হতে লাগল। একটি কাগজ একাধিক স্থান থেকে প্রকাশিত হবার সূচনা করে স্টেটসম্যান। শতাধিক বছরের প্রাচীন কলকাতার স্টেটসম্যান, দিল্লি থেকে ১৯৩১ সালে একটি সংস্করণ প্রকাশ করে সময়ের সঙ্গে পা মিলিয়েছিল। কিন্তু কোনও কারণে বেশি এগুতে পারেনি। সকাল-এর ভারতবর্ষের দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশের আগে অনেক কাগজেরই একাধিক সংস্করণ হয়ে গিয়েছিল।

বম্বে সকাল-এর উদ্বোধনে বিশেষ ঘটা হল না। এটাই সকাল-এর প্রথা। বম্বে সংস্করণের বিক্রয় সংখ্যা আমাদের আশানুরূপ হয়নি। প্রত্যাশা বেশি ছিল

বলে ঈষৎ দমে গিয়েছিলাম। পরে বুঝেছিলাম যে সকাল-এর পরিচয় মফস্‌সলের কাগজ হিসাবে। রাজধানীতে নিজের স্থান করে নিতে সময় লাগবে, যতদিন না সকাল-এর মফস্‌সলের ছাপ মুছে যায়। ভাগ্যক্রমে সকাল-এর ধীরে হলেও অগ্রগতি অব্যাহত থাকল।

টাইমস অফ ইন্ডিয়ার আমেদাবাদ সংস্করণ ও বম্বে সকালের প্রকাশের সময় প্রথম জেনেছিলাম যে কুরিয়ার সার্ভিসের প্রবর্তন প্রথম বম্বেতেই হয়েছিল। আমেদাবাদ থেকে বম্বেতে কোনও কিছু পাঠাতে হলে সেই সার্ভিসের শরণাপন্ন হতে হত। গুজরাতিরা এই সার্ভিসকে বলতেন আংগাডিয়া সার্ভিস। আমেদাবাদ থেকে সন্ধ্যায় পাঠিয়ে দিলে পরের দিন দশটার মধ্যেই বম্বেতে পৌঁছে দিত আংগাডিয়া। পুনে ও বম্বের মধ্যে অনুরূপ ব্যবস্থার নাম ছিল প্রবাসী। সকালে দিলে দুপুরেই প্রবাসী পাঠানো বস্তুকে বম্বেতে পৌঁছে দিত। সামান্যই খরচ লাগত। অনেকে মাসিক টাকা দিয়ে নিয়মিত এই ব্যবস্থার সাহায্য নিতেন।

পুনে বম্বের মধ্যে প্রবাসী সার্ভিস আমাদের দুর্মূল্য টেলিফোনের খরচা অনেক কমিয়ে দিয়েছিল। সস্তার টেলিফোন, উপগ্রহ মারফত নিজস্ব যোগাযোগ তখনও কল্পকাহিনীর পর্যায়ে। মাদ্রাজের হিন্দু কাগজ টেলিফোন লাইনে তার পাতাগুলি মাদ্রাজ থেকে অন্য প্রকাশন কেন্দ্রে পাঠাবার আয়োজন করেছিল সর্বপ্রথম। অর্থাৎ, মূল সংস্করণের পাতাগুলির ছবি অবিকৃত অন্য প্রকাশনকেন্দ্রে পৌঁছে যেত কয়েক মিনিটের মধ্যে। শাখা প্রকাশন কেন্দ্রগুলিতে ছাপার আয়োজন থাকলেই যথেষ্ট। সেখানে পাতা তৈরি করবার প্রয়োজন নেই।

যেহেতু বম্বে পুনের দূরত্ব সামান্য, সকালের পক্ষে প্রবাসী সার্ভিস প্রয়োজানুরূপ ছিল। তা ছাড়া বম্বে সংস্করণের পাতা বিশেষ করে বম্বের জন্য তৈরি না করলে সকালের মফস্‌সলি ছাপ ঘুচত না।

বম্বেতে দুই বর্ণময় ব্যক্তিত্বের সঙ্গে আমার পরিচয় ছিল। দুই বিপরীত চরিত্রের মানুষ। ব্লিৎজ সাপ্তাহিকের মালিক আর কে করঞ্জিয়া এবং কারেন্ট কাগজের মালিক ডি এফ করাকা। দু'জনই পারশি। আর কে করঞ্জিয়া, রুসি, বামপন্থী। ডি এফ অর্থাৎ দোসু করাকা দক্ষিণপন্থী। রেশারেশি খুব ছিল দু'জনের মধ্যে। পরস্পরের বিরুদ্ধে নিজের কাগজে লেখা অনেক সময় মাত্রা ছাড়িয়ে যেত।

প্রত্যক্ষ বামপন্থার সঙ্গে রুসির কতটা প্রাণের যোগ ছিল বুঝতে পারিনি। তিনি মোরারজি দেশাই-এর তীব্র সমালোচক। তাঁর কোনও কাজই রুসির সমর্থন পায় না। রুসি মদ্যনিরোধ নীতির প্রকাশ্য বিরোধী, এই আইন ভাঙতে ভালবাসতেন। মেরিন ড্রাইভের ওপর এক বাড়ির একতলায় তাঁর ফ্ল্যাট। বসবার ঘর দেখলে মনে হবে কোনও পানশালায় বুঝি ভুল করে ঢুকে পড়েছি। তাঁর বন্ধু-বান্ধব সহযোগে সেখানেই নির্ভয়ে মদ্যপান হত। বিলাতি মদ্যে তাঁর পানশালা সর্বদা ভরা থাকত। তিনি আমার বিপদ আপদে অনেক সাহায্য করেছেন।

টাইমস ছাড়ার পর রুসি আমাকে বলেছিলেন, তুমি ভাল কাজ করেছ। এবারে বোরি বন্দরের বৃদ্ধার বিরুদ্ধে অসি-চালনা করো। তুমিই পারবে। রামায়ণে আছে, রাবণের পরিবারের কারও সাহায্য না পেলে কি রাম লঙ্কা জয় করতে পারতেন। কাকে রাম বলে উল্লেখ করলেন রুসি বুঝতে পারিনি। আমার নিন্দা হল না প্রশংসা তাও বুঝিনি। টাইমস অফ ইন্ডিয়াকে তার রক্ষণ-শীলতার জন্য বোরি বন্দরের বৃদ্ধা বলা হত।

রুসি করঞ্জিয়া বলতেন, তাঁকে লোকে কী করে কমিউনিস্ট বলে? তিনি তো ব্যক্তিকেন্দ্রিক আধিপত্যের প্রবক্তা। ব্লিৎজ কাগজ তাঁর ব্যক্তিগত সম্পত্তি। তিনি পানভোজনে আসক্ত। সব রকম অভিজাত অভ্যাসে তাঁর অকুণ্ঠ রুচি। অতি মূল্যবান, শোভন পরিচ্ছদ পরেন।

করঞ্জিয়া ব্যবসায়ে চতুর ছিলেন। তাঁর কাগজ নেহরুকে সর্বাবস্থায় সমর্থন করত। নেহরুর মন্ত্রিসভার দু'-একজনকে বাদ দিয়ে সবাইকে তাঁর আক্রমণ সহ্য করতে হয়েছে। এই ক'জনের মধ্যে ছিলেন, কৃষ্ণ মেনন, টি টি কৃষ্ণমাচারী, রঘুনাথ রেড্ডি। নেহরুর প্রবল সমর্থক হবার কারণে কেউ তাঁর কোনও ক্ষতি করতে পারেনি।

দোসু করাকা আচরণে এবং মনে প্রাণে দক্ষিণপন্থী। তিনি ইংরেজি লিখতেন খুব ভাল। কিন্তু তাঁর কাগজ কারেন্ট করঞ্জিয়ার ব্লিৎজের তুলনায় নিস্প্রভ ছিল। নেহরু ও ইন্দিরার আমলে, যখন হাওয়া বইছে বাঁ দিকে, তিনি বিশেষ সুবিধা করতে পারেননি। কারেন্টের বিক্রি ব্লিৎজের চেয়ে অনেক কম ছিল। কিন্তু শিল্পপতিদের সহানুভূতি ছিল তাঁর প্রতি। কারেন্ট বিজ্ঞাপন ভাল পেত। তবুও শেষ পর্যন্ত তিনি কাগজটা বিক্রি করে দিলেন। নিঃসন্তান মানুষ, হয়তো সে কারণেই। কিছুদিন বই লিখলেন, দু'-একটা কাগজে কিছুদিন কলমও লিখেছিলেন। অসময়ে মারা গেলেন।

দোসু করাকা অক্সফোর্ডে লেখাপড়া করেছেন। অক্সফোর্ড ইউনিয়নের প্রথম ভারতীয় প্রধান। দোসু ব্যারিস্টারি পাশ করে কিছুদিন বম্বেতে প্র্যাকটিসও করেছিলেন। বৃত্তি বদলে বম্বে ক্রনিকল দৈনিকপত্রে যোগ দিয়েছিলেন। দ্বিতীয় মহা যুদ্ধের সময় সমরাঙ্গণে প্রতিবেদকের কাজ করেছেন। তারপর ১৯৫০ সালে নিজের কাগজ সাপ্তাহিক কারেন্ট প্রকাশ করলেন। তাঁর লেখনী শাণিত ছিল। সুখপাঠ্য ইংরেজি লেখেন। আয়ব্যয়ের কাজটা ভাল জানতেন না। সব সময় টাকার দরকার পড়ত।

টাইমস অফ ইন্ডিয়া তাঁর একটা বই প্রকাশ করেছিল। ছত্রপতি শিবাজি মহারাজের জীবনী। বইটির নাম শিবাজি। আরও কুড়ি-বাইশটি বই লিখেছিলেন। তার মধ্যে আই গো ওয়েস্ট বইটির প্রচুর বিক্রি হয়েছিল। পশ্চিম দেশের সমাজের ওপর এমন শ্লেষাত্মক বই বেশি নেই।

রুসি করঞ্জিয়ার ব্যবসায়িক সাফল্যের ঈর্ষা করতেন দোসু করাকা। তাঁর ব্যবসা-বোধ ছিল না। তিনি স্বতন্ত্র মহারাষ্ট্র রাজ্যে প্রথম মুখ্যমন্ত্রী চ্যবনের সমর্থক ছিলেন। চ্যবনের পূর্বগামী মোরারজি দেশাই রুসির বিরাগ অর্জন করেছিলেন। দোসু করাকা মোরারজি একটি সুপাঠ্য জীবনী রচনা করে প্রশংসা পেয়েছেন। দু'জনের একটি বিষয়ে মিল ছিল। নানাসাহেব পারুলেকর দু'জনেরই চোখের বালি। তিনি কখন কার ওপর বিরক্ত হবেন, এঁরা বুঝতে পারতেন না। যদিও পারুলেকর কারও কোনও ক্ষতি করতে চাইতেন না। অযথা কারও সমালোচনা করাও তাঁর অভ্যাস নয়।

বম্বে-পুনের পথে প্রায়ই যাতায়াত করতে হয়। এই পথ আমাকে চিরকাল মোহিত করেছে। জীবন আবার মসৃণ গতিতে চলতে আরম্ভ করল। রাজ্য ও দেশ, দুই-ই তখন শান্ত। দেশে এমার্জেন্সি আসন্ন, আমরা বুঝতে পারিনি।

সকাল-এর বম্বে অফিসে কাজ করছি। হঠাৎ ঘরে ঢুকলেন বম্বের একদা মুকুটহীন রাজা এস কে পাটিল।

পাটিল তখন কেন্দ্রীয় মন্ত্রিত্ব ছেড়েছেন। তবুও এই শহরে তাঁর দাপটের কিছুমাত্র হানি হয়নি। পাটিল দক্ষিণ বম্বে থেকে বরাবর লোকসভায় নির্বাচিত হয়েছেন। বম্বে কংগ্রেসের ওপর তাঁর নিরঙ্কুশ প্রভাব। মানুষটা পদমর্যাদার গৌরব প্রকাশ করেন না। কাজে অকাজে যখনই টেলিফোন করেছি, তিনি নিজে ফোন ধরতেন। কখন দেখা করব, নিজেই বলে দিতেন। কোনও

সেক্রেটারি বা সহায়কের সঙ্গে পরামর্শ করতে হত না। মানুষকে সাহায্য করতে দ্বিধা করতেন না। কট্টর দক্ষিণপন্থী। তখন বাম হাওয়া বইতে শুরু করেছে, তাই তাঁর শত্রুরও অভাব ছিল না। শিল্পপতিরা তাঁকে সমীহ করতেন।

এস কে পাটিল স্বয়ং অঘোষিত সকাল অফিসে আসায় তখন দিনের বেলা অফিসে যে ক'টি কর্মী কাজ করছিল, সারা অফিসে সাড়া ফেলে দিল। এস কে পাটিল আমার সামনের চেয়ারে বসলেন। সকাল কেমন চলছে খোঁজখবর নিলেন। তারপর যেমন এসেছিলেন, তেমনই কোনও বিদায় নেবার ঘটা না করে চলে গেলেন।

মানুষটা এমনই। তাঁর বাড়িতে গিয়ে দরজায় ঘণ্টি বাজিয়েছি, তিনি স্বয়ং এসে দরজা খুলে দিলেন, এমনও হয়েছে। যাকে বলি চালচুলো নেই। কিন্তু দাপটে অদ্বিতীয়।

বহু মন্ত্রী এবং নানাবিধ পদাধিকারীর সঙ্গে বিভিন্ন সময়ে দেখা করতে হয়েছে। এস কে পাটিলের বাড়িতে গেলে কিন্তু চা ও জলখাবার আসবেই। তিনি যখন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী, তখনও। কখনও অন্যথা হয়নি। ভদ্র, তীক্ষ্ণ-বুদ্ধিসম্পন্ন, প্রভাবশালী এই রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব কেন নিজের ভবিষ্যৎ আন্দাজ করতে পারলেন না, এটা আমার কাছে পরম বিস্ময়ের। শেষে লোকসভার দুটি নির্বাচনে জিততেও পারলেন না ভারতীয় রাজনীতি থেকে নির্বাসিত হয়ে ক্রমশ বিস্মৃত হলেন।

কিছুদিন ধরে ড. পারুলেকরের শরীর ভাল যাচ্ছিল না। প্রায়ই বিকালে আর অফিসে আসতেন না। বাড়িতে বসে অফিসের কাজ করতেন। এতদিন তাঁর ব্যাধির কথা কাউকে বলেননি। এখন জানা গেল তিনি কর্কটরোগে আক্রান্ত হয়েছেন। নিজে এই ব্যাধির আক্রমণের কথা জানতেন, কাউকে সে-খবর দিয়ে বিব্রত করতে চাননি। ব্যাধির প্রকোপ দ্রুত বৃদ্ধি পেতে লাগল। অফিসে আসা একেবারেই বন্ধ হয়ে গেল। তাঁর আপ্তসহায়ককে বাড়িতে ডাকতেন। পরে শুনলাম তিনি নিজের জীবনী শ্রুতিলিখন করাচ্ছেন।

আমি অফিস থেকে ফেরার পথে নিয়মিত তাঁর বাড়িতে যাই। শায়িত নানাসাহেবের পাশে চেয়ারে বসি। আমাকে দেখে খুশি হন। অফিসের খোঁজখবর পান। নিজে বেশি কথা বলতে পারেন না। বুঝতে পারি, ক্লান্ত হয়েছেন। আমার জন্য হুইস্কির ডিক্যান্টার আসে। তাঁর সামনে বসে একা পান করতে ইচ্ছা করে না আমার। তিনি বললেন, ডাক্তার বলেছে সামান্য ওয়াইন ছাড়া তাঁর অন্য কোনও উগ্র পানীয় নেওয়া বারণ। জানি, ওয়াইন বলতে নানাসাহেব বোঝেন ফ্রেঞ্চ ওয়াইন। কোথায় পাব সেই মদিরা? অতএব একটা ভাল শেরির বোতল জোগাড় হল লীলার চেষ্টায়।

এর পর থেকে সন্ধ্যায় আমাকে যখন হুইস্কির গেলাস নিয়ে বসতে হয়, নানাসাহেবের জন্য এক চামচ শেরি আসে গেলাসে। যখন দেখি তিনি ক্লান্তিতে আচ্ছন্ন হয়ে আসছেন, তখন চলে আসি।

মাঝে মাঝে বম্বে যেতেই হয়। হয় সেদিনই, নয়তো পরের দিন ফিরে আসি। এক সন্ধ্যায় বম্বে অফিসে বসে আছি, খবর এল নানাসাহেব আর নেই। গাড়ি করে পুনে ফিরতে রাত্রি একটা বেজে গিয়েছিল। তাঁর বাংলোয় বুঝি সকাল-এর সব কর্মীই জড়ো হয়েছেন। শহরের মানুষেরা অনেকে তখন চলে গিয়েছেন। আমি তাঁর বিছানার পাশে গিয়ে বসলাম, যেমন নিয়মিত বসেছি গত কয়েকদিন ধরে।

মনে পড়ল দিন সাতেক আগে এমনই বসে ছিলাম তাঁর শয্যার পাশে হুইস্কির গেলাস হাতে নিয়ে। নানাসাহেব হঠাৎ বললেন, তোমাকে একটা কথা বলার আছে। আমার এক খণ্ড জমি আছে আউন্ধের কাছে। সেই জমি আমি পাঁচভাগ করেছি। প্রত্যেক ভাগ প্রায় পাঁচশো বর্গমিটার। এক ভাগ আমি তোমাকে দিয়ে যেতে চাই। আমার ইচ্ছা তুমি সেইখানে বাড়ি করে সপরিবার সুখে থাকবে।

নানাসাহেবের সঙ্গে আমার বন্ধুত্ব। জানি তিনি আমাকে স্নেহ করেন। তাঁর কথায় আমি নির্বাক হয়ে গেলাম। সকাল-এর সঙ্গে আমার সম্পর্ক তো মাত্র তিন বছরের। অভিভূত হয়ে যাওয়াই স্বাভাবিক। বললাম, আমাকে কেন দেবেন। আপনার স্ত্রী রয়েছেন, মেয়ে লীলা রয়েছে, এ-সবই তো তাদের প্রাপ্য। নানাসাহেব বললেন, তাদের ব্যবস্থাও করেছি। তোমার পাশেই এক খণ্ড জমি মাদামের জন্য। আমাদের সলিসিটর জশুভাই, আমার আপ্তসহায়ক, আর কে ই এম হাসপাতালের কাজে আমার সহকারী নাদকার্নির জন্যও এক এক খণ্ড জমি উইল করে দিয়েছি। লীলার অন্য ব্যবস্থা। তুমি কিন্তু ওই জমিতে বাড়ি কোরো।

ব্যাধির জন্য, না আবেগে তাঁর গলা বুজে এসেছিল ধরতে পারিনি। মনে মনে বললাম, স্নেহের দান মাথায় করে রাখব। রাখতে পারিনি, সে অন্য কাহিনী। সুদুর মহারাষ্ট্রের একজন দেশস্থ ব্রাহ্মণ বাংলার অব্রাহ্মণ, অল্পদিনের পরিচিত মানুষ আমাকে উইল করে পুনে শহরে জমি দিয়ে যাবেন, তার গুরুত্ব আমি সেই মুহূর্তে বুঝতে পারিনি।

নানাসাহেবের শেষের ক'দিনে লেখা আত্মজীবনী প্রকাশিত হয়েছিল তাঁর মৃত্যুর পরে। বইয়ের নাম দেবাচী ঘণ্টা। অর্থাৎ, ঈশ্বরের ডাক। তাঁর নিশ্চয়ই আরও অনেক কথা বলার ছিল। পীড়িত শরীরে শেষের ক'দিনে এর বেশি লিখতে পারেননি।

ওই বই থেকেই প্রথম জানলাম তিনি ক্যান্সারে আক্রান্ত হয়েছিলেন তিন বছর আগে। রোগের সংক্রমণ হয়েছিল প্যাংক্রিয়াসে। অসহ্য যন্ত্রণা হত। ক্লান্তি বোধ করছি বলে যখন একা থাকতে চাইতেন, তখন যন্ত্রণা আর সহ্য হচ্ছে না। লিখেছেন, হিরণ্যকশিপুর উদর বিদীর্ণ করার মতো, আমার মনে হত নখরাঘাতে অন্তঃস্থ সব কিছু ছিন্ন করে ফেলি।

নানাসাহেবের উইলে কয়েকটি ট্রাস্ট গঠনের নির্দেশ ছিল। মেয়েকে কোনও

কিছু দিয়ে যাননি। ট্রাস্টগুলির আয় থেকে মেয়ের জন্য যথোপযুক্ত ব্যবস্থা করে গিয়েছিলেন। তাঁর একমাত্র সন্তানকে উত্তরাধিকার থেকে বঞ্চিত করার কারণ, অনুমান করি, তিনি ঈষৎ চপলমতি মেয়ের বুদ্ধি বিবেচনার অভাবের জন্য তার স্বার্থেই ট্রাস্টগুলি তৈরি করতে বলেছিলেন।

নানাসাহেবের শেষযাত্রায় পুনের গণ্যমান্য মানুষ থেকে সাধারণ মানুষ, সবাই যোগ দিয়েছিলেন। সাধারণ মানুষ নানাসাহেবকে নামেই জানত। তাঁকে চিনত তাঁর লেখার মধ্যে দিয়ে। সবাই তাঁর ক্ষীণ ক্ষুদ্র শরীরকে শ্রদ্ধা জানাতে এসেছিল। অন্ত্যেষ্টি শেষ হতে সন্ধ্যা হয়ে গিয়েছিল।

সহকারী সম্পাদককে সম্পাদকের ভার দেওয়া হল। পুনেতে থাকেন সকাল-এর একজন ডিরেক্টর, ডা. মিসেস কয়াজি। দীর্ঘকাল নানাসাহেবের সঙ্গে সমাজসেবা করেছেন। পুনের কে ই এম হাসপাতালকে বড় করে তোলবার কাজে দু'জনের অবদান সামান্য নয়। ডা. মিসেস কয়াজি আপাতত ডিরেক্টর বোর্ডের তরফে সকাল-এর দেখাশোনা করবেন।

শ্রাদ্ধাদি শেষ হল। মাঝে মাঝে আমাকে বম্বে যেতে হয়। নিজের কাজে উৎসাহ হারিয়ে ফেলছি। মনের কথা বলার মানুষ পাই না, যার সঙ্গে আমার ভাবনার মিল আছে।

একটা যুগ শেষ হয়ে গেল। ডিরেক্টররা সবাই পুরাতন। আমার সঙ্গে তাঁদের পরিচয় আছে। তবু কাজ করতে তেমন স্বাধীনতা পাব না মনে হচ্ছে। মনের আনন্দ কমে এল। মনস্থির করতে বেশিদিন লাগল না। সকাল-এর কাজে ইস্তফা দিলাম।

বম্বে ফিরে এলাম। অগ্রপশ্চাৎ চিন্তা করিনি। আমার বন্ধু দিল্লির কোহলি সাহেব খবর পেয়েই ফোন করলেন। বললেন, তুমি দিল্লি চলে এসো। আমার সঙ্গে কাজ করো।

কে ডি কোহলি অফসেটে ছাপার রোটারি মেশিন তৈরি করেন। ভারতবর্ষে প্রথম। শুরুর সমস্যাগুলি পার হয়ে এসেছেন। এখন দ্রুত বৃদ্ধির সময়। তাঁর বড় ছেলে সুইজারল্যান্ডে ইঞ্জিনিয়ারিং পড়ে, ছোট ছেলে তখনও স্কুলে। আমি যোগ দিলে তাঁর কাজে সাহায্য হতেই পারে। কিন্তু তাঁর ব্যবসা অন্য ধরনের, আমার সে-বিষয়ে আদৌ অভিজ্ঞতা নেই।

ইন্দিরা গান্ধীর দাপট তখন মধ্যগগনের সূর্যের মতো তীব্র। সামান্যমাত্রও

সমালোচনা সইতে পারেন না। সহযাত্রী খবরের কাগজগুলি ছাড়া অন্য কাগজেরা তাঁর চোখের বালি। কীভাবে তাদের পদানত করা যায়, সে-চেষ্টায় তাঁকে সাহায্য করবার জন্য অনুগতদের মধ্যে যোগ দিয়েছেন আর একজন মন্ত্রী, রঘুনাথ রেড্ডি। শ্রমমন্ত্রী।

বশংবদ কয়েক মন্ত্রী, কিছু চাটুকার আমলা এবং সাংবাদিক গোপনে একটি দলিল তৈরি করছিলেন খবরের কাগজের বিষয়ে। খবরের কাগজকেই রাজনীতির মানুষদের, ক্ষমতার অধিকারীদের প্রধান শত্রু বলে চিহ্নিত করা হয়েছে তখন। সেই গোপন দলিলের খবর আচমকা প্রকাশিত হয়ে গেল। দলিলের মূল উদ্দেশ্য হল কাগজগুলিকে দুর্বল এবং নির্বিষ করে দেওয়া। প্রস্তাব ছিল কাগজের মালিকানা এক পরিবারের বা অল্প কয়েকজনের হাতে থাকা চলবে না। কর্মচারীদেরও মালিকানার অংশীদার করতে হবে। ইংরেজি শব্দ ব্যবহার করা হয়েছিল 'ডিফিউশান'।

সরকার, বিশেষ করে প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধী প্রসন্ন ছিলেন না শিল্পপতিদের ওপর। তিনি নিজে তখন রক্তাম্বর পরিহিতা। শিল্পপতিদের স্বাধীনতা দমন করতে প্রচণ্ড আগ্রহী। তাঁদের সংবিধান-অনুমোদিত মতপ্রকাশের স্বাধীনতা থেকে বঞ্চিত করতে আগ্রহী। শিল্পপতিরা ধনবান, সেটা তাঁদের শক্তির উৎস। তাঁদের হাতে সংবাদপত্র থাকলে তাঁদের শক্তি বৃদ্ধি পায়। অতএব প্রস্তাব করা হয়েছিল খবরের কাগজ থেকে শিল্পপতিদের বিচ্ছিন্ন করা হবে। ইংরেজিতে এক শব্দে বলা হয়েছিল 'ডিলিঙ্কিং'।

গোপন দলিলের দুরভিসন্ধির সংবাদ অকস্মাৎ প্রকাশিত হতেই খবরের কাগজের মালিকরা সন্ত্রস্ত হয়ে পড়লেন। দেশ জুড়ে আলোচনা শুরু হল। শুনলাম সেই সময় প্রধান ভারতীয় খবরের কাগজগুলির কয়েকজন মালিক ম্যানিলার পথে যাত্রা করেছেন। ম্যানিলাতে প্রেস ফাউন্ডেশন অফ এশিয়ার মিটিং-এ তাঁরা যোগ দেবেন। খবরটা শুনেই মাঝপথে যাত্রা স্থগিত রেখে তাঁরা সিঙ্গাপুর থেকে দেশে ফিরে এলেন। অমৃতবাজার পত্রিকার তরুণকান্তি ঘোষ এবং হিন্দুর জি নরসিংহম সেই দলে ছিলেন। নিজেদের অস্তিত্বের ওপর আক্রমণের আশঙ্কায় কে স্থির হয়ে থাকতে পারে?

মিহিরলাল গাঙ্গুলি তখন অমৃতবাজার পত্রিকার জেনারেল ম্যানেজার। তাঁর সঙ্গে আমার পরিচয় ইন্ডিয়ান অ্যান্ড ইস্টার্ন নিউজপেপার সোসাইটির মিটিং-এ। আমরা উভয়েই ওই সোসাইটির পরিচালন কমিটির সদস্য।

দেখলাম ডিফিউশন এবং ডিলিঙ্কিং-এর ব্যাপারে তিনিও সমান উত্তেজিত। তিনি নিজে মালিক নন। উচ্চ পদাধিকারী। তাঁর উত্তেজনা আমাকে বিস্মিত করেছিল।

তখনও মিহির গাঙ্গুলিকে ভাল করে জানি না। পরে দেখে আশ্চর্য হয়েছি তাঁর নিজের খবরের কাগজ এবং সে-কাগজের মালিকদের প্রতি একনিষ্ঠ আনুগত্য দেখে। তখন ভাবিওনি যে একদা আমি তাঁর সহকর্মী হব, এবং তাঁরই উদ্যোগে তাঁর পাশে চলে আসব।

সকাল ছাড়বার পর দিনকয়েক বিশ্রাম নেব ঠিক করেছিলাম। বম্বের বাইরে কোথায় যেন গিয়েছিলাম দু'-তিনদিনের জন্য। ফিরে এসেই কলকাতা থেকে মিহিরবাবুর টেলিফোন পেলাম। এর আগে আমাকে কখনও টেলিফোন করেননি। নিউজপেপার সোসাইটির মিটিং-এ দেখা হয়। নানা বিষয়ে আলোচনা হয়, দু'-এক সন্ধ্যা পান-ভোজনের আসরে দু'জনে মিলিত হই। তার অধিক ঘনিষ্ঠতা হয়নি।

মিহিরবাবু প্রথমেই বললেন, আপনি না বলবেন না। আপনাকে আসতেই হবে।

ক্রমশ প্রকাশ পেল তিনি চান আমি তাঁর সঙ্গে কলকাতার অমৃতবাজার পত্রিকায় যোগ দিই, এই তাঁর ইচ্ছা এবং সনির্বন্ধ অনুরোধ।

এই প্রস্তাবের জন্য আমি প্রস্তুত ছিলাম না। বলতে হল, আমাকে একটু ভাববার সময় দিন। কিন্তু মিহিরবাবু তৎক্ষণাৎ আমার সম্মতি চান। তাঁকে নিরাশ করতে হল। বললেন, কাল আবার ফোন করবেন।

কী করে তাঁকে বোঝাব যে একদিনে এই সিদ্ধান্ত নেওয়া যায় না। কুড়ি বছরের বম্বেবাস সহসা তুলে ফেলার কথা স্থির করা সম্ভব নয়। তখনও মিহিরবাবুর চরিত্র আমার অজানা। কোনও কাজ হাতে নিলে, কোনও কাজ করতে হলে তিনি কাজটা না শেষ হওয়া পর্যন্ত তাঁর লক্ষ্যে অচল থাকবেন, কিছুতেই বিচ্যুত হবেন না। কোনও বাধা মানবেন না। বিশেষ করে সেই কাজ যদি অমৃতবাজার পত্রিকার প্রয়োজনে হয়। লক্ষ্যের অবিচল অনুসরণের এই স্বভাব মিহিরবাবুকে অমৃতবাজার পত্রিকার মালিকদের প্রিয় করেছিল। যদিও পদ ছিল জেনারেল ম্যানেজারের, তাঁর মূল কাজ ছিল কাগজের সমৃদ্ধি বাড়ানো।

কলকাতার অমৃতবাজার পত্রিকা, যুগান্তর, সাপ্তাহিক অমৃত, এলাহাবাদের নর্দার্ন ইন্ডিয়া পত্রিকা এবং হিন্দি দৈনিক অমৃতপ্রভাত মিলিয়ে পত্রিকা গোষ্ঠী সামান্য ছিল না। ভারতবর্ষের দশটি প্রধান গোষ্ঠীর একটি। মিহিরবাবুর আসল কাজ ছিল জনসংযোগ। এবং তদ্দ্বারা কাগজগুলির বিজ্ঞাপন বাড়ানো।

খবরের কাগজের প্রধান আয় তার বিজ্ঞাপনের থেকে আসে। তখনও দেশের খবরের কাগজে নতুন ম্যানেজমেন্ট ধারার স্পর্শ পৌঁছয়নি। দেশের আই আই এম প্রতিষ্ঠানগুলির দশ বছর পূর্ণ হয়নি। যে কাগজ বিজ্ঞাপন বাড়াতে পারে, তারই সমৃদ্ধি বাড়ে। যাঁরা বিজ্ঞাপন দেন তাঁদের তুষ্ট রাখতে পারলে, নেহাত অযোগ্য না হলে সে-কাগজে বিজ্ঞাপন বাড়ে।

মিহির গাঙ্গুলির মতো সর্বস্তরে জনসংযোগে এমন দক্ষ মানুষ আমি জীবনে দেখিনি। তখনও খবরের কাগজের পাঠক ও স্বভাবচরিত্রের সমীক্ষার প্রচলন হয়নি খবরের কাগজে। কাগজের পাঠকসংখ্যা দিয়েই তার গুরুত্ব নিরূপণ হয়। ঠিক পাঠকসংখ্যা নয়, আসলে বিক্রয়সংখ্যা। তত দিনে খবরের কাগজের নিজের ঘোষিত বিক্রয়সংখ্যার চেয়ে অডিটব্যুরোর সার্কুলেশনের ছাপ পাওয়া বিক্রয়সংখ্যা উত্তরোত্তর গুরুত্ব পাচ্ছে। সেখানেও জনসংযোগ কাজ করে। এ-বিশ্বাসে অটল ছিলেন মিহিরবাবু।

এই মানুষটিকে যত দেখেছি, ততই আশ্চর্য হয়েছি। পরের দিন সকালেই মিহিরবাবুর ফোন এল। ধরেই নিয়েছেন তাঁর অনুরোধ আমি ফেলতে পারব না। কুড়ি বছরের নোঙর তুলে বন্দরের কাল শেষ করব, এ তো সামান্য সিদ্ধান্ত। মিহিরবাবু খবর দিলেন, কাল সকালে তরুণবাবু কোথা থেকে যেন ফেরার পথে বম্বেতে সামান্য সময় থাকবেন। আমি যেন বম্বের এয়ারপোর্টে তাঁর সঙ্গে অবশ্যই দেখা করি।

বম্বে এয়ারপোর্টে যাঁর সঙ্গে দেখা করলাম তিনি তরুণকান্তি ঘোষ। তিনি তখন পশ্চিমবঙ্গ সরকারের মন্ত্রী। তিনি আমার অপরিচিত নন। গভীর পরিচয় নয়। মাঝে মাঝে এখানে-ওখানে দেখা হয়েছে। তাঁর বাবা তুষারকান্তি ঘোষকে অনেক বার দেখেছি। তিনি বড় কাগজের মালিক-সম্পাদক। সুন্দর কথা বলেন, মানুষকে সহজে আপনার করে নিতে পারেন। এক বার আমার বাড়িতেও এসেছিলেন।

তরুণবাবু আমাকে কোনও কথা বলবার সুযোগ দিলেন না। তিনিও ধরে নিয়েছেন, আমি তাঁদের কাগজে যোগ দেব। তা ছাড়া, তাঁর বিশ্বাস, এই তো

দেশে ফেরবার অর্থাৎ কলকাতায় ফেরবার সময়। কোথায় বিদেশে পড়ে আছি, কাদের অনুগ্রহের আকাঙ্ক্ষায়? যদি সদ্য কলকাতা যেতে আমার অসুবিধা হয়, আপাতত বম্বেতেই কাজ শুরু করতে পারি। তারপর, নিজের সুবিধামতো বম্বের তাঁবু তুলে কলকাতায় গেলেই চলবে।

অন্যের কথা শোনা তরুণবাবুর অভ্যেস নয়। পরে কাছাকাছি কাজ করবার সময় দেখেছি, তিনিও নিজের লক্ষ্যে অবিচল, কোনও বাধা স্বীকার করেন না, পরাজয়ও নয়।

মিহিরবাবু সম্বন্ধে অনেক কথা বলা যায়। সকালে উঠেই সব খবরের কাগজ নিয়ে পড়তেন। কোন বিজ্ঞাপন অমৃতবাজার, যুগান্তরকে বাদ দিয়ে অন্য কাগজে বেরিয়েছে মনে মনে তার তালিকা করে ফেলবেন, তারপর দশটা পর্যন্ত সেইসব বিজ্ঞাপনদাতাদের সঙ্গে যোগাযোগ করবেন। দুটো টেলিফোনে এবং কোনও সহকারী ছাড়া, প্রয়োজনীয় সবার সঙ্গে কথা বলবেন, কখন দেখা করতে যাবেন তাও তখনই ঠিক হয়ে যাবে।

মিহিরবাবু সর্বদা পরিচ্ছন্ন পোশাকে থাকতেন। সাদা খদ্দরের পাটভাঙা পাঞ্জাবি ও ধুতি, পায়ে ভারী চপ্পল। এই ছিল তাঁর পোশাক। কাগজপত্র, ফাইল, এ-সব তাঁর দরকার হত না। প্রখর স্মরণশক্তি ছিল। সন্ধ্যা পর্যন্ত কাজ করতে ক্লান্তি ছিল না। সমস্তক্ষণ তাঁর চিন্তা শুধু পত্রিকার উন্নতিতে আবদ্ধ থাকত।

নিউজপেপার সোসাইটির মিটিং-এ মিহিরবাবুর প্রায় অচ্ছেদ্য সঙ্গী ছিলেন কানাইলাল সরকার। কানাই আনন্দবাজারের প্রতিনিধি। তিনি আনন্দবাজার পত্রিকা গোষ্ঠীর বিজ্ঞাপন ম্যানেজার। কর্মক্ষেত্রে মিহিরবাবুর প্রতিদ্বন্দ্বী। কিন্তু বন্ধুত্বের সম্পর্ক অটুট। মিটিং-এ দু'জনে পাশাপাশি বসবেন। হয়তো দু'জন কোনও বিতর্কিত বিষয়ে দু'পক্ষে। উত্তেজিত বাদানুবাদ হবে। অথচ আশ্চর্য, মিটিং-এর পরে, হয়তো মিটিং-এর মধ্যেই আবার অচ্ছেদ্য বন্ধুত্ব।

কানাইবাবু আনন্দবাজার পত্রিকার মালিকদের আত্মীয়। অশোককুমার সরকারের সঙ্গে তাঁর বন্ধুত্বের সম্পর্ক। কলকাতার বাইরে দেখেছি, অশোকবাবুর সব সময়ের সঙ্গী কানাই সরকার। কানাইবাবু সোজাসুজি কথা বলেন, রেখেঢেকে কথা বলা তাঁর অভ্যাস নয়। যতই শ্রোতার অপ্রিয় হোক, কানাইবাবু তাঁর মতপ্রকাশে দ্বিধা করেন না। প্রতিবাদ শুনলে দপ করে জ্বলে উঠতে পারেন, আবার দপ করে নিভেও যান। হয়তো এ-কারণেই কানাইবাবু অশোকবাবুর অপরিহার্য সঙ্গী ছিলেন।

মিহিরবাবুর মতো কানাই সরকারও সর্বদা সাদা ধুতি-পাঞ্জাবি পরতেন। ব্যবসার জগতের প্রধানদের সবাইকে চেনেন। তাঁর একটা সুবিধা ছিল; তিনি শান্তিনিকেতনে পড়াশুনা করেছেন। সেই সূত্রেও অনেকের সঙ্গে যোগ ছিল তাঁর। একটা অসুবিধা ছিল, মদ্যপান করেন না। অথচ, সেই সময় বিজ্ঞাপনের জগতে মদ্যপান ফ্যাশান থেকে অভ্যাসে পরিণত হতে চলেছে।

মিহিরলাল গাঙ্গুলির এখানে সুবিধা ছিল। তিনি সব গোষ্ঠীতেই মিশতে পারতেন। সন্ধ্যার পর স্কচ হুইস্কি উপস্থিত না হলে স্পষ্টতই নিরাশ হতেন। মিহিরবাবুর আরও একটা বাড়তি সুবিধা ছিল। তাঁর সঙ্গে রাজনীতির জগতের যোগ। তিনি কর্পোরেশনের কাউন্সিলর ছিলেন অনেক দিন। ডেপুটি মেয়রও হয়েছিলেন। পরের বছর মেয়র হবার সম্ভাবনা। কেন মেয়র হতে পারলেন না,

সে-বিষয়ে মিহিরবাবু কিছু বলতে চাইতেন না। আমার ধারণা হয়েছিল, মিহিরবাবু পত্রিকার মালিকদের কাছ থেকে যে সাহায্য পাবার আশা করেছিলেন এই ব্যাপারে, তা তিনি পাননি। এমনই মানুষ, কখনও সে-কথা উচ্চারণ করেননি। আমি বহু মদ্যপানের সন্ধ্যা তাঁর সঙ্গে কাটিয়েছি। আমার মনে হয়েছে তিনি মালিকদের কাছ থেকে প্রত্যাশিত সমর্থন ও সাহায্য পাননি। পানসভার অসতর্ক মুহূর্তেও তাঁর মুখ থেকে এমন কথা শুনিনি। কিন্তু আমার ধারণা, তিনি এমনটা আশা করেননি। যে অমৃতবাজারকে ইষ্টজ্ঞানে চিরকাল সেবা করে এসেছেন সেখান থেকে প্রত্যাশিত সাহায্য না পাওয়ায়, তাঁর অনুক্ত বেদনা আমাকে স্পর্শ করেছিল।

কলকাতার খবরের কাগজের প্রধানদের সঙ্গে আমার পরিচয় ছিল। আনন্দবাজারের অশোকবাবু, অমৃতবাজার পত্রিকার তুষারবাবু, স্টেটসম্যানের সদ্য-আগত প্রধান কুসরু ইরানি, তিনজনের সঙ্গে নিউজপেপার সোসাইটির সূত্রে আমার জানাশোনা ছিল।

আমার কলেজ জীবনের কয়েকজন বন্ধুও আছেন এখানে। তাঁদের সঙ্গে আমার যোগ দূরত্বের কারণে ছিন্ন হয়নি। দুর্গাপ্রসন্ন চক্রবর্তী বছরে দু'-চারবার বম্বেতে আসত। দুর্গা বিবিধ কোম্পানির ডিরেক্টর, স্টেট ব্যাঙ্ক ও রিজার্ভ ব্যাঙ্কেরও কোনও কমিটির সদস্য। তাকে মাঝে মাঝে বম্বে আসতে হয়। সে বম্বে এলে ঋতু অনুযায়ী হয় পটল, নয় নতুন গুড় আর অব্যর্থ মিষ্টি দই আনবেই। এমন আশ্চর্য বন্ধুবৎসল মানুষ বেশি নেই সংসারে। অলক ঘোষ কলকাতা ইলেকট্রিক সাপ্লাই-এর চিফ ইঞ্জিনিয়ার, তাকেও মিটিং বা সেমিনার উপলক্ষে বম্বেতে আসতে হয়েছে। কলকাতায় ফিরলে আবার তাদের সঙ্গে নিয়মিত দেখাসাক্ষাৎ হবে। অলক শুধু বড় কাজই করে না, সে রাসবিহারী ঘোষের ভাই বি বি ঘোষের নাতি। তাদের প্রকাণ্ড বাড়ি দক্ষিণ কলকাতায়, কম্পাউন্ডের মধ্যে একটা ছোট পুকুর। অভিজাত বাড়ির সন্তান, খেলাধুলা করে, বিলিয়ার্ড খেলে। তখনও গল্ফ ধরেনি, পিয়ানো বাজায়, গান গাইতে পারে। দীপেন সেন তখন মার্টিন কোম্পানিতে বড় কাজ করে। তার কোম্পানির কাছ থেকে আমরা একটা রেকটিফায়ার কিনেছিলাম। সেই সূত্রে ছাত্রজীবনের যোগ পুনঃপ্রতিষ্ঠা হয়েছে। দীপেন সুদর্শন, গৌরবর্ণ, কম কথা বলে।

কলকাতায় তখন আমার সহপাঠীদের রাজত্ব। প্রশাসনের শীর্ষে

সিদ্ধার্থশঙ্কর রায়, পুলিশের ইন্সপেক্টর জেনারেল রণজিৎ গুপ্ত, দেবব্রত ধর ডেপুটি পুলিশ কমিশনার। আর আছেন সত্যজিৎ রায়, তখন তাঁর খ্যাতি মধ্যগগনে। প্রতাপচন্দ্র চন্দ্র সাময়িক নিষ্ক্রিয়, কিছুদিন পরেই কেন্দ্রে শিক্ষামন্ত্রী হবেন।

দু'বছর আগে কোনও একটা মিটিং-এ কলকাতায় এসেছি, তখন শহরে নকশালবাদীদের দাপট। অজানা শহরে বাইরের লোকদের চলাফেরা করতে সাহস হয় না। আমার সঙ্গে বম্বে দিল্লি থেকে যাঁরা এসেছেন, তাঁদের শহরটাকে আদৌ ভাল লাগছে না বলে আমার বিরক্তি হচ্ছে।

সন্তোষকুমার ঘোষ আসবার পর আনন্দবাজার পত্রিকার লক্ষণীয় পরিবর্তন। পুরনো অনেক প্রথা বর্জিত হল। কাগজটা আধুনিক হয়ে উঠল। যুগান্তরের সবাই সন্তোষের খবরের কাগজে সাফল্য সম্বন্ধে সন্দেহ প্রকাশ করেছিলেন। বহুদিন সন্তোষের প্রভাব স্বীকার করতে চাননি। আমার মনে হয়েছিল, নতুন ধরনের সাংবাদিকতা শুরু হল সন্তোষের নেতৃত্বে। আনন্দবাজার অনেক উজ্জ্বল হয়েছিল, তাতে কোনও সন্দেহ নেই।

প্রতিষ্ঠিত সাহিত্যিককে খবরের কাগজ চালানোর ভার দেওয়ায় অনেকেই আশ্চর্য হয়েছিল। আনন্দবাজার যদিও বাঙালি সাহিত্যিকদের সঙ্গে চিরকালই সংযোগ রেখেছিল। সন্তোষের খবরের কাগজের অভিজ্ঞতা সামান্য নয়। সে স্টার অফ ইন্ডিয়া, হিন্দুস্তান স্ট্যান্ডার্ডে কাজ করেছে। তবু বাংলা কাগজের উচ্চতম পদে তার নিযুক্তি আমাকে বিস্মিত করেছিল। সত্যযুগে অল্পদিন ছাড়া, যখন আমি যৌবনের উচ্ছলতায় বহু সাহিত্যিককে সেখানে এনেছিলাম, আর কোথাও সাহিত্যের মানুষদের সঙ্গে সংবাদপত্রের যোগ দেখিনি। প্রধানত ইংরেজি কাগজে কাজ করেছি, ভারতীয় সাহিত্যিক ইংরেজিতে লিখছেন, এমন মানুষ তখন বেশি ছিলেন না। সম্পাদকীয় পাতায় এবং অন্যত্র বিশেষ প্রবন্ধ লেখা ছাড়া তাঁদের প্রয়োজন হত না।

মারাঠি দৈনিক সকালে-এ কাজ করেছি। মারাঠি সাহিত্যিকেরা তখন প্রতিপত্তিশালী ছিলেন। কিন্তু কাগজের মালিক ও সম্পাদক ড. পারুলেকর তাঁদের শতহস্তেন দূরে রাখতেন। অথচ, সকাল এবং আনন্দবাজার পত্রিকা উভয়ই সুখ্যাত খবরের কাগজ। আনন্দবাজারের সাহিত্যিকদের সঙ্গে সংযোগ বৃদ্ধি পেয়েছিল অশোককুমার সরকারের আমলে। তিনিও মালিক এবং

সম্পাদক। তিনি অকুণ্ঠে কাগজ পরিচালনার ভার একজন সাহিত্যিকের হাতে তুলে দিয়েছিলেন। তার সাফল্যে পুরস্কৃত হয়েছিলেন।

অশোকবাবুই, আমার বিশ্বাস, এই সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন। তিনি আদ্যন্ত বাঙালি ছিলেন, শুধু পোশাক-পরিচ্ছদই নয়, চিন্তায়, ব্যবহারে। তাঁর ধারণা ছিল, ভারতবর্ষে বাঙালিদের সমকক্ষ কেউ নেই। বিশ্বাস করতেন, আইন, চিকিৎসাবিদ্যা, ইঞ্জিনিয়ারিং, সর্বত্রই বাঙালি সবার ওপর। এই বিশ্বাস তর্কাতীত ছিল না। কিন্তু তিনি অনড় থাকতেন। সুখাদ্যে আসক্ত ছিলেন, কিন্তু শরীর সব সময় একতালে চলত না বলে সামান্য আক্ষেপ ছিল। বিশ্বাস করতেন বাংলা খাদ্যের মতো সুস্বাদু ভোজ্য আর কোথাও পাওয়া যায় না। তাঁর বাড়ির রান্নার প্রতি পক্ষপাত ছিল।

আই ই এন এস অর্থাৎ ইন্ডিয়ান অ্যান্ড ইস্টার্ন নিউজপেপার সোসাইটির কার্যকরী সমিতির মিটিং এক-দু'মাস পর পর ভারতবর্ষের নানা শহরে হত। সেই সূত্রে আমরা অনেকে বাঙ্গালোর গিয়েছিলাম। তখন বাঙ্গালোর মফস্‌সলের ঘুমন্ত শহর, হোক না কেন এক রাজ্যের রাজধানী। সবাই বলত অবসরপ্রাপ্তদের শহর।

তখন বাঙ্গালোরে ভাল হোটেল বলতে একটিই ছিল। অশোক হোটেল। নতুন হয়েছে। আই ই এন এস সদস্যেরা প্রধানত সেখানেই থাকতেন। সকাল-সন্ধ্যা সবার সঙ্গে দেখা হয়। গল্পগুজব হয়। পানশালাটি ভাল, অনেকে তার পৃষ্ঠপোষকতা করছেন। যা হোক, অশোক হোটেল বিদেশি অচেনা ভোজ্য পরিবেশনে যত পটু, স্বদেশি খাবারে তত নয়। নিকটে একটি নামকরা দেশি ভোজনশালা ছিল, এম টি আর, মাবল্লি টিফিন রুম। কর্ণাটক তো বটেই, সারা দক্ষিণ ভারতের ভোজনরসিকেরা তার নাম জানে। সাধারণ ভোজ্য, ইডলি, দোসা, উপমা ইত্যাদি। মনে রাখবার মতো খাবার পাওয়া যেত এম টি আরে। পাঁচ-ছ'জন একবার একত্রে সেখানে গিয়েছি প্রাতঃরাশের জন্য। দেখি দোকানের দরজা বন্ধ। চলে আসছিলাম। পথচারী একজন বললেন, ভিতরে ভিড়, আসন খালি হলেই দরজা খুলবে, আপনাদের ডাক পড়বে। আমরা বন্ধ দরজার সামনে অপেক্ষা করছি। দরজা খুলল, দোকানের কোনও কর্মী, আঙুলের ইঙ্গিতে বলল, তিন জন। অর্থাৎ তিনটি আসন খালি হয়েছে। আরও কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে ছ'জন জায়গা পেলাম। খাদ্য তালিকা দীর্ঘ নয়, তা ছাড়া সব দিন সব জিনিস পাওয়া যায় না। দোকানের পরিচালকদের ইচ্ছা মতন

প্রাত্যহিক খাদ্যের আয়োজন। হয়তো সেদিন রাওয়া ইডলি, কিংবা রাওয়া দোসা; অথবা আজ সাদা দোসা, মসালা দোসা নেই।

মোহিত হয়েছিলাম। শুদ্ধ ঘৃতপক্ক পদগুলি। দোসার সঙ্গে ছোট্ট একটা বাটিতে সুগন্ধে আমোদিত করা কিঞ্চিৎ ঘৃত। ইডলির সঙ্গে তো বটেই। মিষ্টান্নও অপূর্ব ছিল। এঁরা গর্ব করেন খাঁটি জিনিস ছাড়া কোনও পদার্থ ব্যবহার করা হয় না এম টি আর-এ। এমার্জেন্সির সময় সব জিনিসের দাম বেঁধে দেওয়া হয়েছিল। সরকার ইডলি দোসার যে দাম স্থির করেছিলেন, সেই দামে নির্ভেজাল ভোজ্য পরিবেশন করা যায় না বলে এম টি আরের কর্তৃপক্ষ ভোজনশালা বন্ধ রেখেছিলেন। এক কর্তাব্যক্তি সেই সময়ে খবরের কাগজে এ-বিষয়ে প্রকাশিত খবরটা আমাদের গর্বের সঙ্গে দেখালেন।

এম টি আরের প্রবেশপথ দিয়ে বাইরে বেরুনো চলে না। বেরুনোর নির্দিষ্ট পথ আছে পিছনের দিকে। রন্ধনশালার ভিতর দিয়ে। উদ্দেশ্য, খাদ্যরসিকরা দেখতে পাবেন, কেমন পরিচ্ছন্ন পরিবেশে, হাত না দিয়ে ভোজ্য প্রস্তুত হয় এখানে।

সেদিন এম টি আর থেকে ফেরার পথে অশোকবাবু ও কানাইবাবুর সঙ্গে দেখা হয়েছিল। আমরা কোথায় গিয়েছিলাম শুনে অশোকবাবু বললেন, কী খেলেন সেখানে লুচি ছোলার ডাল, না কচুরি আলুর দম?

আমাদের উত্তর শুনে তিনি অবাক হলেন, ওইসব খেয়ে এলেন সেখানে? ব্রেকফাস্টে লুচি কচুরি না হলে টোস্ট আর অমলেটের মতো এমন কোনও ভোজ্য আর আছে? আপনারা সে-খাবার ফেলে ওইসব সম্বর ধোসার জন্য দৌড়লেন? টোস্ট আর অমলেট। ইংরেজদের খাদ্যজগতে ওই একটাই অবদান। এক কথায়, অসাধারণ।

অশোকবাবুর ভারতীয় মার্গসংগীতে রুচি ছিল, জ্ঞানও ছিল। এক সন্ধ্যায় আমরা দিল্লিতে আমেরিকান দূতাবাসে বিলায়েত খানের সেতারবাদন শুনতে গিয়েছি। তিনি কী রাগ বাজাচ্ছেন, আগে বলেননি; তাতে আমার কোনও ক্ষতি হয়নি। আমি সংগীতে রাগের পার্থক্য বুঝি না। সুখশ্রাব্য সংগীতের মূর্চ্ছনা আমাকে আবিষ্ট করে দেয়। অশোকবাবু আমার পাশে বসেছিলেন, তিনি আমাকে বললেন, দেশ বাজাচ্ছেন, বুঝলেন? আমি কিছুই বুঝিনি, শুধু বুঝেছি, আনন্দধারা বয়ে যাচ্ছে। অশোকবাবু আবার বললেন, শুদ্ধ দেশ নয়। আরও কিছু আভাস পাচ্ছি।

আমার সংগীতের বিশ্লেষণে রুচি নেই। অশোকবাবু ঠিক বলছেন কি না আমার বোঝবার শিক্ষা নেই। ভাবলাম, শুধু টিপ্পনী কবছেন। উনিই বা কী করে বুঝবেন।

বাজনার শেষে বিলায়েত বললেন, দেশ রাগ বাজালাম এতক্ষণ। তবে এতে কিছু মিশ্র ছিল, এটা আমাদের গুরুদেব প্রচলন করেছিলেন।

আই ই এন এস-এর সেক্রেটারি ছিলেন আর ডি শেঠ। তিনি উত্তরপ্রদেশের বিসওয়াঁ-র রাজা-সমান জমিদারবাড়ির সন্তান। দেবদ্বিজে ভক্তি করেন। উত্তরপ্রদেশের পরম্পরায় মিষ্টভাষী এবং অতি ভদ্র। একবার বাঙ্গালোরে তিনি বললেন, গত রাত্রে তিনি সত্য সাইবাবাকে স্বপ্নে দেখেছেন। স্থির করেছেন আজ হোয়াইটফিল্ডে তাঁর আশ্রমে যাবেন। আমাদেরও তাঁর সঙ্গে যেতে অনুরোধ করলেন। বিকালে কোনও কাজ ছিল না, আমরা ছ'জন তাঁর সঙ্গে বাঙ্গালোর শহরের অনতিদূরে হোয়াইটফিল্ড গিয়েছিলাম। দলে ছিলেন মিহির গাঙ্গুলি এবং কানাই সরকার।

অনেকখানি খোলা জায়গা, একধারে সাধারণ একটি বাগানের মধ্যে সত্য সাইবাবার বাসস্থান। তখন সেখানে দু'-তিনশো মানুষ জড়ো হয়েছে। ইতস্তত ঘুরে বেড়াচ্ছে। আমরা দ্বারীদের বললাম, আমরা ভারতবর্ষের নানা স্থান থেকে এসেছি, আমরা সাইবাবার সাক্ষাৎপ্রার্থী। দ্বারীরা বিনীতভাবে জানাল, সাইবাবা যদি বিকালে দর্শন দেন, অর্থাৎ বাড়ির বাইরে আসেন, তা হলে দেখা হতে পারে। তবে তিনি এখন সাধারণকে দেখা দেবেন কি না কেউ বলতে পারে না। তা ছাড়া, তিনি যদি কারও সঙ্গে দেখা করতে চান, তিনি স্বয়ং তাকে ডেকে পাঠাবেন। এ ছাড়া তাঁর সঙ্গে সাক্ষাতের অন্য উপায় নেই।

আমাদের সঙ্গে আশ্রমের কারও জানাশোনা নেই। কাকে অনুরোধ করব? মানুষের জটলা দেখছি। নানা প্রদেশের মানুষ এসেছেন এখানে। পাঞ্জাবি, গুজরাতি, মারাঠি। হঠাৎ একজন কর্মী এসে আমাদের খবর দিল, সাইবাবা আমাদের ডেকেছেন। আমরা বাড়ির ভিতরে ঢুকলাম। একটি ছোট ঘরে আমাদের বসতে হল। বড় একটা শতরঞ্চি পাতা রয়েছে সে ঘরে। একটু পরেই সাইবাবা এলেন। চেনা চেহারা। নানাস্থানে তাঁর ছবি দেখেছি। মাঝারি উচ্চতা, একমাথা ঝাঁকড়া কালো চুল, গেরুয়া পরিধেয়। স্মিত হেসে আমাদের বসতে বললেন।

আর ডি শেঠ প্ল্যাস্টিক দিয়ে মোড়া সাইবাবার একটা ছবি এনেছিলেন। তাড়াতাড়ি সেটা বার করে বললেন, বাবা এই ছবির ওপর আপনার সই করে দিন। সাইবাবা বললেন, কেন ব্যস্ত হচ্ছ। আগে জলপান করো। তারপর আমি ছবি দেব। তোমার আনা প্ল্যাস্টিকের ওপর কি সই করা যায়?

কিছু দক্ষিণী খাবারদাবার এসেছিল। এবং উত্তম দক্ষিণী কফি। সাইবাবা ভাঙা হিন্দি এবং আড়ষ্ট ইংরেজি বলছেন। জিজ্ঞাসা করলেন, আমরা তেলুগু বলতে পারি কি না। আমাদের মধ্যে তেলুগুভাষী কেউ ছিল না। সাইবাবা বললেন, তিনি তেলুগু ছাড়া অন্য ভাষা জানেন না বললেই চলে।

আমাদের সবার পরিচয় জিজ্ঞাসা করলেন। আমাদের খবরের কাগজগুলি কেমন চলে খবর নিলেন। আমরা মেঝেতে শতরঞ্চির ওপর বসে আছি। জলযোগ শেষ হয়েছে, সাইবাবা দাঁড়িয়ে আছেন। হঠাৎ বললেন, তোমরা আমার ছবি চেয়েছিলে, তাই না? এই নাও।

চোখের পলকে তাঁর হাতে চারটে ছোট ছবি এসে গেল। কোথা থেকে এল, কেমন করে এল বুঝতে পারলাম না। আমাদের মধ্যে চারজনকে একটা করে ছবি দিলেন। ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেসের নারায়ণ ও আমি বাদ গেলাম। কিন্তু কী করব। যদি না দেন, সে তাঁর ইচ্ছা।

নারায়ণ অত সহজে নিরস্ত হবার মানুষ নয়। সে বলল, বাবা, তুমি আমাদের দু'জনকে ছবি দাওনি।

সাইবাবা বললেন, দিইনি বুঝি?

আবার দেখি তাঁর হাতে দুটি ছবি এসে গেল। নারায়ণ এবং আমি ছবি দুটি পেলাম।

সাইবাবা বললেন, দেশের মানুষ শিক্ষার্জন না করলে, দুনিয়ার খবর না রাখলে দেশের উন্নতি হবে না। তাই আমি স্থির করেছি আমার সাধ্যমতো দেশে কলেজের স্থাপনা করব। কিন্তু সাধারণ পাঠ্যের কলেজ নয়। আমি শিক্ষকদের প্রশিক্ষণের কলেজ করব। বি টি কলেজ। ভাল শিক্ষক থাকলে তবেই তো ভাল ছাত্র হবে। উঁচুদরের মানুষ তৈরি হবে। দেশের সব চেয়ে বড় প্রয়োজন শিক্ষকের।

ওঠবার সময় বললেন, ইচ্ছে হলে আবার এসো। তোমাদের ভাল হোক।

সে-রাত্রে পানশালায়. খাবার টেবিলে সব আলোচনার মুখ্য বিষয় ছিল

সাইবাবা। কেউ আমাদের ভাগ্যের তারিফ করল, একজন মহাপুরুষের সঙ্গে আমাদের দেখা হয়েছে। অন্য পক্ষ উত্তেজনার সঙ্গে বলল, আমরা একজন বুজরুকের সঙ্গে সাক্ষাতে মূল্যবান সময় নষ্ট করেছি।

যখন সাইবাবা বলেছিলেন, তোমাদের মঙ্গল হোক, তখন কানাইবাবু বলেছিলেন, বাবা, আমার বন্ধু অধ্যাপক নির্মলকুমার বসু ক্যানসার রোগে কষ্ট পাচ্ছেন। তাঁকে নিরাময় করে দাও। সাইবাবা ডানহাত উঁচু করতেই তাঁর আঙুলে কিছু পরিমাণ ভস্ম দেখতে পেলাম। সাইবাবা বলেছিলেন, এই ভস্ম তোমার বন্ধুর মাথায় দিয়ো। ভাল হবে।

এখন উত্তেজিত কানাইবাবু বললেন, এ নিয়ে তর্ক করবার কী আছে? এই ভস্ম আমি নির্মলবাবুর কপালে লাগিয়ে দেখব। যদি কষ্ট কম হয়, নিরাময় হয়ে যান, বুঝব বাবার অলৌকিক শক্তি আছে। এ তো সোজা পরীক্ষা।

বাঙ্গালোরে মানুষের আলাপচারীর মধ্যে সাইবাবা সহজেই ঢুকে যেতেন। সব সময়ই দু'পক্ষ সমান যুযুধান। সত্য মিথ্যা কে নিরূপণ করতে পারে জানি না। আমার মনে হয়েছে, পৃথিবীর বহু জিনিস তো আমাদের অজানা, আমাদের জ্ঞানবুদ্ধির বাইরে। তবু, তাদের অস্তিত্ব আছে বলে আমরা বিশ্বাস করি। তা হলে সাইবাবার এই অলৌকিক শক্তি সত্য হতেও পারে?

ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেসের মালিক রামনাথ গোয়েঙ্কার কাছে শুনেছি, তিনি সাইবাবাকে বলেছিলেন, বাবা তুমি এইসব সাধারণ ম্যাজিক কেন দেখাও? ভাল ম্যাজিশিয়ান তোমার সঙ্গে পাল্লা দিতে পারে। সাইবাবা উত্তর দিয়েছিলেন, আমার অনেক কাজ করবার আছে। তার জন্য মানুষের মনে স্থান চাই। অলৌকিক ঘটনাবলী আমার ভিজিটিং কার্ড। মানুষের মনে প্রবেশ করবার উপায়।

সাইবাবা প্রসঙ্গে অনেক কাহিনী বলা যেতে পারে। আমার এক সহপাঠীর অভিজ্ঞতা তার মুখ থেকে শুনেছি, তাই বলি। বন্ধু ড. প্রভাত ভট্টাচার্য। ভাটপাড়ার গোঁড়া ব্রাহ্মণ পরিবারের সন্তান। লেখাপড়ায় অত্যন্ত ভাল। ডক্টরেটের জন্য আমেরিকা গিয়েছিল, সম্ভবত হাভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে। তারপরও বহুদিন আমেরিকায় শিক্ষকতা করেছে। ইতিমধ্যে এক অ্যাংলো ইন্ডিয়ান তরুণীকে বিয়ে করেছে। দেশে ফিরে চাকরি পেয়েছিল হিন্দুস্থান অ্যান্টিবায়োটিক্সে, হরিদ্বারে। সম্ভবত জেনারেল ম্যানেজার। তাকে বছরে একবার দু'বার নানা কাজে বাঙ্গালোর আসতে হত। সেখানে যে বন্ধুর বাড়িতে

থাকে তিনি বাঙালি, সাইবাবার অনুরক্ত ভক্ত। একদিন তিনি বললেন, 'সাইবাবার আশ্রমে যাচ্ছি। তুমি যাবে?'

প্রভাত ভাসাভাসা সাইবাবার কাহিনী শুনেছে। সিংহের কেশরের মতো কালো চুলের মুকুট মাথায় সাইবাবার ছবিও দেখেছে। সে বিজ্ঞানী, এ-সব অলৌকিক জিনিস তার আদৌ বিশ্বাস হয় না। প্রভাত সেবার বন্ধুর সঙ্গে সাইবাবার আশ্রমে গেল না। পরের কাহিনী প্রভাতের মুখ থেকে শোনা।

প্রভাত বাঙ্গালোর থেকে হরিদ্বার চলেছে ট্রেনে। সে রাত্রে ভাল ঘুম আসছে না। মাঝে মাঝেই ভেঙে যাচ্ছে। হঠাৎ অনুভব করল তার মাথার কাছে কে যেন দাঁড়িয়ে আছে। মানুষটি তার পাশে এসে দাঁড়াল এবার। তার পরনে গৈরিক বস্ত্র, এক মাথা কালো ঝাঁকড়া চুল। সাইবাবার যে-ছবি দেখেছে বন্ধুর বাড়িতে ঠিক তেমনি। একসময় প্রভাত ঘুমিয়ে পড়েছিল।

হরিদ্বার পৌঁছে ঘটনার কথা আর মনে ছিল না। স্বপ্নে, না জাগরণে কী দেখেছিল, কাজের মাঝখানে সম্পূর্ণ বিস্মৃত হয়েছিল।

প্রভাত কিছুদিন পরে আবার বাঙ্গালোর এল। সেই বন্ধুর বাড়িতেই ছিল। তিনি সাইবাবার ভক্ত। মাঝেমাঝেই হোয়াইটফিল্ডে যান। আবার প্রভাতকে তাঁর সঙ্গে সেখানে যাবার আমন্ত্রণ করলেন। এবারে প্রভাত আর আপত্তি করেনি। বন্ধুর সঙ্গে সাইবাবার আশ্রমে গিয়েছিল। সাইবাবার সঙ্গে দেখা হল। সেই সনাতন চেহারা, যেমন ছবিতে দেখা, অবিকল তেমনই। প্রভাত হাত তুলে নমস্কার করেছিল। সাইবাবা অতিপরিচিত কাউকে সম্বোধন করার ভঙ্গিতে জিজ্ঞাসা করলেন, কেমন আছ? হরিদ্বারে সব ভাল তো।

প্রভাত চমকে গিয়ে বলল, আপনার সঙ্গে আমার সুযোগ থাকলেও আগে সাক্ষাৎ হয়নি। এই প্রথম আপনার আশ্রমে এলাম।

সাইবাবা বললেন, সে কী? তোমার মনে নেই? তুমি হরিদ্বারে যাচ্ছিলে, ট্রেনের কামরায় তোমার সঙ্গে দেখা হল। মনে পড়ছে না?

প্রভাত আমাকে বলল, সেদিন থেকে আমি সাইবাবার ভক্ত হয়ে পড়েছি।

প্রভাতের আর-এক অবিশ্বাস্য অভিজ্ঞতার কাহিনী আমি দুর্গা চক্রবর্তীর কাছে শুনেছি। বস্তুত এমন কাহিনী অনেক আছে। দেশি-বিদেশি অনেক বই-ও আছে এ নিয়ে। সত্য-মিথ্যার আবরণেই ঢাকা থাকলেন সাইবাবা।

বাঙ্গালোর গেলেই আমরা হোয়াইটফিল্ডে যাবার চেষ্টা করেছি। সব সময় পাঁচ-সাতজন সঙ্গীও থাকেন। সাইবাবা পূর্বপরিচিতদের নাম মনে রাখেন।

তাঁদের সংসারের, ব্যবসার খোঁজ নেন। বলা বাহুল্য বিস্মিত হয়েছি। সাক্ষাৎ কোনও বারই সহজ হয় না। তিনি ডাকলে তবেই দেখা হয়। কী করে জানতে পারেন কে এসেছে, কে দেখা করতে চায়, তবেই তো ডেকে পাঠাবেন, তাও আমার অজানা।

সেবারে এক সন্ধ্যায় গিয়েছি, আমাদের পরিচিত এক সাংবাদিককে দেখলাম। তিনি আশ্রমের নানা কাজের স্বেচ্ছাসেবী। তাঁর চেষ্টায় সেবার আমাদের ডাক পড়েছিল। আমি এবং তিন বন্ধু। প্রতি ঘরে অপেক্ষমাণ মানুষের ভিড়। আমরা চারজন একটা ঘরে একমাত্র সোফায় আসীন হলাম। কিছুক্ষণ পরে সাইবাবা এলেন, তাঁর বসার জায়গা নেই। আমাদের উঠতে দিলেন না। দাঁড়িয়ে থাকলেন। যথারীতি কুশলপ্রশ্ন করলেন, পরিবারের, কর্মস্থলের খোঁজখবর নিলেন। আমি পুনরায় অবাক হয়ে ভাবলাম, রোজ শয়ে শয়ে ভক্ত তাঁর কাছে আসে, কত ধনশালী, প্রথিতযশা, ক্ষমতাশালী ব্যক্তিরা আসেন, তাঁদের মাঝখানে আমাদের মতো সাধারণ মানুষের কথা কীভাবে তাঁর মনে থাকে? এও কি ইন্দ্রজাল?

এবারে আমাকে বললেন, আমি তোমাকে একটা জিনিস দেব। আমি মনে করেছিলাম ভস্ম বা বিভূতি দেবেন। তাই হাত বাড়িয়ে দিলাম। তখন তাঁর শূন্য হাতে বড় সবুজ পাথর লাগানো একটা আংটি এসে গিয়েছে। আংটিটা আমার আঙুলে পরিয়েও দিলেন। পরে জেনেছি আংটিটা সোনার, আধভরির অধিক হবে। পাথরটির নাম পেরিডট, উজ্জ্বল সবুজ রংবিশিষ্ট রত্ন, বেশি দাম নয়। ইংরেজিতে বলে সেমি-প্রেশাস স্টোন।

পৃথিবীর বহু রহস্যের হদিস পায় না মানুষ। আমার অভিজ্ঞতাও রহস্যে মোড়া আছে।

শীতের এক মলিন সন্ধ্যায় বম্বের পাট চুকিয়ে দিয়ে কলকাতা ফিরলাম। শহর কুয়াশায় ঢাকা। উজ্জ্বল আলোও কেমন যেন ম্রিয়মাণ হয়ে আছে। সকালে উঠে শহরটা ভাল লাগল। ব্যস্ত, চঞ্চল, প্রাণবন্ত। তখনও আমাদের বাড়ির সামনের রাস্তায় বেশি বাস চলাচল শুরু হয়নি। মাঝে মাঝে যে দু'-একটি বাস যাচ্ছে, তাদের গা দেখা যাচ্ছে না। বাইরেটা যেন মানুষ দিয়ে মোড়া। এত ভিড়। যানবাহন চলাচল অত্যন্ত মন্থর। অনেক রাস্তাতেই কাজ হচ্ছে। পার্ক স্ট্রিট চৌরঙ্গির মোড়ের উত্তর-দক্ষিণ দু'দিকেই পাতালরেলের কাজ শুরু হয়েছে। শুনি, খুব কাজ হচ্ছে। আশেপাশের অনেক রাস্তা খোলা থাকলেও, সেখান দিয়ে যাতায়াত কঠিন এবং বিপজ্জনক। নানা স্থানে খুঁড়ে রাখা হয়েছে। সামান্য অন্যমনস্ক হলেই বিপদ। খুশি হয়েছিলাম। কলকাতা শহরের উন্নয়নের জন্য বড় পদক্ষেপ নিয়েছে প্রশাসন। তখনও জানি না, এই কাজ শেষ হতে কুড়ি বছর লাগবে। ততদিন পথ চলার যন্ত্রণা আমাদের ভবিষ্যৎ সুদিনের আশায় সহ্য করতে হবে।

বাগবাজার জনারণ্য। একটা ছোট গলির ভেতর অমৃতবাজার পত্রিকার অফিস ও ছাপাখানা। নতুন ও পুরনো বাড়ি মিলিয়ে। দুই বাড়ির বিভিন্ন তল সমান উচ্চতার নয়। অনেক ওঠা-নামা করতে হয়। ভেতরে ঢুকে ঠিক অফিসবাড়ি মনে হয় না। কে কোথায় বসে, তার হদিস পেতেই ক'দিন লাগল।

এখানে কাজের ধারা অন্য রকম। যত হাঁকডাক হয় তত কাজ হয় না। অনেক লোক অনেক পদে কাজ করে। একজন হয়তো সুপারভাইজার, আর একজন জয়েন্ট সুপারভাইজার। তাদের নীচে হয়তো অ্যাসিস্ট্যান্ট সুপারভাইজার, এবং যেহেতু তিন শিফটে কাজ হয়, অ্যাসিস্ট্যান্ট সুপারভাইজার তিন জন। তার নীচে শিফট-ইন-চার্জ। তার পরের ধাপে অ্যাসিস্ট্যান্ট শিফট-ইন-চার্জ। এক কথায়, কাজের অনুপাতে কর্মীর সংখ্যা

বেশি। তা ছাড়া, কে কখন আসে তারও কোনও নিয়ম নেই। যারা কাছাকাছি থাকে, তারা সকালে একবার অফিসে আসে, তারপর খাবার জন্য বাড়ি চলে যায়। সুবিধা মতো ফেরত আসে।

শুনে অবাক হয়েছিলাম। স্টেটসম্যান বা আনন্দবাজারেও কর্মী সংখ্যা প্রয়োজনের অধিক।

তরুণবাবু একদিন আমাকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন, যুগান্তর, অমৃতবাজার এত বিক্রি হয়, তবু আমাদের লাভ হয় না কেন বলতে পারেন?

লাভ না হবার নানা কারণ ছিল। আমার প্রথম যে কথাটি মনে এসেছিল, তাই বললাম, পত্রিকা যুগান্তরে কর্মীর সংখ্যা প্রয়োজনের প্রায় দ্বিগুণ। তরুণবাবু বললেন, তা হলে তো লোক কমাবার চেষ্টা করতে হয়। আপনি সেই কাজটা করুন।

কয়েকদিন পরে আবার তরুণবাবুর সঙ্গে দেখা হল। বললেন, সেদিন আপনাকে কর্মী সংখ্যা কমাবার কথা বলেছিলাম। কিন্তু ভেবে দেখলাম দেশের মানুষের সবার চাকরি জোটে না। অর্থাভাবে কষ্ট পায়। আমরা যদি দুশো বা পাঁচশো বেশি কর্মী রেখেও থাকি, সেটা তো মানুষকে সাহায্য করাই হচ্ছে, তাই না। তবু তো এতগুলো মানুষ খেটেখুটে খাচ্ছে, তাদের পরিবার প্রতিপালন করছে, এটা কি খারাপ কাজ?

উত্তর অত্যন্ত সরল ছিল। লাভ যদি না চান, তা হলে যত খুশি চাকরি দিতে পারেন যোগ্য এবং অযোগ্যকে। এতে দোষের কী থাকতে পারে? তখন ভাবতেও পারিনি একদিন এই বিপুল কর্মীসংখ্যা পত্রিকাগোষ্ঠীর জীবন সংশয়ের অন্যতম কারণ হবে। খেয়াল হয়নি যে নতুন নতুন প্রযুক্তির প্রয়োগ হলে কর্মীসংখ্যা অধিকতর বাহুল্য হবে।

অন্য শহরের তুলনায় কলকাতায় বেতনের হার কম ছিল। প্রথম প্রেস কমিশন এই দিকে অঙ্গুলিনির্দেশ করেছিলেন। তাঁদের দেওয়া তথ্য দেখে অবাক হয়েছিলাম বেতনের হার কলকাতায় এত কম কেন।

আনন্দবাজার গোষ্ঠীর সঙ্গে পত্রিকাগোষ্ঠীর একটা অঘোষিত রেষারেষি ছিল। ছ' মাস অন্তর অডিট ব্যুরো সার্কুলেশনের প্রকাশিত বিভিন্ন সংবাদপত্রের বিক্রয়সংখ্যা পাওয়া যেত। কী করে নিজের কাগজের বিক্রয়সংখ্যা প্রতিযোগীর বিক্রয়সংখ্যার বেশি করা যায় তাই নিয়ে অহরহ চিন্তা ছিল। আর ছিল অন্য কাগজের বিক্রয়সংখ্যা সন্দেহ করা। কেউ

বিশ্বাসই করতে চাইত না যে অন্য কাগজের বিক্রয়সংখ্যা সত্যিই অত বেড়েছে।

এই ভাবনায় মিহির গাঙ্গুলি অগ্রণী ছিলেন। তিনি অন্যের কোনও উন্নতি বিশ্বাস করতে চাইতেন না। তাদের কোনও কাজই তাঁর অনুমোদন পেত না। দৈনিক সকাল ছেড়ে দেবার পর বন্ধুবান্ধব অনেকেই আমার জন্য ভাবিত হয়েছিলেন। অশোকবাবুর ইচ্ছা ছিল এবং প্রস্তাবও করেছিলেন যে, আমি প্রেস ট্রাস্ট অব ইন্ডিয়ার ডিরেক্টর ইন চার্জ বা ওই জাতীয় কোনও পদ গ্রহণ করি। আমি তখন প্রেস ট্রাস্টের ডিরেক্টর, চেয়ারম্যানের পদেও উন্নীত হয়েছি এক বার, যদিও সবই আমার টাইমস অব ইন্ডিয়ার পদাধিকারী হবার সুবাদে। অশোকবাবুর এবং অন্যান্য বন্ধু ডিরেক্টরদের আগ্রহ থাকা সত্ত্বেও সে-প্রস্তাব আমি গ্রহণ করতে পারিনি। অশোকবাবু ক্ষুণ্ণ হয়েছিলেন। কাউকে বুঝি বলেওছিলেন প্রতাপ রায় ভুল করলেন। ওই পদ তাঁর নেওয়া উচিত ছিল। অনেককাল পরে মিহিরবাবুকে এই কথা বলেছিলাম। মিহিরবাবু বললেন, ওরা তো তাই চাইবেই। আপনি যাতে অমৃতবাজার পত্রিকায় চলে আসতে না পারেন, তারই চেষ্টা। পত্রিকার ভাল হোক, এটা ওদের সহ্য হবে না।

এমনই ছিল দু'পক্ষের রেষারেষি। পত্রিকাতে যোগ দিয়ে জানতে পারলাম কলকাতায় খবরের কাগজের বিক্রেতাদের শক্তিশালী ইউনিয়ন আছে। তখন কেন্দ্রীয় তথ্যমন্ত্রী নন্দিনী শতপথী। তিনি এই ইউনিয়নের সমর্থক ছিলেন। খবরের কাগজকে ত্যক্ত করবার যে কোনও কাজই তাঁর সমর্থন পায়। এ রাজ্যের প্রশাসনও সেই পথে।

কলকাতায় আসবার অল্প ক'দিনের মধ্যেই আমার সঙ্গে খবরের কাগজ বিক্রেতা ইউনিয়নের সঙ্গে সাক্ষাৎ হয়েছিল। বিক্রেতারা তখন এতই শক্তিশালী যে তাঁদের অনুমোদন ছাড়া কোনও সংবাদপত্রের দাম বাড়ানো বা কমানো যায় না। ঠিক মনে পড়ছে না, কাগজের দাম বাড়ানো বা কমানোর বিষয় নিয়ে মিটিং হবে হকার্স ইউনিয়নের সঙ্গে। সময় রাত্রি এগারোটার পর। স্থান আনন্দবাজার পত্রিকার অফিস। অমৃতবাজারের প্রতিনিধি হয়ে আমি সেখানে গিয়েছি। আনন্দবাজার পত্রিকার অরূপ সরকার তখন নবীন যুবক। যৌবনের সব গুণই তার মধ্যে বর্তমান, বুদ্ধি, উৎসাহ। বাড়তি হল গাম্ভীর্য ও বাক্‌সংযম।

স্টেটসম্যানের তরফে এসেছেন বাসুদেব রায়। তিনি নিজে আইনজ্ঞ। শ্রমিকদের সঙ্গে আলোচনা তাঁর কাজের মধ্যে।

আলোচনায় যেমন হয়, অনেক বৃথা বাক্য ব্যয় হল। তারপর সহসা মীমাংসা হয়ে গেল। আমি অবাক হয়েছিলাম। মনে হল, যে-সিদ্ধান্তে আমরা একমত হলাম, আগেই স্থির হয়ে ছিল। শুধু আমিই জানতাম না আলোচনার ফল কী হবে। অরূপ একটা চুক্তিপত্র বের করে ফেলল। বাসুদেব তাঁদের উকিল দিয়ে তৈরি করানো একটা খসড়া চুক্তিপত্র এনেছিলেন। অ-প্রস্তুত আমাকে নিজে একটা খসড়া চুক্তিপত্র লিখতে হল। অন্য দু'জন নিশ্চয় অবাক হয়েছিলেন। আমি ভেবেছিলাম, এ চুক্তিপত্রের দাম কী? এ তো এক তরফা অঙ্গীকার। অপরপক্ষ আমাদের অজানা, যতই সংগঠিত হোক, তাদের কাকে ধরব, চুক্তি পালিত না হলে? তবে কেন এই সতর্কতা? কেন ঘটা করে সই করা।

আমার আর-এক সংবাদপত্র ইউনিয়নের সঙ্গে চুক্তির কথা মনে এল। বম্বের ঘটনা। ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেসের নারায়ণ ও টাইমসের আমি এক পক্ষে। অন্য পক্ষে জর্জ ফার্নান্ডেজ। তিনি ওই ইউনিয়নের সভাপতি। জর্জ ফার্নান্ডেজ তখন শ্রমিক নেতা। কোনও একটা মামলার জন্য আত্মগোপন করে আছেন। দূত মারফত স্থির হল এক অপরাহ্ণে তিনি চার্চগেট স্ট্রিটের গুদোঁ রেস্টুরেন্টে আমাদের সঙ্গে মিলিত হবেন।

আমি ও নারায়ণ সেখানে আগেই পৌঁছেছিলাম। কিছুক্ষণ পরে আত্মগোপনকারী জর্জ ফার্নান্ডেজ প্রকাশ্যে এলেন। কোনও প্রকার দ্বিধা বা আশঙ্কা নেই। আলোচ্য বিষয় ছিল, ইউনিয়নের দাবি, সব কাগজের ছুটির নির্দিষ্ট তালিকা করতে হবে। ক'দিন কাগজ বন্ধ থাকবে। বিভিন্ন কাগজ বিভিন্ন দিন, কেউ হোলির দিন, কেউ জন্মাষ্টমীতে বন্ধ থাকলে হকারদের অসুবিধা হয়। বন্ধ রাখার দিনগুলি সব কাগজে প্রযোজ্য হবে। দশ মিনিটেই আলোচনা শেষ হয়ে গেল। জর্জ চা পান করে চলে গেলেন। কোনও চুক্তিপত্র সই হল না। যা স্থির হয়েছে দু'পক্ষ মান্য করবে।

সে রাত্রে কলকাতায় বসে আমার মনে হয়েছিল, বাঙালিরা বেশি সতর্ক। কোনও ঝুঁকি নিতে চায় না। তাই চুক্তিপত্র, তাই উকিল, তাই মুশাবিদা। বম্বের সেই অলিখিত চুক্তি মসৃণভাবে পালিত হয়েছিল। তা নিয়ে কোনও বিরোধ হয়নি।

খেলাধুলো সম্বন্ধে যথেষ্ট আগ্রহ দেখলাম কলকাতার খবরের কাগজে। যদিও শেষ পাতায়, তবু খেলাধুলোর বিস্তৃত বিবরণ থাকে কলকাতার

কাগজে। প্রধানত ফুটবল খেলা নিয়ে আলোচনা। খেলোয়াড় বা ক্লাবদের নিয়ে তেমন আলোচনা, বিতর্ক হয় না। টেলিভিশন তখনও ভবিষ্যতের গর্ভে। রেডিয়োতে খেলা সম্বন্ধে কিছু আলোচনা হয়। সিনেমা থিয়েটারের মতো খেলাধুলো, একটি বিষয় মাত্র, তার বেশি নয়। অমৃতবাজারে খেলাধুলোর বোধহয় আগ্রহ কিঞ্চিৎ বেশি। কারণ কয়েকজন পুরনো খ্যাতনামা খেলোয়াড় পত্রিকাতে কাজ করেন। তার মধ্যে ক্রিকেটার কমল ভট্টাচার্য এবং ফুটবল খেলোয়াড় অজয় বসু। পত্রিকার অন্যতম প্রধান প্রফুল্লকান্তি ঘোষ যৌবনে খেলাধুলো করতেন। তাঁরই আগ্রহে বুঝি পত্রিকাতে খেলাধুলোর ওপর ঝোঁক বেশি ছিল।

পত্রিকায় ক্রিকেটেও আগ্রহ ছিল। বেরি সর্বাধিকারী ক্রিকেট খেলায় আলোচনা পাঠাতেন। লালা অমরনাথও পত্রিকায় নিয়মিত লিখেছেন। সেই সূত্রে লালার সঙ্গে পরিচয় হয়েছিল। তিনি ভিজিয়ানা গ্রামের বা ভিজির অধিনায়কত্বে ভারতের হয়ে ইংল্যান্ডে খেলতে গিয়ে দল থেকে বহিষ্কৃত হয়েছিলেন। তাঁকে তৎক্ষণাৎ ভারতে ফেরত পাঠানো হয়েছিল। চল্লিশ বছর আগেকার সেই ঘটনার তিক্ততা এখনও তাঁর মন থেকে মোছেনি। ভিজির প্রভূত নিন্দা করলেন।

খেলাধুলো যে পরে খবরের কাগজের দ্বিতীয় প্রধান বিষয় হয়ে উঠবে রাজনীতির পর, তখন বুঝতে পারিনি। যদিও পাঠকের বিশেষ আগ্রহের বিষয় যে খেলাধুলো সে তথ্য আমি অনেক আগেই জেনে গিয়েছি। পঞ্চাশের দশকের শেষ দিকের ঘটনা। টাইমস অফ ইন্ডিয়া একটি সমীক্ষার আয়োজন করেছিল। এই ধরনের সমীক্ষা সম্ভবত সেই প্রথম। পাঠকদের আর্থ-সামাজিক অবস্থান নিরূপণের জন্য সেই সমীক্ষা।

সমীক্ষার উদ্দেশ্য ছিল প্রতিষ্ঠা করা যে টাইমসের পাঠকেরা উচ্চস্তরের মানুষ, তাঁদের অনেকেরই রেফ্রিজারেটর আছে, গাড়ি আছে, তাঁদের আয় বেশি, তাঁরা উচ্চমূল্যের জিনিস কেনেন এবং কিনতে সক্ষম। এই তথ্য দিয়ে একটি পুস্তিকা তৈরি করা হয়েছিল। আমার ধারণা, সংবাদপত্রের পাঠকের সম্বন্ধে এই জাতীয় তথ্য সংগ্রহ করায় টাইমসই অগ্রণী।

সমীক্ষার তথ্য আহরণের সময় আমরা আরও একটি বিষয়ে জানবার চেষ্টা করেছিলাম। পাঠকেরা কী পড়েন, কী পড়তে ভালবাসেন, কোন বিষয়ের খবর প্রথমেই পড়েন। প্রকাশ পেয়েছিল, খেলাধুলার খবর পাঠকের কাছে

সর্বাপেক্ষা আগ্রহের বিষয়। সঠিক সংখ্যা মনে নেই, বোধহয় ষাট শতাংশ পাঠক সর্বপ্রথম খেলার খবর পড়েন, এই কথা বলেছিলেন সমীক্ষকেরা। একটা চমকপ্রদ উদ্ঘাটন হল, টাইমসের পাঠকের সম্পাদকীয় পাতায় বিশেষ আগ্রহ নেই। দশ শতাংশেরও কম সংখ্যক পাঠক সম্পাদকীয় প্রবন্ধে আগ্রহী।

সমীক্ষার পর খেলাধুলার খবরের ওপর আরও জোর দেওয়া হয়েছিল। সম্পাদকীয় পাতার অবমূল্যায়ন করা হয়নি। কলকাতার যুগান্তর পত্রিকা গোষ্ঠীতে খেলার পাতাকে গুরুত্ব দেওয়াতে আমি আনন্দিত হয়েছিলাম।

টাইমসের শান্তিপ্রসাদজি চাইতেন রাজনীতির মানুষ এবং ক্ষমতার অধিকারীদের সঙ্গে সদ্ভাব রাখা হোক। তখন আমাকে প্রায়ই দিল্লি আসতে হয়। দিল্লি এসে কয়েকজন মন্ত্রীর সঙ্গে দেখা করা নিয়ম ছিল। কাজটা ভাল লাগত না, সদ্য কোনও প্রার্থনা নেই, তাঁকে দেবার কিছু নেই, শুধু পরিচয় ঝালিয়ে রাখা। কয়েকজনের সঙ্গে দেখা করা আমার অবশ্য কর্তব্য ছিল। যেমন, মোরারজি দেশাই। তিনি তখন অর্থমন্ত্রী। প্রত্যুষে তাঁর সাক্ষাৎ পাওয়া সহজ ছিল। সেটা তাঁর চরকা কাটবার সময়। কার্পেটের ওপর বসে তিনি চরকা কাটতেন প্রত্যহ। আমি কার্পেটের একধারে বসেছি, বিনম্র এবং সন্ত্রস্ত। মোরারজি কটুভাষী ছিলেন, অকারণে কথা বলা পছন্দ করতেন না। তাঁর ঘর থেকে বেরিয়ে আসতে পারলে পরম তৃপ্তি পেতাম। কথাবার্তা সামান্যই হত। সরকার সম্বন্ধে আমার বক্তব্য কিছু নেই, কোনও কিছু চাইতেও আসিনি। তবু দেখা করতে আসতে হত।

একবারের কথা স্পষ্ট মনে আছে। আমি সদ্য টাইমসের প্রধানের পদে উন্নীত হয়েছি। হঠাৎ জিজ্ঞাসা করলেন, সুন্দরী চিত্রতারকাদের সম্পর্কে তোমার দুর্বলতা নেই তো? থাকলেও তাঁর প্রত্যাশিত উত্তরই দিতাম, না, নেই। এই প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করার একটা কারণ ছিল। আমার পূর্বগামী টাইমসের প্রধান চিত্রতারকাদের সঙ্গে প্রভূত বন্ধুত্বের আকাঙ্ক্ষী ছিলেন। যেহেতু টাইমস ফিল্মফেয়ার পত্রিকা প্রকাশ করে, তাই তারকারাও স্বভাবত তাঁর সঙ্গে সদ্ভাব রাখতেন। তারকাদের মধ্যে অবশ্য মহিলারাই প্রধান। ওই নিয়ে তাঁর সম্বন্ধে নানা কাহিনী শোনা যেত। ঈর্ষান্বিত মানুষেরা তাঁর ক্রিয়াকর্মের হদিস রাখত। আমি অনাকাঙ্ক্ষী না হলেও দুঃসাহসী হতে পারিনি।

অতএব মোরারজিকে বেশ জোরের সঙ্গেই বললাম, না, মোরারজিভাই,

আমি সুন্দরী তারকাদের সঙ্গে বিশেষ যোগাযোগ রাখি না। কর্তব্য যেটুকু দাবি করে, কদাচ তার বেশি নয়।

শুনে মোরারজি নিশ্চয় নিশ্চিন্ত হয়েছিলেন। বললেন, 'এই যে তারকেশ্বরী, আমার ডেপুটি মিনিস্টার, তাঁর সঙ্গে আমার যোগাযোগ রাখতেই হয়, কিন্তু কখনওই তাঁর সঙ্গে একা সাক্ষাৎ করি না। ঘরে সব সময় আর কেউ উপস্থিত থাকে।'

মোরারজির চরিত্রবল সম্বন্ধে আমি নিশ্চিন্ত হয়েছি, এ-কথা তাঁকে বলতে পারিনি। তিনি আবার বললেন, তুমি সাবধানে থেকো। সুন্দরী তারকাদের সঙ্গে বেশি মেশামিশি মানুষের চরিত্র ভ্রষ্ট করে।

তারকেশ্বরী সিংহ, যুবতী এবং সুন্দরী। সদ্য নির্বাচনে জিতে কেন্দ্রীয় মন্ত্রী হয়েছেন, তাঁর সম্বন্ধে নিরুদ্বেগ হয়ে মোরারজির কাছ থেকে ফিরে এসেছিলাম।

আমার আর এক গন্তব্য ছিল, এস কে বা সদোবা পাটিলের বাড়ি। মহারাষ্ট্রের নেতা, নেহরু যে তাঁকে বিশেষ পছন্দ করেন না সবাই জানে। পাটিলের বাড়িতে খোলামেলা, উদ্বেগ, আশঙ্কাহীন আবহাওয়া। যদি তাঁর সেক্রেটারির ঘরে কিছুক্ষণ অপেক্ষা করতে হয়, এক কাপ চা বা কফি অব্যর্থ আসবে। পাটিলের ছেলে আমাদের অফিসে মধ্যম স্তরের ম্যানেজার। পাটিল কখনও তার বিষয়ে কিছু জিজ্ঞাসা করেননি, কিছু চাননি।

যেখানে যেতে ভাল লাগত, সে স্থান হল মোরারজির ছেলের দরবারে। কান্তিভাই দেশাই মোরারজির বিপরীত চরিত্র। চা জলপান করাবেন। বহু মানুষের আর্জি শুনবেন, সাহায্যের প্রতিশ্রুতি দেবেন। ব্যবসায়ী, শিল্পপতি মহলে তাঁর প্রতাপ অবিসংবাদিত। শুনতাম তাঁর অনেক টাকা। কোনও দিন তার প্রকাশ দেখিনি।

পরে, দু'জন বাঙালি আমার গন্তব্যের তালিকায় ছিলেন। অশোক সেন এবং অতুল্য ঘোষ। অশোক সেন তখন সদ্য মন্ত্রী হয়েছেন। শান্তিপ্রসাদজি আমাকে এক বার বললেন, আমি যেন অবশ্যই তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ করি, তাঁর কিছু প্রয়োজন আছে। নির্দেশমতো গিয়েছিলাম। অশোক সেন আমাকে বললেন, কলকাতার বসুমতী দৈনিক কাগজটি কেনবার কথা ভাবছেন। বর্তমান মালিকেরা কাগজটা চালাতে পারছেন না। কিছু হিসাবপত্র দেখলাম। মি.

সেনের ইচ্ছা আমি এক বার কলকাতা গিয়ে কাগজটার হালচাল দেখে আসি।

কলকাতায় এলাম এবং বসুমতী অফিসেও গেলাম। অফিস অতি ম্রিয়মাণ। অগোছালো ছাপাখানায় যেমন হয়, সর্বত্র কাগজের টুকরো ছড়িয়ে আছে, প্রতিষ্ঠানের যে ভগ্নদশা বুঝতে অসুবিধা হয় না। সম্পাদকীয় বিভাগের কয়েকজনের সঙ্গে কথাবার্তাও হল। তাঁরা পরিচালক ও মালিকদের প্রতি অসন্তুষ্ট। একজন তো আমাকে স্পষ্টই বললেন, টাইমস যেন এই ব্যাপারে নাক গলাবার চেষ্টা না করে। তাঁদের বোধহয় আশঙ্কা হয়েছিল, টাইমসের পক্ষে আমি কাগজটা কিনে নিতে এসেছি।

ফিরে এসে অশোক সেনকে বললাম, কাগজ চালানো বড় কঠিন কাজ। তার ওপর অসুস্থ কাগজ। বিক্রি তলানিতে এসে ঠেকেছে। আপনার এ কাগজের হাঙ্গামা না নেওয়াই ভাল।

অশোক সেন খুব নিরাশ হয়েছিলেন, হয়তো অসন্তুষ্টও। কিছুদিনের মধ্যেই কাগজটা কিনে ফেললেন। আমি ভাবলাম, সদবুদ্ধি দিয়েছিলাম, তিনি গ্রহণ না করলে কী করবার আছে। বসুমতী খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে চলতে লাগল। তারপর হঠাৎ হাউই-এর মতো আকাশ ছুঁয়ে ফেলল। বিক্রি লক্ষাধিক। তখন কলকাতায় এক চাঞ্চল্যকর ঘটনা ঘটে গিয়েছে। সুরূপা গুহের আত্মহত্যা না মৃত্যু। সতীকান্ত গুহ, তাঁর স্ত্রী এবং পুত্র এই মামলায় জড়িয়ে পড়লেন। তাঁরা মানী লোক, কলকাতার সবাই তাঁদের চেনে, সাউথ পয়েন্ট স্কুলের প্রতিষ্ঠাতা। সেই সময় ওই মামলার বিস্তারিত বিবরণ প্রকাশ হতে লাগল বসুমতীতে, প্রত্যহ বিক্রি বাড়তে থাকল।

অশোক সেনের সঙ্গে দেখা করা আমার নিয়মিত কাজ।

যখন যাই তিনি বলতে ছাড়েন না, আপনি তো বারণ করেছিলেন, দেখছেন বসুমতী কেমন চলছে। লক্ষের ওপর বিক্রি আরও বাড়ছে।

বসুমতীর বিক্রয়সংখ্যা নিয়ে পরে কিন্তু সমস্যা হয়েছিল। অডিট ব্যুরো সার্কুলেশন বসুমতীর বিক্রয়সংখ্যা স্বীকার করতে রাজি হয়নি। সেনসাহেব আশা করেছিলেন যে অডিট ব্যুরোর পরিচালকদের অন্যতম হওয়ার দরুন আমি এ-বিষয়ে সাহায্য করতে পারব। করতে পারিনি বলে তিনি ক্ষুব্ধ হয়েছিলেন।

অতুল্য ঘোষ দিল্লি এলে ক্যানিং লেনে থাকতেন। তাঁর সঙ্গে দেখা করতে যাওয়াও আমার কর্তব্যের মধ্যে ছিল। তাঁর বাড়িতে আবহাওয়া শান্ত, স্থির,

টেনশনমুক্ত। অতুল্যবাবু তখন সিন্ডিকেটের অন্যতম সদস্য। তাঁদের উদ্যোগেই মোরারজিকে ডিঙিয়ে ইন্দিরা প্রধানমন্ত্রী হলেন, লালবাহাদুর শাস্ত্রীর মৃত্যুর পরে।

অতুল্যবাবুর বাড়িতে নানা রাজনৈতিক নেতা আসতেন। প্রফুল্লচন্দ্র সেন, বিজু পট্টনায়কের সঙ্গে এখানেই আমার পরিচয় হয়েছিল। দেখে অবাক হয়েছি, রাজনীতিতে আকণ্ঠ নিমজ্জিত অতুল্য ঘোষ কবিতা পড়তে ভালবাসতেন। আধুনিক ইংরেজি কবিতার বই তাঁর অনেক পড়া ছিল।

ইন্দিরা গান্ধী প্রথমে তথ্যমন্ত্রী হয়েছিলেন লালবাহাদুর শাস্ত্রীর মন্ত্রিসভায়। যে দুর্ধর্ষ, ক্ষমতায় একাগ্র, বিরোধিতা দাবিয়ে রাখতে সতত একমুখী, তাঁর সে-রূপ তখনও প্রকাশ পায়নি। তথ্যমন্ত্রী হবার পর ইন্ডিয়ান অ্যান্ড ইস্টার্ন নিউজ পেপার সোসাইটিতে তাঁকে দ্বিপ্রহরে ভোজনের নিমন্ত্রণ করা হয়েছিল। শান্ত মূর্তি, বেশি কথা বলেন না, ইন্দিরা তাঁর স্বাভাবিক, ভদ্র ব্যবহারে আমাদের মুগ্ধ করেছিলেন। তাঁর কাজের বিষয়, ভবিষ্যতে কী করবার ইচ্ছা ইত্যাদি নিয়ে কিছু কথাবার্তার পর খাবার টেবিলে বসা গেল। সোসাইটির তখনকার সভাপতি উপেন্দ্র আচার্যের ডান পাশে ইন্দিরা গান্ধী। আমি আচার্যের বাঁ পাশে বসেছিলাম। উপেন্দ্র আচার্য পাটনার ইন্ডিয়ান নেশন দৈনিকপত্রের প্রতিনিধি। তিনি নিরামিষাশী। পরিবেশক ভোজ্য নিয়ে এসেছে, আচার্য ব্যস্ত হয়ে বললেন, কী এনেছ? নিরামিষ তো?

আমি কিঞ্চিৎ রসিকতা করার লোভ সংবরণ করতে পারলাম না। বললাম, তুমি কি চিরকালই নিরামিষাশী? আচার্য বললেন, অবশ্য, জীবনে কখনও মাছ, মাংস খাইনি।

আমি বললাম, তা হলে ভাবনার কী আছে? যা এনেছে খেতেই পার। কখনও মাছ মাংসের স্বাদ পাওনি। তুমি মাছ বা মাংস খেলে বুঝতেই পারবে না। মনে করবে নতুন কোনও সবজি খাচ্ছ।

আচার্যের ডান পাশ থেকে ইন্দিরা গান্ধী বললেন, কথাটা ঠিক। একটা ঘটনার কথা বলি। আমার বয়স তখন ছ'-সাত বছর। আমার বাবা-মা কোনও কারণে নিরামিষাশী হয়েছিলেন, আমিও নিরামিষ খেয়ে মানুষ হচ্ছিলাম। আমাদের প্রতিবেশীর আমার বয়সি ছেলেমেয়ে ছিল। আমি প্রায়ই তাদের বাড়িতে যেতাম, তাদের সঙ্গে খাওয়া-দাওয়া করেছি। বাড়ি ফিরে বলতাম, পাশের বাড়ির খাবার কত ভাল, আমাদের বাড়ির রান্নায় সেই স্বাদ নেই। তখন

তো জানি না, ওবাড়িতে আমি মাংস, মুরগি খাচ্ছি। ভেবেছি, অন্য কোনও সবজি। মাছ মাংসের স্বাদ তো আমি জানিই না।

বলা বাহুল্য ভোজনকক্ষে হাস্যরোল উঠেছিল। পরে সেই ইন্দিরা গান্ধীর সামনে এমন কৌতুকের কথা বলার সাহস কারও হবে না। অনুগ্রহ-প্রার্থী আমাদের তো নয়ই। ইন্দিরার মুখের ভাবলেশহীন কাঠিন্য সাক্ষাৎকারের শেষ সময় পর্যন্ত স্থির থাকত। লঘু কোনও বাক্য বলি এমন সাধ্য নেই।

ইন্ডিয়ান নিজউ পেপার সোসাইটির পরিচালন সমিতির সভ্যরা দেশের বিভিন্ন পত্র-পত্রিকার প্রতিনিধি। তখন পরিচালন সমিতির সভ্যসংখ্যা কম ছিল। অনেকেই বহু বছর ধরে সেখানে আছেন, সে কারণেও সবার সঙ্গে বেশ বন্ধুত্বের সম্পর্ক ছিল। ভারতবর্ষের কাগজ বলতে প্রধানত ইংরেজি কাগজ। ভারতীয় ভাষার কাগজেরা সবে উঠতে আরম্ভ করেছে। তখনও আমরা তর্ক করছি, ভবিষ্যতের ভারতে কোন ভাষার কাগজ স্থায়ী আসন পাবে। অনেকের বিশ্বাস, ভারতীয় ভাষায় কাগজেরা যত বড় কাগজই হোক, ইংরেজি ভাষার কাগজদের সমকক্ষ হওয়া অসম্ভব। আবার, কিছু প্রকাশক, ভবিষ্যতের অন্য ছবি প্রত্যাশা করে ভারতীয় ভাষার কাগজ প্রকাশ করতে শুরু করেছেন।

মাদ্রাজের হিন্দু সংবাদপত্রের সি জি কে রেড্ডি ভাবতেই পারতেন না, কোনও দিন তামিল বা তেলুগু ভাষার কাগজের অনেক বিক্রি হবে। রেড্ডিকে আমরা সি জি কে বলে ডাকতাম। আমার বন্ধুত্বের বৃত্তে সে অন্যতম ছিল।

তার জীবনের পুরো ইতিহাস আমি জানি না। যেটুকু জানতাম এবং মানুষটাকে দেখে চিরকাল চমৎকৃত হয়েছি।

সি জি কে অল্পবয়সে নাবিক হয়ে দক্ষিণপূর্ব এশিয়ায় চলে গিয়েছিল। সেখানেই নেতাজির আজাদ হিন্দ আন্দোলনের সঙ্গে জড়িয়ে পড়ে। তাকে কোনও বিশেষ বার্তা দিয়ে সাবমেরিনে করে ভারতীয় তটে নামিয়ে দেওয়া হয়। সি জি কে-র সঙ্গে আরও একজন ছিল। সেই সঙ্গী প্রথম ধরা পড়ে এবং তার ফাঁসি হয়। সি জি কেও ধরা পড়ে। রাজার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার অপরাধে কিছুকাল জেলে ছিল। দেশ স্বাধীন হবার পর সে মামলা থেকে মুক্তি পেল। সে অন্ধ্রের মানুষ, তেলেগু বলে। তখন অবশ্য অন্ধ্রপ্রদেশের সৃষ্টি হয়নি। তাকে দেখা গেল বাঙ্গালোরে একটি ইংরেজি দৈনিকপত্রের স্থাপনার কাজে যুক্ত হয়েছে। সেই কাগজটির নাম ডেকান হেরাল্ড। সেখান থেকে মাদ্রাজের হিন্দু কাগজে যোগ দিয়েছিল সি জি কে বিজনেস ম্যানেজার হিসেবে। তার আগে

সোসালিস্ট পার্টিতে যোগ দিয়ে সি জি কে লোকসভার সদস্য নির্বাচিত হয়েছে। আমরা ভেবেছি কিছু সময় রাজনীতি করে সি জি কে এখন ব্যবসায় মন দিয়েছে। পরে জেনেছিলাম সোসালিস্ট পার্টির সঙ্গে তার বরাবর অপ্রত্যক্ষ সম্পর্ক ছিল।

সি জি কে অত্যন্ত কর্মঠ, স্থির-বুদ্ধি, সফল মানুষ বলে হিন্দু কাগজে তার সমাদর। নানা বিষয়ে খবর রাখে, সব বিষয়ে কথা বলতে পারে, তাকে কোনও অসতর্ক মুহূর্তে ধরা যায় না, আমাদের সঙ্গে তার গভীর বন্ধুত্ব হয়েছিল।

ভারতবর্ষ মস্ত দেশ। কোনও শহর থেকে প্রকাশিত কাগজ একশো মাইলের বেশি দূরে অন্যত্র পৌঁছতে পারে না। অন্য জায়গায় কাগজ পৌঁছতে দুপুর হয়ে যায়। অর্থাৎ কাগজের বিক্রয়ের পরিধি খুব ছোট ছিল। তখন টেলিফোন লাইনের মাধ্যমে বা উপগ্রহ মারফত এক শহরের কাগজের পাতার ছবিগুলি অন্য কোথাও পাঠানো যেত না। ফলে কাগজের বিক্রির সংখ্যা সীমিত থাকত, এবং ফলস্বরূপ বিজ্ঞাপনও বেশি বাড়ত না। অথচ কাগজটির অন্যত্র চাহিদা আছে, এবং সম্ভাবনাও প্রচুর। ট্রেন, বাস সার্ভিস দিয়ে কাজ হয় না।

সি জি কে একটা নতুন পদ্ধতি প্রয়োগ করেছিল। হিন্দু পত্রিকা কয়েকটা পুরনো ডাকোটা প্লেন কিনেছিল। মাদ্রাজে হিন্দু পত্রিকা ছাপানোর সঙ্গে সঙ্গে মাদুরা, ত্রিচিনাপল্লী, বাঙ্গালোর প্রভৃতি স্থানে হিন্দু পত্রিকার বান্ডিল ডাকোটা বিমানের দ্বারা পাঠানো হত। প্রত্যুষে প্লেন পৌঁছয়, সেই শহরে বিক্রি তো হয়ই, তারও বাইরে আরও একশো মাইল দূরেও হিন্দু যেতে লাগল বাস-এ অথবা ট্রেনে। প্রচণ্ড খরচা ছিল এই পদ্ধতির। সি জি কে জানত, এই ব্যয় ছাপিয়ে বাড়তি টাকা পাওয়া যাবে পাঠক বৃদ্ধি হবার কারণে বিজ্ঞাপনের বৃদ্ধি থেকে। হয়েছিলও তাই। হিন্দু এবং সি জি কে এখানে প্রথম।

নিউজ পেপার সোসাইটির মিটিংয়ের সময় মাঝে মাঝেই একজনকে দেখা যেত, যার সঙ্গে ভারতীয় কাগজের কোনও সম্বন্ধ নেই, অথচ সংবাদপত্র বিষয়ে বিশেষ অভিজ্ঞ। তার নাম অমিতাভ চৌধুরী। সে একদা যুগান্তরে রিপোর্টিংয়ের কাজ করত। শ্রীনিরপেক্ষ ছদ্মনামে লেখা শুরু করে। সেই প্রথম ভারতবর্ষে ইনভেসটিগেটিভ রিপোর্টিং। অর্থাৎ গভীর অনুসন্ধানের পর রিপোর্ট করার শুরু হল। খবর আর তৎকালীন ঘটনায় সীমাবদ্ধ থাকল না। খবরের ভিতরের খবর, যা প্রকাশ্য নয়, যা সবাই জানে না তাই নিয়ে। নিরপেক্ষর লেখা জনপ্রিয় হয়েছিল, ...প্রতিফলিত হয়েছিল যুগান্তরের বিক্রির সংখ্যা বৃদ্ধিতে। ম্যানিলা থেকে দেওয়া বিশ্রুত র‍্যামন ম্যাগসাইসাই এওয়ার্ড ভারতবর্ষে সর্বপ্রথম পায় অমিতাভ চৌধুরী তার অনুসন্ধান-ধর্মী প্রতিবেদনের জন্য।

আমার সঙ্গে যখন পরিচয় হল অমিতাভের তখন সে আমেরিকায় কিছুদিন কাজের অভিজ্ঞতার পর, ইন্টারন্যাশনার প্রেস ইনস্টিটিউটে (আই পি আই) যোগ দিয়েছে জেনেভায়। আই পি আই বিশ্বের মুদ্রিত খবরের কাগজের বিষয়ে গবেষণা এবং তাদের আরও উন্নত করবার জন্য নানা প্রশিক্ষণের চেষ্টা করছে। সেই সূত্রেই বোধহয় অমিতাভ এদেশে আসত। একসঙ্গে সারা ভারতের প্রকাশকদের আর কোথায় পাওয়া যাবে।

আমাদের সন্ধ্যায় মিলিত হওয়া প্রায় নিয়মিত ছিল। সি জি কে, অমিতাভ ও আমি। আরও একজন সুন্দর মানুষও সেখানে থাকত। চঞ্চল সরকার, মৃদু ও মিষ্টভাষী, ভাল ইংরেজি লেখে, স্টেটসম্যানের সহ-সম্পাদক। ওয়াকনিস নামে তার লেখা পাঠকসমাজে অতি আদরের। সেও অভিজ্ঞ মানুষ, দুনিয়ার খোঁজখবর রাখে। সংবাদপত্রর উন্নতিকল্পে দেশে প্রেস ফাউন্ডেশন অফ ইন্ডিয়ার প্রতিষ্ঠা হয়েছে, চঞ্চল তার ডিরেক্টর।

সন্ধ্যা থেকে গভীর রাত্রি পর্যন্ত আলোচনা হত। দেশের কাগজগুলি সনাতনপন্থী। নতুন কোনও কিছু গ্রহণ করতে চায় না অথচ যে কাগজ সবার আগে সমকালীন হবে, তার সাফল্য নিশ্চিত।

আমাদের কারও আর্থিক সামর্থ্য নেই। থাকলে আমরা ক'জন মিলে একটা কাগজ করতে পারতাম, যা সময়ের সঙ্গে তাল মিলিয়ে চলে।

অনেক স্বপ্নের কেল্লা আমরা গড়েছি তখন। নতুন হাওয়া বইছে। গতানুগতিক খবরের কাগজের কায়কল্প করা দরকার অবিলম্বে, বর্তমান চালের কাগজ চলবে না ভবিষ্যতে। ইন্টারন্যাশনাল প্রেস ইন্সটিটিউট (আই পি আই) এই বিষয়ে সাহায্য করবার জন্য প্রস্তুত। তাঁরা বিশেষজ্ঞ পাঠাবেন। তাঁরা হাতে কলমে দেখিয়ে দেবেন কেমন করে পুরনো ধাঁচের কাগজের হেডলাইন আরও চিত্তাকর্ষক করা যায়, রিপোর্টিংয়ের স্টাইল সম্বন্ধেও তাঁরা নতুন দিক নির্দেশ করবেন। পাতা কেমন করে সাজালে কাগজের রূপ চমকপ্রদ হয়, তাও তাঁরা দেখিয়ে দেবেন।

আমাদের প্রতিষ্ঠিত সম্পাদকদের এ-সব নতুন তত্ত্ব দরকার নেই। তাঁরা বললেন, থাইল্যান্ড বা ফিলিপাইনসে এইসব কুশলী বিশেষজ্ঞরা সফল হয়ে থাকতে পারেন, কিন্তু ভারতবর্ষ অন্য দেশ, এখানে তাঁদের কারুকার্যে কোনও লাভ হবে না। আমাদের পাঠক-পাঠিকা অনেক বুদ্ধি ধরেন, তাঁদের চটকে ভোলানো যায় না।

কেরালার অধুনা অতিবিখ্যাত একটি দৈনিক মালয়ালা মনোরমা সবার আগে আই পি আই-এর সাহায্য নিতে এগিয়ে এসেছিল। আই পি আই-এর পাঠানো প্রশিক্ষক মালয়ালা মনোরমার খোল-নলচে বদলে দিয়েছিলেন। ফল পেতে দেরি হয়নি। মনোরমার বিক্রি দ্রুত ঊর্ধ্বগামী হয়েছিল।

মনোরমার ইতিহাসও স্মরণ করবার মতো। ত্রিবাঙ্কুর ও কোচিন মহারাজার রাজত্বে মনোরমা একটা ছোট কাগজ ছিল। প্রতিষ্ঠাতা স্বাধীনচেতা মানুষ, সামন্তরাজার খামখেয়ালি ও উগ্র আচরণের বিরুদ্ধে লিখতে দ্বিধা করেন না। আসলে, রাজা নয়, রাজার প্রতিনিধি দেওয়ান বাহাদুরই রাজ্য চালান এবং সম্ভবত রাজাকেও। তখনকার দেওয়ান প্রভূত ক্ষমতাধর, বিচক্ষণ। তিনি মনোরমার সমালোচনা বরদাস্ত করবার মানুষ নন। একদিন হুকুম জারি করে কাগজটা বন্ধ করে দিয়ে তাদের দরজায় তালাচাবি লাগিয়ে দিলেন।

মালিকরা আবেদন নিবেদন করে কোনও ফল পেলেন না। ১৯৪৭ সালে

ভারত স্বাধীন হবার সঙ্গে সঙ্গে সেই বন্ধ দরজার তালা খুলল, কাগজটা অনেক বছর পরে আবার প্রকাশিত হল।

যে সময়ের কথা বলছি তখন কাগজ পরিচালনা করেন পরিবারের প্রবীণতম, চেরিয়ন। তাঁর ভাই ম্যাথু আমাদের বন্ধু। তারই উদ্যোগে মনোরমা আই পি আই-এর সাহায্য নিয়েছিল। সাফল্যে খুশির সীমা ছিল না। দৈনিক একলক্ষ কপিরও কম বিক্রি হত। প্রশিক্ষণের পরে লক্ষ ছাড়িয়ে গেল। তখন কি কেউ ভাবতে পেরেছিল যে পরে মালয়ালা মনোরমা ১২টি কেন্দ্র থেকে একযোগে প্রকাশিত হবে এবং বিক্রয়সংখ্যা ১২ লক্ষের কাছে পৌঁছবে।

আমার জানা আরও একটি কাগজ আই পি আই-এর সাহায্য নিয়েছিল। কাগজটি অচলায়তন-সমান অমৃতবাজার পত্রিকা। নিজের গৌরবে অলংকৃত, শতাব্দী-প্রাচীন অমৃতবাজার পত্রিকা কী করে এমন আশ্চর্য বিপ্লবী সিদ্ধান্ত নিয়েছিল জানি না। ওয়াকার নামে এক ইংরেজ পত্রিকায় এসে কিছুকাল রিপোর্ট লেখার স্টাইল, হেডলাইন তৈরি করা, কাগজে ব্যবহারের 'টাইপ ফেস', কাগজ সাজানোর ধারার আমূল পরিবর্তন করেছিলেন। এ ঘটনা আমি কলকাতায় পৌঁছবার আগের। আমি যখন এলাম, পত্রিকা প্রায় তার পুরনো চালে ফিরে এসে হাঁফ ছেড়েছে। কী হয়েছিল আমার জানা নেই। হয়তো পুরনো, অনুরক্ত পাঠকেরা এত আধুনিকতা বরদাস্ত করতে পারেননি, হয়তো মালিকেরা এবং সম্পাদকেবা অচিরকালের মধ্যে ফল না পাওয়ায় ধৈর্য রাখতে পারেননি। ওয়াকার দেশে ফিরে গিয়েছিলেন, পত্রিকার বিক্রয় সংখ্যার বিশেষ পরিবর্তন হয়নি।

পত্রিকার সম্পাদক তুষারকান্তি ঘোষ দেশে-বিদেশে খ্যাতনামা ব্যক্তি। তিনি নিউজ পেপার সোসাইটির প্রতিষ্ঠাতাদের অন্যতম। আমি যখন আই এন এসের পরিচালক সমিতির সদস্য হলাম, তুষারকান্তিও সেই সমিতিতে ছিলেন। বয়স হয়েছে, তবু মনের স্ফূর্তিতে অসামান্য ছিলেন। রসিক মানুষ, মনমাতানো গল্প বলতে পারতেন এবং নিজেকে নিয়ে তামাশা করতে দ্বিধা করতেন না। তাঁর উপস্থিতি যে-কোনও সভাকে সঞ্জীবিত করত। পত্রিকায় যোগ দিয়ে তাঁকে আরও নিকট থেকে দেখলাম।

দেশাত্মবোধের বীজে যে কাগজের জন্ম, প্রতিবাদ যার ভাষা ছিল একদা, সেই কাগজ তখন কংগ্রেস রাজত্বে যেন নির্জীব হয়ে পড়েছে। কার সমালোচনা

করবেন, তাঁদের তো এঁরাই উঁচু করেছেন। সম্পাদকীয় লিখিয়েরা দুপুরের পরে তুষারকান্তির সঙ্গে আলোচনা করতেন। বাইরে থেকে দেখলে মনে হবে আড্ডার আসর বসেছে। তুষারকান্তি হাসিতে, গল্পে গুরুতর বিষয়কে নির্বিষ করে দিতে জানতেন। কোন সিদ্ধান্ত তাঁর কাগজের ক্ষতি না করে সমালোচনার রূপ নিতে পারে, সেটা স্থির করতে তাঁর সময় লাগত না। সম্পাদকীয় লিখিয়েরা নির্দেশ নিয়ে নিশ্চিন্তে চলে যেতেন।

পত্রিকায় কারও সমালোচনা করা সহজ কাজ ছিল না। প্রথমত, তুষারকান্তির পরিবার বিশ্বাসে এবং আচরণে বৈষ্ণব। কারও সম্বন্ধে কটু কথা লেখা তাঁদের রুচির বাইরে। দ্বিতীয় কাগজটার স্বার্থ বজায় থাকা চাই। এবং তৃতীয়ত, এই কাজটাই কঠিন ছিল, কাগজের লেখার জন্য তরুণকান্তির যেন কোনও ক্ষতি না হয়, তাঁকে অস্বস্তিতে পড়তে না হয়, তরুণকান্তি ঘোষ কংগ্রেসের মানুষ, তখনও পশ্চিমবঙ্গে মন্ত্রী, তাঁর রাজনৈতিক উচ্চাশার যাতে কোনও হানি না হয়, সেজন্য সর্বদা সচেষ্ট থাকাই তো স্বাভাবিক। তরুণকান্তির কাছে পত্রিকাই ধ্যানজ্ঞান। যে-কোনও প্রকারে পত্রিকার সম্মান ও সমৃদ্ধি বাড়াবার চিন্তা ছিল সর্বসময়ে। দীর্ঘকাল রাজ্য মন্ত্রিসভায় ছিলেন। কিন্তু, আমার ধারণা, পত্রিকার মঙ্গল ও উন্নয়ন তাঁকে সর্বদা ব্যস্ত রাখত। তিনি কংগ্রেসি রাজনীতি ছাড়তে পারেন না, অথচ সে কারণে পত্রিকার অবমূল্যায়নও অনভিপ্রেত। দুয়ের সমীকরণ কঠিন কাজ ছিল। তরুণকান্তি আর্থিক উন্নতি দিয়ে সেটা দূর করবার চেষ্টা করেছেন অহরহ।

তুষারকান্তি ও তরুণকান্তির চরিত্রে বৈপরীত্য ছিল। তুষারবাবু স্থিতধী, হৃদয় যতই আন্দোলিত হোক, সব কথা না বলে থাকতে পারতেন। তরুণকান্তি আবেগপ্রবণ, সহসা উদ্বেলিত। আবার পরক্ষণেই শান্ত। তাঁর সঙ্গে একটি বিষয়ে আমার ঘোর মতানৈক্য ছিল। তিনি বিশ্বাস করতেন, আর্থিক আয়োজনই কাগজের উন্নতিকল্পে যথেষ্ট—সে প্রয়োজন বিজ্ঞাপনের বৃদ্ধি দ্বারা হোক, অথবা ব্যাঙ্কের কর্জ নিয়ে। তিনিও পিতার মতো সংঘাতের সব সম্ভাবনা এড়িয়ে চলতেন। ক্ষণস্থায়ী, সাময়িক আপস করতে দ্বিধা করতেন না।

পিতা-পুত্রের একটি বিষয়ে খুব মিল ছিল। দু'জনেই ভোজনবিলাসী ছিলেন। তুষারবাবু সেই বিলাসকে নিয়মের শৃঙ্খলে বেঁধে রেখেছিলেন। প্রত্যুষে প্রাথমিক চা-এর পর প্রাতরাশে দুটি পোচড ডিম এবং দু'খণ্ড টোস্ট, যথোচিত মাখন সহযোগে। দ্বিপ্রহরে ভাত ডাল, আলু ভাতে, কিঞ্চিৎ ভাজা বা

চচ্চড়ি, বড় দুটি কই মাছের ঝাল, অথবা দু'খণ্ড রুই মাছের কালিয়া এবং শেষে মিষ্টান্ন। নৈশভোজে একটি কুক্কুট শাবকের রোস্ট গ্রহণ করা তুষারবাবুর অবশ্য কর্তব্য ছিল। ভোজন শেষ হত এক বড় বাটি ঘন ক্ষীর দিয়ে। তাঁর আর একটি প্রিয়পদ ছিল কচ্ছপের ডিম। বোধহয় ছ'টা-আটটা খেতেন। অন্য যে-কোনও পদ যুক্ত হলে খুশি হতেন। কিন্তু ভোজনের সময়টা বাঁধা ছিল, তার কোনও পরিবর্তন হবে না। অন্য কোনও সময়ে শত অনুরোধে কিছু মুখে দেবেন না, শুধু অপরাহ্ণ চারটের সময় দু'খণ্ড বিস্কুট সহযোগে এককাপ চা। সম্ভবত এই নিয়মানুবর্তিতাই তাঁকে দীর্ঘায়ু করেছিল।

তরুণকান্তির ভোজনের সময় এবং ভোজ্যতালিকা কোন দিন কী হবে কেউ বলতে পারত না। বাড়ি থেকে পঞ্চব্যঞ্জন সহযোগে খাবার আসত, কিন্তু তার সঙ্গে অবশ্যই বাইরের ভোজনশালা থেকে আহৃত পদ যুক্ত হবে। তখন তিনটে বাজতে পারে, চারটেও। দ্বিপ্রহরের ভোজন অফিসে হত। উপস্থিত ব্যক্তিরা তাঁর ভোজ্যের অংশগ্রহণের জন্য হার্দিক আমন্ত্রিত হত। তাঁর সঙ্গে ভোজন করে আমিও আনন্দ পেয়েছি। তবে এখানে কলকাতায় ততটা নয়, যতটা লখনউতে।

ভোজন সম্বন্ধে আমারও অমার্জনীয় দুর্বলতা আছে। লখনউতে পত্রিকার সংস্করণ প্রকাশ করতে গিয়ে আবিষ্কার করেছিলাম, নবাবি লখনউয়ের সামান্যই অবশিষ্ট আছে। অবধের ভোজ্যের রেওয়াজ লুপ্তপ্রায়। রইস কোনও উত্তরপ্রদেশবাসীর বাড়িতে ছাড়া তার স্বাদ পাওয়া যায় না অন্যত্র। তবে এই লাইনে অধ্যবসায়ী বলে আমি অচিরে আবিষ্কার করেছিলাম ভর্মার রেস্টুর‍্যান্ট এবং বড়ে মিঞার দস্তরখান, যেখানে লখনউ নবাবিত্বের ছিটেফোঁটা পড়ে আছে।

লখনউয়ের জিমখানা ক্লাবের পিছনের গেটের কাছে বড়ে মিঞার ভোজনশালা ছিল। একটা-দুটো মলিন টেবিল ছিল বসে খাবার জন্য। সেখানে বসে খেলে স্বাদ বেশি পাওয়া যায়, কিন্তু পরিপার্শ্ব পীড়া দেয়, তাই আমরা খাবার নিয়ে হোটেলে ভোজন করেছি। বড়ে মিঞা বেশি পদের কারবারি নন। তিন-চারটির বেশি পদ পাওয়া যায় না সেখানে। তা ছাড়া আজ কোন কোন পদ তৈরি হবে, আগে থেকে জানবার উপায় নেই। তিনি সেদিন বাড়ি থেকে রান্না করে যা পাঠাবেন, শুধু তাই পাওয়া যাবে। প্রত্যেক দিনের ভোজ্যের মধ্যে একটিই অবশ্যম্ভাবী মিল ছিল, তাদের মনোহরণ স্বাদ।

বড়ে মিঞার যে বৈশিষ্ট্যের জন্য আমি তাঁর কাছে চিরঋণী হয়ে আছি, সেটা হল কাকোরি কবাব। কাকোরি কবাব ওইখানে বসে খেতে হবে, নাজুক প্রকৃতির ভোজ্য, তার ভোজনের দেরি সহ্য হয় না। ছাগমাংসের, সদ্যপ্রস্তুত এই শিমুলতুলোর মতো কোমল পদটির কোনও বর্ণনা আমি দিতে পারব না। অপরূপ কোনও অপ্সরা যেমন দর্শনমাত্র আপনার সর্বসত্তা অধিকার করে, তেমনই প্রথম রসনা সংযোগেই আমি কাকোরি কবাবের কাছে নিজেকে স্বেচ্ছা-দাস বানিয়েছি। আমার সমস্ত বোধ প্রথম পরিচয়েই আচ্ছন্ন করেছিল কাকোরি কবাব।

কাকোরি লখনউয়ের সন্নিহিত কোনও গ্রাম যেখানে ইতিহাসখ্যাত কাকোরি ষড়যন্ত্র হয়েছিল। বড়ে মিঞার অনুচর বলেছিল, এই কবাবের অস্তিত্ব এখন কাকোরিতে লুপ্ত হয়েছে। এই কবাবের ঐতিহ্য বড়ে মিঞাই বাঁচিয়ে রেখেছেন।

দিল্লিতে কাকোরি কবাবের প্রচলনে আমার, নিজ মুখেই বলি, সামান্য ভূমিকা ছিল। আগেই বলেছি, আই এন এস-এ বিশেষ কামরাডারি, সহজ সম্প্রীতির আবহাওয়া ছিল। হয়তো তখনও খবরের কাগজ বিশিষ্ট কোনও শিল্পোদ্যোগ হয়ে ওঠেনি, আয়ব্যয়ের হিসাবে তাদের ব্যবসার স্থান নগণ্য, তাই। আমরা দলবেঁধে নানা স্থানে মিটিং করেছি, বম্বে থেকে গোয়া যাবার জাহাজে, হায়দ্রাবাদ থেকে নাগার্জুন সাগর যাবার বাসে, গঙ্গাবক্ষে স্টিমারে, কেরালায় থেকাডির অরণ্যনিবাসে। তখনও আমাদের পাকস্থলী দুর্বল হয়নি, খাওয়া-দাওয়ার শখ ছিল, মিটিংয়ের দিন হোটেলে কী খাওয়া হবে আমরা স্থির করে দিই।

দিল্লিতে একটা মিটিংয়ের সময় আমরা প্রস্তাব করেছিলাম কাকোরি কবাব পরিবেশন হবে মধ্যাহ্নে। খবর নিয়ে জানা গেল, দিল্লিতে কাকোরি কবাব প্রস্তুত করেন, এমন পাচক নেই। আমাদের সংগঠনের সেক্রেটারি ছিলেন সাইবাবা ভক্ত, বিসওয়াঁর রাজপরিবারের সন্তান আর ডি শেঠ। তিনি উত্তরপ্রদেশের মানুষ। তৎক্ষণাৎ আয়োজন করে ফেললেন। মিটিংয়ের আগের দিন কাকোরি অথবা লখনউ থেকে দু'জন গুণী এসে পৌঁছলেন। মধ্যাহ্ন ভোজে তাঁরা আমাদের কাকোরি কবাব পরিবেশন করে মিটিংকে মাতিয়ে দিয়েছিলেন। তার এক-দু'বছরের মধ্যেই আমাদের বন্ধু এবং আই এন এস-এ আমাদের সহযোগী সদস্য ইউনিস দেহলভি, উত্তরপ্রদেশ থেকে দুই

গুণীকে আনিয়ে তাঁর বাড়ির কাছে কৌটিল্য মার্গে একটা ধাবা চালু করেছিলেন। সেখানে অন্যতম পদ ছিল কাকোরি। ভোজন-রসিকেরা শুধুমাত্র কাকোরি কবাবের জন্যই সেখানে আসতেন। আমার ধারণা দিল্লিতে সেই প্রথম কাকোরি কবাবের প্রতিষ্ঠা হল। তারপর এক পাঁচতারা হোটেলে কাকোরি কবাবের পত্তন হয়েছিল। ইউনিস বলেন, তাঁর পাচকদের ভাঙিয়ে নিয়ে দশগুণ দামে কাকোরি কবাব পরিবেশন হত সেই হোটেলের ভোজনশালায়।

লখনউয়ের ভর্মা রেস্টুরেন্ট, নামেতেই প্রকাশ কোনও খানদানি মুসলিম বাবুর্চির নয়। শ্রীযুক্ত ভর্মা তাঁর ক্ষুদ্র ভোজনশালা খুলেছিলেন ন্যাশনাল হেরাল্ডের অফিসের কাছে। তাঁর গুণগ্রাহীর সংখ্যা কম ছিল, প্রচার ছিল না আদৌ। কে না জানে, পৃথিবীতে গুণীর সংখ্যা সামান্য। সমঝদারের সংখ্যা আরও কম। ভর্মাজির ভোজনশালায় দেরি করে গেলে সব ভোজ্য পাওয়া যাবে না, তাই আমরা পূর্বাহ্নে এত্তেলা দিয়ে রাখতাম। এখানে দুটি পদ অলোকসামান্য ছিল। তারা অকস্মাৎ একযোগে মানুষের প্রাণমনচিত্তহৃদয় জয় করে ফেলত। প্রথম পদ তাশকেন্ট কবাব, দ্বিতীয় পদ হান্ডি মিট। তাশকেন্ট কবাব মনে হয় ভর্মাজির নিজের উদ্ভাবন। অতি মিহি কিমার আস্তরণে রহস্যময় কোনও সুস্বাদ পুরকে সুতো দিয়ে বেঁধে ভাজা হত বা সেঁকা হত। এই কবাব কাকোরির থেকে ভিন্ন ধরনের। কিন্তু অমৃত পরিবেশনে তফাত ছিল না। হান্ডি মিট সম্ভবত হাঁড়ির মুখ সিল করে দমে রান্না হত। সমস্ত সুরভি বুঝি সেইজন অচঞ্চল থাকত। ছাগ মাংস রন্ধনে ভর্মার হান্ডি মিট, বড়ে মিঞার খাড়ি মসালে কি মিটের সঙ্গে পাল্লা দিত।

অমৃতবাজার পত্রিকার লখনউ অফিস খুলতে গিয়ে এই দুই স্বনামধন্যের সঙ্গে পূর্ণ পরিচয় হল। তার আগেও দু'-একবার সাক্ষাৎ হয়েছিল। তখন আমি লখনউ গিয়েছিলাম টাইমসের তরফে লখনউয়ের প্রাচীন কাগজ পাইয়োনিয়ার, যেখানে একদা রুডিয়ার্ড কিপলিং কাজ করেছিলেন, সেই কাগজটা কিনে নেওয়া যায় কি না দেখতে। পরে যখন অমৃতবাজার পত্রিকা, তাঁদের এলাহাবাদের নর্দান ইন্ডিয়া পত্রিকার একটি লখনউ সংস্করণ প্রকাশের সিদ্ধান্ত নিলেন, তখন আমাকে প্রায় প্রতি সপ্তাহে লখনউ আসতে হত। কয়েকবার তরুণকান্তিও আমার সঙ্গে এসেছিলেন। তখন আমাদের হোটেলের ঘরে আর দু'-চারজন নিমন্ত্রিতকে সঙ্গে নিয়ে তাঁর মহাভোজের আসর বসত। বেশির ভাগ ভর্মাজির খাদ্যাদিই আসত।

আর আসত চৌকের রাম আশ্রয়ের দোকান থেকে গিলৌড়ি, দ্বিতীয় স্বর্গের

পরমানন্দ সঙ্গে নিয়ে। মিষ্টান্নের ক্ষেত্রে এবং যদি রাম আশ্রয়ের দোকানের হয়, এই পদটির সমকক্ষ কিছু আমার জানা নেই।

লখনউ থেকে প্রথম বেরোল ইংরেজি নর্দান ইন্ডিয়া পত্রিকা। কিছুকাল পরেই প্রকাশিত হল হিন্দি অমৃতপ্রভাত। পত্রিকা গোষ্ঠীর দুটি কাগজই এতদিন শুধু এলাহাবাদ থেকে প্রকাশিত হচ্ছিল। কাগজ দুটি তাদের ছোট ক্ষেত্রের মধ্যে সফল ছিল। রাজধানী লখনউতে কিন্তু কাগজ দুটির অভ্যর্থনা তেমন ভাল হল না। আশাহত হয়েছিলাম। বুঝতে পারলাম এখানে জমিয়ে বসতে সময় লাগবে।

তুষারকান্তি ঘোষও অনেক আশা করেছিলেন। তাঁর বিশ্বাস ছিল, লখনউয়ের পুরনো কাগজ পাইয়োনিয়ারকে ছাড়িয়ে যেতে সময় লাগবে না। তুষারবাবুর অনেক গুণের মধ্যে একটা দোষ ছিল। দোষ বলি, বা, দুর্বলতা। তিনি কোনও খারাপ খবর শুনতে চাইতেন না। লখনউতে আশানুরূপ ফল না পাওয়া, তাঁর কাছে অত্যন্ত খারাপ খবর। সে-খবর তাঁকে দেওয়া হল না। এমনটাই ওই প্রতিষ্ঠানের রীতি হয়ে দাঁড়িয়েছিল। তুষারবাবুকে তাঁর অপ্রিয় কোনও খবর না দিয়ে, তাঁকে মিথ্যা বলতেও কেউ দ্বিধা করত না। সংগঠনের মালিকের কাছে কঠোর সত্য গোপন রাখলে যে সংগঠনেরই ক্ষতি হয়, এ-তত্ত্ব সবাই বুঝত না, তা নয়।

আমি তুষারবাবুকে কিছু বলতে গেলে, তিনি প্রথমেই জিজ্ঞাসা করবেন, কী, কোনও খারাপ খবর না তো? কী করে বলি যে খবরটা খারাপ নয়, সত্য এবং হয়তো অপ্রিয়। মানুষটার বয়স হয়েছে, এখন আর ব্যবসার সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত নন, সুখের জগতের বাইরে যেতে চান না। তাঁকে অপ্রিয় সংবাদে ত্যক্ত করে লাভও নেই। মানুষ পরিবৃত থাকতে ভালবাসেন। তাঁর আসর গল্পে, হাসিতে মাতিয়ে রাখতেন। বাল্যকালে গান-বাজনা শিখেছেন, কথার মাঝখানে দু'কলি গান গেয়ে উঠবেন। তখনও কণ্ঠস্বর মিষ্ট। সুর তাল জ্ঞান অক্ষুণ্ণ। তাঁর আসর থেকে বেরিয়ে এসে মন খারাপ হয়ে যেত। নিরীহ বৃদ্ধকে কেন বসিয়ে রেখেছি অলীক জগতে। আবার, এমনও মনে হয়েছে, তুষারবাবু তো মূর্খ নন, বরং আমার বিশ্বাস, তিনি সংসার-বুদ্ধিতে প্রাজ্ঞ বিচক্ষণ মানুষ, সত্য তাঁর অজানা নয়। তবু আমরা তাঁর জন্য যে অবাস্তব আবহ সৃষ্টি করি তার থেকে তিনি ক্ষণিক মজা পাচ্ছেন। আমাদের ভুল ধারণায় মনে মনে হাসছেন।

দেশের জরুরি অবস্থার অকস্মাৎ ঘোষণা দেশসুদ্ধ মানুষকে চমকে দিয়েছিল। অভাবিত ঘটনায় সবাই হতবুদ্ধি। সর্বজ্ঞ খবরের কাগজগুলিও আসন্ন ঘটনার আঁচ পায়নি। ইন্দিরা গান্ধীর সঙ্গে কিছু খবরের কাগজের সম্পর্ক ভাল ছিল না। তিনি নানাভাবে দেশের সব কাগজকেই নির্জীব এবং পদানত করবার অস্ত্র খুঁজছিলেন। অন্যদিকে জয়প্রকাশ নারায়ণের নবনির্বাণ আন্দোলন উত্তরোত্তর প্রবল হয়ে উঠেছে, প্রত্যহ বড় হেডলাইনে তার প্রতিফলন ইন্দিরা গান্ধীকে আরও উগ্র করে তুলেছিল।

এমার্জেন্সি ঘোষিত হবার পর এক সকালে খবর পেলাম আমাদের বন্ধু সি জি কে রেড্ডি গ্রেপ্তার হয়েছে। সি জি কে রাজনৈতিক মানুষ হতেও পারেন, কিন্তু হিন্দু কাগজে প্রকাশিত মতামতের ওপর তার কোনও অধিকার নেই। উপরন্তু হিন্দু নির্বিবাদী কাগজ, কোনও ব্যাপারে আক্রমণাত্মক ভূমিকা নেওয়া তার স্বভাব-বিরুদ্ধ। পরে প্রকাশ হল যে সি জি কে এবং তার সঙ্গে জর্জ ফার্নান্ডেজ বরোদা ডাইনামাইটের মামলায় জড়িত থাকার অভিযোগে গ্রেপ্তার হয়েছে। আমাদের কিছু করবার নেই, সি জি কে কোথায় আছে, কেমন আছে জানতেই সময় লাগল। পরে জেনেছি, সি জি কে-কে হাতে পায়ে বেড়ি লাগিয়ে কারাগারে রাখা হয়েছে।

সাধারণ নির্বাচনে ইন্দিরা গান্ধীর পরাজয়ের পরে সি জি কে মুক্তি পেয়েছিল।

কলকাতায় এক সকালে খবর পেলাম, পুলিশ গৌরকিশোর ঘোষকে ধরে নিয়ে গিয়েছে। বরুণ সেনগুপ্তও তখন গ্রেপ্তার হয়েছিলেন, এবং জেলে তাঁকে খুব কষ্ট দেওয়া হয়েছিল। গৌরকিশোরের খবর শুনে রণজিৎ গুপ্তকে ফোন করেছিলাম। রণজিৎ তখন পশ্চিমবঙ্গের ইন্সপেক্টর জেনারেল অফ পোলিস। গৌর ভাল আছে এবং তাকে কোথায় রাখা হয়েছে, এর বেশি আর কিছু

জানতে পারলাম না। রণজিৎ প্রসঙ্গত বলল, গৌরকে কোনও কষ্ট দেওয়া হবে না। আরও বলল, এ-বিষয়ে আমার বেশি খোঁজখবর না করাই ভাল।

রণজিৎ গুপ্ত প্রেসিডেন্সি কলেজে আমার সহপাঠী ছিল। আমরা ভিন্ন বিভাগে পড়েছি বলে কলেজে বিশেষ ঘনিষ্ঠতা হয়নি। কলকাতা এসে পুরনো পরিচয় ক্রমশ বন্ধুত্বে উন্নীত হয়েছে। জাঁদরেল পুলিশপ্রধান ছিল রণজিৎ। তার সহপাঠী সিদ্ধার্থশঙ্কর রায় তখন মুখ্যমন্ত্রী। তরুণকান্তি ঘোষও আবার মন্ত্রী হয়েছেন। রণজিৎকে আমি বরাবর প্রশংসার চোখে দেখেছি। নিজের কাজে সে কত সফল আমার জানা নেই। কিন্তু মানুষটার অন্যান্য বিষয়ে ব্যুৎপত্তি আমার বিস্মিত করেছে। সে লেখাপড়া করা মানুষ। পুলিশের সঙ্গে লেখাপড়ার একটা স্বাভাবিক বিরোধ আছে, আর পাঁচজনের মতো আমারও সেই বিশ্বাস ছিল। রণজিৎ আমার সেই ধারণা ধূলিসাৎ করে দিয়েছিল। সে নৃতত্ত্ববিদ্যায় পণ্ডিত। আন্তর্জাতিক পণ্ডিত সমাজেও সে স্বীকৃত।

রণজিতের দুর্বলতা হল সে সোজাসুজি কথা বলে। কারও মনস্তুষ্টির জন্য কোনও কাজ করে না। তাই আশ্চর্য হইনি যখন মুখ্যমন্ত্রী সিদ্ধার্থশঙ্কর রায়ের সঙ্গে তার মতানৈক্য হল। কোনওদিন খুব সদ্ভাব ছিল না, যদিও সহপাঠী, তাকে পুলিশপ্রধান পদ থেকে অপসারিত হতে হয়েছিল। সেই সময় নকশালপন্থীদের দাপট চলছে পশ্চিমবঙ্গে, রণজিৎকে সেই আন্দোলন কঠোর হাতে দমন করতে হয়েছে। কারও কারও এমন ধারণা তাই সৃষ্টি হল যে, কাশীপুরে নকশালদের হত্যার নিষ্ঠুর ঘটনায় রণজিতের হাত ছিল। খবরের খুঁটিনাটি সাধারণ মানুষের গোচর না হবারই কথা। সংবাদে বা তথ্যের পারম্পর্য সময়ের সঙ্গে আরও বিভ্রান্ত হয়ে যায়। রণজিতের ক্ষেত্রেও তাই হয়েছিল। যে ঘটনার সঙ্গে রণজিতের সম্পর্ক ছিল না, অনেকের ধারণা হয়েছিল, সেই ঘটনার খলনায়ক রণজিৎ। রণজিৎ কখনও তার জীবনের ইতিহাস লিখলে এই ভ্রান্ত ধারণা দূর হবে। রণজিৎ লিখতে শুরু করেছে. নিয়মনিষ্ঠ মানুষ একাগ্রভাবে কাজ করছে।

কিছুদিন আগে স্টেটসম্যানের কিছু আভ্যন্তরীণ সমস্যার উদ্ভব হয়েছিল। স্টেটসম্যান পরিচালন ভার নেবার যোগ্য মানুষের সন্ধান চলছিল। দুর্গা চক্রবর্তী সব খবরের ভাণ্ডারী। সেই সময় সে বম্বে এসেছিল। আমাকে বলল রণজিৎ গুপ্ত স্টেটসম্যানের সর্বোচ্চ অফিসার নিযুক্ত হয়েছে। খবরটা সম্পূর্ণ সত্য নয়। এমন কথা হয়েছিল। এবং নিয়োগের সম্ভাবনাও হয়তো ছিল, কিন্তু

অন্য ম্যানেজিং ডিরেক্টর নিযুক্ত হলেন, সি আর ইরানি।

জরুরি অবস্থার সময়ে আমার আরও এক বন্ধু হাজতবাস করেছিলেন। তাঁর নাম কুলদীপ নায়ার। কুলদীপ "বিটউইন দ লাইনস" নামে একটি ইংরেজি বই লিখে খুব নাম করেছিলেন। বইটি বিক্রির রেকর্ড করেছিল।

রামনাথ গোয়েঙ্কার ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেসে জরুরি অবস্থার আগে ইন্দিরা গান্ধীর বিরুদ্ধে অনেক লেখা হয়েছে। ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেসের সম্পাদক ছিলেন ভি কে নরসিংহম। শান্ত মানুষ, কলমের জোর খুব। এমার্জেন্সির বিরুদ্ধে পর পর কয়েকটি স্মরণযোগ্য তীব্র প্রবন্ধ লিখেছিলেন।

ইন্দিরা গান্ধীর প্রথম আক্রমণ হল রামনাথ গোয়েঙ্কার ওপর, তিনি এক্সপ্রেসের চেয়ারম্যান পদ থেকে অপসারিত হলেন। ব্যক্তিগত মালিকানার কাগজে সরকার কীভাবে হস্তক্ষেপ করলেন, বা করতে পারতেন, কোনও সময়ই জানা যায়নি। তবে রামনাথজির মতো উচ্চাসনের মানুষদের কোথাও কোথাও আইনসিদ্ধ কাজ না করার দুর্বলতা থাকে। মনে হয় তেমনই কোনও দুর্বলতার সুযোগ নিয়ে ইন্দিরা গান্ধী, রামনাথজিকে পদত্যাগে বাধ্য করতে পেরেছিলেন। তাঁর নির্দেশে ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেসের নতুন চেয়ারম্যান হলেন কৃষ্ণকুমার বিড়লা। কৃষ্ণকুমার দিল্লির ইংরেজি দৈনিক হিন্দুস্থান টাইমসের মালিক। দুই প্রতিযোগী সংবাদপত্রের এক চেয়ারম্যান, এমন ঘটনা এমার্জেন্সির মতো সময়েই সম্ভব। রাজার দাপট থাকলে বাঘে গোরুতে একঘাটে জল খায়। ভি কে নরসিংহমও এক্সপ্রেসের সম্পাদক পদ থেকে অপসারিত হলেন।

এমার্জেন্সির সময় কৃষ্ণকুমার বিড়লা তাঁর কাগজের সম্পাদক জর্জ ভেবগিজকে সরিয়ে দেন। জর্জ স্বাধীনচেতা মানুষ। স্বভাবে নম্র হলেও, সমালোচনায় উগ্র। তাঁকে নিয়ে কৃষ্ণকুমারের সুবিধা হচ্ছিল না। কৃষ্ণকুমারের আরও নানা ব্যবসায়ে স্বার্থ জড়িয়ে আছে, তিনি ইন্দিরা গান্ধীর বিরুদ্ধতা করবেন কেন? হিন্দুস্থান টাইমসের সম্পাদক নিযুক্ত হলেন হিরন্ময় কার্লেকর। হিরন্ময় তখন কলকাতার স্টেটসম্যানের কনিষ্ঠ সহকারী-সম্পাদক। শোনা গিয়েছিল, তাঁর নিয়োগে হাত আছে দেবকান্ত বড়ুয়ার, কংগ্রেসের সেই নেতা যিনি উদ্ভাবন করেছিলেন সেই বাক্যের, ইন্ডিয়া ইজ ইন্দিরা, ইন্দিরা ইজ ইন্ডিয়া।

আর এক বিড়লা পরিবারের সন্তান এম পি বিড়লার একটি সাপ্তাহিক কাগজ ছিল ইস্টার্ন ইকনমিস্ট। ভাল চলে না, সামান্য বিক্রি, কিন্তু সম্পাদক

বালসুব্রমনিয়াম নির্ভীক মানুষ। এমার্জেন্সি ঘোষিত হবার পর তাঁর তিন-চারটি সম্পাদকীয় প্রবন্ধ, খবরের কাগজের ইতিহাসে স্মরণীয় হয়ে থাকবে। তিনি তাঁর শেষ সম্পাদকীয়তে লিখেছিলেন, এই পৈশাচিক ঘটনার দেশে, যেখানে মানুষ শক্তিহীন, সেখানে লেখালেখির কোনও দাম নেই, তাই এই সপ্তাহ থেকে ইস্টার্ন ইকনমিস্ট বন্ধ করে দেওয়া হল। এমার্জেন্সি শেষ হবার পরে সে কাগজটি আর প্রকাশিত হয়নি।

খবরের কাগজের ওপর সেনসর শুরু হয়ে গেল। এই কাজের জন্য নিযুক্ত সেনসর অফিসার কাগজ ছাপাবার আগে, যা লেখা হয়েছে অনুমোদন না করলে সে-কাগজ ছাপা হবে না, আপত্তিকর অংশ বাদ দিয়ে ছাপতে হবে। কাগজের পাতা ছাপতে যাবার আগের মুহূর্তে আবার নতুন করে পাতা সাজানো সম্ভব ছিল না। সে জন্যও এবং প্রতিবাদের প্রতীক হিসাবে আপত্তিকর অংশ তুলে নিয়ে স্থানটা খালি রাখতেন কিছু কাগজ। সরকারের সেটা আদৌ পছন্দ নয়। পাঠক অনায়াসে বুঝতে পেরে যায় সরকারি হস্তক্ষেপের জন্যই একমাথা চুলের মাঝে আচমকা টাকের মতো খালি জায়গা কাগজে। কানপুরের দৈনিক জাগরণের মালিক-সম্পাদককে এই কারণে কয়েকদিন কারাবাস করতে হয়েছিল।

সরকারের সঙ্গে লড়াইয়ে একমাত্র কুলদীপ নায়ার জয়ী হয়েছিলেন। হাইকোর্ট বা সুপ্রিম কোর্টে তাঁর বন্দিত্বের বিরুদ্ধে মামলায় সরকারের হার হয়। কুলদীপ মুক্তি পেয়ে গিয়েছিলেন।

কলকাতার স্টেটসম্যান কাগজে যিনি প্রথম ম্যানেজিং ডিরেক্টর নিযুক্ত হন, তাঁর নাম কুশরু ইরানি। তিনি অভিজ্ঞ, স্থিরবুদ্ধি মানুষ, যদিও সংবাদপত্রের কাজের কোনও অভিজ্ঞতা নেই তাঁর। ভাল কথা বলেন, মনোযোগ আকর্ষণ করবার মতো বক্তৃতা করতে পারেন, জোরালো ইংরেজি লেখেন। তাঁর শাসনভার নেবার কয়েক বছরের মধ্যেই এমার্জেন্সি জারি হল দেশে। স্টেটসম্যান নির্ভীক কাগজ, এমার্জেন্সির বিরুদ্ধে লেখা চলতে থাকল। কিন্তু সেনসরকে এড়ানো যায় না। অনেক লেখা আপত্তিকর গণ্য হয়ে বাদ পড়ে যায়, শক্তিধর সরকার বৈরী হলে অনেক বিপত্তি স্বীকার করতে হয়। সেনসর অফিসাররা, নিশ্চয় ওপরওলার নির্দেশে আর একটি অস্ত্র ব্যবহার করতেন। পদাধিকারী ব্যক্তি ছাপবার আগে খবরের কাগজের পাতার প্রুফ তাঁর অফিসে চেয়ে পাঠাতেন। দেখতে তাঁর কত সময় লাগবে, তার কোনও হিসাব নেই,

এক ঘণ্টা হতে পারে, দু'ঘণ্টা লাগাও আশ্চর্য নয়। ততক্ষণে কলকাতার বাইরে যাবার সকালের ট্রেনগুলি চলে গিয়েছে, প্লেন ধরা যায় না, যে বাস সার্ভিস কাগজ পাঠানোর জন্য ব্যবহার করা হয়, তারাও অনেক আগেই চলে যায়। কলকাতা বা অন্য প্রকাশন কেন্দ্রেও অনুরূপ দেরি করিয়ে দেবার এই সহজ উপায় ছিল সরকারের।

সব অন্ধকারেরই শেষ হয়। এমার্জেন্সিও শেষ হল একদা। খবরের কাগজের মালিকেরা আবার কাগজের উন্নতিকল্পে ব্যস্ত হলেন, পরস্পরের মধ্যে প্রতিযোগিতা চলতে লাগল।

স্টেটসম্যানের কুশরু ইরানি সংবাদপত্র ও জনগণের স্বাধীনতার প্রবক্তা হিসাবে চিহ্নিত হলেন। সম্মান পেলেন আন্তর্জাতিক সংস্থা কমনওয়েলথ প্রেস ইউনিয়নের কাছ থেকে, অ্যাস্টর অ্যাওয়ার্ডে পুরস্কৃত হলেন। নিউইয়র্কের ফ্রিডম হাউস থেকেও তাঁকে ফ্রিডম পুরস্কার দেওয়া হল।

ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেসের ভি কে নরসিংহম এবং ইস্টার্ন ইকনমিস্টের বাল সুব্রহ্মণিয়মের দুঃসাহসী লেখা ক্রমশ মানুষের স্মৃতি থেকে হারিয়ে গেল। তাঁরা বিশেষ স্বীকৃতিও পেলেন না।

এমার্জেন্সি তুলে নেবার পর সাধারণ নির্বাচনে ইন্দিরা গান্ধীর পরাজয় হয়েছিল; বলা যায় ভরাডুবি। নতুন পাঁচমেশালি জোট, জনতা ক্ষমতায় এল। প্রধানমন্ত্রী হলেন মোরারজি দেশাই। সেই মন্ত্রিসভায় তথ্যমন্ত্রী হয়েছিলেন লালকৃষ্ণ আডবানি।

যথারীতি ইন্ডিয়ান নিউজপেপার সোসাইটি এক সভায় তাঁকে আমন্ত্রণ করেছিল। আডবানি গণতন্ত্র রক্ষার জন্য সংবাদপত্রের মূল্যবান ভূমিকার কথা বললেন। আশ্বাস দিলেন নতুন সরকার সর্বতোভাবে সংবাদপত্রের স্বাধীনতা রক্ষা করবে। কিন্তু বক্তৃতা শেষ করবার আগে এমার্জেন্সির সময়ে ভারতীয় সংবাদপত্রের আচরণ ও ভূমিকার বিষয়ে অবিস্মরণীয় তীব্র কটাক্ষ করলেন। তাঁর কণ্ঠে ধিক্কারের ধ্বনি, বললেন, হোয়েন ইউ ওয়ার আস্কড টু বেন্ড, ইউ ক্রল্‌ড। তোমাদের মাথা নিচু করতে বলা হয়েছিল, তোমরা হামাগুড়ি দিলে।

আমরা শ্রোতারা অধোবদনে এই ধিক্কার শুনলাম।

স্বল্পায়ু জনতা সরকার সংবাদপত্রের প্রতি আদৌ সহৃদয় ছিলেন না। ডি এ ভি পি নামে যে সরকারি সংস্থা তার প্রতিষ্ঠার সময় থেকে কাগজগুলিকে যন্ত্রণা দিয়ে এসেছে, যার বিরুদ্ধে খবরের কাগজ, আই এন এস নিয়মিত

আবেদন নিবেদন করেছে, সরকারের সেই সংস্থা কাগজগুলোর ওপর অর্থনৈতিক চাপ কিছুমাত্র কম করেনি। এর মধ্যে প্রধান ছিল, ইচ্ছা মতো বিশেষ বিশেষ কাগজকে সরকারি বিজ্ঞাপন দেওয়া। আরও অসহ ছিল ডি এ ভি পি কাগজের বিজ্ঞাপন দর স্বীকার না করে, ইচ্ছানুসার দরে বিজ্ঞাপনের দাম দিত। দেশের বিজ্ঞাপনের বাজার বড় নয়, সরকারি বিজ্ঞাপন কম দামেও ছাপতে বাধ্য হত খবরের কাগজ। সেই রীতি চলতেই থাকল। তার ওপর নিউজপ্রিন্ট আমদানি ও বণ্টনের ক্ষেত্রেও সরকারি নীতির কোনও পরিবর্তন হল না। আমরা মনে মনে বলেছিলাম, যে যায় লঙ্কায়, তার লেজ গজায়। মনে মনেই বলেছি, তার অধিক কিছু করতে পারিনি।

অপ্রত্যাশিত দ্রুততার সঙ্গে মোরারজি সরকারের পতন হল। চরণ সিংহের জোড়াতালি দেওয়া সরকারও বেশি দিন চলল না। পুনরায় সাধারণ নির্বাচন। আবার ইন্দিরা গান্ধী সগৌরব ফিরে এলেন। তাঁর আততায়ীর গুলিতে মৃত্যুর পর এলেন রাজীব গান্ধী। ইতিহাসের দ্রুত পটপরিবর্তনের মধ্যেও সংবাদপত্রের সঙ্গে সরকারের সম্পর্কের কিছুমাত্র পরিবর্তন হল না।

ত্যক্ত বিরক্ত অসহায় সংবাদপত্র মালিকরা নিউজপেপার সোসাইটির নেতৃত্বে একটি ঐতিহাসিক অসম সাহসিক প্রস্তাব গ্রহণ করেছিলেন। এ-সব অনেক পরের কথা, তবু এখানে কিছু বলা যেতে পারে। সিদ্ধান্ত হয়েছিল ভারতবর্ষের সব খবরের কাগজ সরকারের নিয়ত নিপীড়নের প্রতিবাদে একদিন প্রতীক ধর্মঘট পালন করবে। তখন সোসাইটির সভাপতি বাসুদেব রায়। তিনি স্টেটসম্যান কাগজের অভিজ্ঞ পরিচালকদের অন্যতম। আই এন এস সদস্যদের মধ্যে তাঁর সমান আইনজ্ঞ আর কেউ ছিল না। খবরের কাগজের বিভিন্ন সমস্যার বিষয়ে ওয়াকিবহাল, দ্বিপাক্ষিক আলোচনায় দক্ষ। আই এন এস সদস্যের মধ্যে একতা আনতে বাসুদেব সফল হয়েছিলেন। সোসাইটির ডাকা প্রতীক ধর্মঘটে সারা ভারতের খবরের কাগজ যোগ দিয়েছিল। আশ্চর্য কল্পনাতীত ঘটনা। শ্রমিক নয়, মালিকেরা ধর্মঘট করে সারা ভারতবর্ষের সব কাগজের ছাপা একদিন বন্ধ রেখেছিল। যে মুষ্টিমেয় এবং দ্বিধাগ্রস্ত কাগজেরা আই এন এস-এর আহ্বান শোনেনি, তারা সংখ্যায় নগণ্য। প্রভাবে নগণ্যতর।

বাসুদেব রায়ের কাজ আদৌ সহজ ছিল না। যে-সব খবরের কাগজ এই অভূতপূর্ব ঘটনায় একতা দেখিয়েছিল, তাঁরা পরস্পরের কট্টর প্রতিদ্বন্দ্বী।

হিন্দুস্থান টাইমসের কৃষ্ণকুমার বিড়লা, টাইমস অফ ইন্ডিয়ার অশোককুমার জৈন, স্টেটসম্যানের সি আর ইরানি, ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেসের রামনাথ গোয়েঙ্কা, আনন্দবাজারের অরূপ সরকার, মালয়ালা মনোরমার কে এম ম্যাথু, অমৃতবাজারের তরুণকান্তি ঘোষ একজোট হবেন সরকার ভাবতে পারেননি। বাসুদেবের চেষ্টায় অসাধ্য সাধিত হয়েছিল। ১৯৬৮ সালের সারা ভারত সংবাদপত্র শ্রমিক হরতালের পর, এই প্রথম এবং সম্ভবত শেষ বার মালিকদের একতা দেখা গিয়েছিল।

পণ্ডিতেরা বলেন, খবরের কাগজের সঙ্গে প্রশাসনের সহজ বিরোধ থাকা গণতন্ত্রের পক্ষে উপকারী, দেশের সুস্বাস্থ্যের লক্ষণ। এদেশে তেমনটা সম্ভব হয় না। খবরের কাগজ ছাপার জন্য নিউজপ্রিন্টের কোটা, ডি এ ভি পি'র বিজ্ঞাপন, মেশিন আমদানির লাইসেন্স সবই জটিল নিয়মকানুনে বন্দি। দরবার, সুপারিশ, কলহ নিত্য কাজের অঙ্গ। দিল্লি না গেলে চলে না। গেলেও ফল হয়, তা নয়। তবু যেতে হয়।

বম্বে ছাড়ার পর পুরনো বন্ধুবান্ধব, সহকর্মীদের সঙ্গে দিল্লিতেই দেখা হয়। বম্বে ছেড়ে চলে এসেছি, মনে হয় না। ভেবেছিলাম কলকাতায় পুরনো বন্ধুদের সঙ্গে নিয়মিত দেখা হবে। কাছে এসেছি, তারা কাছে আছে, এই অনুভবে সান্ত্বনা পাই। তারা তখন, যদিও অনিয়মিত, বম্বেতে আসত, তাদের সঙ্গে বহু সন্ধ্যা মুক্ত আনন্দে কাটিয়েছি। এখানে তারা আপন আপন কাজে ব্যস্ত, সহজে দেখা-সাক্ষাৎ হয় না।

এমন একজন ছিল সুব্রত রায়চৌধুরী। সুব্রত আমার সমসাময়িক, যদিও এক কলেজে পড়িনি। সে এখন মস্ত ব্যারিস্টার, কাজের সূত্রে নানা স্থানে যেতে হয়। সন্ধ্যায় তার মক্কেলরা তাকে ব্যস্ত রাখে। দেখা হবার সময় হয় না। সুব্রত যখন বম্বেতে আসত, তার সঙ্গে বহু সন্ধ্যা পান-ভোজনে যাপন করেছি। মানুষটা শুধু বড় কৌঁসুলি নয়, সে নানা বিষয়ে পড়াশুনা করে। আন্তর্জাতিক আইনে তার গভীর বুৎপত্তি। দেশবিদেশের আইনবিদদের সভায় তার নিমন্ত্রণ হয়।

সুব্রত টাইমসের চেয়ারম্যান শান্তিপ্রসাদ জৈনের কোনও মামলায় তাঁর কৌঁসুলি ছিল। আমার সঙ্গে সেই সূত্রে পরিচয়। আমার সমবয়সি, একই সময়ে পড়াশুনা করেছি। সহজেই বন্ধুত্বের সম্পর্ক গড়ে উঠল। সে রিজার্ভ ব্যাঙ্কের কৌঁসুলি। কী একটা সালিশি কাজে তাকে প্রায়ই বম্বে আসতে হয়। যে হোটেলে থাকে, সেখানে অথবা আমার বাড়িতে সান্ধ্য আসর বসে। বেশির ভাগই সুব্রতর হোটেলে মিলিত হই। কারণ আমি ছাড়াও তার দু'-একজন অতিথি থাকে।

এক সন্ধ্যায় সুব্রতের অতিথি হয়েছিলেন সুমিত্রা দেবী। অসামান্য সুন্দরী এই মহিলাকে বহুদিন আগে বাংলা ছবিতে দেখেছিলাম। সামনা-সামনি দেখেছি একবার। স্থির বিদ্যুৎশিখার মতো রূপবতী সুমিত্রা তাঁর স্বামী দেবী

মুখার্জির সঙ্গে নাটক দেখতে এসেছিলেন স্টার বা রঙমহল মঞ্চে। ভাগ্যক্রমে আমাদের পাশেই তাঁদের আসন হয়েছিল। কী নাটক ছিল, কারা অভিনয় করছিলেন কিছুই মনে নেই। শুধু মনে আছে আমি অবাক চোখে অপ্সরালোকের এই দুই তারকাকে দেখছিলাম। দেবী মুখার্জি রূপবান পুরুষ ছিলেন। দু'জনকে একসঙ্গে দেখে মুগ্ধ হয়ে গিয়েছিলাম। তার অনেক পরে সুমিত্রা দেবীকে আবার দেখলাম। তখন দেবী মুখার্জি পরলোকগত।

তাজমহল হোটেলে সুব্রতর ঘরে সুমিত্রাকে দেখে তখনও চোখ ফেরাতে পারিনি। মনে হল তাঁর সৌন্দর্য অক্ষুণ্ণ আছে। ততদিনে বম্বের চিত্রজগতের বহু তারকার সঙ্গে আমার পরিচয় হয়েছে। তাঁরাও অনেকেই সুন্দরী ছিলেন। তবু মনে হত সাজসজ্জার প্রসাধনে তাঁদের সৌন্দর্য যেন চাপা পড়ে গিয়েছে। সুমিত্রা ধীরে ধীরে কথা বলেন, কণ্ঠস্বর মিষ্ট। সৌজন্যমূলক কিছু কথাবার্তা হয়েছিল। সুন্দরী নারীর সঙ্গে বন্ধুত্বে সুব্রতর স্বাভাবিক প্রবণতা ছিল। শুনলাম সুমিত্রার পরবর্তী বিবাহ হয়েছিল কানপুরের জনৈক ব্যবসায়ী শর্মার সঙ্গে। সেই বিবাহের ছাড়কাটের সময় সুব্রত সুমিত্রার পরামর্শদাতা ছিল। সুব্রতর চেষ্টায় বিচ্ছেদ সহজ হয়েছিল, সুমিত্রা উপযুক্ত ক্ষতিপূরণ পেয়েছিলেন। তিনি সুব্রতর কাছে কৃতজ্ঞ।

সুমিত্রার সঙ্গে পরে আমাদের বন্ধুত্ব হয়েছিল। পরস্পরের বাড়িতে যাতায়াত ছিল। মানুষটার স্বভাব যেন খাদে বাঁধা ছিল। চিত্রতারকাদের মতো উচ্ছলতা ছিল না। সাজসজ্জায়, প্রসাধনে উগ্রতা থাকত না। ঈশ্বরদত্ত সৌন্দর্যই তার পক্ষে যথেষ্ট ছিল। পরে কখনও বম্বে গেলে সুমিত্রার সঙ্গে দেখা করেছি। একমাত্র সন্তান লেখাপড়া ছেড়ে দিয়েছে শুনে দুঃখিত হয়েছিলাম। পরের বার খবর দিলেন, ছেলের স্বভাবের সংশোধন হয়েছে, সে আবার লেখাপড়া করছে।

কলকাতায় ফিরে সুব্রতর সঙ্গে দেখা-সাক্ষাৎ কম হয়েছে। তবু যোগাযোগ ছিল।

ইন্দিরা গান্ধীর দুঃসময়ে তাঁর পক্ষে সওয়াল করে কলকাতা হাইকোর্টে সফল হয়েছিল সুব্রত। শুনেছিলাম সুব্রত প্রথমে ইন্দিরা গান্ধীর পক্ষে দাঁড়াতে রাজি হয়নি। নানা মহলের অনুরোধে রাজি হয়। ইন্দিরা গান্ধীর নামে একটা গ্রেফতারি পরোয়ানা খারিজ হয়ে গিয়েছিল সুব্রতের সওয়ালে।

ক্ষমতা পুনরাধিকার করে ইন্দিরা গান্ধী কৃতজ্ঞতাস্বরূপ তাকে ভারতে

অ্যাটর্নি জেনারেল পদে নিযুক্ত করবেন এমন কথা শুনেছিলাম। আশা করে থাকলাম অনেক দিন। কিন্তু শেষপর্যন্ত সুব্রতর নিযুক্তি হল না। সুব্রত আন্তর্জাতিক আইন বিষয়ে পণ্ডিত ছিল। সে কারণে বিদেশে তার সম্মানের কথাও শুনেছি।

বাংলাদেশ জন্ম নেবার সময় একটা ছায়া মন্ত্রিসভা তৈরি হয়েছিল। ভাবী রাষ্ট্রপতি তখনও দেশে ফিরতে পারেননি। ছায়া মন্ত্রিসভার মূল অফিস কলকাতায় ছায়া মন্ত্রিসভার অনেকেই নিয়মিত সুব্রতর সঙ্গে শলাপরামর্শ করতে আসতেন। বাংলাদেশের জন্মের সঙ্গে সুব্রতর একটা আত্মিক সম্পর্ক গড়ে উঠেছিল। তারই ফল, সুব্রতর এক বছরের কাজ, জেনেসিস অফ বাংলাদেশ। বইটিতে তার তীক্ষ্ণ অন্তর্দৃষ্টি সবার দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল। কৃতজ্ঞ রাষ্ট্রপতি মুজিবর রহমান সুব্রতকে একাধিকবার রাষ্ট্রীয় অতিথি করে বাংলাদেশে নিয়ে গিয়েছিলেন।

বম্বেতে যাঁদের সঙ্গে নিকট সম্পর্ক গড়ে উঠেছিল, তাঁরাও কেউ কেউ কখনও কলকাতা আসতেন। এলে দেখাও হত। একদিন হঠাৎ নিউ মার্কেটে অভি ভট্টাচার্যের সঙ্গে দেখা হয়ে গেল। অভিকে প্রথম দেখেছিলাম ছায়াচিত্রের পর্দায়। নৌকাডুবি ছবিতে। দুই সুন্দরী নবাগত আই সি এস পত্নীর সঙ্গে অভি নায়কের ভূমিকায় অভিনয় করেছিল। সম্ভবত সেটাই অভির প্রথম ছবি। অভি বম্বেতে স্থায়ী হয়ে গিয়েছিল। বোধহয় হিতেন চৌধুরীদের সঙ্গে আত্মীয়তা ছিল। তারকা শ্রেণীতে উঠতে পারেনি অভি। কিন্তু জনপ্রিয় শিল্পী ছিল। নিরভিমান, হৃদয়বান মানুষ ছিল অভি।

নিউ মার্কেটে দেখা হতেই প্রথম জিজ্ঞাসা করল আমি দাদাজির সঙ্গে দেখা করেছি কি না। অভির সূত্রেই আমি দাদাজিকে প্রথম দেখি বম্বেতে অভির বাড়িতে। স্বীকার করতে হল, আমার মনে ছিল না যে দাদাজি কলকাতার বাসিন্দা। দেখা করিনি।

অভি ক্ষুণ্ণ হল। বলল, আপনার সময়টা যে ভাল চলছে, তার কারণ তো দাদাজি। তিনিই আপনার সমূহ মঙ্গল করছেন। আপনার জীবনের ছক তো তাঁরই করা।

মনে পড়ল অভির অনুরোধেই আমি দাদাজির সঙ্গে দেখা করতে অভির বাড়িতে গিয়েছিলাম। দাদাজি আমার কাছে রহস্যময়ই থেকে গেলেন। অভি

আমাকে বলেছিল, আপনি বম্বেতে আছেন, দাদাজির কথা শোনেননি। আশ্চর্য। ইনি মানুষ নন, ঐশী শক্তিসম্পন্ন পুরুষ। আমার বাড়িতে ক'দিন আছেন। একদিন এসে সাক্ষাৎ করে যান।

যাওয়া হয়নি। কোনও একটা পার্টিতে অভির সঙ্গে দেখা হতেই আবার বলল, এলেন না? দাদাজি শীঘ্রই চলে যাবেন। আসুন, দেরি করবেন না।

ভাবলাম না যাওয়া অন্যায় হচ্ছে। বন্ধু মানুষ অনুরোধ করেছে। সত্যিই হয়তো অসাধারণ কোনও পুরুষ।

অভির বাড়িতে গিয়ে অবাক হয়েছিলাম। প্রশস্ত ড্রইংরুমে একটা সেটিতে খালি গা, সিল্কের লুঙ্গিপরা দাদাজি সিগারেট খাচ্ছেন। সামনে বড় শতরঞ্জি পাতা, সেখানে ভক্তেরা উপবিষ্ট। দাদাজি ভক্তবৃন্দকে বললেন, গুরু হবার মতো যোগ্য মানুষ মর্ত্যলোকে হয় না। উচ্চমার্গের কোনও মানুষ বড় জোর পথপ্রদর্শক অগ্রজ হতে পারে। তার বেশি নয়। তাই সবাই তাঁকে দাদাজি বলে ডাকে।

অভি আমার কানে কানে বলল, আসলে নিজে উনি ভগবানের অংশ। সে দাদাজিকে আমার নাম বলল। দাদাজি আমার স্ত্রী ও আমাকে কুশল প্রশ্ন করলেন। একটু পরে আমাদের দু'জনকে পাশের ঘরে তাঁকে অনুসরণ করতে বললেন। ভক্তগণের ঈর্ষান্বিত দৃষ্টি এড়িয়ে আমরা পাশের ঘরে দাদাজির কথামতো কার্পেটের ওপর বসলাম। দাদাজি আমাদের সামনের আসনের ওপর বসলেন। বললেন, কেউ গুরু হতে পারে না। গুরু হবার যোগ্যতা শুধু ঈশ্বরের আছে।

আমার মনে তখন পর্যন্ত গুরু সম্বন্ধে কোনও সংশয় ছিল না। আমি নীরবে দাদাজির বাক্যে সায় দিলাম। দাদাজি এবার আমাদের মাথায় হাত দিয়ে আশীর্বাদ করলেন। তাঁর আশীর্বাদের ক্রিয়া অভিনব। গলার নীচে চারটি আঙুল ঠেকিয়ে হাতটি ধীরে ধীরে কপাল পর্যন্ত তুললেন। ক্ষণিক হাত রাখলেন মাথার ওপর। ক্ষীণ, অতিমধুর গন্ধ পেলাম। সেই গন্ধ চার-পাঁচ সপ্তাহ পেয়েছিলাম। তারপর ধীরে ধীরে চলে গেল।

এবারে তিনি আমার হাতে একখণ্ড কাগজ দিলেন। কাগজটায় নাকি কিছু লেখা ছিল না। আমার সেটা লক্ষ করা হয়নি। দাদাজি আমাদের বললেন, ওই কাগজে একটা মন্ত্র লেখা আছে, দেখো। দেখলাম দুটি শব্দ লেখা আছে। কাগজে বুঝি আগে কিছুই লেখা ছিল না। এখনই অলৌকিক ভাবে ওই দুটি

শব্দ এসে গিয়েছে। ঈষৎ হতচকিত আমি পূর্বে সাদা কাগজটা লক্ষ করিনি।

দাদাজি বললেন, ওই মন্ত্রটি আমি তোমাকে দিইনি। তোমার প্রাণ থেকে এসেছে। মনে রাখতে পারবে তো? ওই মন্ত্র জপ করলে বিপদমুক্ত হবে।

আমাদের বললেন, তুমি কাগজটা ভাঁজ করে ঈশ্বরকে প্রণাম করো। প্রণামান্তে কাগজটার ভাঁজ খুলতে বললেন। ভাঁজ খুলে আমরা হতবাক। কাগজে কিছুই লেখা নেই।

আমরা দু'জন মন্ত্রমুগ্ধ বসে আছি। অভির অতিকথন আমাদের প্রভাবিত করেনি। এমন নয় যে, অলৌকিকত্বে বিশ্বাস করে এখানে এসেছি। আমরা এসেছি বন্ধুকৃত্যের কারণে। আমার দিকে চেয়ে দাদাজি বললেন, তোমাকে একটা বই দেব। পাশেই একটা বাঁধানো বাংলা বই ছিল। তুলে নিয়ে বললেন, বইটাতে তোমার নাম লিখে দিই, কেমন? কী যেন তোমার নাম?

বম্বেতে যাঁরা আমাকে চেনে তাদের কাছে আমি পি কে রায়। আমাকে নাম জিজ্ঞাসা করলে আমি নির্ভুল বলি প্রতাপকুমার রায়। এখনও তাই বললাম। যুগপৎ দাদাজি তখন বলছেন কী যেন নাম তোমার? পি কে রায়।

বইটার মলাট তুলতেই দেখা গেল কালি দিয়ে নাম লেখা রয়েছে পি কে রায়। মুহূর্তে আমার ঘোর কেটে গেল, প্রশ্ন ও সংশয়ে আক্রান্ত হয়েছিলাম। সেই সংশয় আজও কাটেনি। দাদাজি অন্তর্যামী বিশ্বাস করতে আমার দ্বিধা হয়েছে। অথচ অলৌকিক ঘটনার ব্যাখ্যাও খুঁজে পাইনি।

যে-বইটা দাদাজি দিয়েছিলেন, সেটা পড়ে পড়ে দেখেছি। দাদাজির ভক্তদের অভিজ্ঞতার বর্ণনা। ব্যাখ্যা না পেয়ে গ্রহণ করতে পারছি না। বর্জন করবার যুক্তিও পাই না। অভির মতো প্রশ্নহীন বিশ্বাস থাকলে সন্দেহের যন্ত্রণায় পীড়িত হতাম না। অভি সম্পূর্ণ বিশ্বাস করত, দূরে কারও সঙ্গে কথা বলবার জন্য দাদাজির টেলিফোন কানেকশনের দরকার হয় না। টেলিফোন রিসিভার তুলে উদ্দিষ্টকে ডাকলে সে ওদিক থেকে সাড়া দেবে। কথাবার্তা হবে। দাদাজি বম্বেতে, সে আছে হয়তো ভুবনেশ্বরে। এমনই নানা প্রত্যক্ষদর্শীর বিবৃতি ছিল দাদাজির দেওয়া বইটিতে।

আমার দাদাজি পর্ব প্রথম দর্শনেই শেষ হয়নি। অভির অনুরোধ ঠেলতে পারিনি। তার বাড়িতে এবং বম্বের আরও কয়েকটি বাড়িতে দাদাজির লীলা দেখেছি। আমার সহকর্মী অরুলকর দাদাজির অন্ধ ভক্ত ছিল। সব অঘটনেরই একটা যুক্তিযুক্ত কার্যকারণ সম্পর্ক খুঁজে পেত। অরুলকর পুঁথিগত বিদ্যার

বেশি কিছু জানত না। ভীরু, বিশ্বাসপ্রবণ ছিল। কিন্তু অভি ভট্টাচার্য? বুদ্ধি-সম্পন্ন, লেখাপড়া করা, সংসারঅভিজ্ঞ মানুষ। সেও তর্কাতীত বিশ্বাস কী করে আপ্লুত হল? নিউ মার্কেটে সেদিন আমিও অভির সঙ্গে তর্ক করিনি। অভি আমাকে আবার বলে গেল, আমি যেন দাদাজির সঙ্গে নিশ্চয় দেখা করি। কারণ অভি বলেছিল, 'এই পৃথিবীতে যেখানে যা ঘটছে, সবই দাদাজির নির্দেশ।'

আমি অভিকে বলিনি যে দাদাজি বোধহয় আমার সঙ্গে দেখা করতে ইচ্ছা করেননি।

বম্বেতে দাদাজি অভির বাড়িতেই থাকতেন। নিউ মার্কেটের সেই দিনের পর, আমার সঙ্গে অভির আর দেখা হয়নি। দাদাজির সঙ্গেও নয়।

অভি আমাকে বলেছিল যে বিখ্যাত আইনজীবী নানি পালকিওয়ালা দাদাজির সঙ্গে দেখা করে মুগ্ধ হয়েছেন। তিনি নাকি আপন নাম লেখা হাত ঘড়ি পেয়েছিলেন।

নানি পালকিওয়ালা এই ঘটনার সত্যতা সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করবার সুযোগ হয়নি। ভারতবর্ষের দুর্ধর্ষ আইনজীবী পালকিওয়ালার সঙ্গে আমার পরিচয় হয়েছিল পঞ্চাশের দশকের শুরুতে। সবে বম্বে টাইমসের কাজে যোগ দিয়েছি তখন। শ্রমিক ইউনিয়নের সঙ্গে আমাদের একটি মামলা শ্রম আদালতে চলছে। আমাদের উকিলের নাম শুনলাম নানি পালকিওয়ালা। মামলাটার বিষয়ে উকিলকে সাহায্য করবার ভার পড়েছিল আমার ওপর। প্রথম তাঁর সঙ্গে আলোচনায় বসলাম হাইকোর্টে তাঁর অফিসের যে ঘরে একদা বসতেন পালকিওয়ালার গুরু বোম্বের অতিবিখ্যাত আইনবিদ সর জামসেদজি কাঙ্গা। পালকিওয়ালা সর জামসেদজির সহকারী হিসাবে হাইকোর্টে কাজ শুরু করেছিলেন। তিনি ব্যারিস্টার নন। বম্বে বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পাশ করা উকিল। আমার থেকে সামান্য বড়, অতি বিনয়ী, সদালাপী সুন্দর মানুষ। যদিও তখনও তিনি ভারতবর্ষের অন্যতম আইনবিদ হয়ে ওঠেননি। শ্রম আদালতে এবং আয়কর ট্রিবিউনালে প্র্যাকটিশ করেন। দুই আদালতেই বেশ নাম হয়েছে। বম্বের বাইরে কেউ তাঁর নাম শোনেনি।

উত্তর জীবনে অনেক অর্থলোভী, সুদক্ষ, জ্ঞানবান আইনজীবীর সঙ্গে পরিচয় হয়েছে। কিন্তু পালকিওয়ালার মতো এমন নির্লোভ, বুদ্ধিমান এবং নিজের বিষয়ে সুপণ্ডিত মানুষ আর দেখিনি। ক্রমে তাঁর প্র্যাকটিস আরও বিস্তৃত হয়। সারাদিন নিরলস কাজ করেন, কাজের শেষ হয় না। যখনই গিয়েছি হাসিমুখে অভ্যর্থনা করেছেন। স্থির হয়ে বক্তব্য শুনেছেন, পরামর্শ দিয়েছেন। পরের সকালে আদালতে সওয়াল করবার জন্য তৈরি হয়েছেন। তাড়াহুড়ো করা নয়, দেখলে মনে হবে মানুষটার বুঝি অফুরন্ত সময়। মেরিন ড্রাইভের ওপর একটা বাড়ির ওপরতলার বড় ফ্ল্যাটে সাধারণ মানুষের মতো থাকতেন। যখন আরও নাম হল সারা দেশে, তখনও। পাণ্ডিত্যের, ঐশ্বর্যের

কোনও দম্ভ ছিল না। আইন ছাড়াও আর নানা বিষয়ে তাঁর অধিকার ছিল। ভারতীয় সংবিধানের সর্বজনস্বীকৃত ব্যাখ্যাকার পালকিওয়ালা তাঁর সওয়ালে প্রতিষ্ঠা করেছিলেন যে আমাদের সংবিধানের মূল কাঠামো বদলাবার অধিকার নেই লোকসভার। মূল কাঠামোয় হস্তক্ষেপ করার অধিকার কারও নেই।

সাহসী মানুষ ছিলেন। ইন্দিরা গান্ধীর নির্বাচন নাকচ হয়ে যাবার পর তিনি সুপ্রিম কোর্টে আপিল করেন। পালকিওয়ালা সেই মামলার ইন্দিরা গান্ধীর কৌঁসুলি ছিলেন।

সুপ্রিম কোর্টে এলাহাবাদ হাইকোর্টের নির্দেশের স্থগিতাদেশ প্রার্থনা করলেন ইন্দিরা গান্ধীর কৌঁসুলি নানি পালকিওয়ালা। স্বপক্ষে রায়ও পেয়েছিলেন। সে রায় ছিল শর্তসাপেক্ষ। সুপ্রিম কোর্ট আদেশ দিয়েছিলেন ইন্দিরা গান্ধী লোকসভায় অংশ নিতে পারেন, কিন্তু যতদিন না মূল মামলার নিষ্পত্তি হয়, তিনি লোকসভার কোনও বিতর্কে ভোট দিতে পারবেন না।

এই রায়ের দু'দিন পরেই দেশে এমার্জেন্সি ঘোষিত হল। পালকিওয়ালা তৎক্ষণাৎ ইন্দিরা গান্ধীর মামলায় পদত্যাগ করে চলে এলেন।

ব্যস্ত আইনজ্ঞ পালকিওয়ালার সঙ্গে দেখা করবার সময় পাওয়া কঠিন ছিল। মনে আছে একবার সকাল ছ'টার সময় দেখা করেছিলাম। রাত্রি দশটার পর দেখা করেছি একাধিকবার।

অফিস থেকে আমাকে খবর দিল যে বছর শেষ হয়ে আসছে, নানি পালকিওয়ালার বিল এখনও আসেনি। তাঁকে দেয় টাকার অঙ্ক লিখে না রাখলে, হিসাব সংক্রান্ত অসুবিধা হবে। এ কথা তাঁকে বলেছিলাম। তবু তাঁর বিল পেতে দেরি হল। ফি আদায়ের জন্য নানি পালকিওয়ালার বিন্দুমাত্র ব্যস্ততা দেখিনি কোনও দিন। পরে খবরের কাগজে তাঁর নাম দেখে বিস্মিত হয়েছিলাম, ভারতবর্ষের আয়কর দেবার ক্ষেত্রে প্রথম একশো জনের মধ্যে তাঁর নাম ছিল। কয়েক বছরই তাঁর নাম থাকত ওই তালিকায়। একদিন জিজ্ঞাসা করেছিলাম, আপনি এত কাজ করেন, টাকা আদায়ের চেষ্টা করেন না, তবু আয়কর দাতাদের শীর্ষ তালিকায় আপনার নাম। তখন অতি উচ্চ হারে আয়কর দিতে হত। একদিন বলেছিলাম, আয়ের সামান্যই আপনার হাতে থাকে। তবু এত কাজ করেন কেন, দিবারাত্রি? পালকিওয়ালা বলেছিলেন, কী জানো, এই আমার প্রতিষ্ঠিত হবার সময়, যদি কাজ কমিয়ে দিই, তা হলে মানুষ আমাকে ক্রমশ ভুলে যাবে। যত কাজ করব, ততই মামলা আসবে আমার কাছে, ততই পসার বাড়বে।

পরে অবশ্য আর সাধারণ মামলার ভার নিতেন না। বিশেষ বিশেষ দুরূহ মামলায় অংশ নিতেন শুধু। বহুকাল পরে কলকাতা এয়ারপোর্টে তাঁর সঙ্গে হঠাৎ দেখা হয়ে গেল। সম্ভবত তখন তিনি স্টেটসম্যান পত্রিকার ডিরেক্টর। বহুকাল যোগাযোগ নেই, তবু তিনি অনায়াসে চিনতে পারলেন। মামুলি কথাবার্তা হল কিছুক্ষণ। দিন কয়েক পরে বম্বে থেকে পাঠানো তাঁর একটি চিঠির সঙ্গে তাঁর লেখা একটি বই পেলাম, "উই দ্য পিপল"। চমৎকার ইংরেজি লিখতেন পালকিওয়ালা। এই বইটিতে ভারতের অতীত গরিমার সগর্ব যুক্তিপূর্ণ বর্ণনা। দেশ, দেশের মানুষকে ভালবাসা, এবং গভীর অধ্যয়নের ফল এই বই।

পালকিওয়ালার আর দুটি গুণ ছিল। অসাধারণ বক্তা ছিলেন। একবার বম্বে রোটারি ক্লাবের সভায় সদ্য ঘোষিত কেন্দ্রীয় বাজেটের ওপর বলেছিলেন। আধ ঘণ্টার সে বক্তৃতা আমরা মন্ত্রমুগ্ধ হয়ে শুনেছিলাম। পরে প্রতি বছর তাঁর বাজেটের ওপর বক্তৃতা ব্রাবোর্ন স্টেডিয়ামে হত। এক ঘণ্টা ধরে বাজেট প্রস্তাবের চুলচেরা বিচার করতেন পালকিওয়ালা। এক মুহূর্ত থামতেন না, কোনও বাক্য হাতড়াতে হত না, অনর্গল অনবদ্য ইংরেজিতে বাৎসরিক সেই বক্তৃতা শোনবার জন্য বম্বের মানুষ অপেক্ষা করেছে। পরে অবশ্য আরও নানা শহরে পালকিওয়ালা বাজেট বক্তৃতা করেছেন, এমনকী কয়েক বছর এই শহরেও।

তাঁর দ্বিতীয় গুণের কথা অনেক পরে জানা গিয়েছিল। যেমন অজস্র রোজগার করেছেন, তেমনই নানা কাজে তাঁর দান অজস্র ছিল। পালকিওয়ালা টাটা উদ্যোগের বিভিন্ন কোম্পানির ডিরেক্টর হয়েছিলেন। তারপর থেকে জাতীয় গুরুত্বপূর্ণ কোনও বিষয়ের মামলা ছাড়া অন্য কোথাও যুক্ত হতেন না।

তাঁর সঙ্গে আবার আমার দেখা হয়েছিল বম্বে এয়ারপোর্টে। তখন আমি লন্ডনের কমনওয়েলথ প্রেস ইউনিয়নের বার্ষিক সভায় আয়োজন করছি। দিল্লির সেই সভায় আমার নিমন্ত্রণে পালকিওয়ালা বক্তৃতা করতে রাজি হয়েছিলেন। কমনয়েলথের সব দেশ থেকে প্রতিনিধি সেই সভায় যোগ দিয়েছিলেন। লন্ডন টাইমস, ডেলি টেলিগ্রাফ, গার্ডিয়ান প্রভৃতি কাগজের সম্পাদক পরিচালকেরা সেই সমাবেশে এসেছিলেন। পালকিওয়ালা ভারতীয় ঐতিহ্যের ওপর অসাধারণ এক ঘণ্টার বক্তৃতা করে শ্রোতাদের চমকিত

করেছিলেন। পালকিওয়ালার বক্তৃতার একটা ক্যাসেট করিয়েছিলাম। বাইরে থেকে আগত সদস্যেরা শ'খানেক ক্যাসেট কিনেছিলেন।

কলকাতায় দেখলাম, এখানের সম্পাদকেরা অন্য চরিত্রের মানুষ। সমাজে তাঁদের বিশিষ্ট স্থান। তাঁরাও নিজেদের বিশিষ্ট ব্যক্তি মনে করেন। বম্বেতে এমনটা দেখিনি। বেশির ভাগই পেশাদার সম্পাদক। কাগজের সম্পাদক বলে যে তাঁরা অন্য স্তরের মানুষ গণ্য হবেন, তা নয়। সংবাদপত্র কর্মীদের মধ্যে অবিসংবাদিত প্রধান, এই পর্যন্ত। আমরা বাঙালিরা সম্পাদককে অন্য মর্যাদা দিয়েছি। বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, হরিশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, বিপিনচন্দ্র পাল, শিশিরকুমার ঘোষ ভিন্ন চরিত্রের মানুষ ছিলেন। সমাজে তাঁদের সম্মানের স্থান অনেক উঁচুতে। তুষারকান্তি ঘোষ, সত্যেন্দ্রনাথ মজুমদার, বিবেকানন্দ মুখোপাধ্যায়ও স্বাভাবিক সম্মানের পাত্র। তাঁরাও মনে করতেন সংবাদপত্রের অস্তিত্বের কেন্দ্রবিন্দু তাঁরা। তাঁদের জন্যই সংবাদপত্রের সুনাম।

তুষারকান্তি দু' পুরুষের সম্পাদক। এককালে খবরের কাগজের অন্যান্য বিভাগে কাজ করেছেন। স্থির ধারণা ছিল, তিনি নিজে চেষ্টা করলে কাগজের বিক্রি অনেক বাড়াতে পারতেন।

তুষারকান্তি মোটর গাড়ি চড়তে ভালবাসতেন। গাড়ি করে দু'-একশো মাইল বেড়িয়ে আসা তাঁর ব্যসন ছিল। দিঘা দেওঘর বা পুরীর মতো জায়গা গাড়ি করে না গেলে তাঁর আনন্দ হত না। এই সব ছোট বড় যাত্রা থেকে ফিরে তিনি আমাদের খবর দিতেন কাগজের বিক্রি কত বাড়িয়ে এসেছেন।

যে শহরে যেতেন, সেখানে তাঁর সঙ্গে দেখা করতে আসতেন পরিচিত অপরিচিত মানুষ। তুষারবাবু তাদের জিজ্ঞাসা করতেন তাঁরা কোন কাগজ পড়েন। কেউ বলবেন পত্রিকা অর্থাৎ অমৃতবাজার পত্রিকা। কেউ নাম করবেন স্টেটসম্যানের। তুষারবাবু শেষোক্তদের পত্রিকা পড়তে অনুরোধ করলে তাঁরা বলতেন, হ্যাঁ এবার পত্রিকাই পড়ব। তুষারবাবুর সহকারী এই খবরটা খাতায় লিখে রাখতেন। কলকাতায় ফিরে তুষারবাবু আমাদের সেই খবর দিতেন, তাঁর অনুরোধে কত পাঠক এখন থেকে পত্রিকা পড়তে শুরু করেছে।

মালিক এবং সম্পাদক স্বয়ং শহরে এসেছেন, পত্রিকার স্থানীয় এজেন্ট (বিক্রেতা) অবশ্যই দেখা করতে আসবেন। কত কপি পত্রিকা আনান তিনি এখন, দৈনিক? তুষারবাবুর অনুরোধে তিনি পত্রিকা বিক্রি আরও বাড়াতে রাজি

হতেন। সঙ্গে সঙ্গে তাঁর চিঠিও আসত, পত্রিকা পাঠানোর সংখ্যা বাড়িয়ে দিন।

তুষারবাবু ফিরে এসে সবিস্তারে এই সব ঘটনা আমাদের বলতেন।

ততদিনে এজেন্ট তুষারবাবুর মুখরক্ষার জন্য বাড়ানো অর্ডার কমিয়ে দিয়ে আবার পুরনো চাহিদায় ফিরে গিয়েছে। সে খবর আর তুষারবাবুকে জানাবার দরকার ছিল না।

নিশ্চিত, উল্লসিত তুষারবাবু আবার পরবর্তী ভ্রমণের জন্য তৈরি হয়েছেন।

কিছু সম্পাদক ও কলম লেখকের অনড় বিশ্বাস থাকে যে তাঁদের লেখার জন্য খবরের কাগজ বিক্রি হয়, বিক্রি বাড়ে। এমন একজন কলম লেখককে আমি জানি, যাঁর দৃঢ় বিশ্বাস ছিল এবং প্রসঙ্গ উঠলেই সেই কথা বলতেন, যেদিন তাঁর কলম কাগজে ছাপা হয়, সেদিন কাগজের বিক্রি কুড়ি হাজার বেশি হয়। শোনা যায় তিনি নাকি তাঁর কাগজের প্রকাশককেও এই কথা বলেছিলেন। প্রকাশক অবশ্যই জানতেন তাঁর কাগজের কত বিক্রি এবং এও তাঁর অজানা ছিল না যে ওই লেখকের কলম প্রকাশের দিনে বিক্রির কোনও হেরফের হয় না।

এই কলম লিখিয়ের সঙ্গে আমার একদা যাতায়াতের পথে এয়ারপোর্টে দেখা হয়েছিল। তিনি তখন উল্লিখিত কাগজ থেকে অবসর নিয়েছেন। অন্য একটি সদ্য-স্থাপিত বাংলা দৈনিকের তিনি পরামর্শদাতা। আমাকে বললেন, জানেন নতুন কাগজটা খুব দ্রুত উন্নতি করছে। আমাকে বলতেই হল যে তা তো হবারই কথা, তাঁর মতো অভিজ্ঞ মানুষের পরামর্শ তারা নিয়েছে।

উল্লসিত ভদ্রলোক বললেন, শুধু উন্নতি করছে তা নয়। ওদের বিক্রি চল্লিশ হাজার ছাড়িয়ে গিয়েছে।

আমি খুব অবাক হয়েছিলাম। হয়তো তাঁর দাবি মেনে নিলেই হত। সদ্য আবির্ভূত একটা কাগজের বিক্রি চল্লিশ হাজারে পৌঁছলে আমার কোনও ক্ষতি-বৃদ্ধি নেই। তবু আমি উত্তর দিয়েছিলাম। তার কারণ ওই নতুন কাগজের মালিক মাত্র ক'দিন আগেই আমাকে বলেছিলেন, তাঁর কাগজের বিক্রি দশ হাজারে উঠেছে। হয়তো আরও বাড়ত, কিন্তু তাঁর আর বেশি ছাপার উপযুক্ত মেশিন নেই। নতুন মেশিন না আসা পর্যন্ত দশ হাজারেই আটকে থাকতে হচ্ছে।

আমি বোকার মতো কলামনিস্টকে বলে ফেললাম, চল্লিশ হাজার ছাপবে কী করে ওদের প্রেস। ওদের তো দুটিমাত্র সিলিন্ডার প্রিন্টিং মেশিন আছে। দুই

মেশিনে মিলে আট পাতার কাগজের ঘণ্টায় দে'ড় হাজার কপি মাত্র ছাপতে পারে। চল্লিশ হাজার কপি ছাপতে প্রত্যহ ছাব্বিশ ঘণ্টা মেশিন চালিয়ে ছাপতে হবে। বলেই লজ্জিত হয়েছিলাম। শুধু শুধু প্রবীণ সাংবাদিককে আঘাত দিলাম। কিন্তু তিনি আদৌ আহত বা বিব্রত হলেন না। বললেন, অত কথা আমি জানি না। চল্লিশ হাজার বিক্রি হয় এখন। ওরা নতুন মেশিনের অর্ডার দিয়েছে।

দিনে ছাব্বিশ ঘণ্টা হয় না, এবং দৈনিক কাগজ ছাপার জন্য তিন-চার ঘণ্টার বেশি বেশি সময় পাওয়া যায় না। মাঝ রাত্রের আগে সব খবর নিয়ে কাগজ তৈরি হয় না, তারপর সূর্যোদয়ের আগে ছাপবার জন্য তিন-চার ঘণ্টার বেশি সময় হাতে থাকে না। আশ্চর্য, তিনি কী করে তাঁর অসম্ভব দাবি করলেন। ভবিষ্যতের মেশিনে আজকের কাগজ ছাপা হচ্ছে, এমন অতীন্দ্রিয় ঘটনা স্বচ্ছন্দে বিশ্বাস করছেন, জোরের সঙ্গে বলতে পারছেন।

আমার মনে হয়েছিল নিজের বিশ্বাসে অনড় না থাকতে পারলে বোধহয় বড় সংবাদিক হওয়া যায় না।

কলকাতায় আসবাব পর বিজ্ঞাপনজগতের মহারথীদের সঙ্গে পরিচয় হল। ঘনিষ্ঠতাও হয়েছিল দু'-চার জনের সঙ্গে। বম্বেতে বড় কাগজের উচ্চ বৃক্ষশাখে আমার স্থান ছিল, বিজ্ঞাপনজগতের মানুষের সঙ্গে যোগাযোগ রাখার প্রয়োজন ছিল না। দায়িত্বপ্রাপ্ত আর দু'-দশজন অফিসার সে কাজ করতেন। তবুও কয়েকজনের সঙ্গে বন্ধুত্ব হয়েছিল।

সনৎ লাহিড়ি বিজ্ঞাপনের মানুষ। আসলে তার কাজ ছিল জনসংযোগের। সে ডানলপ কোম্পানিতে নিযুক্ত ছিল। পাবলিক রিলেশন্স ম্যানেজার। জনসংযোগ দেখাশোনা করত।

অডিট ব্যুরো অফ সার্কুলেশন নামের একটি সংস্থা গঠন করা হয়েছিল চল্লিশের দশকের শেষভাগে। খবরের কাগজ, বিজ্ঞাপনদাতা এবং বিজ্ঞাপন এজেন্সি, এই তিন গোষ্ঠীকে নিয়ে তৈরি হয়েছিল অডিট ব্যুরো অফ সার্কুলেশনস। আমি টাইমস অর্থাৎ সংবাদপত্রের তরফে সেই সংস্থার পরিচালক সমিতির সদস্য। সনৎ সেখানে এল বিজ্ঞাপনদাতাদের তরফ থেকে। বিজ্ঞাপন এজেন্সির তরফ থেকে বিজ্ঞাপনজগতের দিকপাল সুভাষ ঘোষালও ওই পরিচালক সমিতির সদস্য হয়েছিল।

সনৎ ছটফটে মানুষ। জোরে কথা বলে, উচ্চকণ্ঠে ছাড়া হাসতে পারে না। রসিক, অথচ প্রয়োজনে কাউকে অপ্রিয় বাক্য বলতে দ্বিধা করে না।

সুভাষ ঘোষাল বিপরীত চরিত্রের, সহজে হইচই করবার মানুষ নন। গম্ভীর গলায় কথা বলেন, নিজের কাজে কিংবদন্তি সমান।

কর্মস্থল কলকাতা হলেও দিল্লি-বম্বে যাতায়াত করতে হয় মাঝে মাঝে। যাওয়া আসার পথে পরিচিত কারও সঙ্গে দেখা হয়। তাঁদের মধ্যে যাঁর সঙ্গে প্রায়ই দেখা হত, তিনি হেমন্ত মুখোপাধ্যায়। ছায়াছবির সংগীত পরিচালনায়

তাঁর নাম সবে মধ্যগগন পার হয়েছে। অনেক ক্ষেত্রে তখনও তিনি অদ্বিতীয়। এমন বলিষ্ঠ মধুর কণ্ঠস্বর বাংলা গানের জগতে আর কারও ছিল না।

হেমন্ত মুখোপাধ্যায়ের সঙ্গে আমার বম্বেতে পরিচয় হয়েছিল। জলসা বা কোনও সভায় কখনও সখনও দেখা হয়। হেমন্ত যে বাড়িতে থাকতেন, উত্তর বম্বের খার-এ সেই বাড়ির নাম গীতাঞ্জলি। আমি থাকতাম দক্ষিণ বম্বের মালাবার হিলসে। আমার বাড়ির নামও ছিল গীতাঞ্জলি। হেমন্তের কাছে তাঁর ভক্তদের লেখা অজস্র চিঠি আসা স্বাভাবিক ছিল। আসতও নিশ্চয়ই। অসম্পূর্ণ ঠিকানা এবং ডাকঘরের কল্যাণে মাঝে মাঝে হেমন্তর চিঠি আমার বাড়ি গীতাঞ্জলিতে দিয়ে যেত ডাকপিওন। হেমন্তের বাড়ি গীতাঞ্জলিতেও কখনও আমার চিঠি পৌঁছেছে। এই কারণে তাঁর সঙ্গে কয়েকবার টেলিফোনেও কথা হয়েছে।

খামের ওপর তাঁর নাম দেখে সে চিঠি তাঁর বাড়িতে পাঠিয়ে দিয়েছি। আমার চিঠির বাক্সে চিঠি দিয়ে গিয়েছে, অবশ্যই আমার চিঠি মনে করে এমনও হয়েছে যে নামটা আর দেখিনি, চিঠিটা খুলে ফেলেছি। একবার চিঠি খুলে বুঝতে পারলাম চিঠিটা আমার উদ্দেশে নয়। প্রথম পত্রের কথা আজও মনে আছে। দাদা, আপনি নিয়মিত কোকিলের ডিম খান শুনেছি। খাবেনই তো, না হলে আপনার গলা অমন সুমিষ্ট হয়। আমিও গান করি, এখনও তেমন নাম করতে পারিনি। দয়া করে আমাকে জানাবেন, আপনি রোজ ক'টা করে কোকিলের ডিম খান। কোকিলের ডিম কোথায় পাওয়া যায়?

চিঠি খুলে ফেলার ত্রুটি স্বীকার করে, চিঠিটা হেমন্তর কাছে পাঠিয়ে দিয়েছিলাম। যদিও আমারও জানবার প্রবল ইচ্ছা ছিল, জিজ্ঞাসা করা হয়নি তিনি প্রত্যহ ক'টা কোকিলের ডিম খান।

একবার বম্বে থেকে আসবার প্লেনে হেমন্তর সঙ্গে দেখা হল। তখন প্লেনে এত ভিড় থাকত না। অনেক খালি থাকত। দু'জনে পিছনের সারিতে পাশাপাশি বসলাম। সেবার নানা গল্প হয়েছিল। এক সময় হেমন্ত বলেছিলেন, বম্বেতে কেউ আর তাঁকে ডাকে না। প্রডিউসাররাও তাঁকে ভুলতে বসেছেন। ভাগ্যক্রমে তিনি কলকাতার সঙ্গে সম্পর্ক রেখেছেন, তাই মাঝে মাঝেই তাঁর কলকাতা থেকে ডাক আসে ছবির সংগীত পরিচালনা এবং ছবিতে গান গাইবার জন্য।

অকৃতজ্ঞ বম্বের প্রতি তাঁর আক্ষেপ তাঁর কথায় ফুটে উঠল। বললেন, আমি বলেছি, তোমরা আমাকে ছবির নায়কের গান গাইবার জন্য নাও ডাকতে পার,

ভিখিরি বা জীবনযুদ্ধে পরাজিত কোনও চরিত্রের গান তো আমাকে দিতে পার। বম্বে আমাকে অকেজো করেছে, কিন্তু কলকাতা আমার মান রেখেছে।

সরল, নিরভিমান মানুষটি বম্বের বাঙালিদেরও অত্যন্ত প্রিয় ছিলেন। বহু সভাসমিতিতে আসতেন। তাঁকে দেখলে দর্শক শ্রোতা খুশি হয়ে উঠত। তাঁকে একটা গান গাইবার অনুরোধ করত। সে অনুরোধ তিনি স্বীকারও করতেন। শুধুই হারমোনিয়াম, তবলার আয়োজন নেই, তবুও গেয়েছেন। তাঁর থেকে অনেক কম ওজনের গাইয়ে বাজিয়েরা তবলা হারমোনিয়াম নিয়ে যে বায়নাক্কা করতেন, তা বিন্দুমাত্র ছিল না হেমন্তের চরিত্রে।

হরিসাধন দাশগুপ্তের ছবির উদ্বোধন হল বম্বের এক সিনেমাঘরে। ছবিটার আগে নাম ছিল, এক অঙ্গে এত রূপ। পরে নাম বদলে দেওয়া হল। হেমন্ত এবং আমি সেখানে গিয়েছিলাম। হরিসাধন আমার পুরনো বন্ধু, যদিও ইদানীং বেশি দেখা সাক্ষাৎ হয় না। তাই আমাকেও হেমন্তের সঙ্গে মঞ্চে ডাকা হল উদ্বোধন কার্যের জন্য। এইসব অনুষ্ঠানে যেমন বলতে হয় তেমনই কিছু বলেছিলাম। এবারে প্রধান অতিথি হেমন্তের পালা। তিনি মঞ্চের সামনে দাঁড়াতেই সবাই উচ্চকণ্ঠে অনুরোধ করতে থাকল, একটা গান, আপনি একটা গান করুন।

হেমন্ত বিরক্ত হয়েছেন বোঝা গিয়েছিল। ছোট একটা বক্তৃতা করলেন, গান গাইলেন না। পরে আমাকে বলেছিলেন, দেখুন তো সবাই সব সময় আমাকে গান করবার জন্য চাপ দেয়। বোঝে না, আমি বক্তৃতাও করতে পারি, আমার বলার কিছু থাকতেও পারে।

শ্রোতাদের আমি দোষ দিতে পারি না। অমন কণ্ঠের অধিকারী সমনে থাকলে কে না ক্ষণিকের জন্য সুখের সাগরে ডুব দিতে চাইবে।

হেমন্তকে আমি প্রথম দেখেছিলাম, কলকাতায়। আমরা ছাত্র। হস্টেলের অনুষ্ঠানে তাঁকে নিমন্ত্রণ করা হয়েছিল। হেমন্তকে দেখে প্রথমে চিনতে পারিনি। ধুতি, হাতগুটানো লম্বা শার্ট। পায়ে বোধ হয় চপ্পল। শেষ দেখা পর্যন্ত তাঁর পোশাকের কোনও পরিবর্তন দেখিনি। ফিল্ম ফেয়ারের তারকাখচিত অনুষ্ঠানে বছরের পর বছর দেখেছি। ওই এক পোশাক, ধুতি আর শার্ট হাতগোটানো। তাঁর বোধহয় সাজগোজের দরকার ছিল না। যেখানেই যান ভক্তবৃন্দ তাঁকে ঘিরে ধরত।

যেদিন প্লেনে পাশাপাশি বসে ঘণ্টা দুয়েক গল্প করেছিলাম, মনে হয়েছিল,

ছেলে প্রডিউসার হয়ে বউমা মৌসুমীকে নায়িকা করে ছাবি তৈরি করাটা তাঁর মনঃপূত ছিল না। ব্যস, ওই পর্যন্তই, তার বেশি কিছু বললেন না। বরং মৌসুমীর অভিনয় কুশলতার নির্বাধ প্রশংসা করেছিলেন।

এমার্জেন্সি ঘোষণার অব্যবহিত আগের সময়। শৃঙ্খলা, নিয়মানুবর্তিতা মানুষ ভুলে গিয়েছে। যখন তখন প্লেন ধরবার জন্য দীর্ঘ সময় এয়ারপোর্টে কাটাতে হয়। লখনউ থেকে কলকাতায় যাব, আমাকে দিল্লির প্লেনে তুলে দেওয়া হল। সেখান থেকে কলকাতা রওনা হলাম। সেই প্লেন লখনউ হয়ে এল, সেখানে আধঘণ্টা থামল।

অব্যবস্থার চূড়ান্ত তখন। নানা কারণ দেখানো হত। আই এ সি-র প্লেন সংখ্যা কম, উড়ান অনেক বেশি। আবহাওয়া খারাপ, কী আর করা যাবে। এমার্জেন্সি ঘোষণা হবার পরমুহূর্তে বদলে গিয়েছিল। প্লেন, ট্রেন নির্ধারিত সময়ে চলতে লাগল। দোকানদার বেশি দাম নিতে পারে না। সাধারণ মানুষ যারা ব্যক্তি স্বাধীনতা নিয়ে মাথা ঘামায় না, তারা বুঝি খুশি হয়েছিল। কিন্তু এমার্জেন্সিকে দেশের মানুষ যে সহ্য করেনি, তার প্রমাণ পাওয়া গেল কয়েকমাস পরে, যখন ইন্দিরা গান্ধী এবং তাঁর দল সম্পূর্ণ পরাজিত হলেন।

এমার্জেন্সির আগে দিল্লি অথবা বম্বে যাওয়ার পথে লখনউ আগ্রা, কিংবা নাগপুরে অনির্দিষ্ট অপেক্ষা করতে হয়েছে। সেই সময় একবার আগ্রাতে রাত্রিবাস করতে হয়েছিল। আমার সহযাত্রী ছিলেন সুভাষ ঘোষাল। বিজ্ঞাপনের জগতে অতি যশস্বী মানুষ। জে ওয়াল্টার টমসনের দ্বিতীয় পদাধিকারী, তাদের কলকাতা শাখার ম্যানেজার।

ওই সময়টা বড় আনন্দের ছিল। বিজ্ঞাপনের জগতের সুভাষ ঘোষালের সঙ্গে ক্রমশ ঘনিষ্ঠতা হয়েছিল। তখন জে ওয়াল্টার কোম্পানির রমরমা চলেছে। ভারতবর্ষের সেরা বিজ্ঞাপন এজেন্সি। ঠিক কী কারণে মনে নেই, হঠাৎ জে ওয়াল্টারের অবস্থা কাহিল হয়েছিল। তখন টমসনের প্রধান, ইংরেজ ফিলডেন সাহেব অবসর নিয়েছেন। সুভাষকে বম্বের হেড অফিসে বদলি করা হল। সুভাষ প্রমোশন চাইল না, সে কলকাতা ছাড়তে রাজি নয়। কলকাতা তার প্রিয় শহর। সে পদোন্নতি প্রত্যাখ্যান করেছিল।

অস্ট্রেলিয়া থেকে আর একজন সেই ভার নিল। সেই সাহেব কোম্পানি ভাল চালাতে পারলেন না। শেষ পর্যন্ত সুভাষকে বম্বে যেতে হল।

সুভাষ ভোজনরসিক ছিল। বম্বেতে গেলে সুভাষের সঙ্গে একবেলা ভোজন বরাদ্দ ছিল। আমরা ওবেরয় হোটেলের কাফে রয়ালে সুযোগ পেলেই যেতাম। এক সময়ে আমাদের প্রিয় সুপ ছিল ভিসিসোয়াজ, লীক এবং আলু দিয়ে তৈরি। অনেক দ্বিপ্রহর আনন্দে কেটেছে।

সুভাষ এবং সনৎ ভোজনপ্রিয় ছিল। কোথায় কী ভাল পাওয়া যায় তার হদিস রাখত।

আমাদের আর এক বন্ধু, চিদানন্দ দাশগুপ্ত। চিদানন্দ ইন্ডিয়া টোব্যাকো কোম্পানির প্রচার কার্যের প্রধান ছিল। সেও এ বি সি প্রতিষ্ঠানের সদস্য হয়েছিল। চিদানন্দর সঙ্গে আলাপ হয়েছিল অনেক পরে। তার নাম জানতাম অনেকদিন আগে। পরিচয় পত্রিকাতে গুরুতর বিষয়ে চিদানন্দের লেখা পড়েছি। তার ওপর তার নামও বেশ ভারী। আমি তার লেখা দেখে ভেবেছি, চিদানন্দ বুঝি প্রবীণ কোনও লেখক। এখন দেখা হলে জানলাম আমাদের বয়সি। একই সময় লেখাপড়া করেছি। চিদানন্দের ছায়াচিত্র সম্বন্ধে প্রভূত জ্ঞান। এক সময় সত্যজিতের সঙ্গে প্রথম ফিল্ম ক্লাব প্রতিষ্ঠা করেছে। ছায়াছবি তার মজ্জায়, সব সময় ছবি নিয়ে ভাবছে, সমালোচনা লিখছে। শেষে শখের জিনিসটা তাকে গ্রাস করেছিল। আই টি সির উঁচু পদ ছেড়ে দিল। এবারে ছবি করার মন কাজে মন দিল।

প্রথম ছোটগল্পে ছবি করেছিল। ভাল ছবি করেছিল। কিন্তু ছোটগল্প ছায়াছবিতে জমে না। টাকাও লাগে অনেক। তবু শখ ছাড়ে না। আই টি সির অমন বিশিষ্ট চাকরি ছেড়ে আমেরিকানদের স্প্যান ম্যাগাজিনে ম্যানেজিং এডিটর হয়েছিল। আবার সেই কাজ ছেড়ে পুনরায় ছবি করার কাজে লেগেছিল। এই ছবিটা বেশ ভাল হয়েছিল, কিন্তু বক্স অফিসের দাক্ষিণ্য পেল না।

আগ্রার হোটেলে অনেক রাত্রি পর্যন্ত গল্প হয়েছিল, সুভাষের সঙ্গে। বিজ্ঞাপনের জগতে সুভাষের প্রবেশ কোনও পরিকল্পিত ক্রিয়া নয়। পাটনা থেকে গ্র্যাজুয়েট হয়ে সুভাষ কলকাতা এসেছিল মামার কাছে। মামা প্রশান্ত মহলানবিশ ভারতবর্ষে আজকের অন্তর্ভেদী বিজ্ঞানচর্চা সংখ্যাতত্ত্বের প্রবর্তক। ব্যস্ত মানুষ। সুভাষ মামার সঙ্গে দেখা না করেই শহরে কাজের সন্ধানে বেরিয়ে

পড়েছিল। একটা শিক্ষানবিশীর কাজ পেয়েও গিয়েছিল সঙ্গে সঙ্গে। ভারতবর্ষের সর্বপ্রধান এজেন্সি জে ওয়াল্টার টমসনে। সেখানে শুরু। সেখানেই শেষ। স্ত্রীর তরফে সত্যজিৎ রায়েদের সঙ্গে আত্মীয়তা আছে। কলকাতার উচ্চ সমাজে সহজেই প্রবেশ ঘটেছিল। পরে সুভাষকে ঘিরেই বিজ্ঞাপনের উচ্চসমাজ তৈরি হয়। আমার বিজ্ঞাপন জগতের সঙ্গে দীর্ঘকাল সম্পর্কের সময়ে, সুভাষের মতো সর্বক্ষেত্রে সম্মানিত ব্যক্তি আর কেউ ছিল না।

সনৎ লাহিড়িও তার আপন কাজে দক্ষতা এবং অভিজ্ঞতাব জন্য সম্মান পেত। দৃঢ়চিত্ত মানুষ ছিল সনৎ। শেষ বয়সে নির্দ্বিধায় দ্বিতীয় বিয়ে করেছিল। যার সঙ্গে বিয়ে হল, তাঁকে আমরা নামেডাকে বেশি চিনতাম। রায়পুরের লর্ড সিংহ পরিবারের মেয়ে, তাঁর কথা বলার ধরনে, আচারে ব্যবহারে আভিজাত্যের ছাপ, মনে হত সকলের সঙ্গে সহজ মেলামেশা করতে পারতেন না। কিন্তু ভাল জানাশোনা হলে দেখলাম মার্জিত মিষ্টি স্বভাবের মানুষ, আভিজাত্যের উদাসীনতা ছিল না।

সনৎ অকালে চলে গেল। সামান্য শল্যচিকিৎসা এমন বাঁকা মোড় নেবে কেউ ভাবতে পারেনি।

চিদানন্দ দাশগুপ্ত তার প্রাজ্ঞতার জন্য পরিচিত। প্রচারের কাজে তার দক্ষতা। কিন্তু তার বিস্তৃততর পরিচয় তার প্রাজ্ঞতার জন্য। চিন্তাশীল, সমাজতাত্ত্বিক হিসাবে তার খ্যাতি আছে। নইপাল, সর বিদিয়া নইপালের একটি বইতে তার সঙ্গে নইপালের তিন-চার দিন ব্যাপী কথোপকথন লিপিবদ্ধ করা আছে। চিদানন্দের মতামতকে তিনি ভারতীয় চিন্তাধারা ও দৃষ্টিভঙ্গির নিদর্শন বলে উল্লেখ করেছেন।

তখন বম্বেতে থাকি। একবার কলকাতায় এসে চিদানন্দর বাড়িতে গিয়েছিলাম, নৈশ আহারের জন্য। চিদানন্দের স্ত্রী সুপ্রিয়ার আয়োজনে পরিপাটি আহার হয়েছিল। তাদের কিশোরী বড় মেয়ের সঙ্গে দেখা হল। আজকের অপর্ণা সেন। সত্যজিতের ছবিতে সেই প্রথম অভিনয় করেছে। অতি সরল ভূমিকায়। চিদানন্দ বলল, এখন আবার পড়াশুনার সময়। সত্যজিৎ আমায় বলেছে যদিও, কিন্তু পড়াশুনোর শেষে অভিনয়। তার আগে নয়। নম্র কিশোরীটি তার প্রথম অভিনয়ে জনচিত্ত আকর্ষণ করেছিল। পরে তার দ্বিতীয় ছবিতে অভিনয় আমাকে মুগ্ধ করেছিল। যদিও তখন বুঝতে পারিনি,

অভিনয়ের ক্ষেত্রেই নয়, ছবি তৈরির ব্যাপারে সর্ব বিভাগেই অপর্ণা এমন প্রতিষ্ঠা পাবে।

প্রচার জগতের যে তিন দিকপালের সঙ্গে আমার ঘনিষ্ঠতা হয়েছিল, তাঁরা তিনজনেই ব্রাহ্ম। এই যোগাযোগের তাৎপর্য ধরতে পারিনি। এঁরা ধর্মে কতটা ব্রাহ্ম বলতে পারব না। কিন্তু আচারে ব্যবহারে নীতিনিষ্ঠ ব্রাহ্মের সব গুণই তাঁদের বর্তমান ছিল। এই যোগাযোগের কোনও স্বাভাবিক কারণ খুঁজে পাইনি। শুধু মনে হয়েছে আমার ঠাকুরদার কাছ থেকেই আমি প্রথম ব্রাহ্ম সমাজের সম্বন্ধে জানতে পেরেছিলাম। তাঁর বন্ধুরা অনেকেই ব্রাহ্ম ছিলেন। তিনি অহিন্দু ছিলেন না, হয়তো সনাতনীও ছিলেন না। কিন্তু ব্রাহ্ম সমাজের প্রতি আকর্ষিত হয়েছিলেন।

বম্বেতে খেলাধুলার জগতের সঙ্গে আমার বিশেষ যোগ ছিল না কোনও দিন। কাউকে চিনতামই না। কেবলমাত্র সদ্যঅবসরপ্রাপ্ত ক্রিকেট সম্রাট বিজয় মার্চেন্ট ছাড়া। বিজয় শিল্পপতি পরিবার থ্যাকারসে গোষ্ঠীর সন্তান। অসাধারণ বক্তৃতা করতেন ক্রিকেট বিষয়ে। সচরাচর নিমন্ত্রণ প্রত্যাখ্যান করতেন না। সর্বত্র সমান আদৃত।

সেবারে কলকাতা থেকে বম্বে গিয়েছি অফিসের কাজে। বিকালে আমার হোটেলে বিজয়ভাইকে চায়ে নিমন্ত্রণ করেছি।

বিজয়ভাইয়ের জন্য অপেক্ষা করছি, হঠাৎ বিনা নোটিশে উপস্থিত হলেন তুষারকান্তি ঘোষ। তুষারকান্তি তখন কী সূত্রে বম্বে এসেছেন। বম্বেতে যথারীতি মেয়ে বুলবুলের কাছে আছেন। তিনি খবর না দিয়ে আমার ঘরে এসে পড়ায়, বেশ বিব্রত বোধ করেছিলাম। তাঁকে সে কথা বলতেও পারি না। আমি তাঁর কোম্পানিতে চাকরি করি।

তুষারকান্তি ঘোষ এবং বিজয় মার্চেন্ট দুই ভিন্নপথের পথিককে নিয়ে কী করে সন্ধ্যা কাটাব, ভেবে আকুল হচ্ছি। একজন সাংবাদিকতার মানুষ, অন্যজন খেলাধুলা। একটু পরেই নিয়মানুবর্তী বিজয় এসে পড়লেন। পরিচয় করিয়ে দিলাম। আশ্বস্ত হলাম, এঁরা পরস্পরের অপরিচিত নয়। নামে দু'জনেই দু'জনকে চেনেন। চা এসে গেল। সেদিকে মনোযোগ দিলাম।

খেলাধুলোর বিষয় এসে পড়তেই তুষারবাবু বেশ উজ্জীবিত বোধ করলেন। জিজ্ঞাসা করলেন, বিজয়ের কাছে তাঁর কোন খেলাটা সর্বাধিক স্মরণযোগ্য।

আশ্চর্য হয়ে শুনলাম তুষারবাবু বলছেন, তাঁর মতে বিজয়ের স্মরণযোগ্য ম্যাচ অন্য মাঠে এবং অন্য একটি খেলায়। আলোচনা জমে উঠল। দু'জনেই ক্রিকেটের তাবৎ রেকর্ডের সঙ্গে ওয়াকিবহাল। আমি আলোচনা ধরার বাইরে থাকলাম। খুব উচ্ছল আলোচনা হতে থাকল। আমি খেলা সম্বন্ধে বিশেষ অজ্ঞ। প্রক্ষিপ্ত হয়ে গেলাম। বিজয় স্বচ্ছন্দে স্মৃতিচারণ করতে লাগলেন, কবে কলকাতায় শেষ খেলেছেন, কেন কলকাতার দর্শক ও খেলার মাঠ তাঁর প্রিয়।

মানুষের জীবনে কত অজ্ঞাত দিক থাকে। বহুদিনের চেনা মানুষের চরিত্রেরও কতখানি আমরা হঠাৎ আবিষ্কার করে চমকে উঠি।

আড্ডা ভালবাসেন, গুরুতর বিষয়ে আপাত আগ্রহ নেই, কৌতুকের গল্প শুনতে ভালবাসেন যে তুষারবাবু, তিনি বই ছাড়া থাকতে পারতেন না। তাঁর কাছে, তিনি যেখানেই থাকুন, একটি দুটি বই অবশ্য থাকবে। এ তথ্যও আমার অগোচরে ছিল। এবং আরও আশ্চর্য তিনি দাম দিয়ে বই কিনতেন। নামী বইপত্রের পুরনো সংস্করণ, বিখ্যাত বহুপঠিত বই—তাঁর লাইব্রেরিতে মজুত থাকত। সাধারণত সব বই দু' কপি করে কিনতেন। এক কপি তাঁর কলকাতার লাইব্রেরিতে, আর একটি এলাহাবাদের লাইব্রেরির জন্য। আরও একটি বিচিত্র দিক ছিল, বিবিধ বিষয় সম্বন্ধে তাঁর আগ্রহ। আজ হয়তো হাসিরাশি পড়ছেন, কিছুক্ষণ পরেই শিবরাম চক্রবর্তীর বাড়ি থেকে পালিয়ে, তারপর অমিয়নিমাই চরিত।

স্মরণশক্তিও অসাধারণ ছিল। আমি বাল্যকালে একটা বই পড়েছিলাম, বঙ্গের রত্নমালা।

কলকাতায় একদিন দেখি তুষারবাবু দুপুরে সেই বই খুলে পড়ছেন।

আমি অবাক হতে তিনি আরও অবাক হলেন, বললেন, তুমিও এই বই পড়েছ?

বই-এর মলাট বন্ধ করে, রামদুলাল সরকারের কাহিনীটি মুখস্ত বলতে লাগলেন। রামদুলালের আনুগত্যের কথা অনর্গল বললেন, তাঁর গলা আবেগে ধরে এল।

বাবার কাছে একবার শুনেছিলাম, মানুষ বিপদে পড়লে বেশি অসহায় বোধ করে যখন তার নিকট বন্ধুরাও তাকে ছেড়ে চলে যায়। ও তো অস্বাভাবিক কিছু নয়, অন্ধকার হলে মানুষের চিরসঙ্গী ছায়াও তাকে ছেড়ে চলে যায়। উর্দু বয়েৎ-এর শেষ লাইনটা ছিল, তারিকীমে সায়াভি জুদা হোতা হ্যায় ইনসাঁ সে।

বাবা দুঃখবাদী ছিলেন না আদৌ। এমন নিষ্ঠুর শ্লোক কেন উদ্ধার করেছিলেন, জানা হয়নি।

অন্য পক্ষে বিপদের সময় বন্ধুরা যে এগিয়ে আসেন, সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দেন, তার উদাহরণ আমার অজানা নয়।

বাবাকে বলবার সুযোগ পেলাম না সে কথা। নিরুপায় হয়ে যখন বম্বে পুনে ছাড়লাম, তখন বিপর্যস্ত হয়েছিলাম সন্দেহ নেই। সেই সময় অমৃতবাজার যুগান্তরের মিহিরলাল গাঙ্গুলি না থাকলে জীবনের গতি কোন দিকে ঘুরত জানি না। বম্বে দিল্লি মাদ্রাজের কাগজ থেকে আহ্বান আসছে, বুঝতে পারছি না কোন কাজটা আমার পক্ষে শান্তির হবে, শুভ হবে।

মিহিরবাবুর জেদ আগ্রহে তাই বম্বের পঁচিশ বছরের বাস তুলে দিয়ে কলকাতা এসেছিলাম। জীবনের যে এমন মোড় ঘুরতে পারে, কোনওদিন কল্পনা করিনি।

কলকাতা ছেড়েছি পঞ্চাশ দশকের প্রথম দিকে, ফিরে এলাম সত্তর দশকের মাঝামাঝি। আমার পেশার মানুষগুলির অনেকেই আমার পরিচিত, ঘনিষ্ঠও, তবু নতুন কর্মস্থলে স্থিতু হওয়া সহজ ছিল না। মিহিরবাবু আমার জীবনযাত্রা মসৃণ করায় খুব সাহায্য করেছিলেন। ক্রমশ বাঙালির বন্ধুবৎসল সমাজে সহজ হয়ে গিয়েছিলাম। অতীতকালের স্বপ্নের মতো বম্বের জীবন ভাসা ভাসা মনে পড়ে। বুঝতে পারি, একদা প্রিয় ওই সমাজ এখন আর আকর্ষণ করে না। ধনী সফল মানুষদের সমাজ এখন আর তেমন আকাঙ্ক্ষার নয়।

ইতিমধ্যে ভারতে রাজনৈতিক স্থিতাবস্থা ফিরে এসেছে। পত্রিকায় মহা উৎসাহ নতুন উদ্যোগে নামবার সময় শুরু হল। এলাহাবাদ, লখনউ কানপুরে নতুন সংস্করণ শুরু হয়েছে। নতুন কিছু করবার আয়োজনে, ছোট ছেলের মতো আমি মনপ্রাণ সমর্পণ করেছি। একটা অসুবিধা তখন অনুভব করিনি। কোনও কাজে অর্থাভাব হয় না। কর্তাদের, বিশেষ করে তরুণবাবুর সর্বপ্রকার ব্যয়ে প্রশ্রয় ছিল। অথচ আয়ের তেমন সাচ্ছল্য ছিল না। তাঁর ব্যক্তিত্ব ছিল। সর্বত্র কর্জের আবেদন নিয়ে চলে যেতে পারতেন, যেতেনও এবং সচরাচর টাকার বন্দোবস্ত করে তবেই ফিরতেন।

এই কর্জ নেওয়াই পত্রিকা গোষ্ঠীর কাল হল। কিছুমাত্র সাহায্য পেলেন না শ্রমিক ইউনিয়নের কাছ থেকে। বরং আমার মনে হয়েছে, তারা যেন সর্বদা পত্রিকার মঙ্গলের পরিপন্থী। সামান্য কিছু মনোমালিন্য হলেই, রাত্রে স্ট্রাইক হবে, যার ফলে পরের দিন আর কাগজ বেরুবে না। ওই প্রতিক্রিয়াও বিচিত্ররূপে দেখা দেবে। সমস্ত অফিসে স্ট্রাইক হয় না। একটা ক্ষুদ্র অংশ যেমন ধরা যাক, স্টিরিও সেকশন, কুড়ি পঁচিশজন মানুষ কাজ করে সেখানে, শুধু এই অংশে স্ট্রাইক হবে, বাকি সবাই, স্টিরিওর কাজ না হলে তাদের কাজ শুরু করা যায় না। সবাই কাজের অভাবে দাঁড়িয়ে থাকবে। ভারী অসহ ব্যবস্থা ছিল।

আমরা নিরুপায় হয়ে দেখতাম, পরের দিন সকালে কাগজের বিক্রি কিছু কমে যেত। সেই ঘাটতি মিটিয়ে ওঠবার আগেই আবার অন্য কোনও অংশে একদিনের স্ট্রাইক। আবার বিক্রি কিছুটা পড়ে যাওয়া অবধারিত ছিল। ওই কলহের পদ্ধতি পত্রিকা গোষ্ঠীকেই দুর্বল করে দিয়েছিল।

সাতের দশকের শেষ হয়েছে। আটের দশক শুরু হল। মানুষ নির্ভয়ে সন্ধ্যার পরও কলকাতার পথে ঘোরাফেরা করে। কালো টাকার প্রসাদ, অশেষ মূল্যবৃদ্ধি। টাকার বর্হিমূল্য অস্থির। এক ডলারের দাম বাড়তে বাড়তে সাড়ে সাত টাকায় পৌঁছেছে। দেশের জনসংখ্যার তেইশ কোটি মানুষ দারিদ্র্য সীমার নীচে। দারিদ্র্যের পুনর্নির্ধারিত সীমা হয়েছে বছরে এগারো হাজার চারশোর নীচে। কর্মহীন মানুষের সংখ্যা চার কোটি। বাজারে কালো টাকার পরিমাণ বুঝি ষাট হাজার কোটি। ডলারের দাম সত্তরের দশকের শেষে সাড়ে আট থেকে আশির দশকের শেষে কুড়ি টাকা। সর্বব্যাপী মূল্যবৃদ্ধি।

কলকাতায় ফিরে এখানকার সাংস্কৃতিক আবহাওয়া আমাকে স্বভাবতই

আকর্ষণ করেছিল। বম্বে বাসের দরুন বহু বছর বুভুক্ষু ছিলাম। এখানে হঠাৎ বাংলা ছবি বাংলা নাটক দেখবার অজস্র সুযোগ আমাকে নতুন করে আনন্দ দিয়েছিল। যদিও তখন একটু বাড়াবাড়ি ছিল ব্রেখট নিয়ে। আমরা সদ্য ব্রেখট আয়ত্ত করেছি।

এই নতুন ধারার নাটক স্বভাবতই সবাইকে টানছিল। কিন্তু ক্রমশ ব্রেখটের বর্ণিত এক ধরনের বঞ্চনার নাটক আর মানুষের মনোরঞ্জনে যথেষ্ট হল না। বঞ্চনা তো শুধুই আর্থিক বা সামাজিক নয় তার ওপরে বাইরেও বঞ্চিত বিষয়ের সংখ্যা অনেক।

তখনও শম্ভু মিত্র দাপটের সঙ্গে রাজত্ব করছেন। শম্ভু মিত্র এবং তৃপ্তি মিত্র। প্রত্যহ সন্ধ্যায় দেখবার মতো কোনও না কোনও নাটক মঞ্চস্থ হত। ভাঙাচোরা মুক্তাঙ্গন । এ ছাড়া রবীন্দ্রসদন এবং একাডেমি মঞ্চ ছিল। কিন্তু সারা বাজারের মূল্য বৃদ্ধির সঙ্গে আমাদের নাটমঞ্চ পাল্লা দিয়ে উঠতে পারছিল না। উত্তর কলকাতার সেদিন পর্যন্ত জনপ্রিয় বাংলা নাটকগুলিও ধীরে ধীরে উঠে যেতে লাগল। অত কম টিকিটের দামে নাটক চালানো যায় না। আমেরিকায় তখন দেখেছি চল্লিশ-পঞ্চাশ ডলারের কমের আসনে নাট্যগৃহের শেষ প্রান্তে বসে প্রায় কিছুই দেখা যায় না। তবু সে নাটকে অনেক বাজনাবাদ্দি বাজে। মঞ্চ, আলোকসজ্জায় অপরূপ হয়ে ওঠে, মঞ্চকৃত্য চোখ ধাঁধিয়ে দেয়। আর আমাদের ভাঙাচোরা মঞ্চে দারিদ্র্যজনিত পোশাক পরে, সাজসজ্জা না করে, স্বাভাবিক হবার চেষ্টায় নাটক মঞ্চস্থ হয়। সেটা ভাল লাগে তার নতুনত্বের জন্যে। কিন্তু সে আকর্ষণ বহুদিন টিকতে চায় না।

আর সুখের জিনিস হল কলকাতার মিষ্টান্নের সঙ্গে নতুন করে পরিচয়। প্রতিষ্ঠিত অভিজাত বাঙালিদের সঙ্গে মিষ্টান্নের দোকানগুলি মনেপ্রাণে বাঁধা। দই কিনতে হলে তার প্রিয় দোকানেই যাবে। অন্য কোথাও নয়। রসগোল্লা? সেও চিত্তরঞ্জন ছাড়া আর কোথাও হয়? আগে কে সি দাসে যাওয়া হত। এখন কদাচ। সন্দেশ কিনতে হলে গিরিশ, নকুড়ের দোকান সিমলা স্ট্রিটে আর বাগবাজারে মাখনের দোকান। বিকেলবেলায় ভাল শিঙাড়া, সে তো দেশবন্ধু। যদি বাসনা হয় ভেজিটেবিল চপের তা হলে যেতে হয় সুরভি। আদি প্রিয় রাধাবল্লভির জন্য অবশ্যই যেতে হবে পুঁটিরামে।

আমার সামনে নতুন করে একটা সুখের খনি খুলে গেল। মৎস্য মাংসাদিতেও কলকাতা পিছিয়ে ছিল না, বলতে পারি এগিয়েই ছিল। দিলখুশা,

অনাদি, রয়াল, সিরাজ তো এখনও তাদের নামেতেই মোহজাল বিস্তার করে।

স্বদেশে ফিরে আমার প্রথমত লাভ হল কিছু পুরনো প্রায় হারিয়ে যাওয়া বন্ধুদের সঙ্গে আবার দেখা হওয়া।

সন্তোষ বোসের সঙ্গে কতকাল পরে আবার দেখা হল। চল্লিশ বছর? হাওড়ার সন্তোষ বোস প্রেসিডেন্সিতে আর্টস পড়ত। চল্লিশের দশকের পরে আর কখনও দেখা হয়নি। ইতিমধ্যে তার বিয়ে হয়েছে। তার স্ত্রী মায়া আমাকে দাদা বলে। বম্বের উষার অভাব মায়া মিটিয়ে দিয়েছে।

ত্রিশ দশকের দ্বিতীয় দিবস থেকে এই কাহিনীর শুরু। সেদিন আমি সবে স্কুলে ভর্তি হয়েছি।

এখন আশির দশকে পৌঁছেছি। কলকাতা, দিল্লি, আবার কলকাতা, বম্বে, পুনে পরিক্রমা করে অবশেষে পুনরায় কলকাতা। অর্ধশতকের ছোটবড় ঘটনা নিয়ে এই রচনা। মানুষের স্মৃতি বড় বিচিত্র। যে ঘটনা, যে মানুষ মনে তখন কিছুমাত্র দাগ কাটেনি, সেগুলি যেন স্পষ্ট মনে আছে। অন্যপক্ষে যা একদা জীবনে আলোড়ন তুলেছিল, আনন্দ অথবা যন্ত্রণায় অস্থির করেছিল তা কিছুমাত্র মনে নেই। না মনে আছে শত্রুর কথা, না মনে আছে মিত্রের কথা।

পঞ্চাশ বছর এত অল্প সময় তাই বা কে ভাবতে পেরেছিল।

মনে আছে ওই সময়ে আবার অস্থির হয়ে উঠেছিলাম। পত্রিকার কর্তৃপক্ষের ব্যবহার ত্রুটিহীন। তাদের আদেশের মধ্যেও আত্মীয়তার ছাপ থাকে। সহকর্মীরা শান্ত নিরীহ প্রকৃতির মানুষ। তবু অনুভব করছিলাম এই আবহাওয়া আমার ভাল লাগছে না। এখানে যেন সবই ভাল। শুধু কাজের আবহাওয়া নেই।

কর্তৃপক্ষ আমার মতামত স্বীকার করে নেন। সেগুলো কাজে লাগাবার সুযোগ দিতে ত্রুটি করেন না। তবুও উদ্দেশ্যে পৌঁছতে পারি না। হয়তো ব্যর্থতা আমার, আর কারওর নয়। আমি আসবার পরে পত্রিকার এলাহাবাদের হিন্দি কাগজ অমৃতপ্রভাত, লখনউয়ের হিন্দি এবং ইংরেজি অমৃতপ্রভাত এবং নর্দার্ন ইন্ডিয়া পত্রিকার শুরু হয়েছে। এবার কানপুরেও যন্ত্রপাতি বসিয়ে নর্দার্ন ইন্ডিয়া পত্রিকা শুরু করা হল। সাফল্য বড় মাপের হচ্ছে না বলে আক্ষেপ ছিল।

উত্তরপ্রদেশ আমার অজানা জায়গা। মনে হল ঘরের কাছে নতুন কিছু

করতে পারলে আনন্দ হবে। অতএব জামশেদপুরে নর্দার্ন ইন্ডিয়া পত্রিকা এবং অমৃতপ্রভাত শুরু হল। দেখলাম বিহার জায়গাটা সহজ নয়। তাও রাঁচি গেলে যেন ভাল হত। প্রথমে তাই স্থির হয়েছিল। সনৎ লাহিড়ি আমাদের পরিকল্পনা বদলে দিয়েছিল। তখন সনৎ ডানলপ কোম্পানি থেকে অবসর নিয়ে সাময়িকভাবে টাটাদের কাজ করছে। সেটা বুঝি টাটাদের শতবার্ষিকী। সনৎ আমাকে রুশি মোদির সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিল। রুশি মোদি এবং টাটা কোম্পানিতে আমার এক বহুদিনের পরিচিত ডিরেক্টর সাবাওয়ালার সঙ্গে দেখা হল। মোদি ও সাবাওয়ালা দু'জনে আমাকে বোঝালেন জামশেদপুরে কাগজ প্রকাশ করলে ফল ভাল হবে এবং টাটাদের অকুণ্ঠ সমর্থন পাওয়া যাবে।

পরে বম্বেতে জে আর ডি টাটাব সঙ্গে দেখা করেছি। তিনিও আমাদের জামশেদপুরে অভ্যর্থনা করলেন। জে আর ডি-কে তাঁর নিকটের মানুষেরা জে বলে ডাকত। এমন সদাশয় অভিজাত ভারতীয় শিল্পের শীর্ষস্থানীয় মানুষ আর দেখিনি। বুঝতে পারি আলোচনার আগে ভাল করে তৈরি হয়ে আসেন। তাই তাঁর সঙ্গে কথা বলা সহজ হয়। মানুষটাকে দেখে এক নজরেই ভাল না লেগে উপায় নেই। এমন অসাধারণ ব্যক্তিত্ব।

জে আর ডি টাটা আমাদের জামশেদপুর সংস্করণের উদ্বোধন করলেন। বক্তৃতায় পারদর্শী নন। বলা যায় লাজুক প্রকৃতির। ছোট্ট একটা লিখিত বক্তৃতা পড়লেন।

বম্বেতে পঁচিশ বছর ছিলাম। তার মধ্যে জে আর ডির বক্তৃতা শুনেছি একবারই। ইহুদি মেনুহিনকে সম্বর্ধনা জানানো হচ্ছে। জে আর ডি টাটা একটা ছোট ভাষণ দিয়েছিলেন। ছোট বলেই লিখে আনেননি। ক'টা লাইন বলতে গিয়ে বারবার হোঁচট খেলেন। মনে আছে রুশি মোদি তাঁর নাতিদীর্ঘ বক্তৃতায় নানা রসিকতা করে দর্শকদের মুগ্ধ করেছিলেন।

টাটাদের সৌজন্য এমন যে, তারপর যতবার জামশেদপুর গিয়েছি তাদের বিশেষ অতিথি নিবাসে আমার স্থান হত। নিঃশুল্ক। এবং আমাকে প্রায়ই যেতে হত।

খালি বাইরে নয় পত্রিকার ভেতরেও যথেষ্ট পরিবর্তন হচ্ছিল। এক কথায় বলা যায় একটা বিপ্লবের মতো। আজকের সংবাদপত্র পাঠকেরা পত্রিকার ইতিহাস দ্রুত বিস্মৃত হচ্ছে। ভারতীয় কংগ্রেসের জন্মের আগে অমৃতবাজার

পত্রিকা একটি বাংলা সাপ্তাহিক খবরের কাগজ হিসেবে প্রকাশিত হত। পত্রিকা ছিল প্রতিবাদের কাগজ। বিদেশি শাসকরা বলাবাহুল্য পত্রিকাকে পছন্দ করতেন না। প্রচুর বিপদের মধ্যে দিয়ে পত্রিকা প্রকাশিত হতে থাকল বাংলার একটি প্রত্যন্ত গ্রাম থেকে।

পত্রিকা শাসকদের রক্তচক্ষুকে ভয় পায়নি। দ্বিধাহীন সমালোচনা করেছে। ১৮৭২ সালে তিনশো টাকার সুনাম মূলধন নিয়ে পত্রিকা কলকাতায় উঠে এল। আজ এটা ইতিহাসের কাহিনী যে একটা সরকারি আইন, যার উদ্দেশ্য ছিল ভারতীয় ভাষার পত্রিকাদের কণ্ঠরোধ করা, তার আওতার বাইরে আসবার জন্য পত্রিকা রাতারাতি ইংরেজি ভাষায় রূপান্তরিত হয়। সেই থেকে অমৃতবাজার পত্রিকা ইংরেজি ভাষায় প্রকাশিত হয়েছে।

পত্রিকা সেই পুরনো কৃতিত্বের ওপর ভরসা করে চলেছে। বরাবর গর্ব করেছে তার খবর দেওয়ার ক্ষমতা নিয়ে। এডওয়ার্ড এইটথের সিংহাসন ত্যাগের ঘটনা সারা পৃথিবীতে পত্রিকাতে প্রথম ছাপা হয়েছিল। এই গৌরব আমি যখন কলকাতায় এলাম তখনও সযত্নে পালিশ করে রাখা হয়েছিল।

পত্রিকা প্রাচীনপন্থী বলে বাদ দিয়ে দেওয়াটা অনুচিত হবে। আই পি আই বা ইন্টারন্যাশনাল প্রেস ইনস্টিটিউট থেকে উপদেষ্টা আনিয়ে বছর কুড়ি আগে পত্রিকার খোলনলচে বদলে দেওয়া হয়েছিল। এই ধরনের সাহায্য নিয়ে মালয়ালাম মনোরমার অগ্রগতি শুরু হয়। অমৃতবাজারে এত নতুনত্ব সহ্য হয়নি। এসব আমার শোনা কথা, ওয়াকার নামে যে সাহেব এসেছিলেন পরামর্শ দেবার জন্য তিনি কাগজের টাইপ, ভাষা সাজসজ্জা সম্পূর্ণ বদলে দিয়েছিলেন। হয়তো জানতেন না বলে বা সুবিধে পাননি বলে কাগজের বিষয়বস্তুর কোনও বদল করতে পারেননি। এক অতি বৃদ্ধ নতুন পোশাকে থেকে গিয়েছিল। কয়েকমাস পরে হয়তো বা এক বছর পরে ওয়াকার ফিরে গেলেন। পত্রিকা আবার তার লোম-ওঠা পুরনো সিংহের চামড়া পরে নিশ্চিন্ত হল। দু'-একজন ছাড়া সবাই খুশি হলেন।

আমার সময়ে সেই সংস্কারের কাজ আর একবার শুরু করা গেল। বুঝতে পেরেছিলাম স্থির হয়ে পুরনো পরম্পরা আঁকড়ে বসে থাকলে কিছু হবে না। বাইরের থেকে কিছু দক্ষ অভিজ্ঞ সাংবাদিককে আনা হল সম্পাদকীয় দপ্তরে। পত্রিকায় যোগ দিলেন শংকর ঘোষ। তিনি পুরনো হিন্দুস্থান স্ট্যান্ডার্ডে কাজ করেছেন। দীর্ঘকাল বম্বের টাইমস অফ ইন্ডিয়ার পূর্ব ভারতের সংবাদদাতা

ছিলেন। বম্বেতে আমার সহকর্মীদের কাছে আমি শংকরবাবুর প্রশংসা শুনতাম। যদিও তখনও তাঁকে চিনতাম না। শংকব ভাল ইংরেজি লেখেন। বিস্তৃত লেখাপড়া করা আছে, সহজেই পত্রিকাব উন্নতি করতে পারবেন এই ভরসা ছিল। কিন্তু শংকর শান্ত প্রকৃতির মানুষ। উঁচু গলায় কথা বলেন না। কারুর সঙ্গে সংঘর্ষে যান না। বোঝা গেল তাঁর সঙ্গে হাতে-কলমে কাজ করবার অতি কুশলী দু'-একজন সহকর্মীর দরকার।

স্টেটসম্যান এবং বিজনেস স্ট্যান্ডার্ডে কাজ করার পর প্রদীপ্ত সেন আমাদের বার্তা সম্পাদক হিসেবে যুক্ত হলেন। নীচের দিকেও দু'-একজন নতুন লোক যোগ করা হল। কিন্তু অচলায়তনকে নড়ানো অত সহজ নয়, যে অচলায়তন নিজের গৌরবের ভারে ন্যুব্জ হয়ে পড়েছে।

তবু পত্রিকাতে একটা নতুন হাওয়া বইতে শুরু করেছে। আমরা উৎফুল্ল হয়ে উঠলাম। ইতিমধ্যে আমার সঙ্গে এসে যোগ দিয়েছে একটি বুদ্ধিমান আধুনিক যুবক। তার নাম তুহিনকান্তি ঘোষ। তরুণবাবুর বড় ছেলে। বিশ্ববিদ্যালয়ের অতি উজ্জ্বল ছাত্র। বাল্য ও কৈশোরে এলাহাবাদে কেটেছে বলে বাঙালিদের সংকীর্ণ মনোভঙ্গির বাইরে যেতে পেরেছে। আমার সঙ্গে মনের মিলও হয়েছিল খুব। দু'জনে মিলে বহু পরিকল্পনা করেছি।

রীতি ও অভ্যাসের জগদ্দল পাথর সরানো তুহিন ও আমার সাধ্য ছিল না। পত্রিকা গোষ্ঠীর অগ্রগতি চলতে লাগল মন্থরে। ইতিমধ্যে যুগান্তরের প্রখ্যাত বার্তা সম্পাদক অবসর নিয়েছিলেন। তাঁর স্থান নিলেন আনন্দবাজার থেকে আসা অমিতাভ চৌধুরী। অমিতাভ প্রাক্তন শান্তিনিকেতনিক। দীর্ঘকাল, সম্ভবত তাঁর প্রথম কর্মজীবন থেকে আনন্দবাজারে কাজ করেছেন। যুগান্তরে আসাতে আনন্দিত হলাম।

খানিকটা নতুন প্রাণের জোয়ার এল পত্রিকা গোষ্ঠীতে। আসলে, খবরের কাগজ হল বৃন্দ-বাদনের মতো। অনেক যন্ত্রী একসঙ্গে আসরে নামে। তারা এক সুরে একতানে বাজালে ঐকতান হয়, নইলে হট্টগোল। বিভিন্ন বিভাগকে একভাবে উদ্বুদ্ধ করতে না পারলে খবরের কাগজ ভাল চলে না, তার উন্নতি লব্ধ হয় না।

এই সময় পত্রিকা বাড়িতে আর একজনকে পাওয়া গেল। সে খবরের কাগজে, স্টেটসম্যানে বহুদিন যুক্ত ছিল, জ্যোতির্ময় দত্ত। জ্যোতির্ময় নানা গুণের অধিকারী। সে যেন যে কোনও কাজই করতে পারে। প্রবন্ধ লেখা থেকে

রিপোর্টিং পর্যন্ত। যে কোনও কাজ দিলে অবিলম্বে সম্পন্ন করতে পারে। প্রেসিডেন্সি কলেজের মেধাবী ছাত্র। ইংরেজি, বাংলা উভয় ভাষায় সিদ্ধহস্ত। তার মাথায় নিত্য নতুন আইডিয়া।

জ্যোতির্ময় পত্রিকা এবং যুগান্তরে নিয়মিত কলম লিখতে শুরু করল। মোহনবাগান ক্লাবের জয়ন্তী উপলক্ষে বিশ্ববিশ্রুত ফুটবলার পেলে আসবেন, এখানে প্রদর্শনী খেলা হবে। শহরে তাই নিয়ে তুমুল উত্তেজনা। যথারীতি টিকিটের জন্য হাহাকার। আমরা এই উৎসবের সমস্ত ঘটনা পরিপূর্ণভাবে প্রকাশের জন্য তৈরি হচ্ছি। পূর্বাহ্ণে পেলের সঙ্গে যোগাযোগ করতে পারলে বিশেষ রিপোর্ট লেখা যায়। কিন্তু তাঁর সঙ্গে যোগাযোগের সমস্ত চেষ্টা ব্যর্থ হচ্ছে।

বুদ্ধিটা জ্যোতির্ময়ের মাথায় এসেছিল সম্ভবত। অথবা অমিতাভ চৌধুরীই এই প্রস্তাব করেছিলেন। পেলে তখন জাপানে। তিনি জাপান থেকে কলকাতা আসবেন। অমিতাভ বললেন, কাউকে জাপান পাঠিয়ে দেওয়া হোক। সে জাপানে পেলের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে, তাঁর সঙ্গে এক প্লেনে কলকাতা আসতে পারবে। অনেক বিশেষ রিপোর্ট পাওয়া সহজ হবে। আর সব কাগজের ওপর টেক্কা দেওয়াও হবে।

আমরা তৎক্ষণাৎ রাজি। তবে, জাপান যাতায়াতের ভাড়া অনেক। পেলের ওপর বিশেষ রিপোর্টের জন্য জাপান যাওয়া ব্যয়সাধ্য। তা ছাড়া, এই খবরের জন্য এত ব্যয় সমীচীন হবে তো? কম খরচে আমাদের অভীষ্টে পৌঁছতে বুদ্ধি কে দিয়েছিলেন এখন আর মনে নেই। স্থির হল, আমাদের প্রতিনিধি এখান থেকে আগেই ব্যাঙ্কক চলে যাবে। সেখান থেকে পেলের সঙ্গে কলকাতার প্লেন ধরবে। কিন্তু, এ তো খেলার রিপোর্ট নয়, তার অধিক। আমাদের প্রতিনিধিকে বুদ্ধিমান মানুষ হতে হবে। কোথাও ভুল হলে চলবে না। ভুল হলে সব আয়োজন ব্যর্থ হবে। কাকে পাঠানো যায়? খেলাধুলা বিভাগের কেউ না হলে আর কে হতে পারে? সবারই অব্যর্থ মনে হল. জ্যোতির্ময় দত্ত। ইংরেজি বাংলা উভয় ভাষাতেই পটু। তার নানা বিষয়ে অভিজ্ঞতা। কৌশলী।

সুতরাং, জ্যোতির্ময়কে পাঠানোর আয়োজন হল। আমাদের প্রত্যাশা অভ্রান্ত ছিল। পেলের পাশে বসে কলকাতায় ফিরে জ্যোতি পেলের সঙ্গেই গ্র্যান্ড হোটেলেই উঠবে, যাতে সুইমিং পুলের ধারে, বা লাউঞ্জে তাঁর সঙ্গে কথা বলবার আরও সময় ও সুযোগ পায়। সব কাজ পরিকল্পনা অনুসারে নির্ভুল

হয়েছিল। জ্যোতি গ্র্যান্ড হোটেলের মধ্যে পেলের সঙ্গে হোটেলে ঢুকল, অন্য সব সাংবাদিকরা পাহারার ঘেরাটোপ কাটিয়ে হোটেলের ভিতরেই ঢুকতে পারল না, তাদের উত্তেজনার শেষ নেই।

জ্যোতি এমনই আর একটা চমক দিয়েছিল বাঙালি পাঠকদের। ধারণাটা কী করে জ্যোতির মাথায় এসেছিল, জানি না। বলল, অফিস সাহায্য করলে একটা রোমাঞ্চকর অভিযান করতে পারে। পাল-তোলা ছোট নৌকায় করে কলকাতা থেকে শ্রীলঙ্কাযাত্রা। প্রস্তাবটা চমকপ্রদ মনে হয়েছিল। জ্যোতি বলেছিল সে ছাড়া আর একজন নাবিক যা যাত্রী থাকবে নৌকায়। বলতে পারি, অগ্রপশ্চাৎ না ভেবেই রাজি হয়ে গিয়েছিলাম। জানতাম যে নৌকাচালনায় জ্যোতির সামান্যমাত্র অভিজ্ঞতা নেই। তবু সে এই অসমসাহসিক কাজে নামতে চেয়েছিল। ছোট, পালতোলা নৌকা, যেমন ইলিশমাছের ঋতুতে গঙ্গায় অসংখ্য দেখা যায়, সেই ধরনের। জ্যোতি বইপত্র পড়ে নৌকার ডিজাইন করে ফেলল। গঙ্গার কোনও অখ্যাত ঘাটে অজানা মিস্ত্রিদের দিয়ে নৌকাটা তৈরি করা হল। অধৈর্য মানুষ, দেরি সহ্য হয় না, তাই কয়েক রাত্রি মিস্ত্রিদের সঙ্গে জেগে নৌকা তৈরির তদারকি করল জ্যোতি।

বম্বেতে আমার বন্ধু দিলীপচাঁদ মিত্র, প্রশিক্ষিত নাবিক। কয়েক বছর সমুদ্রগামী জাহাজের ক্যাপ্টেন ছিলেন, তখন বম্বের নৌ-প্রশিক্ষণ কলেজে পড়াতেন। তাঁর সঙ্গে পরিচয় হওয়াতে জ্যোতি যেন হাতে স্বর্গ পেল। আর কী? এখন তো সবই জানা হয়ে যাবে। সবই তার আয়ত্তে! উৎসাহের প্রাবল্যে জ্যোতি ছোটখাট কোনও জিনিসের প্রতি নজর দেয়নি। তখনও একটা কম্পাস কেনা হয়নি। সঙ্গে একটা রেডিয়ো রাখার কথা মাথায় আসেনি। শেষ মুহূর্তে তড়িঘড়ি কিছু কিছু সংগ্রহ হল। জ্যোতির সঙ্গে যাবার দু'জন সঙ্গী সে নিজেই নির্বাচন করেছিল। একটি মেয়ে, অন্যটি পুরুষ। তারা অনেক ব্যাপারেই জ্যোতির সঙ্গে পাল্লা দেয়। তারা কখনও নৌকাচালনা করেনি, সমুদ্রযাত্রার কোনও অভিজ্ঞতা নেই। তারা দেখে কেমন করে দিক চিনতে হয়, পথনির্দেশ পাওয়া যায় তাও তাদের সম্পূর্ণ অজানা ছিল। অভিযানের তিনদিন আগে থেকে দিলীপ মিত্রের প্রশিক্ষণে তারা দু'জন এবং জ্যোতিও কিছু জ্ঞান আহরণ করেছিল। সেই জ্ঞানের গভীরতা কত হল, হয়তো দিলীপচাঁদ বলতে পারত। তাকে এ বিষয়ে প্রশ্ন করে নিরুদ্যম হতে চাইনি। তখন আমরাও অভিযাত্রার স্নায়ুপীড়ায় আক্রান্ত হয়েছি।

সেই অতি স্বল্প আয়োজন, ক্ষুদ্র পালক-প্রমাণ নৌকা, অনভিজ্ঞ তিন নাবিক নিয়ে এক দ্বিপ্রহরে উট্রাম ঘাট থেকে যাত্রা শুরু হল। অন্যতম প্ররোচক আমি স্বয়ং। সেদিন গঙ্গাতীরে জ্যোতিকে শুভযাত্রা ইচ্ছা করবার জন্য আগত নারী-পুরুষ যেমন উচ্ছ্বসিত কথাবার্তা বলছিলেন, আমার সেই কলতানে যোগ দেবার সাহস নেই। অনভিজ্ঞ তিনটি প্রাণীকে অকূল সাগরে ভাসিয়ে দেবার পর তাদের খবরের জন্য কতদিন অপেক্ষা করতে হবে জানি না। তারাও তটভূমিতে না পৌঁছলে সাধারণ ডাক-তারের সাহায্য ছাড়া কোনও খবর পাঠাতে পারবে না। প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের মাঝে কোথাও হারিয়ে গেলে আমরা কখনও জানতেও পারব না। নানা দুর্ভাবনায় আমি বিপর্যস্ত হয়েছিলাম। একপাশে দাঁড়িয়ে জ্যোতির স্ত্রী মীনাক্ষী অঝোরে চোখের জল ফেলছিল। কোন উৎসাহে তাকে প্রফুল্ল করব, কোন সান্ত্বনায় তাকে আশ্বস্ত করব!

সমবেত জয়ধ্বনির মধ্যে জ্যোতির নৌকা ছাড়ল। অনেক দূরে মিলিয়ে যাওয়া পর্যন্ত আমরা নির্নিমেষ চেয়ে তাকলাম।

জ্যোতি শেষ পর্যন্ত শ্রীলঙ্কা পর্যন্ত যেতে পারেনি। বিরূপ আবহাওয়ায় তাড়নায় ভাইজাগ পার হবার পর সম্ভবত তৃতীয় দিনে জ্যোতির নৌকা তীরে উঠে যায়। ভেঙেচুরেও গিয়েছিল। টেলিফোনে খবর পেয়ে একাধারে দুঃখ এবং স্বস্তি অনুভব করেছিলাম।

পত্রিকার গোষ্ঠীতে আবার বড়-ছোট নানা কাজ শুরু হয়ে গিয়েছিল। শহরের বুকের ওপর মস্ত জমি কেনা হয়েছে, সেখানে বহুতল বাড়ি তৈরির আয়োজন হচ্ছে, বড় নতুন ছাপার মেশিন কেনা হবে, দেখবার জন্য জার্মানি গিয়েছি, কলকাতায় প্রথম ফটোকম্পোজিং পত্রিকাতে বসানো হবে তারও প্রাথমিক কাজ শুরু হল। এদিকে পত্রিকার কর্জ বাড়ছে, সমরূপ আয়ও হচ্ছে না। তরুণবাবু সান্ত্রীমন্ত্রী নির্বেশেষে দৌড়ে বেড়াচ্ছেন।

আমি অনুভব করছি, ফাঁকা ভিতের ওপর এই অট্টালিকা তৈরি করে আনন্দ পাব না, হয়তো চলবেও না। তা ছাড়া, এই কাগজ দুটি আমার কল্পনার কাগজ নয়। ওরা এত করেও আধুনিক হতে পারছে না। আমার মন চঞ্চল হয়ে উঠছে। হয়তো এখনও অন্য কোনও কাগজ করবার সময় আছে। ছোট হোক, একটা মনের মতো কাগজ হলে অনেক আনন্দ পাব।

এরই মধ্যে, ত্রিশ বছরের অধিক খবরের কাগজে কাজ করবার পর, অনেক অভিজ্ঞতা হয়েছে। সুখের এবং দুঃখের। মাঝে মাঝে যেমন গভীর আনন্দ পেয়েছি, তেমনি সহসা দুর্লঙ্ঘ্য ব্যর্থতা। তবু, সুখের পাল্লাটা কম ভারী নয়।

একটা উর্দু শের মনে পড়ছে। যা পাওয়া যায়, তাই নিয়ে সন্তুষ্ট থাকতে হয়। জীবনে মাত্র একবারই বসন্ত আসে, তাতে কী? ক'টা মানুষের জীবনে একটা বসন্ত আসে? এক তবঃসুম ভি কিসে মিলতা হ্যয়।